CUR HOA768-12-P036086

গায়ত্রী

সম্পাদিকা
রায়

৪১ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮৩

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪১ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৩৮৩ ॥

P 36,086

সূচীপত্র

য়য়িণী নাই তব ভয়		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১
লার রেনেশাঁস	(গ্রন্থপরিচিতি)	সমদর্শী	১০২
য়শ্রীর জয়যাত্রা	(কবিতা)	শান্তশীল দাশ	১০৮
শ-চীন দ্বন্দ্ব	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অভয়শঙ্কর শর্মা	১০৯
াচীন ভারতের স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ	(প্রবন্ধ)	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	১১৯
স্ ডিলাইট ইজ্ গড		জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার	১২৩
কার সুভাষচন্দ্র		শিবব্রত ঘোষ	১২৫
লিক সাহিত্য	(গ্রন্থপরিচিতি)	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১
কবিতা		শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩৮
কবিতা		বাসুদেব দেব	১৪০
ান প্রসঙ্গ			১৪৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়শ্রী ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

জয়শ্রীর ৪০ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য অখ্যাত অজ্ঞাত অথচ শক্তিমান গল্প লেখকদের সাহিত্য দরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দেশের নানা প্রান্ত থেকে এ বিষয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করে এই প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে মে ১৯৭৬র পরিবর্তে ৩০শে জুন ১৯৭৬ করে দেওয়া হল।

সম্পাদক, জয়শ্রী

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

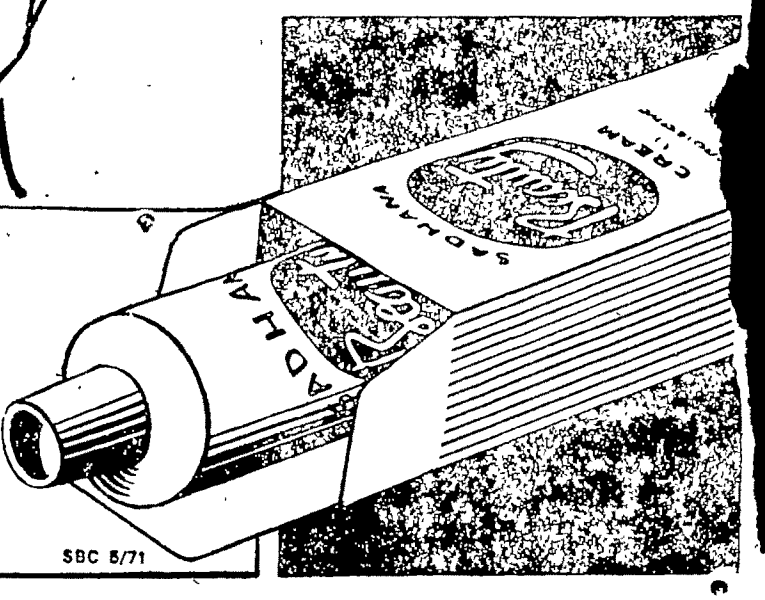

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC 5/71

জয়শ্রী

৪১ বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

ওঁ

বিভাষিনী নাই তব ভয়,
দুঃখেও নয়ন তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সমান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০ ফাল্গুন
১৩৩৮

বাংলার রেনেশাঁস

সমদর্শী

খ্যাতনামা সাহিত্যিক, অনাস্বাদিত বাচনভঙ্গির প্রাবন্ধিক, বাংলার অন্যতম শ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তিনটি লীলা বক্তৃতাবলী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ১৯৬৭ সালের লীলা বক্তৃতাবলী তিনি ১৯৭১ সালে প্রস্তুত করে পরিবেশন করেছিলেন। তাই ১৯৭১ সালে বাংলা দেশ-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং তার অঙ্কুর পূর্ব পাকিস্তানে একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মদানে বন্ধনমুক্তির যে দুর্বার আবেদন সৃষ্টি হয়েছিলো তাকেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় তথা ভারতের রেনেশাঁসকে সামনে রেখে, এই গ্রন্থে দ্বিতীয় রেনেশাঁস-এর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

অন্নদাশঙ্করের অনুপম বাক্যবিন্যাস, চিন্তার ও ভাবের যে সাবলীল গতিভঙ্গিকে তিনটি বক্তৃতার মধ্য দিয়েই বহন করে চলেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে পাঠকের মনকেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলতে হয়। গ্রন্থকারের দৃপ্ত যুক্তির স্নিগ্ধ দীপ্তি পাঠকের মনকে আলোকিত করে নিয়ে চলেছে স্বল্পপরিসর গ্রন্থের সাতাশী পৃষ্ঠার একটানা প্রবাহে তারই পথে নূতন চিন্তার আকস্মিক আলোকসম্পাত প মাঝে মাঝে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। যেমন সত্যি, তেমনি বলতে হয় গ্রন্থকারের কোনো যুক্তির দোরগোড়ায় থমকে দঁ পাঠকের কানে পরস্পরবিরোধিতার রেশ আসে, কিম্বা কোথাও বা গ্রন্থকারের ত্বরিৎ-গি সঙ্গে সায় না দিতে পেরে দ্বিধাগ্রস্ত পাঠক খেয়ে অস্বস্তি বোধ করে। এ-ছাড়া রেনেশাঁস-এর প্রকৃতির বিশ্লেষণ সূত্রে এ প্রশ্ন তুলেছেন যা পাঠককে তো ভাবিয়ে, এবং মনে হয় যেন নিজের মনের অ প্রশ্নেও পাঠককে শরিক করে তুলতে গ্রন্থকারের বিদগ্ধ মনের ও অগাধ পাণ্ডিত্যে পাতায় পাতায় আকীর্ণ হয়ে আছে।

ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে ই পরিক্রমাকে দেখেছেন এক অপরূপ মহিমায় চোখে ইতিহাসের ভেতর দিয়ে মানবমনে মুক্তির নিরন্তর অভিযান চলেছে, যাকে

...নাউন্সুয়াল কোয়েষ্ট' বলে আখ্যাত করেছেন। ...য়েনবির চোখে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে বয়ে ...লেছে চ্যালেঞ্জ এণ্ড রেসপন্স-এর প্রবাহ, অর্থাৎ কোনো সভ্যতার সামনে দুর্জয় প্রতিরোধের আবির্ভাব এবং তাকে উত্তরণের অতোধিক উদ্যোগ। এই বন্ধনমুক্তির নিরন্তর অভিযানে ছেদ পড়লে, কিম্বা সভ্যতার প্রবাহের পথে দুর্জয় প্রতিরোধের অনুদ্যোগ দেখা দিলে অথবা প্রতিরোধের শক্তির কাছে যদি উদ্যোগের আয়োজন পরাজিত হয়, ইতিহাস ও সভ্যতার প্রবাহে ছেদ পড়ে, 'ডিসকনটি-...য়িটি' দেখা দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে ইতিহাস কী কখনও সুপ্ত হয় না কেবলমাত্র সুপ্ত থাকে? ইতিহাসই ...জবাবে বলছে যে তার অবলুপ্তি কিম্বা সুষুপ্তি, ...-ই ঘটে থাকে। এই সুষুপ্তিকে অবলুপ্তি বলে ...হওয়াটা অসম্ভব নয়। সুষুপ্তিটা তাই আসলে ...সকনটিন্যুয়িটি' নয়।

রেনেশাঁস এমনি একটি সুষুপ্তি থেকে জাগরণ। ...বিংশ শতাব্দীর বাংলার তথা ভারতের এই ...প্ত জাগরণ রেনেশাঁস বা 'নবজাগরণ'-এর প্রতিষ্ঠা ...য়ছে। একইভাবে তাই চৈতন্যদেব-এর ...কার বন্ধনমুক্তির জোয়ার অপূর্ব জাগরণ এনে ...য়ছিলো, যা জীবনের সর্বাঙ্গীন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে তার আয়ু স্বল্পস্থায়ী হলেও, ভারতবর্ষের ইতিহাসে পারম্পর্যের অন্যতম ...তুবন্ধন। গ্রন্থকার নিজেই বলছেন: 'আমাদের দেশে যাঁরা রেনেশাঁসের দীক্ষা নিলেন তাদের ...ও একভাগ বলতে আরম্ভ করলেন যে আমাদের মধ্যযুগটাও ছিল অন্ধকার যুগ। কিন্তু সে কথা বললে যে ইসলাম প্রভাবিত আরব্য ও পারসিক ঐতিহ্য ক খর্ব করা হয় তাই নয় নামক কবীর চৈতন্য প্রবাহকেও উপেক্ষা করা হয়। মধ্যযুগ নিয়ে এই যেমন এক সমস্যা তার পূর্ববর্তী যুগ নিয়েও তেমনি আরেক ইসলামী ধর্মপ্রচারকরা হয়তো তাকে অন্ধকার যুগ বলে অশ্রদ্ধা করে থাকবেন, কিন্তু প্রাচীন আরবরা প্রাচীন পারস্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাচীন গ্রীকরাও ইসলাম এসে দেশশুদ্ধ মানুষকে মুসলমান করেনি, খ্রীষ্টধর্ম যেমন করেছিলো ইউরোপের মানুষকে। তেমন কোনো ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটি ইউরোপের মতো ভারতের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটে নি। (পৃঃ ৭) কিন্তু রুমানিয়ার জনৈক লেখক গ্রন্থকারকে যখন বলেন: চার হাজার বছরের বহমান সভ্যতা আপনাদের (২৯ পৃঃ) তখন তাঁর মনে খটকা বাধায় মহেঞ্জোদারো হারাপ্পার লুপ্ত সভ্যতা, বৌদ্ধধর্মের অস্তগমনের পর ইসলামের উদয় "প্রায় একই ঐতিহাসিক লগ্নে" হলেও সাময়িক ছেদের পর। এই দুই ক্ষেত্রকেই গ্রন্থকার 'ধারাভঙ্গ' বা 'ডিস্কন্টিনিউটির' স্বাক্ষর বলে মনে করেন। অথচ তাঁরই যুক্তিপ্রবাহে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এগুলি আসলে অবলুপ্তি বা ডিস্কন্টিনিউইটি নয়, সুষুপ্তি মাত্র।

গ্রন্থকার নিপুণ ব্যাখ্যায় ইউরোপের রেনেশাঁসের পরম্পরাকে চার শতাব্দীর ব্যাপ্তি দিয়ে পর পর রেনেশাঁস, রিফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট ও ফরাসী

বিপ্লবের স্তর-বিন্যাসে সাজিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ভারতের রেনেশাঁস, রিফরমেশন, এনলাইটেন-মেণ্টকে একই শতাব্দীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন; গান্ধীজীর গণআন্দোলনকে দেশ কাল ভেদে ফরাসী বিপ্লবের স্থলবর্তীরূপে দেখেছেন। রাজা রামমোহন পশ্চিমের এই আলোকে সর্বপ্রথম আমাদের দেশে স্বাগত জানিয়েছেন এবং চার শতাব্দীর আলো একই সঙ্গে আমাদের উপকূলে এসে পৌঁছায়। কিন্তু আমাদের দেশে তো তিনটিই, অর্থাৎ রেনেশাঁস রেফরমেশন এবং এনলাইটেনমেণ্ট, একই সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে। ইউরোপের মত এদের তো আলাদা আলাদা সীমানায় রেখে দেখা চলে না। অথচ গ্রন্থকার এক জায়গায় বলছেন: আপাতত রেনেশাঁস নিয়েই আমাদের আলোচনা। রিফরমেশন আমার আলোচ্য নয়" (পৃঃ ৬) তখন কেমন একটা অসঙ্গতি বোধ হয়। অথচ তিনি নিজেই যেমন বলছেন "রামমোহনের মধ্যে তিনটিই একসূত্রে গ্রথিত" (পৃ৬) তেমনি বলেছেন "আমাদের রিফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার তথা সমাজ সংস্কার আমাদের রেনেশাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেণ্ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন।" (পৃঃ ৬) প্রশ্ন আসে রেনেশাঁস-এর প্রকৃতি কী, তার পরিচয় কি দিয়ে? গ্রন্থকার বলছেন: "রেনেশাঁসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সর্বাবয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা। আর একটা মানব জীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা। তেমনি আরো একটি লক্ষণ হলো মানবিক ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ স্বীকার না করা। (পৃঃ ১০) এটা সম্ভব হবে মানবমনের সর্বাঙ্গীন বন্ধনমুক্তির ভেতর দিয়ে, যা অভিব্যক্ত হয়ে উঠবে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, কলা প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং ভক্তি ও আপ্তবাক্যের পরিবর্তে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে। এই সামগ্রিক সংস্কার ছাড়া রেনেশাঁস-এর কী অবশিষ্ট থাকে সেটা ভেবে কূল পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়লে মনে হয় গ্রন্থকার অন্তত ধর্ম-সংস্কারকে রেনেশাঁস-এর সীমানা থেকে সন্তর্পণে বাইরে রেখে গেছেন। বোধহয় সমাজ সংস্কারকেও। রামমোহন যেমন প্রথম পশ্চিমের জাগরণকে চিনতে পেরেছিলেন এবং নব ভগীরথের মত বাংলার উপকূলে বইয়ে দিয়েছিলেন তেমনি তিনি ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি সংস্কারেও পুরোগামী ছিলেন এই জন্য যে এই সংস্কারগুলি রেনেশাঁস-এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ, রেনেশাঁসকে চিনতে হলে এই সংস্কারগুলিকে তো অবশ্যই চিনতে হবে। অথচ, রামমোহন তো বেদান্তে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়ে গেছেন, এবং গ্রন্থকারও বলেছেন: "তিনি স্বয়ং ছিলেন জবরদস্ত মৌলবী, প্রচণ্ড বৈদান্তিক, প্রগাঢ় খ্রীষ্টভক্ত।" (পৃঃ ৯)

রেনেশাঁস-এর সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নের উত্তর গোটা গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকলেও গ্রন্থ শেষে মনে যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যায়। প্রাচীন ভারতের বনিয়াদকেই তো

পশ্চিমের নবজাগরণ প্রবল বেগে আলোড়িত করে তার সুষুপ্তি ভাঙিয়ে দিলো? প্রাচীন প্রাচ্যের সঙ্গে নবীন প্রতীচ্যের সমন্বয় ঘটে গিয়ে প্রাচ্যে নতুন জীবনের বেগবান স্পন্দন সুরু হোলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এই নবজাত বন্ধনমুক্তির আবেগ সকল জড়তা, অজ্ঞানতা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। সনাতনীদের প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করে তাকে প্রতিহত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। রামমোহন. বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ পুরোধাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তার সামনে এদের পিছু হটতে হোলো। ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকলে যে ফসল তোলা যায় না তারই উল্লেখ করে গ্রন্থকার বলেছেন: "নতুন আইডিয়ার জন্য বাংলার মন প্রস্তুত ছিল। পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃত ও পারসিকচর্চা প্রস্তুতির কাজ করে রেখেছিল। বহুকালের কর্ষিত ক্ষেত্রে নতুন বীজ বপন করতে না করতেই তা অঙ্কুরিত হলো। সাত সমুদ্র পারের অচেনা ভাষা ও ভাব আত্মসাৎ করতে এক পুরুষও লাগল না।" (পৃঃ ১৬) এই চমৎকার বিশ্লেষণের পরও গ্রন্থকার যেন সঙ্কেদেই বলছেন: "আমাদের রেনেশাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্লাসিকাল বনেদ ছিল না।" প্রাচীন ভারতের যে ঐতিহ্য পরম্পরা বর্তমানে এসে পৌঁচেছে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তার নব নব বিকাশই তো রেনেশাঁস-এর স্ফুরণ। আজকের পশ্চাদপট তো অতীতভারত, আবার আগামীর পশ্চাদপদ হবে বর্তমান ভারত। আমাদের তো সেদিক থেকে পোক্ত ক্লাসিক্যাল বনিয়াদ রয়েছে, সেটা আমরা অস্বীকার করি কি করে? অতীতমুখিনতা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীলতার জনক, কিন্তু অতীত সিক্ততা প্রগতির পথে সহায়ক। জীবনে যদি নোঙরই না রইলো, এনলাইটেনে-মেন্টের আড়ালে তো পরানুকরণের জয়ঢাক চলবে, আত্মবিস্মরণ আচ্ছন্ন করে অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে। গ্রন্থকারের ঐতিহ্য সম্পর্কে সংশয়ও যেমন রয়েছে তেমনি ঐতিহ্যকে অস্বীকারও করেন নি! যে "উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তা অমূল্য।"

মানবিকতাবাদ রেনেশাঁসের-এর সর্বোত্তম ফসল। রামমোহন ও সহযোগীরা মিলে তার প্রথম পাঠ দিয়েছেন জার্মাণী মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাব্দী পূর্বের সেই স্বাধীন 'মানবিক বিদ্যার অনুবর্তন" (পৃঃ ৯) করে। রবীন্দ্রনাথ মানবিকতা-বাদের আর একজন শক্তিধর পুরুষ। কিন্তু এ-সম্পর্কে একটি অনুল্লেখ চোখে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ মানবিকতাবাদকে বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রচার করেছেন যে কণ্ঠ সমকালীন আর সকল কণ্ঠকে ছাপিয়ে গেছে। গ্রন্থকার বোধহয় একবারই বিবেকানন্দের উল্লেখ করে বলেছেন: "স্বামী বিবেকানন্দের মত দূরদর্শী পুরুষ সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন যদিও সেটা ধর্মনিরপেক্ষও নয়, নিরীশ্বরও নয়...তবু সেটা সামাজিক ন্যায়।" (পৃঃ ৪৪) স্বামী বিবেকানন্দের সমাজবাদ ধর্ম-নিরপেক্ষ নয় কেন, নিরীশ্বরই বা নয় কেন? স্বামী বিবেকানন্দর সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত,

বঞ্চিতদের ভাই বলে গ্রহণ করবার জন্য প্রবল আবেগই নিয়ে অলঙ্ঘনীয় আবেদন জানিয়েছিলেন এবং সেই একই সঙ্গে ধর্মকে পঞ্চাশ বছরের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে বলেছিলেন। যারা ধর্মের নামে এদের উপর অত্যাচার করতো, সমাজে এদের অপাংক্তেয় করে শোষণ করতো তাদের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। সুতরাং সমাজতন্ত্রী ভাবনার জন্য তাঁকে প্রশংসা করেও গ্রন্থকার কেন তাঁর সমাজবাদে ধর্মের ও ঈশ্বরের ছোপ লাগিয়ে দিলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এদের বন্ধন-মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম তাঁর কাছে অবান্তর। আর তাঁর ধর্মবোধের স্বরূপ কি ছিল, তিনি জীবনে ও জগৎকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে অধ্যাত্মচিন্তার কিম্বা সত্যানুসন্ধানের স্থান নির্দেশ করেছেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবলে চলবে না, সেই সঙ্গে জগতের হিতসাধন করতে হবে। এর চাইতে বন্ধন মুক্তির আর কি বড়ো কথা হতে পারে?

রিভাইভাল বা পুনরুজ্জীবন ও রেনেশাঁস নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে অনেক তুলনামূলক আলোচনা আছে। কোন্‌টা রিভাইভাল বলতে গ্রন্থকার বলেছেন যারা প্রাচীন ভারতে ফিরে যেতে চান। আর "রেনেশাঁস পন্থীদের কথা হলো পুনর্জন্ম মানে পূর্বজন্ম নয়, দেশ তার পূর্বজন্মে ফিরে যেতে পারে না। দেশকে বাঁচতে হবে কালের সঙ্গে তাল রেখে।" (পৃঃ ৫৯) এটা খুবই খাঁটি কথা। কিন্তু যারা উচ্চ কোটির বন্ধনমুক্তি চেয়েছেন, তারা কি রিভাইভাল চেয়েছেন। সসীম জগতের বাইরে অসীমের সন্ধানে যে মুষ্টিমেয় পুরুষ সাধনা করে গেছেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তাদের কি রিভাই-ভ্যালিষ্ট বলবো? বর্তমান বিজ্ঞানই বলছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের বাইরে তাদের পথ অগম্য, অথচ ইন্দ্রিয়াতীত আর এক জগতের ঝলক তারা অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। বুদ্ধিতে যা নাগাল পাওয়া যায় না, বোধি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। তবে সেই মুষ্টিমেয়দের জন্য। রামকৃষ্ণদেব যখন বলেন "যত মত তত পথ" সেটা সমন্বয়ের শীর্ষবিন্দুর ইসারা দেয়, স্বপ্রকাশ বোধি তার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। সেই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদীদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ সালে রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে মিলিত হবার দুর্বার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

"জাতীয়তাবাদই পুনরুজ্জীবনবাদের উত্থানের কারণ" (পৃঃ ৫৯) হবে কেন? জাতীয়তাবাদ মানবিকতাবাদেরই অন্যতম প্রকাশ। এ সময় জাতীয়তাবাদে গোঁড়ামি ছিল, যেমন ছিল জীবনের অন্য ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বাধীনতার যেমন রূপান্তর ঘটেছে জাতীয়তাবাদেরও তেমনি রূপান্তর ঘটেছে। আজ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। রুশ বিপ্লবও পথান্তরিত হবার ফলে সমাজবাদের সঙ্গে একনায়ক-তন্ত্রের অচ্ছেদ্য জোট বাঁধা পড়েছে, ফলে সেখানে

হয়েছে স্বাধীনতার অপমৃত্যু। তাই বলে সমাজবাদ তো অচ্ছ্যুত কিম্বা একতন্ত্রী হয়ে যায় নাই। সমাজবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার জোট আবার তাই নূতনভাবে পোক্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে দেশে দেশে। বলতে গেলে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম রেনেশাঁস-এর অন্তিম ফসল। একে পথান্তরিত করবার অশুভ শক্তি সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে শুভশক্তিও এই প্রত্যয় স্বপথে রাখবার জন্য সমানভাবে বদ্ধপরিকর।

গ্রন্থকারের অপর একটি ত্বরিৎ সিদ্ধান্তর সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। আমাদের কলোনিয়াল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এর উল্লেখ করে গ্রন্থকার বলছেন "গোড়ায় এটা ছিল সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। পরে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি "কুইট ইণ্ডিয়া" সঙ্গে সঙ্গে "ডিভাইড এ্যাণ্ড কুইট"। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র ভিতরেই উভয়ের বীজ নিহিত ছিল।" (পৃঃ ৪৭) দেশবিভাগের জন্য বঙ্কিমকে দায়ী করে অপরের কৃতকর্মের অপরাধ যাঁরা দেশকে আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন তাদের একজন পুরোধার স্কন্ধে অকারণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটা যুক্তির ও নীতির দিক থেকে অসঙ্গত। বঙ্কিমের লেখায় মুসলমান-বিরোধের প্রতিফলন সমকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। যেমন ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের লেখকদের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। কেউ বলবে না যে সংশ্লিষ্ট লেখকরা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছেন।

বাংলাদেশ-এর মুক্তি যুদ্ধকে দ্বিতীয় রেনেশাঁস বলেছেন গ্রন্থকার। তাই যদি হয় তবে এই জাগরণ মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে ফুৎকারে নিভে গেলো কেন? এই বিপ্লবের মধ্যে ভারতবর্ষের অসমাপ্ত বিপ্লবের সমাপ্তির সম্ভাবনাও এর মধ্যে কেউ কেউ দেখেছিলেন। আসলে গণতন্ত্র, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ প্রত্যয়টিই গোলবাধালো। বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের নেতৃত্ব মুসলমান-মানসের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে ধর্ম-নিরপেক্ষতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় এবং তারই ফলে গণতন্ত্রের প্রত্যয়টিতেও ধ্বস নামে এবং সমাজবাদ অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সামরিক অভ্যুত্থান নৃশংস হত্যায় মুজিবর রহমানকে অপসারিত করবার স্পর্ধা খুঁজে পেলো। বাংলাদেশ-এর দ্বিতীয় রেনেশাঁস বর্তমানে দুঃস্বপ্নের রাত্রিতে পর্যবসিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি গবেষণাগ্রন্থ বলা যেতে পারে। প্রত্যেক চিন্তাশীল বাংলাভাষীদের অবশ্য পঠনীয়।

বাংলার রেনেশাঁস। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা-৩। পাঁচটাকা।

জয়শ্রীর জয়যাত্রা

শান্তশীল দাশ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

অশুভ শক্তির সাথে অবিরাম যুদ্ধ করে করে
এগিয়ে চলার নাম বুঝি বা জীবন।
'জয়শ্রী'-জীবন কথা যখনি স্মরণ করি,
এই কথা মনে পড়ে যায়।
বিশ্বকবির দে'য়া পুত নামখানি
বুকে নিয়ে নানা বাধা বিঘ্ন-ঘেরা পথে
যে চলেছে অবিরত, দ্রুতগতি কখনো মন্থর ;
কোন অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস
করেনি-যে, তমিস্রা বিমুক্ত প্রভাতের
মন্ত্রখানি যপ করে রক্তাক্ত চরণে
চলেছে, চলেছে শুধু কতনা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে,
আর সেই আশীর্বাদ : বিজয়িনী হবে তব জয়।

সে-যাত্রা হয়নি শেষ, চল্লিশ বছর এসে গেল,
উত্থান পতন কত, কত ভাঙাগড়া
কত হাসি কত কান্না, কত আসা-যাওয়া—
আপন উদ্দেশ্য পথে অচল অটল,
দশের মঙ্গল চিন্তা, মানুষের কল্যাণ কামনা
সঙ্গী তার, নিত্য সঙ্গী, 'জয়শ্রী'র অভিযান
চলে, আজো চলে।

লীলা রায় 'জয়শ্রী'র অন্য নাম বুঝি :
মহীয়সী মূর্তিখানি দেখেছি যে তাঁর,
কোমলে কঠোরে গড়া, ত্যাগব্রতে প্রদীপ্ত জীবন ;
অবিচল সর্ব কর্মে—ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে
কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত না মৃত্যুর হাতছানি—
সব তুচ্ছ করে তার কর্ম অব্যাহত ;
সেবা তার ধ্যান জ্ঞান, দেশের মঙ্গল
ব্রত তার, সেই ব্রতে সমর্পিত সমস্ত জীবন :
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখেছি সে-রূপ
কী মহিমময়ী।
তারপর মৃত্যুসাথে সুদীর্ঘ সংগ্রাম—
সেও এক ইতিহাস উজ্জ্বল সুন্দর ;
সংগ্রামের শেষে তিরোধান
বীরাঙ্গনা বিজয়িনী বেশে।

'জয়শ্রী' আজো সে চলে বক্ষে নিয়ে তার
কবির আশিস্ আর সারথির স্মৃতি
নিরলস দীপ্ত সংগ্রামের।
সে সংগ্রাম হয়নিকো শেষ—
আজো দিকে দিকে কত দুঃখ শোক, বেদনা যন্ত্রণা,
অশ্রুজল আজো কত চোখে।
প্রসন্ন আলোকে উদ্ভাসিত
হবে যবে জীবনের সমস্ত অঙ্গন,
আনন্দে উচ্ছল,
যাত্রাশেষ হবে 'জয়শ্রী'র।
সেদিন আসেনি আজো, তারই সাধনায়
'জয়শ্রী'র জয়রথ চলুক সম্মুখে
সর্ব অকল্যাণ মুক্ত প্রসন্ন আলোকতীর্থ পথে।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ :
চৈত্র সংখ্যার পর
কিস্তি ৬

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভয়শঙ্কর শর্মা

পোমোনারেভের আশীপৃষ্ঠার সার্কুলার

অতঃপর পোমোনারেভ আশী পৃষ্ঠাব্যাপী এক সার্কুলারে প্রতিনিধিদের কাছে চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি বিষদভাবে তুলে ধরলেন। এই সার্কুলারের ভিত তৈরী হয়েছিলো ১৯৫৭র মস্কো সম্মেলনের ঘোষণার ওপর এবং চীনাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তারা সেই সম্মেলনের সর্বস্বীকৃত ঘোষণা থেকে দূরে সরে গেছে।—এই সার্কুলারে সে-সময়কার বিশ্বপরিস্থিতির প্রকৃতি নিয়ে—'character of the present era'—আলোচনাই প্রধান স্থান নেয়। কারণ এই প্রকৃতি বিচারই ছিল আসলে মৌলিক সমস্যা। সমসাময়িক কাল ইতিহাসের কোন্ পর্যায়কে উন্মোচিত করছে, সে-সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত কম্যুনিষ্টদের পক্ষে যে কাজে নামা মুস্কিল। তাদের কাছে প্রশ্ন ওঠে যুগটা কিসের—সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের, না সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের? বিপ্লবীরা কি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিখার সীমান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, না বিপ্লবের উদ্বেলিত শক্তি জনচেতনাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখানে অভিষ্ট লক্ষ্যে সেই শক্তিকে পরিচালিত করা যেতে পারে?

মতভেদটা এখানেই নিহিত ছিল। রুশ কম্যুনিষ্টদের মতে সমকালীন বিশ্ব 'সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ এবং বিপ্লব'—'imperialism, wars, and revolutions', দ্বারা প্রবলভাবে চিহ্নিত। কিন্তু রুশীদের মতে এটাতো সব নয়। সমকালীন বিশ্ব তো সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়, সমাজবাদে উত্তরণ এবং বিশ্ব সমাজবাদী সংহতি গড়বার এবং সংগঠিত করবার সময়—'disintegration of imperialism, transition to socialism, and of formation and consolidation of the world system of socialism'. সমকালীন বিশ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণের যাথার্থতা থেকে সংগ্রামের রণনীতি ও কৌশল বেরিয়ে আসবে। তখনই সমাজবাদে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, বোঝা যাবে এবং যুদ্ধ শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ঠিক ঠিক পথ নির্ণীত হবে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে চীনারা একসময় এই নীতিগুলির সমর্থক ছিল। কিন্তু পরে তারা তাদের

মত পরিবর্তন করে 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকায় বলেছে যে যুদ্ধ কিম্বা শান্তির নিয়ামকরূপে কম্যুনিষ্টরা অসহায়। এদের আসল নিয়ামক সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বোচ্চস্তরের সমরাধিনায়করা। রুশ কম্যুনিষ্টদের চোখে এই বিশ্লেষণ একেবারে অবাস্তব এবং ভ্রান্ত। শান্তি-রক্ষার শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজ-বাদ শিবির প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েছে। এরাই যুদ্ধবাজদের দমিয়ে রাখবে। এই অবস্থায় যুদ্ধের 'অনিবার্যতা' প্রচারে নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করে বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে নির্জীব করে দেওয়া হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে তাদের অগ্রিম নিরস্ত্রীকৃত করা হবে—'disarming them in advance'—।

সাকুলারে ১৯৫৭-এর মস্কো সম্মেলনে মাও-সে-তুং-এর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, মাও-ও গোড়ায় এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখন তাদের মতের অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের একই নিঃশ্বাসে 'কাগুজে বাঘ' ও অপ্রতিরোধ্য বলে বিবৃত করা চলেনা, চীনারা যা করছে। ১৯৫৭-র সম্মেলনে মাও বলেছিলেন: 'পনের বছর সময় দরকার, তারপর বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপন সম্ভব হবে'—"Everything reduces itself to gaining fifteen years. Lasting peace will then be assured throughout the world."

চীনারা বলতে চায় যারা যুদ্ধ-বিরোধী, তারা পরাধীন দেশের মুক্তিযুদ্ধেরও বিরোধী। সোভিয়েত রুশের কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে এধরণের প্রচার মিথ্যা। যুদ্ধের সম্ভাবনা অপসারিত হলে, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে। আর সহ-অবস্থান কখনই জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের পরিপন্থী নয়। সশস্ত্র সংগ্রামেরও নয়। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পন্থা অবলম্বন করতে হবে সমাজবাদী ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করবার জন্য এবং সমাজবাদ ও কম্যুনিজম-এ উত্তরণকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকায় বলা হয়েছে যুদ্ধকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই, কারণ যুদ্ধে যা ক্ষতি হবে, সমাজবাদের জয়ে তা পূরণ হয়ে যাবে। এই যুক্তি সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি কখনই গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তারা মনে করে, কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি সমাজকে শত শত বছর পিছিয়ে দিতে পারে না, কিম্বা লক্ষ লক্ষ লোকের ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ হতে পারে না—'The Communist Parties cannot permit society to be thrown back hundreds of years'.

ভারতবর্ষ, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র কিম্বা ইন্দোনেশিয়ার মত অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে সোভিয়েত রুশ-এর আর্থিক সাহায্যের সমালোচনায় কম্যুনিষ্ট চীনের নেতারা বলছেন সোভিয়েত আর্থিক সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত এই দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়ারা শক্তিশালী হয়ে নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ গ্রহণ করে। এই সমালোচনার জবাবে পোমোমারেভ-এর সাকুলারে বলা হ'ল কম্যুনিষ্টদের জানা উচিত বিপ্লবের ধাপগুলি ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না—'skip stages in the

revolution'.। জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখলও কম্যুনিষ্ট বিপ্লবে উত্তরণের একটি সুচিহ্নিত ধাপ। নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে কম্যুনিষ্টদের বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধির জন্য এই ধরণের সরকারগুলিকে সমর্থন করা উচিত। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে চীনাদের অভিযোগ খণ্ডন করে সার্কুলারে বলা হয়, সোভিয়েত রুশের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মনে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে শান্তির স্বপক্ষে ব্যাপক পপুলার ফ্রন্ট এবং গণ আন্দোলনের সৃষ্টি, যার পরিণতিতে আমেরিকা বহির্বিশ্বের তাদের সামুদ্রিক ঘাঁটিগুলি গুটাতে বাধ্য হবে। অথচ, চীনাদের নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে ঠাণ্ডা লড়াই এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

সার্কুলারের শেষ কথা, সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি 'শান্তিপূর্ণ উপায়'কে কখনই একমাত্র উপায় মনে করে না। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট দলের বিংশতম কংগ্রেসে এবং মস্কোর ১৯৫৭-এর সম্মেলনে এই পথকে অন্যান্য পথের মধ্যে একটি পথরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। চীনারাও এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলো।

সার্কুলারের উপসংহারে চীনা কম্যুনিষ্টদের আচরণের সমালোচনা করা হয়। চীনারা একদিকে বলে সমাজবাদী শিবিরের নেতা সোভিয়েত রাশিয়া, আবার অপরপক্ষে সোভিয়েত রুশের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরোক্ষ কটাক্ষ করছে, অথবা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রচার করছে। কিন্তু সোভিয়েত কম্যুনিষ্টরা, যে সব ক্ষেত্রে চীনা পার্টির সঙ্গে মতভেদ হয়েছে, সে-সম্পর্কে তারা বরং নীরব থেকেছে, লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে। ২৫শে জুন দেখা গেলো অন্যা দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা—এক আলবানিয়া বাদে—হয় চীনাদের কাছে ঐক্যের জন্য আবেদন করছে, নয়তো চীনাদের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, না হলে কমবেশী তীব্র সমালোচনা করছে। চীনের প্রতিনিধিদের নেতা পেং এই ধরণের পরিস্থিতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও ধীর-সংযত ভাবে উত্তরদানকালে পেং বল্লেন চীনের সমালোচনার বেশীর ভাগ ন্যায়সম্মত নয়। চীনা পার্টির আসল মতের সঙ্গে প্রতিনিধিদের অবহিত হওয়া উচিত। সহ-অবস্থান নীতির তারা বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, এই নীতির বাস্তব অনুশীলন তারা করে আসছেন আর বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছে চীনাদের রুশ-বিরোধী প্রচারের কারণ হোলো, এই প্রতিনিধিরা চীনের শিল্প ও কৃষির অগ্রগতিকে উসহাস করেছে। আর শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নে চীনারা বরাবরই শান্তির সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদীরা আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাবে না, পেং তা আদৌ মনে করেন না। অর্থাৎ চীনের নীতি হোলো যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য এবং শত্রুকে মহড়া নেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। ১৯৭৫

সালের মস্কৌ ঘোষণার সঙ্গে এই নীতির সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

কিন্তু ১৫শে জুন পেং-এর বক্তৃতার পর একটি ঘটনা ক্রুশ্চেভকে এবং গোটা সোভিয়েত পার্টির শিবিরকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেলো। পোমোনারেভ-এর ২১শে জুন-এর সার্কুলারে চীনা পার্টির সমালোচনার জবাবে পেং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির লেখা গোপন চিঠির আশী পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি অনুবাদ সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রচার করলেন। পোমোনারেভ-এর সার্কুলার লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে কখনও কখনও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হলেও একটি যুক্তিপূর্ণ দলিল। কিন্তু সোভিয়েত পার্টির এই গোপন চিঠিটি চীনা পার্টির উদ্দেশ্যে বল্গাহীন কট-কাটব্যে পূর্ণ। এই গোপন দলিলটিতে দুইটি রাষ্ট্রের রেষারেষি এবং সোভিয়েতের ক্ষমতা মদমত্ততার ছাপ রয়ে গেছে। এই চিঠিতে ভারত ও আলজিরিয়ার প্রতি চীনা নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে চীনাদের কাজের ফলে বুর্জোয়াদের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের শান্তির সদিচ্ছা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণকে কম্যুনিজমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহাতুর করে তুলেছে। এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে চীনারা আগে জাতীয়তাবাদী পরে কম্যুনিষ্ট এবং সামরিক বিষয়ে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে চীনাদের অসম্মতি তীব্রভাষায় নিন্দিত হয়েছে। সুতরাং এই গোপন চিঠিটির অনুবাদ পেং বুখারেষ্ট-এর কম্যুনিষ্ট সমাবেশে প্রকাশ করে চীনা কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে সোভিয়েত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির আসল মনোভাব উদ্ঘাটিত হয়ে পোমোনারেভ-এর সার্কুলারের তাত্ত্বিক যুক্তিকে লঘু করে দিলো। বলাই বাহুল্য পেং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দেশেই এই কাজটি করেছেন। আর অতো বড় চিঠির অনুবাদ সময় নিয়ে পিকিং থেকেই তৈরী করে আনা হয়েছে।

পরদিন অর্থাৎ ২৬শে জুন ক্রুশ্চেভ উন্মত্তের মত দিশেহারা হয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আক্রমণ করলো। তার বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতায় না ছিল যুক্তির বালাই, না ছিল তাত্ত্বিক আলোচনা। ব্যক্তিগত আক্রমণে তার বক্তৃতা ছিল ভরপুর। ক্রুশ্চেভ পরিষ্কার ভাষায় বললেন, বিষয়টি সোভিয়েত ও চীনা পার্টির মধ্যে মতভেদে সীমাবদ্ধ নয়—এই মতান্তরে পরিখার এক পাশে চীনা পার্টি আর অপর পাশে অন্যান্য সকল কম্যুনিষ্ট পার্টি। মাও-সে-তুঙকে নাম ধরে আক্রমণ করে বললেন, সে হচ্ছে দ্বিতীয় স্ট্যালিন, যে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না এবং বর্তমান বিশ্বের বাস্তবর্বর্জিত তত্ত্বের জাল বোনাই যার কাজ—'oblivious of any interests other than his own, spinning theories, detached from the realities of the modern world.' মা-ও-সে-তুং-এর বিরুদ্ধে আরও বিষোদগার করে ক্রুশ্চেভ বললেন: সে অতিবাম, অতি-গোঁড়া এবং প্রকৃতপক্ষে বাম

সংশোধনবাদী হয়ে গেছে—'an ultra Leftist an ultra dogmatist, indeed, a left revisionst.' চীনারা বড় বেশী যুদ্ধের কথা বলে কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের কতটুকু তারা বোঝে? চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে সোভিয়েত রুশ চীনাদের বর্জন করেছে, এই অভিযোগ তীব্রভাবে অগ্রাহ্য করে ক্রুশ্চেভ বলেন যে চীনারা তাদেরই এই কাজের ফলে সমাজবাদের ক্ষতিসাধন করেছে এবং সোভিয়েত রুশের সঙ্গে একযোগে ভারতকে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। বড় রাষ্ট্রের দেশপ্রেমের দম্ভ সম্পর্কে লেনিনের উক্তি তাদের স্মরণে রাখা উচিত। তারা কি জানে না কৌশলগত কারণে লেনিন ব্রেষ্ট-লিটভস্ক চুক্তি অনুযায়ী রুশের ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন—যার বিরোধিতা করেছিলো ট্রটস্কি। সোভিয়েত ইউনিয়নেরও সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। রুশ-ইরাণ সীমান্তে অনেক ঘটনায় সোভিয়েত রুশের মানুষ ইরাণের গুলিতে নিহত হয়েছে। সোভিয়েত রুশ যদি সীমান্ত সমস্যা সমাধানে চীনের পথ ধরতো, তবে ইরাণের সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধ বেধে যেতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সব ঘটনার পরিণতিতে যুদ্ধ বাধাবে না, কারণ সে-কাজ হবে বিপ্লব-বিরোধী।

কিন্তু ক্রুশ্চেভ সব চাইতে বিষোদ্গার করেন এই বিতর্কে চীনের অনুসৃত কতকগুলি পদ্ধতি এবং চীনের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে। তার বক্তব্য ট্রটস্কী-পন্থীদের অনুসরণে চীনারা নিজের মত অপরের ওপর জোর করে চাপাতে চায়।

ক্রুশ্চেভের পর পেং আবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন যে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং মাও-সে-তুংকে আক্রমণ করবার জন্যই ক্রুশ্চেভ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। মাও-সে-তুং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে পেং বলেন ক্রুশ্চেভ-এর চাইতে অনেক বেশী বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে মাও-সে-তুং পরিচিত। ক্রুশ্চেভতো সংশোধনবাদী এবং এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করাই তার সহজাত প্রকৃতি। যুদ্ধ? কোরিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনারা প্রমাণ করে দিয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।

ক্রুশ্চেভ পেং-এর সংযত অথচ দৃঢ় উত্তরের কোনো জবাব দেন নাই। মাও সে-তুং-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কত গভীর ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় তা অনাবৃত হয়ে গেলো। স্থির হোলো আগামী নভেম্বরে লেনিন বিপ্লব বার্ষিকীতে মস্কো বিশ্ব কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সম্মেলন বসবে। দুইটি সর্ববৃহৎ কম্যুনিষ্ট শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব কম্যুনিষ্ট মহলের অন্দরে ছড়িয়ে গেল। কোনো দল নিখাদ কম্যুনিষ্ট কোন দল লেনিনের আসল উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্বটা ক্রমে ক্রমে এই পর্যায়ে গড়িয়ে গেলো। নভেম্বর সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশন গঠন করে

বুখারেষ্ট থেকে সমবেত কম্যুনিষ্টরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলো।

বুখারেষ্ট সম্মেলনের পর

বুখারেষ্ট সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির এবং সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিভেদের রেখা, ২৯শে জুন কালির আঁচড়ে মস্কৌর 'প্রাভদা' এবং পিকিং-এর 'পিপলস ডেইলী'র সম্পাদকীয়তে ফুটে বেরুলো। জুলাইতে মস্কৌতে আপত্তিজনক সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগে ক্রুশ্চেভ 'ফ্রেণ্ডসিপ' (Friendship) নামক চীন-রুশ সাময়িক পত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। জুলাই মাসেই মস্কৌ পার্টির পত্রিকা 'কম্যুনিষ্ট' চীনাদের তাত্ত্বিক মতকে তীব্রতরভাবে আক্রমণ করলো। আর তার কিছুদিন বাদে সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বুখারেষ্ট সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে ক্রুশ্চেভের নীতির অনুমোদনরূপে বিবৃত করে 'সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ'-এর নিন্দা সেই বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত করলো। চীনাদের তাত্ত্বিক মত আনুষ্ঠানিক ভাবে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রথম 'স্খলন'রূপে—'deviations'—চিহ্নিত করলো।

তখনও সোভিয়েত কারিগররা চীনে কল-কারখানা তৈরী করছে। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কারিগরদের ফেরৎ নিয়ে আসবার জন্য কয়েক বছর পূর্বেই পিকিং-এ পত্র দিয়েছে। তাদের যুক্তি চীনে ইতিমধ্যে অনেক কারিগর তৈরী হয়ে গেছে। চীনারা আপত্তি করাতে তাদের ফেরৎ আনা হয় নাই। এরপর চীনারাই তাদের আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। ফলে সোভিয়েত-এর স্থির সিদ্ধান্ত পিকিংকে জানিয়ে বলা হয়, আগষ্টের মধ্যেই তাদের ফেরৎ নিয়ে আসা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই কারিগররা সোভিয়েত রুশে ফিরে যাবার সময় তাদের কারিগরী বিদ্যা নিয়েই ফিরে গেলো না, তাদের তৈরী নক্সাগুলিও ফেরৎ নিয়ে গেলো। সোভিয়েত রুশের এই চালে চীনের শিল্পায়ন পর্যুদস্ত হোলো, দুই দলের বিরোধ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের আকার নিলো। চীনারা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো সোভিয়েত রুশ এরকম একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে চীন-সোভিয়েত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদীরাই খুশী হবে। চীনারা চৈনিক সভ্যতা সক্রান্ত সর্বাঙ্গীণ আলোচনার জন্য ৯ই আগষ্ট মস্কৌতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের মহতী সম্মেলন বয়কট করে সোভিয়েত রুশের আচরণের মৌন অথচ মুখর প্রতিবাদ জানালো।

১৬ই আগষ্ট 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকায় লি ফু-চু (Li Fu-Chu) একটি প্রবন্ধে বলেন ১৯৫৮ সাল থেকে 'আধুনিক সংশোধনবাদী'রা ('Modern revisionists') চীনকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু পরিণামে তারা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। প্রায় একই সময়ে লি উই-হান (Li Wei-han) একটি বক্তৃতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে দাবী করলেন মাও-সে-তুং-তত্ত্ব যে

লেনিন-তত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যাতা এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ—'Mao Tse-tung ideology is Marxist-Leninism in its fullest developed form"।

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে চীনা কম্যুনিষ্টরা সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে পত্র লিখে পোমোনারেভ-এর ২১শে জুন-এর সার্কুলার-এর জবাব দিয়ে আসল প্রতি-আক্রমণ সুরু করলো। আসন্ন নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সমাবেশে এই দলিলটি চীনা কম্যুনিষ্টদের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে দিলো। এই দলিলটি ইতিমধ্যে অন্যান্য পার্টির কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দলিলটি সুরুই হয়েছে এই বলে যে চীন-রুশ বিরোধ হালের নয়, এর গোড়া ১৯৫৬-এ অনুষ্ঠিত সোভিয়েত পার্টির ২০তম সম্মেলনে। চীনারা অভিযোগ তুলেছে ভ্রাতৃসুলভ পার্টিগুলির সঙ্গে পূর্ব-আলোচনা না করে একদিকে যেমন স্ট্যালিনের সত্যিকারের ভূমিকাকে ('positive role') অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে তেমনি 'শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন'-এর একটি ভুল তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চীনাদের বক্তব্য যে তারা সে সময় এই একতরফা পদ্ধতির এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো।

এই চিঠিতেই চীনারা প্রথম বিজ্ঞাপিত করে যে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল প্রয়োগের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলো এবং পোলিশ পার্টির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ভ্রাতৃসুলভ পার্টিগুলির সম্মেলন আহ্বান করতে তারাই নিষেধ করেছিলো। সশস্ত্র বলপ্রয়োগে হাঙ্গেরিয় অভ্যুত্থানের দমন সুনিশ্চিত করবার জন্য চীনাদেরই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিলো—সে সংবাদও চীনাদের এই চিঠিতে সর্বপ্রথম ব্যক্ত হয়।

১৯৫৭-র মস্কো সম্মেলনের ১২-পার্টির ঘোষণার খসড়াতে মতভেদের দরুণ বিপ্লবের উত্তরণ সম্পর্কিত অংশে চীনাদের চাপে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চিঠিটিতে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক ভাষায় বিরোধের স্বরূপ সম্বন্ধে সোভিয়েত পার্টিকে অবহিত করবার নিরুত্তাপ প্রচেষ্টার ছাপ ছিল।

চিঠিতে বলা হয় ২রা জুন বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টি চীনা পার্টিকে লেখে। চীনারা সম্মত হয়ে প্রস্তুতির জন্য সময় চায়। ৭ই জুন সোভিয়েত পার্টি বুখারেষ্টে একটি ঘরোয়া বৈঠকের প্রস্তাব দেয়। আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে ক্রুশ্চেভের প্যারিসের বৈঠক ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পর কম্যুনিষ্টদের কৌশল কি হবে সেটাই বুখারেষ্টের প্রস্তাবিত বৈঠকে আলোচ্য। রাশিয়া আরও জানায় বৈঠকটি হবে গোপন এবং সেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নেওয়া হবে না চীনারা এই প্রস্তাবে তাদের সম্মতি জানায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ না করে চীনা পার্টির ওপর বিদ্বেষপূর্ণ অতর্কিত আক্রমণে চীনারা হতভম্ব হয়ে গেছে।.....মাও-এর 'কাগুজে বাঘ' ('Paper

tiger) তত্ত্বকে ক্রুশ্চেভ ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু লেনিন সম্বন্ধে তার কি বক্তব্য? লেনিন নিজেই বলেছেন ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পা মাটিতে গড়া —'Anglo-French imperialism has feet of clay.'

চীনাদের ১০ই সেপ্টেম্বরের চিঠি ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযানই শুধু নয়, বিদ্রোহ বলা চলে। খুব যুক্তিপূর্ণ এবং সংযত-ভাষায় রচিত। এই চিঠিতে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি প্রথম জানলো পোলিশ এবং হাঙ্গেরিয় বিদ্রোহের ধাক্কা থেকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে মাও-সে-তুং-ই রক্ষা করেছেন। কিন্তু চীনাদের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টাও এই চিঠিতে রয়েছে। আসলে মাও-সে-তুং ১৯৫৬র বিংশতিতম কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো প্রতিবাদই করেন নাই। ১৯৫৭র মস্কৌ ঘোষণার খসড়া রচনায় মাও-সেতুং ক্রুশ্চেভকে সাহায্য করেছেন এবং সেই ঘোষণায় ষোল আনা সায় দিয়েছেন।

আসলে চীনাদের জাতীয়তাবাদী সত্ত্বার উগ্রতাও এই বিরোধে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। চীনকে ফরমোজার বিরুদ্ধে রুশ সাহায্যের এবং পারমাণবিক অস্ত্র সাহায্যে রুশের অস্বীকৃতি—এই দুইটি ঘটনা নিয়ে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টির উপস্থিতিতে সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে চীনা অভিযোগ কোনো তাত্ত্বিক পর্যায়ে পড়ে না, চীনাদের জাতীয়তাবাদী সত্ত্বার লাঞ্ছনাই এই অভিযোগের মূলে কাজ করেছে।

মস্কৌর নভেম্বর সম্মেলনের প্রস্তুতি

১৯৬০-এর নভেম্বর মস্কৌতে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলনের জন্য গঠিত ২৬ দলের প্রস্তুতি কমিশন সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কৌতে সমবেত হয়। সোভিয়েত পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত হলেন দুই তাত্ত্বিক কোজলভ (Kozlov) এবং সুসলভ (Suslov)। চীনাদের তেরজনের প্রতিনিধিদের দলের নেতা ছিলেন তেং সিয়াও-পিং (Teng Hsiao-ping), চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, পেং চেন (Peng Chen) এই দলে ছিলেন। প্রস্তুতি পর্যায়ে কোজলভ ও সুসলভ-এর মহড়া নেবার জন্য তেং সিয়াও-পিং এবং পেং চেন রইলেন। আর প্রকাশ্য অধিবেশনে চীনাদলের নেতৃত্ব দেবার জন্য এসে পৌঁছালেন চীন প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান লিউ সাও-চি (Liu Shao-Chi)।

প্রস্তুতি কমিশনের বৈঠক চলে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে নভেম্বরের গোড়া পর্যন্ত। প্রস্তুতি কমিশনকে নীতি-নির্ধারক ঘোষণা প্রস্তুত করতে হবে, সেই ঘোষণা ১৯৫৭-এর মস্কৌ ঘোষণাকে আরও পূর্ণতা দান করে সকল মতের মিলিত দলিল হবে, যেই দলিল সামনে রেখে বিশ্বের সকল কম্যুনিষ্ট পার্টি একই সুরে কথা বলতে পারে।

চীনারা খসড়ার প্রতি ছত্রে ছত্রে তীব্র ও তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছে। এই খসড়া দলিলটি আলোচনার সময় অনেক দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির

প্রতিনিধিরা জানতে পারলেন চীনাদের তিক্ততার অন্যতম কারণ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র দিতে ক্রুশ্চেভের অস্বীকৃতি। চীনা সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে 'একলা চলবার' এবং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর না করবার আহ্বানের কারণও তাই—সেটাও তারা বুঝতে পারলো।

প্রস্তুতি কমিটির আলোচনায় ব্যক্তি-পূজা (Personality cult) এবং দল-পাকানো (fractionalism)—খসড়া বিবৃতিতে এই দুইটি প্রসঙ্গ উঠলে চীনারা প্রবল বিরোধিতা করে। ব্যক্তি-পূজার প্রসঙ্গ চীনাদের মনে মাও সম্পর্কে শ্রদ্ধাপ্লুত অর্ঘকে কটাক্ষ করতে পারে এবং দল-পাকানো বলতে ফ্রন্ট সংগঠনগুলিতে চীনাদের দলীয় তৎপরতাকে বোঝাতে পারে। চীনাদের জেদ এই দুইটি প্রসঙ্গ খসড়া থেকে বাদ দিতেই হবে। রুশীদের তেমনি পাল্টা জেদ রাখতেই হবে। শেষ পর্যন্ত চীনাদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলিত খসড়া তৈরী হলো এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয়রা এক অবিস্মরণীয় বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

সুসলভ খুব সংক্ষেপে অথচ খুব সোজাসুজি দুই পক্ষের তাত্ত্বিক বিচার-সমন্বিত খসড়া প্রস্তাবের একটি ভাষ্য রচনা করে প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিলেন। সুসলভ নূতন কোনো কথা না বল্লেও তার এই সংক্ষিপ্তসারটি নভেম্বর সম্মেলনের একটি উল্লেখ্য দলিল। তার টিকা-ভাষ্যের বক্তব্যে বলা হয়েছে:

১) অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তির পারস্পরিক পরিবর্তিত সম্পর্ক চীনারা বুঝতে পারে না; লেনিন-তত্ত্বেরও তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছে।

২) রুশীরা মনে করে সমাজবাদী শক্তিগুলি এতো প্রবল যে তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। চীনারা আগে বলেছিলো পনের বছর শান্তি বজায় থাকলে যুদ্ধের সুযোগ বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের এই ধারণা পাল্টে গেছে। এখন তারা মনে করে পুঁজিবাদীদের যুদ্ধ থেকে বিরত করা যাবে না।

৩) চীনারা নামে মাত্র শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সমর্থন করে এবং একই সময়ে বলে যে যুদ্ধ অনিবার্য। দুইটি পথই খোলা আছে, হয় যুদ্ধ, না হয় শান্তি। তৃতীয় কোনো পথ নাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদের হাতে মানবতা ধ্বংস হতে দিতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি, পুঁজিবাদী দেশে কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে জনসাধারণের মুক্তির লড়াই পরিচালনার সুযোগ দেবে।

৪) চীনারা অভিযোগ করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শক্তিকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করছে। সংগ্রামের বর্তমান স্তরে কৌশলের প্রয়োজন আছে। তার মানে এই নয় যে আমরা অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্ধ। একদিকে যেমন সামরিক প্রস্তুতি চলবে। আর একদিকে আদর্শ হবে নিরস্ত্রীকরণ। চীনারা তা মনে করে না। তারা তৃতীয় পন্থা, অর্থাৎ, স্থানীয় যুদ্ধের কথা বলে। এটা অবাস্তব। এ-পথে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে।

৫। পুঁজিবাদী শক্তির মহড়া নিতে হবে জনসাধারণের এবং শ্রমিকদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

পরিষদীয় পথে ক্ষমতা দখল যে আবশ্যিক সেকথা আমরা বলি না।

৬। চীনাদের মতের রূপায়ণ তাদের এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

৭। 'ব্যক্তি-পূজা'র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে চীনাদের আপত্তি আছে যদিও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দলের কাছে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে।

৮। চীনাদের মনোভাব সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কম্যুনিষ্ট শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করে।

৯। সংক্ষেপে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সোভিয়েত পার্টি এই মতভেদ দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে।

সম্মেলন আরম্ভ হবার পূর্বে খসড়া ঘোষণা ছাড়া আর একটি দলিল প্রতিনিধিদের হাতে এলো। খসড়া তো প্রস্তুতি কমিটি প্রচার করেছে। আর পরেরটি। ১২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এই চিঠিটি—৫ই নভেম্বরের তারিখ দেওয়া—সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রচার করলো। চীনাদের ১০ই সেপ্টেম্বরের প্রচারিত চিঠির জবাবে এই চিঠি। চিঠিটির মূল বক্তব্য কোনো দলীয় তত্ত্ব নয়—চীনের গণপ্রজাতন্ত্রের চাইতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এটি রচিত। এই চিঠির মূল বক্তব্য চীনারা ক্রুশ্চেভকে ব্যক্তিগতভাবে এই চিঠিতে হতমান করতে চায়। সোভিয়েত রুশ ঐক্যের খাতিরেই চীনা পার্টির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ প্রকাশ করে নাই, যদিও চীনা সংবাদপত্র পরোক্ষে সোভিয়েত পার্টিকে আক্রমণ করেছে। সৌভ্রাত্র-মূলক পার্টিগুলির মধ্যে অনৈক্যের দায়িত্ব তাই চীনা পার্টিকে বহন করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

চাই ভালো লেখা—চাই নতুন লেখক

শক্তিশালী নতুন লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা প্রকাশের সুযোগ 'জয়শ্রী'তে সর্বাগ্রে।

প্রবন্ধ হবে তথ্যবহুল মননশীল আনুমানিক তিনহাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ শেষে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব লেখাই স্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা টাইপে এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবেন। রচনার মাথায় শব্দ সংখ্যা লিখে দেবেন। রচনার সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biodata) পাঠাতে ভুলবেন না।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক, জয়শ্রী

প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

মহামতি কণাদ ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটি সংক্ষিপ্ত হলেও তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি বলেছেন—যার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অথবা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ হয়, তাকেই বলা হয় ধর্ম। মহর্ষি কণাদ অবশ্য ধর্ম বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই বুঝেছেন। এই চতুর্ব্বর্গ লাভই যে মানব-জীবনের লক্ষ্য, আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা ঋষিগণও এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু জগতের কল্যাণকামী এই ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করেছেন—দেহ ও মনের রোগই হচ্ছে এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রধান অন্তরায়। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে কোন্ কোন্ বিধি পালন করলে দেহ ও মনকে রোগমুক্ত রাখা যায়, তাঁরা তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্যনীতি বা স্বস্থবৃত্ত বলতে আমরা এই বিধানগুলিই বুঝে থাকি। অবশ্য, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ রোগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রজ্ঞ ও ক্রিয়াকুশল ভিষকের শরণাপন্ন হবেন। যেখানে উত্তম বৈদ্য, উত্তম ঔষধ, উত্তম (অর্থাৎ চিকিৎসকের আজ্ঞাকারী) রোগী ও উত্তম (অর্থাৎ বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল) পরিচারকের সমাবেশ ঘটবে, সেখানে রোগী (ব্যাধি অসাধ্য না হলে) নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হবেন। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য হচ্ছে—স্বস্থবৃত্তের অনুসরণ করে দেহ ও মনকে ব্যাধিমুক্ত রাখা। কারণ, Prevention is better than cure. কিন্তু আধিব্যাধিরূপ ভুজঙ্গের দংশন থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের মিতাহারী, মিতাচারী, মিতভাষী, ধৈর্য্যশীল ও ক্লেশ সহিষ্ণু হতে হবে। আমাদিগকে বিশেষ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি স্মরণ রাখতে হবে—'জিতং সর্বম্ জিতে রসে' অর্থাৎ যিনি রসনাকে জয় করেছেন, তাঁর সকল ইন্দ্রিয়ই স্বাভাবিক নিয়মে জিত হয়। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সেবায় অমিতাচারী, শুধু ঔষধ সেবনের দ্বারা সে যে কখনো পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না, ভারতীয় ঋষিগণ দ্বিধাহীন কণ্ঠে এ কথা প্রচার করেছেন। P 36,086

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করার ব্যাপারে পথ্যের ওপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে শুধু পথ্যের দ্বারাই রোগীকে নিরাময় করা যায়। কিন্তু যারা পথ্যবিহীন অর্থাৎ যারা হিতকর দ্রব্য পরিমিত রূপে গ্রহণ করে না, তাদের শত ঔষধেও কোনো ফল হয় না।

'বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাম্ শতৈরপি ॥'

আয়ুর্বেদের নির্দ্দেশ হচ্ছে প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষের মতো আরোগ্যকামী ব্যক্তিকেও মাত্রাশী ও পথ্যাশী হতে হবে অর্থাৎ হিতকর দ্রব্য মাত্রানুসারে গ্রহণ করতে হবে। আর শুধু পরিমিত মাত্রায় আহার গ্রহণ করলেই চলবে না, মাত্রানুসারে ব্যায়াম ও বিশ্রাম করতে হবে, যথাকালে নিদ্রিত ও জাগরিত হতে হবে, হাস্য করা, কথা বলা, পথ চলা, ইন্দ্রিয়-সেবা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই মাত্রা রক্ষা করে চলতে হবে। প্রাচীন ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন—স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংযমের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মহামতি চরকের উপদেশ হচ্ছে—খাদ্য গ্রহণের সময় কুক্ষির দু'ভাগ খাদ্যের দ্বারা ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ কর্ব্বে। অবশিষ্ট এক ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য শূন্য রাখবে। আহার-গ্রহণের সময়ে আমাদের দশটি বিধি মনে রাখতে হবে, যথা—'নাতি দ্রুতমশ্নীয়াৎ,' 'অতি দ্রুত ভোজন কর্ব্বে না', 'নাতি বিলম্বিতমশ্নীয়াৎ', 'ভোজন করতে বসে দীর্ঘ কালক্ষেপ কর্ব্বে না,' 'জীর্ণে অশ্নীয়াৎ' 'ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হলে ভোজন কর্ব্বে,' 'অজল্পন্ অহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত,' কথা না বলে, না হেসে তন্মনা হয়ে ভোজন কর্ব্বে। মহামতি চরকের আর একটি নির্দ্দেশ এই—নিজের হিতাহিত বিচার করে আহার কর্ব্বে ইত্যাদি।

ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হবার পূর্ব্বে আহার গ্রহণ করাকে আয়ুর্ব্বেদে বলা হয়েছে অধ্যশন। এই অধ্যশন যে বহু ব্যাধির মূলে, তাতে সন্দেহ নেই। নীতিবাক্যেও বলা হয়েছে—'অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।' মহামতি মাধব কর বলেছেন—

'অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলম জীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥
ন তং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তমজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ ॥'

যারা অজিতেন্দ্রিয়, পশুর মতো যারা অপরিমিত ভোজন করে, তারা সকল রোগের মূল অজীর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যারা মিতাহারী ও শাস্ত্রজ্ঞ, তাদের অজীর্ণ রোগ হয় না। যারা মূঢ়, অজিতেন্দ্রিয় ও রসনা-লোলুপ (ভোজনবিলাসী)' তাদেরই অজীর্ণ রোগ হয়ে ওঠে।

একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা আছে,—একদিন মহামনা ধন্বন্তরি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে 'কোঽরুক্, কোঽরুক্, কোঽরুক্' শব্দে একটা পাখী ডেকে উঠলো।' তাঁর মনে হোলো, পাখী তাঁকে জিজ্ঞাসা করচে 'কোঽরুক্' অর্থাৎ 'কঃ অরুক্,' 'আরোগী কে?' ধন্বন্তরি উত্তর করলেন—

'জীর্ণে হিতমিতভুক্ শতপদগামী বামপার্শ্বশায়ী।
সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্।'

অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হলে যিনি মাত্রানুসারে হিতকর দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং আহারের পর শত পদ গমন করে বামপার্শ্বে শয়ন করেন, 'তিনিই অরোগী, তিনিই অরোগী, তিনিই অরোগী।' আয়ুর্বেদের একটি নির্দ্দেশ হচ্ছে—

'ভুক্ত্বা শতপদং গত্বা বামপার্শ্বেন সংবিশেৎ।'

আয়ুর্বেদের মতে রস ছ প্রকার,—মধুর, অম্ল,

লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুকে, কষায়, মধুর ও তিক্ত রস পিত্তকে এবং কষায়, কটু ও তিক্ত রস শ্লেষ্মাকে জয় করে। স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি প্রতিদিন মাত্রানুসারে ছয় রসের সেবা কর্ব্বেন। আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে, যারা প্রতিদিন ছয় রস সেবনে অভ্যস্ত, তারা বলশালী, দীর্ঘায়ু ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। আর যারা এক রসবিশিষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত তারা প্রায়ই বলশালী হয় না, তাদের বেশি কার্য্যক্ষমতা থাকে না, তারা বিপদে অধীর হয়, ও অল্পায়ু হয়ে থাকে। এই জন্যে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ হচ্ছে—

'প্রতিদিন সমাহিত হয়ে অর্থাৎ স্থির চিত্তে আহারের মাত্রা ও কালের কথা চিন্তা করে অন্ন ও পানীয় রূপ যজ্ঞকাষ্ঠ বা সমিধের দ্বারা অন্তরগ্নিতে বা জঠরাগ্নিতে হোম কর্ব্বে।'

গীতায় বলা হয়েছে—জীবনের প্রতিটি কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করতে পারলে কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না। আমরা গীতার মন্ত্র উচ্চারণ করেই জঠরাগ্নিতে হোম করতে পারি। সে মন্ত্রটি হচ্ছে—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্মসমাধিনা॥'

অস্বাস্থ্যের কারণ কি? আয়ুর্বেদ এক কথায় তার উত্তর দিয়েছে—আহার বৈষম্যাদস্বাস্থ্যম্ অর্থাৎ আহারের বৈষম্য থেকেই ধাতুবৈষম্য ঘটে থাকে আর এই ধাতুবৈষম্যই হচ্ছে অস্বাস্থ্যের কারণ। আবার এই আহার বৈষম্যের মূলে কখনো আছে আমাদের অজ্ঞতা কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই রয়েছে আমাদের রসনালোলুপতা। আমাদের দেশে অবশ্যি এমন অনেক ভোজন বিলাসীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা নিমন্ত্রণ সভায় গিয়ে ভোজনের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সভাস্থ সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, অতি ভোজনের জন্যে যারা মৃত্যুকে বরণ করেছে, তারা শহীদের গৌরব প্রাপ্ত হননি। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে কিন্তু অতিভোজন যেমন ব্যক্তিগত জীবনের অনিষ্টের হেতু, তেমনি সামাজিক জীবনেও অকল্যাণের প্রসূতি। ভগবান মনু বলেছেন—

'অনা রোগ্যম নায়ুষ্যং অস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥'

২।৫৭

অতিভোজনের ফলে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও আয়ু হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহা স্বর্গ-প্রাপ্তির বাধা জন্মায়, অতিভোজী নিরয়গামী হয় ও লোকের দ্বারা নিন্দিত হয়, অতএব অতিভোজন বর্জ্জন কর্ব্বে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—

'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥' ৬।১৬

যারা অতিমাত্রায় ভোজন করে বা যারা একেবারেই আহার করে না, যারা অতিমাত্রায় নিদ্রা যায় বা সর্ব্বদাই জেগে থাকে, তারা যোগাভ্যাস

করতে পারে না, অর্থাৎ চিত্তকে একাগ্র করতে পারে না।

'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥'

৬।১৭

যিনি নিয়মিত ভাবে ভোজন ও চলাফেরা করেন, সকল কর্ম্মে যিনি নিয়মিতভাবে চেষ্টা করেন, যিনি যথাকালে নিয়মিত রূপে নিদ্রা যান ও নিয়মিত রূপে জেগে থাকেন, তার পক্ষেই যোগাভ্যাস দুঃখনাশক হয়ে থাকে।

তাই যিনি দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে চান, তাকে আহার-বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে মাত্রা রক্ষা করে চলতে হবে। শুধু তাই নয়, তিনি সকল বিষয়ে হিতাহিত বিবেচনা করে চলবেন। তাঁকে মনে রাখতে হবে, প্রজ্ঞাপরার্ধ বা জ্ঞানকৃত অপরাধই প্রায় সকল ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাধির কারণ। আর ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই লাভ করতে পারে না, কারণ—

'ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।'

জয়শ্রী প্রকাশনের কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬·০০

NETAJI SPEAKS
Volume One
A collection of speeches & writings
5/-

NETAJI THROUGH GERMAN LENS
Nanda Mookerjee ১২.৫০

রামমোহন
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব
সুনীল দাস ১·২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান
অনিল রায় ২·০০

জয়শ্রী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

দিস্ ডিলাইট ইজ গড

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৪, মায়ের দর্শন, পণ্ডিচেরী এসেছি। দর্শন সেরে পঁচিশে নভেম্বর মাদ্রাজে এলুম, বম্বে ফিরে যাব মনে করে, বম্বেতে অনেক কাজ ফেলে এসেছি। আমার কাজগুলো পার্টনারদের বুঝিয়ে রেখে এসেছি। জানি তারা সে ফাইল খুলেও দেখবে না, তাই ফেরার তাড়া।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রালে পৌঁছে কিন্তু অন্য খেলায় পরে গেলুম। রিজারভেশন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে রিজারভেশন স্লিপখানা হাতে নিয়ে ভাবছি আর হাতের কলমটাকে কেবল দাঁতে কাটছি। ভাবনা-রামেশ্বরমে গেলে কেমন হয়? এই আমার প্রথম যাওয়া। রামেশ্বরমের মন্দির, তাঁর বিগ্রহ। রামানদের রাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের রামেশ্বরম মন্দির দর্শন ও তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতাবলী, মন্দিরের শুচি ও সৌম্য শোভা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আচ্ছন্নের দেঁয়াল বেয়ে কারা যেন এসে হাত-ছানি দিয়ে ইসারা করে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলো। নতুন তার রঙ—নতুন তার সুর। পুরো দ্বীপটির একটা চলমান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এমনি অদ্ভুত যে রামেশ্বরমে পৌঁছে দেখি আমার দেখা ছবির সঙ্গে এর যেন তেমন কোন তফাৎ নেই। আশ্চর্য, মন্দিরে ঢুকতে গিয়েই আমার মনে হলো আগে আমি এখানে একবার যেন এ'সছি। জানিনে কেন ও কি করে এমন হলো। মায় বিগ্রহের রূপও যেন আমি হুবহু আমার মনের আয়নায় দেখেছি।

যাব কি যাবনা ভাবছি আর কলমের ক্যাপ দাঁতে কাটছি। টুক করে কলম ফসকে ঘুরে গিয়ে নিবটি এক চুমকি কালী ঠোঁটে ও দাঁতে মাখিয়ে দিতেই চিন্তায় ছেদ পড়লো। চিন্তার ডিস্ক ঘুরে যেতেই আবার নতুন ডিস্ক দেখা দিল। সে রেকর্ডে কোন গান না, এল ছবি, দ্বিধা, ভাবনা সব কিছুরই ছুটি—ভেসে উঠলো নতুন পথে চলার ছবি।

বম্বের সব কাজ-সব ভাললাগা ও অভাললাগা সব যেন কোথায় মেঘের মতো মিলিয়ে গেল। ট্যাক্সিতে এগমুর স্টেসনে পৌঁছে গিয়ে টিকিট খোঁজ করতেই বরাত জোরে এবখানা থার্ডক্লাশ স্লিপার

কোচের টিকিট পেয়ে গেলাম। রাত্রি দশটা নাগাদ গাড়ী ছেড়ে দিল, খুব সকালে ত্রিরুচন্নাপল্লী স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। পরে বহুবার এই শহরে এসেছি। রেবা নদীর ওপর ছিম-ছাম শহর। রক-টেম্পল, বিখ্যাত শ্রীরঙ্গমের মন্দির, জম্বুকেশ্বর সবই এখানে।

সকাল দশটা নাগাদ মণ্ডপম স্টেশন, এর পরেই পেরুতে হবে সেই লোহার পুল যা দ্বীপের সঙ্গে যোজকের কাজ করেছে। পুলটি পার হবার সময় প্রথম মনে হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্র এখানে এসেই বানর সেনার সহায়তায় পাথর ফেলে সমুদ্র বেঁধে সমুদ্র অতিক্রম করে রামেশ্বরমে যান সীতার খোঁজে, শ্রীলঙ্কাদ্বীপে নয়, পরে একথা কখনো আর মনে আসেনি।

রামেশ্বরম পৌঁছবার আগেই দেখি অনেক ছেলে কামরায় ঢুকে পড়েছে। এমনি একটি কালো সুঠাম ও সুশ্রী সতেরো আঠার বছরের ছেলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেই আমায় পরিষ্কার বাংলায় বললো সে গাইড। এমন পরিষ্কার বাংলা দক্ষিণে শুনতে পাব ভাবিনি। ছেলেটি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললো যে কলকাতার কুণ্ডু স্পেশ্যালের কল্যাণে সে বাংলা শিখেছে। আমি হাসিমুখে তার কাছে আমাকে সঁপে দিলুম।

রামেশ্বরম রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম দেখবার মতো। যেমন তার স্টেশন প্ল্যাটফরম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি তার রিটায়ারিং রুম। জায়গা পেয়ে খুশীতে ভরে গেলুম।

চারদিন সে দ্বীপটি ঘুরে বেড়ালুম। প্রত্যেক মুহূর্তেই যেন নতুন আবেগে, নতুন ভাবনা ও নতুন ধ্যানধারণায় কাটতে লাগলো। বেশীর ভাগ সময়ই মন্দিরেই কাটাই। মন্দিরে যেতে আসতে একটি তামিল মেয়ের দোকানে ডাব কিনে খাই। নারকেলের দেশ। মাঝে মাঝে ভাবি কিসের টানে দিনে চার-পাঁচবার মেয়েটির দোকানে যাই আর ডাব কিনি। মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকি। নানান কথা ভাবি, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারিনে। ছোট্ট দ্বীপটি যেন রঙ আর রূপে ভরা। আলো ও হাওয়ায় যেন এক সদ্য-প্রকাশোন্মুখ আত্মার আনাগোনা।

একদিন খুব সকালে মন্দিরে পৌঁছে দেখি সেই মেয়েটি জোড় আসনে বসে গভীর প্রার্থনায় মগ্ন। আলোয় যেন সে স্নান করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কি যে ভাল লাগল। রূপের আভায় মনের দীপ্তিতে সে যেন আমায় আলোয় ভরে দিল। হঠাৎ মেয়েটি ধ্যানমগ্ন চোখ খুলে আমাকে এক পলক দেখেই আবার চোখ বুজে নিল। দুপুরে আবার তার দোকানে গিয়ে ডাব খেলুম। মনের গভীরে আত্মীয়তায় সুর আরো নিবিড় হয়ে উঠল। রামেশ্বরমের সমস্ত সৌন্দর্য আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। মহাবিশ্বের সেই চিরকালের আনন্দধারার টুকরোগুলি যেন আমার গায়ে ফুলের মতো ঝরে পরতে লাগলো।

পরের দিন ধনুষ্কোডি যাব, সকাল সকাল মন্দিরে গেলাম। সেই পরিচিত দৃশ্য। মেয়েটি ধ্যানস্থ, সর্ব

(শেষাংশ ১৪১ পাতায়)

গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্র

শিবব্রত ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[দুই]

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাস। একজন ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগ্‌ল্‌—১৯২০-৩৪" গ্রন্থখানি রচনা করে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার নতুন পরিচয় দিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তিসম্পন্ন প্রথম সারির একজন ভারতীয় লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে।

স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষাভাষী জগতে প্রথম গ্রন্থখানি-ই আশাতিরিক্তভাবে সমাদৃত হওয়ায়, অল্প বয়স্ক যে কোন নতুন লেখক বা গ্রন্থকারের পক্ষে আরও গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র এর ব্যতিক্রম হবেন কেন? ১৯৩৫ সালের ২০শে মে তারিখে ভিয়েনার নিকটবর্ত্তী "স্যানাটোরিয়াম ওয়েষ্ট এণ্ড" থেকে সুভাষচন্দ্রের লেখা এক পত্র থেকে পাওয়া যায়,—"In case I stay long I shall begin writing another book and shall choose a place suitable for the purpose."

চার দিন পরে, অর্থাৎ ২৪শে মে তারিখে একই স্থান থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ অশোকনাথ বসুকে ইংরাজীতে এক চিটি লিখেছিলেন, যার বাংলা তর্জ্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ—"যদি আমি ইয়ুরোপে আর কিছুকাল থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারি এবং যদি আমি কয়েক মাসের জন্য একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আর একটি গ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমানে, আমার মাথায় দুইটি বিষয়-বস্তু ঘোরাফেরা করিতেছে,—(এক) ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস (A History of the Indian Nationalist Movement) এবং (দুই) ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে এমন একখানি গ্রন্থ যাহার মধ্যে থাকিবে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা (A book dealing with the future course of Indian Politics which will embody my ideas as well)। কোন্ গ্রন্থখানি লেখার কাজ সর্বাগ্রে সুরু করা উচিত সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ চাই।"

পত্রপাঠমাত্র জার্মানীর মিউনিখ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের জবাব চলে যায় খুড়োর কাছে। উত্তরে, ২৮শে মে তারিখে নতুন বই লেখা প্রসংগে সুভাষচন্দ্র জানালেনঃ "আমি এখনও স্থির করিতে পারি নাই নূতন বই

Ref. 25/11/37

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমি এখন কলিকাতায় নাই। ছুটির পর কলিকাতায় ফিরিয়া আপনার পত্র পাইব। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

আপনার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন-সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কোনো মতামত দিতে পারিব না।

আপনার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন-সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কোনো মতামত দিতে পারিব না।

ইতি

বিনীত

শ্রীসুকুমার রায়

"সন্দেশ" পত্রিকা সম্পাদক।

লেখা আরম্ভ করবো কিনা। ভিয়েনায় একজন সেক্রেটারী ৬০ সিলিং মাসিক বেতন (অর্থাৎ ৩০ টাকায়) আমি রাখিতে পারি। বাহিরে গেলে খরচ অনেক বেশী পড়বে। সেখানে নূতন লোক রাখ্‌লে বেশী খরচ পড়বে—এখান থেকে নিয়ে গেলেও বেশী খরচ পড়বে কারণ খাওয়া থাকা বাদে আমাকে ৬০ সিলিং দিতে হবে। গতবার আমি প্রকাশকদের কাছ থেকে ৫০ পাউণ্ড পেযেছিলাম—তাই ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। এবার যদি কোনও source থেকে টাকা পাই তাহা হইলে বই লেখা আরম্ভ করতে পারি। বিনা কাজে আমার পক্ষে এখন ইয়ুরোপ থাকা অসম্ভব।"

"আমি এখনও খবর পাই নাই দেশের বন্ধুরা কতদিন টাকা পাঠাতে পারবেন।"

খুবই আক্ষেপের কথা, ১৯৩৫ সালে সুভাষচন্দ্র যে দু'টি গ্রন্থ রচনার বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, অর্থাভাবের দরুণ সে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনামত, নির্দিষ্ট বিষযবস্তুর ওপর, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়নের তৃতীয় প্রয়াস এবার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

একটা কথা এই প্রসংগে বলে নেওয়া দরকার। "ইণ্ডিযান্ ষ্ট্রাগ্‌ল্ ১৯২০-৩৪" প্রকাশের অনেক আগেই, কতিপয ব্যক্তিকে লেখা সুভাষচন্দ্রের কিছু চিঠি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত তাঁব কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বিবৃতির এক সঙ্কলন ১৯২৮ সালেব ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে "তরুণের স্বপ্ন" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এর দু'বছর পরে, ভারতের বিভিন্নস্থানে নানা সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ছাত্র ও যুব সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ও বক্তৃতা একত্রিত করে "নূতনের সন্ধান" নামে অপর এক সঙ্কলন আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণত গ্রন্থ বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার সংগে এরকম সঙ্কলনের যথেষ্ট প্রভেদ থাকায় এ প্রবন্ধে সঙ্কলন দু'টিকে গ্রন্থের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি,—যদিও এবিষয়ে মত পার্থক্য থাকা সম্ভব॥

এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বেশ কিছু চিঠিপত্র পাঠান্তে এবং সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছিলেন এমন কয়েকজন ব্যক্তির সংগে আলাপের পর লেখকের মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে,—১৯৩৫ সালের পর আবার ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র নতুন করে বই লিখ্‌তে মনস্থির করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন "ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগ্‌ল্' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজে হাত দেবেন। সেইমত একটা পরিকল্পনা খাড়া করে এসকল কাজে তার সহকারী এবং পরমআস্থাভাজন অশোকনাথের কাছে, সাঁইত্রিশ সালের ৮ই মে লাহোর থেকে চিঠি দিলেন ঃ

".....I shall be doing some writing work. In this connection I shall require some books. I shall write to you from time to time about this. Could you also procure for me relevant information from back copies of newspapers, reference books etc. ? I mean, will you have time ? I want relevant information, in the first place, about Indian events from 1934 to 1937."

শেষ পর্য্যন্ত, বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শমত তিনি প্রস্তাবিত গ্রন্থের কাজ সুরু না করে নিজের আত্মজীবনী (Autobiography) রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে, ইয়ুরোপ

যাবার প্রাক্‌কালে স্থির করেন সেবার প্রবাসকালে নিজের জীবন-চরিত রচনায় মগ্ন থাকবেন। যে কোন বিষয়েই সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভীষণ 'সিরিয়াস্' ও 'মেথ-ডিক্যাল্'। তাই আত্ম-জীবনী লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এবং ইউরোপ গমনের আগেই তিনি কার কাছ থেকে কোন্ কোন্ উপাদান বা তথ্য পাওয়া সম্ভব, কোন্ বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, সে বিষয়ে তালিকা প্রস্তুত করে, সকলের সংগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে এ-সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে ফেলেছিলেন। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ওপর কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পণের পর অশোকনাথকে সহকারী এবং সমন্বয়-সাধনকারী নিযুক্ত করে সুভাষচন্দ্র কে. এল. এম বিমানযোগে ইওরোপের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন সাঁইত্রিশ সালের আঠারোই নভেম্বর।

আত্ম-জীবনী লেখার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র এতই বিভোর হয়ে উঠেছিলেন যে যাত্রার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে, উড়ন্ত হাওয়াই-জাহাজ থেকেই ব্যস্ত হয়ে কলকাতায় সহকারীকে চিঠি লিখলেন ঃ

"……আমার জীবন চরিতের বিষয়ে যে দুইটি চিঠি কাল রাত্রে তোমায় দিয়েছি, সেগুলির বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করবে। কালীচরণ[১] অথবা গোপাল সান্ন্যাল তোমায় সাহায্য করতে পারবেন।

"……আমার আত্ম-চরিতের বিষয়ে কিছু উপাদান চাই, বিশেষতঃ আমাদের বংশের পুরাণ ইতিহাস। তুমি জোগাড় করতে পারবে? যদি বাবার[২] এবং মা-জননীর[৩] কাছ থেকে শুনে তারপর নোট করে পাঠাতে পার, তাহলে ভাল হয়। আরও কতকগুলো material বাবা পাঠাতে চান। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এয়ার-মেলে পাঠাবে।"

আবার বারোদিন বাদে, পয়লা ডিসেম্বর, অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌গাষ্টাইন্ থেকে হাতে লেখা ইংরাজীতে, দু'পাতা ঠাসা দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন অশোকনাথকে, সেটি অনুবাদের অক্ষম প্রচেষ্টার পর মোটামুটি দাঁড়ায়—

"আজকের চিঠিতে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত করছি। আশা করছি সেগুলোর যথাবিহিত ব্যবস্থা করারমত সময় তোমার হ'বে। যত বেশী সম্ভব ততগুলোর উত্তর তাড়াতাড়ি বিমান-ডাকে দেবার চেষ্টা করো কিন্তু।

১। আমাদের 'পর্য্যায়' কত? ২৭ না ২৮? পর্য্যায় বল্‌তে বোঝায় এক এক পুরুষ (generation) —ফলে তোমার পর্য্যায় আমার থেকে এক বেশী হবে। 'মা-জননী'র কাছ থেকে এটা তুমি জেনে নিতে পারবে।

… … … … … … … … … … … …

৩। কালীচরণকে জিগ্যেস্ করবে, সে আমাকে আমাদের পূর্ব-পুরুষ ও পিতৃ-পুরুষের গ্রাম সম্পর্কে আরও তথ্য ও উপাদান দিতে পারবে কিনা। যদি পারে, সব কিছুই যেন তোমাকে দেয়; আর তুমি সেগুলো অবশ্য করে বিমান-ডাকযোগে পাঠাবে। (ইতিমধ্যেই সে আমাকে যে সব তথ্যাদি দিয়েছে সেগুলো খুবই মূল্যবান এবং কাজের হয়েছে)।

৪। 'মা-জননী' ও রাঙাদাদাবাবুর[৪] কাছ থেকে আমাদের মাতৃকুলের পরিচয় ও বৃত্তান্ত সম্পর্কে নোট নিয়ে তাড়াতাড়ি বিমান-ডাকে পাঠিও। (যথা, আমার মাতামহ, প্র-মাতামহ, তাঁদের কত-

জন সন্তান-সন্ততি, জামাতা প্রভৃতি এবং এঁরা সব কারা ইত্যাদি ইত্যাদি)।

৫। আমার বাবার জীবনীর উপাদানগুলো বিমান-ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। ১৯৩৫ সালে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় এসকল উপাদন সংগ্রহ করা হয়।

* * * *

৭। চল্‌তি ইংরাজী বর্ষের সংগে এখন বাংলা কোন সন্ এবং কি তারিখ চল্‌ছে জানাবে।

৮। ভারত-সম্রাট হিসাবে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবটা হয়েছিল কোন্ সালে? ১৯১১ না ১৯১২?

৯। জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্ত্তী হরিপুরা অধিবেশনের সঠিক তারিখটা আমাকে জানাবে। খবরের কাগজে লিখ্‌ছে ১৬ই নভেম্বর নাগাদ। বি. পি. সি. সি, অফিস অবশ্যই সেটা জান্‌বে।

১০। বই-তে ছাপাবার জন্য বাবা ও মা'র একটা খুব ভাল ফটো তুমি কি আমাকে দিতে পারবে? আমাদের পরিবারের গ্রুপ ফটো এবং মেজদাদার স্বতন্ত্র একটি ফটো চাই। এগুলো সাধারণ ডাকে পাঠাতে পার তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করো।

* * * *

আমার মনে হচ্ছে এখনকার মত আমি তোমার ঘাড়ে যথেষ্ট কাজ চাপিয়েছি। অতএব এবার শেষ করছি।"

আবার ঠিক দশদিনের মাথায় ১০ই ডিসেম্বর বাদ্‌গাষ্টাইন্ থেকে চিঠি এলো ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে। বার বার অনুবাদের ব্যর্থ প্রয়াস না করে এবার মূল ইংরাজী চিঠির অংশ বিশেষ নীচে দেওয়া গেল ঃ—

"I am glad to have your letters of the 25th November and 30th Nov. I have already recd. a packet of letters from Mejdada (written by me from England). The next packet (Burma letters) has not arrived yet—because it is coming by ordinary post. Kali Charan gave me some very useful material about Purandar Khan. I wonder if Nagen[৫] Babu can give me any more.

"By the way I want a good photo of father and mother. The Calcutta Municipal Gazette published a good photo of father when he died. These can come by ordinary mail. I also want information about mother's forbears i.e. re. Kasinath Dutt and others and their connection with other families like Sir Romesh Mitter, Sir N. N. Sircar. Please note down this information and send it by air-mail I am surprised to find how little I know of these family connections"

যতদূর সম্ভব পরিশ্রম করে একদিকে গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ অপর দিকে একাগ্রচিত্তে লেখার কাজ একই সঙ্গে চল্‌তে থাকে। প্রস্তাবিত আত্ম-জীবনীর ভাষা ছিল ইংরাজী। নামকরণ হয়ে গেল সুরুতেই "এ্যান্ ইণ্ডিয়ান্ পিল্‌গ্রিম্"। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ গ্রন্থখানিও সুভাষচন্দ্র সমাপ্ত করতে পারেন নি। ১৮৯৭ সালের জন্ম থেকে সুরু করে ১৯২০ সালে কেম্ব্রিজে অধ্যায়নকাল পর্য্যন্ত নিজ জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার পর লেখার কাজে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়।

১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর থেকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে পর্য্যন্ত যদিও বা একটু ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতিত্বের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে অন্তর্ধান এবং তারপর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানরূপে সুভাষচন্দ্রের দিন, মাস ও বছরগুলি কিভাবে কেটেছিল সেটা অনুমান পর্য্যন্ত করা যায় না। প্রতিনিয়ত যে অকল্পনীয় ব্যস্ততা, উত্তেজনা বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তখন বই লেখা বা আত্ম-চরিত সম্পূর্ণ করার কথা কি আর চিন্তা করা যায়? তাই বলতে হবে রাজনীতির প্রচণ্ড চাপে এবং একদম প্রত্যক্ষভাবে স্বাধানতা সংগ্রাম পরিচালনা করার ফলে "ইণ্ডিয়ান্ পিল্‌গ্রিম্'-এর মৃত্যু ঘটে অথবা বলা যায় বৃহত্তর স্বার্থে 'ভারতীয় পরিব্রাজক' অকালে আত্মহত্যা করেছিল।

সুভাষচন্দ্রের কিছু সহকর্ম্মী, অনুরাগী এবং পরিজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী, তাঁর অবর্ত্তমানে এই অর্ধ-সমাপ্ত "এ্যান্ ইণ্ডিয়ান্ পিল্‌গ্রিম্" গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে "ভারত-পথিক" নাম দিয়ে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

পরম আশ্চর্যজনক এবং অচিন্তনীয় ব্যাপার হচ্ছে—১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ভারত থেকে অন্তর্ধানের পর যুদ্ধরত ও বিধ্বস্ত জার্মানীতে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন একচল্লিশ সালের এপ্রিল থেকে তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত; অর্থাৎ মোট সময় দু'টি বছর-ও নয়। এই সময়ে নাৎসী জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধানদের তাঁর স্বপক্ষে আনতে এবং নিজ ভবিষ্যত সম্পর্কে রীতিমত অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায়, সুভাষচন্দ্রের স্নায়ু ও মনের ওপর পড়েছিল ভয়ানক চাপ। আর সেই সঙ্গে জার্মানীতে আজাদ হিন্দ সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি উদয়াস্ত করছিলেন অমানুষিক পরিশ্রম। অথচ এরই মাঝে, তিনি ১৯৩৭ সালের মে মাসে যে গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করেছিলেন—সেই গ্রন্থ অর্থাৎ "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল"-এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজ সুরু করেছিলেন।

১৯৪৩ সালে সাবমেরিনযোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার আগে, সুভাষচন্দ্র "ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগল্ ১৯৩৫-৪২"-এর পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে তাঁর আস্থাভাজন একান্ত সচিব শ্রীমতী এমিলি শেঙ্কলের কাছে সেটি গচ্ছিত রেখে যান্। ১৯৪৮ সালে সুভাষচন্দ্রের প্রিয় মেজদাদা দেশবরণ্যে শরৎচন্দ্র বসুকে শ্রীমতী শেঙ্কল্ এই পাণ্ডুলিপিটি সমর্পণ করেন। কালক্রমে "দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগল্ ১৯৩৫-৪২" প্রকাশিত হয়।

বর্ত্তমানে কোন কোন প্রকাশক সংস্থা দুটি খণ্ডকে একত্রিত করে "দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগল্ ১৯২০-৪২" নামে একখণ্ডে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন স্বদেশী পাঠকদের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা উপেক্ষা করে। ব্যবসায়ী বা পাটোয়ারী বুদ্ধিতে বিচার করলে এরকম উচ্চ-মূল্য ধার্য্যের যুক্তি আছে। কিন্তু আপমর জনসাধারণের প্রিয় নেতাজীর জীবনী ও রচনা সম্পর্কে আগামী দিনের মানুষকে ওয়াকিবহাল করতে গেলে, নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হলে,—প্রয়োজন ভারতের কুটিরে কুটিরে পৌছবার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুদিত সুভাষ রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ।

উপসংহার

যাহাহোক্, কিছুদিন যাবৎ গ্রন্থাকার সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে, একজন

পাঠক হিসাবে কতকগুলো সাধারণ প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছিল। সেগুলো উল্লেখ করে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করছি।

১। সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষ যে দিনটি পর্য্যন্ত আমরা অবহিত আছি তার মধ্যে একমাত্র "দি-ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগল্ ১৯২০-৩৪"-ই তিনি সম্পূর্ণ ও প্রকাশ করতে সক্ষম হ'ন যদিও ১৯২৫ সাল থেকে বারে বারে তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে সেই বহুল প্রচলিত ইংরাজী প্রবাদ "Man proposes God disposes" সুভাষচন্দ্রের জীবনে ভীষণ-ভাবে প্রযোজ্য নয় কি? ভাষা, সাহিত্য, রচনা-শৈলী ও প্রকাশভঙ্গী-ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধিকার থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ-প্রকাশে সুভাষচন্দ্রের সাফল্য লাভ না করার কারণ যদি বলা যায় তার ভাগ্য, তাহলে অন্যায় হবে কি?

২। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মী যাঁরা পরবর্ত্তীকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাত হয়েছেন অথবা যাঁদের আত্ম-চরিত প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই লেখা বা গ্রন্থ রচনার পক্ষে জেলখানা এবং কারা-জীবনকে উপযুক্ত স্থান ও কাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র, যিনি জীবনে অন্ততঃ দশবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাঁকে সব মিলিয়ে প্রায় আট বছর জেলে অতিবাহিত করতে হয়, তিনি লেখার পক্ষে এ সময়টা উপযুক্ত বিবেচনা করলেন না কেন?

৩। অবশ্য প্রথম গ্রন্থ রচনার কাজ ব্রহ্মদেশে কারা-জীবনেই সুরু করেছিলেন; কিন্তু পরে কয়েকবার বিভিন্ন জেলে বন্দীদশায় কখনও গ্রন্থ রচনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন বলে শোনা যায় কি?

৪। দেখা যাচ্ছে ১৯২৫ সালে 'Pebbles on the Sea-shore' থেকে সুরু করে একের পর এক "Indian Struggle 1920-34" "Indian Pilgrim" এবং "Indian Struggle 1935-42" সব পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে প্রবাস-জীবনে। কেন? স্বদেশের পরিবেশ কি সুভাষচন্দ্রকে গ্রন্থ রচনার কাজে যথেষ্ট প্রেরণা দিত না??

১। স্ব-গ্রামবাসী, অন্তরঙ্গ সহকর্মী ও লেখক শ্রীকালীচরণ ঘোষ।

২। এখানে ভ্রাতুষ্পুত্রের বাবা-কে বোঝাতে চেয়েছেন—অর্থাৎ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। সুভাষ-জনক ১৯৩৪ সালে মারা গিয়েছিলেন।

৩। সুভাষ-জননী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

৪। ভ্রাতুষ্পুত্রের রাঙ্গাদাদু, সুভাষচন্দ্রের অন্যতম মাতুল, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫। প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক এবং সুলেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

আঞ্চলিক সাহিত্য

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার উপলক্ষে বিষ্ণু দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই লজ্জা : 'লজ্জাই বোধ করি যখন দেখি যে প্রতিবেশী আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আমি, ও আমরা, শ্রমস্বীকার করি নি। লজ্জাই পেতে হয় যখন দেখি প্রতিবেশী অনেক বন্ধুজন বাঙলা বলতে পড়তে লিখতে পারেন, কিন্তু আমরা প্রাচীন সম্বন্ধ সত্ত্বেও অসমীয়া বা ওড়িয়া বা হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে, গুজরাটি বা মারাঠি বা পাঞ্জাবী বিষয়ে খুব কম জানি এবং দক্ষিণ ভারতের বিষয়ে আরো কম।' অকাদেমির নতুন প্রকাশিত বই ক-খানি হাতে পেয়ে লজ্জার চেয়েও বেশি বোধ হয় ঔৎসুক্য। পাশের বা ঈষৎ দূরের বাসী আমাদেরই আত্মজন, একই ভারতীয়-মূল থেকে বেড়ে ওঠা বিচিত্র শাখা-পল্লবের মতো, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এরই একখানি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'কেবল দেশ বা পাত্রের নামগুলি ভুলে যেতে পারলে, মনে হয়, ভারতের যে কোনো অঞ্চল নিয়ে এ রকম গল্প রচিত হতে পারে',—তবু আরেক রকম বাঁধুনিতে সত্য বা পৃথক বলে মনে হয়। আধুনিক শহরে আধুনিক কেতায় বিভিন্ন অঞ্চলের যে সব মানুষকে দেখি একে অপরের পুনরুক্তির মতো, তাঁদের ভিতরে খুঁজলে দেখা যায় আধুনিকতা, বা ভারতীয়তার চেয়েও গাঢ় হয়ে আছে আঞ্চলিক গাছপালা-জলমাটি-গৃহশৈলির ছাপ, তার ফলে পাশের মানুষটির জীবনসংস্থান তারই একান্ত, অন্যের তুলনায় আরেক রকম, কাজেই ঔৎসুক্যজনক। একটু টের পেলে কৌতূহল আরো বড় হয়ে ওঠে।

২

'কর্ণাটকের ছোট গল্পে' হাল আমলের কন্নড় সাহিত্যের কিছু পরিচয় আছে। শ্রীযুক্ত এল. এস. শেষগিরি রাওয়ের সঙ্কলনে ও সম্পাদনায় 'কন্নড় সন্ন কথেগলু' নামে বাইশটি গল্পের একটি গল্পসংগ্রহ বেরিয়েছিল ১৯৬২ সালে, তার দশটি গল্প নিয়ে এই বাঙলা সংগ্রহ। অনুবাদ করেছেন বেলতঙ্গদি গোপালকৃষ্ণ রাও এবং তাঁর পত্নী অমিয়া দেবী। মূলানুগ হয়েছে অনুবাদ, স্বয়ং সুনীতিকুমার জানিয়েছেন।

কন্নড় সাহিত্যের একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে—অন্তত বারো শো বছরের, তার প্রায় কিছুই আমাদের চেনা নয়। পম্পা-রামায়ণের জনশ্রুতি এবং গানের কর্ণাটকী ঘরানা শুনতে পাই। এই ছোট্ট গল্পের বই-খানি যুক্ত হল তার পাশে। খুব উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যাবে না যদিও, চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যও খুব

চোখে পড়ে না। ছোট সাংসারিক-প্রতিবেশিক সম্বন্ধ, মানুষের চিরন্তন সুখদুঃখের কথা, শিশুর মন, বিত্তগত সমাজের চেহারা—শুধু ভারতের কেন, যে কোনো অঞ্চল নিয়েই এ রকম গল্প লেখা হতে পারে। চেন্নাম্মার গল্পটি বাদ দিলে পিছনের পটভূমিও তত প্রখর নয়। তবু, বিশেষ একটু স্বাদেরও অনুভব হয়, সব সত্ত্বেও। সেইটুকু বিশেষ করে বলবার। ভূমিকাকল্প 'মস্থমন্তী' গল্পটিতে গল্পের বেশি তাৎপর্য গেঁথে দিয়েছেন লেখক, ছোট দক্ষিণী গ্রাম মস্থমন্তী প্রতীক পরেছে সমগ্র ভারতবর্ষের, তবু তার ক্ষয়গ্রস্ত শিল্পী-পরিবারটি, বর্গির লুণ্ঠনের স্মৃতি, অসমাপ্ত পট, অজল ভাঙা-সোপান দীর্ঘিকা মনে দাগ কেটে যায়। সুন্দর প্রেমের গল্প 'ডাক্তার সুশীলা সংকেত'। দক্ষ হাতে আঁকা নিষ্কলানন্দের প্রাক্-সন্ন্যাস সংরক্ত রাত্রিটি, এবং বলা যায় সার্বভৌম, তবু দার্শনিক বৈদিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যার পূর্ব ও উত্তর-অধ্যায়ের যে বৃত্তটি লেখক এঁকেছেন, নিঃসন্দেহে বিশেষত্বময়। আনন্দের লেখা চেন্নাম্মা দেবদাসীর গল্পে স্পষ্ট-স্থানিকতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই সংগ্রহে ছোটদের জগতের উপর কিছু বেশি পক্ষপাত—এ কি মাটির প্রবণতা, না সংকলয়িতার? 'করুণা' 'তুমি খোকনের মা' 'চম্পি' 'বুট পালিশ' গুলি-ডাণ্ডা'—ছোট এই সংগ্রহের এতখানি ছোটদের। মাসীর কাছে পালিত পাঁচ বছরের অসহায় মাতৃহারা বালক, পড়বার-খেলবার অধিকার বঞ্চিত বিড়ির ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া দশ বছরের ছেলে—অতি-প্রচলিত আখ্যানের সূত্র থেকে নিয়ে অনাড়ম্বর ভাবে বলেও স্মরণীয় করে তোলা হয়েছে।

কন্নড় গল্পগুলির আবেদন স্নিগ্ধ, তার আবহমণ্ডল এখনকার জটিল জগতের তুলনায় একটু বেশি সরল বলেও মনে হতে পারে। এর পাশে রীতিমতো বয়স্ক তামিল সঞ্চয়নের গল্পগুলি। 'আমরা যে কালে বাস করছি' তার ছায়া রয়েছে এখানে, স্পষ্ট। দক্ষিণভূমির এই দুই অঞ্চল, গল্পের মধ্য দিয়ে পরিচয় হলে দুয়ের ব্যবধান কালগত বলে মনে হয়। জীবনের শাশ্বত ভাব ও বৃত্তির সমস্যা বা সুষমা দেখতে পাই কন্নড় গল্পগুলিতে, তামিল গল্পে এসেছে স্পষ্ট চরিত্র, তীক্ষ্ণ স্ব-তন্ত্র ব্যক্তি। এক কথায় আধুনিক মানুষ। একটু আলঙ্কারিক শোনালেও, মনে হয়, মস্থমন্তী গ্রামের সেই বৃদ্ধের মতো কৃষ্ণের পুরোনো পটটুকু আঁকড়ে কন্নড় গল্পের দৃষ্টিকোণ। আর, তামিল লেখক কন্দস্বামী পিল্লেইয়ের মতো ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা হাঁটেন, রুজির ধান্ধায় শত ফের দিয়ে বাঁধা হাল শহরের কঠিন ধাঁচার মধ্যে—রাস্তা ও কাজ এই দুই অবিচ্ছেদ্য তাঁর নিত্যদিনের চলায়, তবু ভগবানও আছেন—নিয়ন্ত্রিত, বা তির্যক্কৃত। তামিল সঞ্চয়নের চোখে পড়বার মতো এই লক্ষণটি—আধুনিক লোকযাত্রায় সচল থেকেও তার নিশ্বাসে এক এক সময় ভেসে ওঠে পুরোনো উত্তাপ। কন্নড় সংগ্রহে 'গুরুর মহিমা' নামে একটি গল্প আছে—এত সহজ কার্যকারণে গাঁথা যে তার কোনো অতিগতা চোখে পড়ে না। সে জায়গায় এখানে 'ভগবান ও কন্দস্বামী পিল্লেই' ছাড়াও আছে 'জননী'—প্রত্যক্ষতঃ; পরাশক্তি স্বয়ং মানবদেহের মধ্য দিয়ে জন্মালেন মানুষ শিশুর রূপে—এখনকার মর্তযন্ত্রণার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবার অভিলাষে, এই লেখায় কোনো বক্রের আশ্রয় নেন নি লেখক। এ ছাড়া আরো নানা জায়গায় রয়েছে এই দ্বৈত-এই বোধ এবং এই জীবন, জীবন—তার অকিঞ্চিৎকের সব রূপঃ আজীবনের সৌহৃদ্য ভেঙে দেওয়া শহরের বাস-সমস্যা, হাজার ফিকির-সিদ্ধ ৯৩৩৩ নম্বর কনস্টেব্‌ল—তার বহু কীর্তি ও শেষ পরিণাম,

স্বামী ছাড়লেও ধর্মআচার যাকে ছাড়ে নি সেই 'অম্মামি অপ্‌পলাম' বেচে দিন-গুজরানো তিরুচি শহরের স্বামীত্যক্তা মহিলা, জাল-নোট চালিয়ে তৃপ্ত বড় হোটেলের মালিক, প্রেম ও বিবাহের আধুনিক নানান জটিলতা—সব দিকে জাগ্রত লেখকের অবধান। কিন্তু এই সবের পিছনে পিছনে ছায়ার মতো—যা অনতিক্রমণীয়, পুরোনো: ধর্ম, সনাতন ধর্মবিশ্বাস—শহুরে শিক্ষিত প্রগতিপন্থী বড়মানুষের ঘরেও যার লয়-ক্ষয় নেই, অচল মন্দিরগুলি—সারা দক্ষিণ জুড়ে যার গৌরবিত আত্মঘোষণা, ভগবান মুরুগন্‌ ও মোহময় সন্ন্যাসব্রত, আর চন্দ্রার্কতারায় গাঁথা দিব্য নিসর্গ। আশ্চর্য লাগে, তামিল লেখকের নিসর্গে রোম্যান্টিক কলাকৈবল্য নেই, রয়েছে তীব্র অধিদৈবত বিকিরণ। নিসর্গ থেকে জীবনে—একই ঢেউ যেন ঢুকে এসেছে জায়গায় জায়গায়—'অপার্থিব সুধাসমুদ্রের'—ঐতিহ্য আশ্রিত আমাদের এই পুরোনো দেশের নিশ্বাস যেন ছুঁয়ে যায়। জীবনের সহস্র বুদ্বুদের ফাঁকে ফাঁকে স্থির পটবিস্তারটুকু যেখানে 'মহাকালের নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে বহির্জগতে—সূর্য অস্ত যায়, চন্দ্রের উদয় হয়, চন্দ্র অস্ত যায়, সূর্যের উদয় ঘটে।' ছ-বছরের শিশুর চোখেও এই চেতনা—'আহা! কী সৌন্দর্য! ওখানে ওই আকাশ পটে ঈশ্বরের কাব্য রচিত হয়ে চলেছে।' শুধু অর্বাচীন এই আধুনিক মুহূর্তটিকে নয়, চিরায়ু রূপ আর সংসারকেও দলিত করে যায় এই বোধ—তার জন্য বেদান্ত-কিশোরী উদয়কুমারীরও প্রয়োজন নেই, রূপসী মোহনার নিতান্ত বাউণ্ডুলে প্রেমিক—তাকেও ছেড়ে যেতে দেখি সর্ব আসক্তি, হিমালয়ের নিষ্কাম শান্তির টানে—অস্বস্তি লাগে এই বিশেষ প্রসঙ্গের পৌনঃপুনিকতায়। আধুনিক কৃষ্টির শোভা-সঙ্গতির তলায় তলায় ভারতবর্ষীয় পরাচেতনা—তামিল লেখকের মনে মনে কি বেজে চলেছে সব সময়? হয়তো এর অনেকটাই গল্পগুলির নির্বাচয়িতার হাত। তবু মানতে হয়, তামিল বা দ্রাবিড় মৃত্তিকায় আর্যভারতীয় সংস্কার আমাদের এই পূর্ব প্রত্যন্তের চেয়ে অনেক রূঢ়, এই গল্পগুলির কোথাও আত্ম-চ্যুতির যে দোলা, স্বীকার করতে হয়, আমাদের গল্পে তার দৃষ্টান্ত খুব মনে পড়ে না। 'কেদারীর মা' গল্পটির কথা বলি। এখানে বৈধব্যের যে বিষাদ, আমাদের উনিশ শতকেই বোধ হয় তার ক্ষান্তি হয়েছে মোটামুটি। এই নব্যতর মুহূর্তে আরো কত কালো লাগতো ঐ বিপ্রতীপ কালিটুকু, এই গল্প পড়ে বুঝতে পারি। স্মরণীয় লেখা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর 'পিতা স্বর্গ'—কেবল মাত্র নিচু জাতের সমাজসমস্যা বলে নয়, অন্ধকার থেকে তুলে আনা হরিজন যুবাটির মুখে—সহজ ফিরে যাওয়ার সমাধানটুকু সত্ত্বেও—এখনকার নিষ্পরিজন অ্যালিয়েনেটেড আত্মার—যেন তার চেয়েও গূঢ় দুঃখের—যে ছায়া, ভিতর অবধি নাড়া দিয়ে যায়। এই সঙ্কলনের সম্পদ এই গল্পটি।

তবু সব লেখাই এত স-উদ্দেশ্য নয়, রচনাশৈলির দিক দিয়েও আকর্ষণ করে কয়েকটি গল্প, তার সবচেয়ে স্মরণীয় বোধ করি কু. প. রাজাগোপালনের 'ভোর হবে'। এক রাত্রির রেলগাড়ির কামরায় দুটি ভাই বোনের আশা-আশঙ্কার ক্রমান্বয় আলোছায়া এবং ভোরবেলায় তার পরিণামটুকু যেভাবে লেখক এঁকে তুলেছেন, নিঃসন্দেহে তাতে দুরূহ কুশলতার ছাপ আছে।

তামিল সঞ্চয়নটি আকারে কিছু বড়। এতে কুড়িটি গল্প আছে, তার পূর্বাহ্নে আছে অ. চিদম্বরনাথনের সুলিখিত ভূমিকা, এবং শেষ দিকে লেখক-পরিচয়। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের অনুবাদও সুন্দর

এবং স্বাভাবিক। কর্ণাটকী-সংগ্রহেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছোট ভূমিকা আছে, কিন্তু কৌতূহল মেটে না—বিশেষ, তারও বেশির ভাগ পুরোনো কন্নড় সাহিত্যের পরিচয়। প্রাসঙ্গিক সমাধান তত নেই, লেখকদেরও জানতে পারি না। এইটুকু অন্তত দরকার। তবু, সংগ্রহ দুটি পড়ে এই অঞ্চলের আরো এবং অন্য রচনার সম্বন্ধে—সেই সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষী আর দুই অঞ্চলেরও সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ প্রজ্বলিত হল, সে কথা বলতে হয়।

৩

বাঙলায় সম্ভবত এই প্রথম; লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার দুটি বই পাওয়া গেছে এই সঙ্গে—আত্মজীবনী এবং তাঁর এক ডজন গল্প। লক্ষ্মীনাথ আমাদের ঘরের মানুষ, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়, এখান থেকেই 'জোনাকি' কাগজ বের করেন তিনি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হেমচন্দ্র গোস্বামী, পদ্মনাথ গোহাইন বরুয়া ইত্যাদির সহযোগে, তাঁর বিবাহ হয় ঠাকুরবাড়িতে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে, তাঁর সাহিত্য ও কর্মের পীঠও এই শহর। ১৯৬৮তে কলকাতায় তাঁর জন্মশতবর্ষও উদ্‌যাপিত হয়।

আত্মজীবনীতে লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন, বিবাহের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'আশীর্বাদ করে আমায় একটা সোনার কলম দিলেন। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার এই কলম থেকে সুনিপুণ লেখা বেরুবে।' আমরা গর্ব বোধ করতে পারি, লক্ষ্মীনাথের সোনার কলমটি এখান থেকেই দেওয়া। আত্মজীবনীতে আরো উল্লেখ আছে, লক্ষ্মীনাথের শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছা ছিল, 'আমি অসমীয়া ভাষায় লেখার চেষ্টা না করে বাঙলা ভাষাতে লিখতে শুরু করি।' স্বয়ং রবিকাকা দুঃখিত হয়েছিলেন বাঙলায় তাঁকে প্রবৃত্ত করতে না পেরে। এতখানি আত্মীয়সম্বন্ধ সত্ত্বেও, আশ্চর্য লাগে, অসমীয়া সাহিত্যের এই দিক্‌পাল সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে আমাদের খুব অল্পজনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় আছে।

ছাত্রজীবনে লক্ষ্মীনাথ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির-শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীর তদগত অনুরাগী ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আপ্লুত। এই প্রতিবেশে ভবানীচরণ দত্তের লেনে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা'র সূত্রপাত, 'জোনাকি' পত্রিকারও শ্রীবৃদ্ধির সূচনা। রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে বাঙলা কবিতার যশঃপ্রার্থী তরুণটি এই সময় থেকেই সর্বান্তঃকরণে আত্মোৎসর্গ করলেন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের ঋদ্ধিসাধনে। অতঃপর ঠাকুরবাড়ির সরাসরি প্রভাব তাঁর নিজস্ব মনোরাগেরই ইন্ধন হয়ে উঠল। শুধু ঠাকুরবাড়ির নয়, সারা বাঙলার নতুন সাহিত্যজাগরণের প্রবর্তনাই তাঁর অসমীয়া রচনায় সুফলপ্রসূ হয়েছিল বলে মনে হয়। তবু, এত দীর্ঘ দিন পরে লক্ষ্মীনাথের লেখা বাঙলায় সরাসরি পড়তে পাবার সূচনা হল।

বারোটি মোট গল্প নিয়ে 'রতন মুণ্ডা'। জীবনস্মৃতির উত্তরার্ধে সাহেবী চলনেবলনে অভ্যস্ত যে মান্য নাগরিক ব্যক্তিটিকে দেখি, গল্পগুলির কোথাও তার ছায়া নেই। গরিব গ্রাম্য মানুষের গল্প—বেশির ভাগ, শান্ত শ্যামশ্রীতে ভরা তার চারপাড়—পুরোনো সংস্কারে জড়ানো মাটি ও মানুষ, কখনো কখনো অত্যন্ত সুকুমার, প্রায় কবিতার মতো। নাম-গল্পটি—'রতন মুণ্ডা', এবং আরো একটি 'জলদেবী'তে এই ধরনের পেলব সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়ঃ রূপসীর পাড়ে বটগাছতলায় বসে থাকা আত্মমুগ্ধ একটি মেয়ে—

ভালোবাসা তাকে কেড়ে নিতে এলো, আর ছোট্ট এক পাহাড়ী নদীর ধারে প্রেমিক-হারানো কোল-কিশোরী ঝুমুরি—ছুটিই ছবির মতো। আর ছুটি গল্প 'ভদরী' এবং 'মুক্তি' পড়ে লক্ষ্মীনাথের রবিকাকাকে মনে পড়ে। যদিও চারপাশটুকু এখানে লক্ষ্মীনাথের আঞ্চলিক-রঙ-লাগা। লেখাগুলিতে দেখি ছোট ছোট জীবন এবং সামান্য অকিঞ্চিৎকর সব প্রসঙ্গ—সংক্ষেপে, নিরাভরণ রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্মীনাথের লেখার এই হল সামান্য লক্ষণ। তাঁর বিষয়বস্তুর সাহায্য তিনি পেয়েছেন, জটিলতার মধ্যে তাঁকে পদার্পণ করতে হয় নি। এক 'পাতমুগী' গল্পটিতে একটু গৃঢ়ৈষার পরিসর দেখতে পাওয়া যায়, বেশি দূর না যেতেই লেখক তাকে সংবরণ করে নিয়েছেন।

লক্ষ্মীনাথের জীবনস্মৃতির প্রাক্-কলকাতা প্রথমাংশ থেকে এই গল্পগুলির উৎস নিষ্পাদন করে নেওয়া যায়। জীবনস্মৃতির এই অংশটুকু বরপেটা-তেজপুর-লখিমপুর-গুয়াহাটি-শিবসাগরের জায়গায় জায়গায় খণ্ডে খণ্ডে ছড়ানো, মাটির বাঁশি, নামঘোষার সুর, শঙ্করদেবের মাধবদেবের পদের গুঞ্জনে ভরা। এই অংশের স্মৃতি-চ্ছবিটুকু লেখক মধুর রঙ দিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছেন। শুয়ালকুছির বড় নৌকায় করে বাইশ-চব্বিশ দিনের নদীর রাস্তা : 'শাদা বালুচর দুপাশে, মাঝখানে চিক্-চিক্ করছে রূপালি ব্রহ্মপুত্র—যেন একটা বড় শাদা চাদর বিছানো', দুধারি মাদুরির বন, কচ্ছপের উদাস চলা, বালির চড়ায় রেঁধে বেড়ে খাওয়া, তারপর দিখৌ মুখের কাছে মিরিগ্রাম থেকে একটা ছেলের ভীষণ একটানা কান্না, লেখক তাঁর স্মৃতি উজাড় করে দিয়েছেন। গৌহাটি-শিবসাগরের কথা বলতেও পঞ্চমুখ লেখক : 'গৌহাটির অপরূপ রূপমাধুর্য, লুইত নদীর মনোরম শোভা রিহা-মেখলার রূপে তার গায়ে বিরাজ করছে, তার গলায় পর্বতের সাতনরী হার, মাথায় ভুবনেশ্বরীর ধবল মুকুট, বুকের উপর উমানন্দ আর উর্বশী। শিবসাগর সমতল, দুচোখ ভরে-যতখানি দেখা যায় তা পর্বতশূন্য নিরাভরণা; মাত্র তার ক্ষীণ হাত দুখানি দিখৌ এবং দিচাং নামের ছোট নদীর বালা একজোড়া দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে।' বর্ণনা যত পরিণতই হোক, দৃশ্য সেই বয়সের সঙ্গে শ্লিষ্ট।

ছোটবেলার ঘরো পরিবেশটুকুও আছে অন্যূন রূপে। সাঁতার-তোলপাড় তেঁতুল গাছে বাঁধা বাড়ির পুকুর, জ্যোৎস্নারাতে চুরি করে নৌকা বাওয়া, হাতী খুজিয়া বাটিতে দৈ মেখে খাওয়া বোকা চাউল, দু-কুড়ি ডিমওলা কচ্ছপ, সুগন্ধ ফুলে ভরা ঢেপাইতিতার গাছ-গুলো, হুর, হুর, গির্ গির্ শব্দে খোলা নদীর ঝড়, সেই সঙ্গে বাঙলা বিদ্যার মহড়া, কীর্তনঘরের বেড়াতে মাটি লেপে তাতে রঙ দিয়ে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা বীররসের যাত্রাপালার প্রভাবে হিরণ্যকশিপু সেজে কলাগাছের গদা নিয়ে যুদ্ধ—একটি পরিপূর্ণ শৈশব অনতিবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন লেখক। ঈষৎ কৈশোর থেকে এসেছে দায়িত্বশীল সব মানুষের মুখ, স্কুল ও মাস্টারমশাইয়েরা, শিবসাগরের স্কুলঘরে ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা, পিয়ালী দিদির মৃত্যুর রাত্রিটি; 'যেদিন তাঁর মৃত্যু হল সেদিন রাত তিনটে নাগাদ তিনি একে একে সবাইকে নাম আর সম্বন্ধ ধরে ডেকে তাঁর ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।....আমাকেও ঘুম থেকে ওঠানো হল এবং ওঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দিদি আমার কাছেও ক্ষমা চাইতে ভুললেন না। আমি নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাঁর কথা শুনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।' পরবর্তী জীবনে প্রথমা কন্যার মৃত্যুতে তাঁর শোক লক্ষ্মীনাথ এতখানি ব্যক্ত করে বলেছেন।

আসামের ঐতিহ্যময় বংশের সন্তান লক্ষ্মীনাথ। তাঁর পিতা বেজবরুয়া বংশের 'বংশাবলী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই গ্রন্থ লক্ষ্মীনাথ প্রকাশ করেন। জীবনস্মৃতির মধ্যে প্রকাশিত এই আত্ম ধিক্কারটুকু মাত্র, নানা কারণেই স্মরণীয়ঃ 'পিতৃদেব ছেলেদের বেজবরুয়া বংশের প্রধান বিদ্যা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন. বিশেষ করে আমাকে। বাঁদর যেমন মুক্তোর মালার কদর বোঝে না আমিও তেমনি তার কদর না বুঝে তাকে অবহেলা করতাম। আমার মনে হত আসল বিদ্যে হচ্ছে ইংরাজি শাস্ত্র আর চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে হলে পাশ্চাত্ত্য এলোপ্যাথিক ডাক্তারি বিদ্যা শিখতে হবে। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কোনো বিদ্যাই নয়। দেশীয় আয়ুর্বেদীয় আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে চলে না, এ যেমন অসার্থক তেমনি অনাবশ্যক। এই কথা মূর্খের মতো মনের মধ্যে পুষে রেখে আমি তার কাছেই ঘেঁষতাম না। সে জন্য আমার মনে যে অনুতাপ হয় তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমি যে কী রত্নকে হেলায় হারিয়েছি।'

শিবসাগর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৬ সালে আঠারো বছরের তরুণ এলেন কলকাতায়। ১৮৮৮তে শুরু 'জোনাকি' কাগজ এবং সেই সূত্রে ধারাবাহিক রচনাচর্চা। ১৮৯০ এ 'জোনাকি'র সম্পাদনা বর্তালো তাঁর উপর। ১৮৯১ এ মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সঙ্গে শালগ্রাম ও হোমবিহীন ব্রাহ্মবিধানে বিধানে বিবাহ, লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন, 'আমি কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করেছিলাম বলে আমার জন্য কলকাতার বেশির ভাগ অভিজাত শ্রেণীর লোকের দরজা খোলা ছিল।' ১৮৯৩ সালে কাঠের ব্যবসায়ে ঢুকলেন লক্ষ্মীনাথ।

জীবনস্মৃতির এই অধ্যায়ে আরেক ঘাটে বাঁধা লক্ষ্মীনাথের জীবন। বিবাহের পর মাত্র একবার দেখি তাঁর সাহিত্যিক পরিস্থিতি—বাঙলাভাষার জন্য তাঁর উপরে শ্বশুরবাড়ির দরবার এবং তার পিঠে; 'আমি তাঁদের নিরাশ করলাম।....অসমীয়া ভাষার জন্য আমার এত দরদ দেখে তাঁদের মন ভেঙে গেল।...যুবকদের নেতা রবিকাকা অবস্থা বিষম দেখে মৌনাবলম্বন করলেন।' কিন্তু তারপর তাঁর সাহিত্য বা অন্তর্-প্রসঙ্গের আর আঁচড় নেই লেখায়, তার বদলে পুন-রুক্তিময় এই তথ্য ঃ ১. 'আমাদের কাঠের ব্যবসায়ের ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল।' পৃ ১৫২। ২. 'দিন দিন আমাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।' পৃ ১৫৩। ৩. 'ক্রমেই আমাদের ব্যবসা চাঁদের কলার মতো বাড়তে থাকে।' পৃ ১৭১। ৪. 'সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসায়খাতে অসমীয়ার নাম সব দিক দিয়ে বড় হয়ে ওঠে—তাই ছিল আমাদের চরম লক্ষ্য।' ইত্যাদি। এরই মধ্যে ১৮৯৫ সালে তাঁর প্রথমা কন্যা সুরভির জন্ম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর এই প্রিয় কন্যাটির মৃত্যু হয়। এই পর্বের প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করে জীবনস্মৃতির কয়েকটি অন্তরঙ্গ পৃষ্ঠা সে অধিকার করেছে।

১৯০০ সালে হাওড়ার ডবসন রোডের বাড়ি কেনেন লক্ষ্মীনাথ, বারো হাজার টাকায়। লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন, 'আজকেও হাওড়ায় ডবসন রোডের বাড়িটা যে দেখবে সেই বুঝতে পরবে যে মাত্র বারো হাজার টাকায় বাড়িটা কিনে আমি তাকে সুন্দর ভাবে নির্মাণ করে সাজিয়ে প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তিতে পরিণত করি।' এই বাড়ি কেনবার পর তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা অরুণার

জন্ম এবং প্রথমা কন্যার মৃত্যু ঘটে।

১৯০৪ সাল অবধি লেখা হয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি'। ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯৩৯ সালের উল্লেখ আছে একএকবার, ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে আসাম সাহিত্য সম্মিলনের অভিনন্দন আনতে গিয়েছিলেন লেখক। ১৯০৪ এর মধ্যে বিবাহ উত্তর বয়সের একটিমাত্র লেখার উল্লেখ পাই, বাঙলা লেখা, "ভারতী' নামে বাঙালি মাসিক পত্রিকায় 'বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধের একটা সমালোচনা লিখে ভারতীতে ছাপানোর জন্য পাঠাই।' এই একটিমাত্র অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গ, একবার মাত্র। আর জীবনস্মৃতির এই সবচেয়ে সোৎকণ্ঠ কৌতুহলের দিনগুলিতে লক্ষ্মীনাথ শ্রান্তিহীন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লিখেছেন আয়ব্যয়ের হিসাব। লিখেছেন, 'আমার পুরোনো ডায়েরি থেকে কতকগুলো কথা সংক্ষেপে এখানে জানাচ্ছি, যার থেকে পাঠকেরা জানতে পারবেন আমাদের ব্যবসায় কত বড় ছিল, আর আমার জীবন ছিল কত কর্মময়।' অসমীয়া সাহিত্যের মুকুটমণি, একাধারে কবি গল্পকার ঔপন্যাসিক রসসাহিত্যিক, দেশানুরাগ-সম্প্রচারী, আসামের জাতায় সঙ্গীত 'অ মোর আপোনর দেশে'র কবির যে কর্ম ও জীবন জানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন পাঠক, তার জন্য এই মুহূর্তেও আমাদের প্রার্থনা রইল সাহিত্যকারের জীবনচরিত গ্রহ একখানি। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনস্মৃতির পাঠকদের তা মঞ্জুর করেন নি।

লক্ষ্মীনাথের দু-খানি বইয়েরই অনুবাদ সচ্ছন্দ।

কর্ণাটকের ছোট গল্প। বি. জি. রাও ও অসমিয়া রাও অনুদিত। পৃ ৮+৯৯। মূল্য পাঁচ টাকা। তামিল গল্প সঞ্চয়ন। অনুবাদ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। পৃ ১৮+২৭৫। মূল্য আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা। রতন মুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অনুবাদ বীনা মিশ্র। পৃ ৮+৮৫। মূল্য তিনটাকা পঞ্চাশ পয়সা। আমার জীবনস্মৃতি। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। অনুবাদ শ্রীমতী আরতি ঠাকুর। পৃ ১৮৬। সব কয়টি বই সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত।

আষাঢ় ১৩৮৩ সংখ্যায় কি থাকছে

১। **'ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন?'** প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলির অভিমত' সম্বন্ধে একটি চাঞ্চল্যকর দলিল।

২। **রুশ-চীন দ্বন্দ্ব ঃ** অভয়শঙ্কর শর্মা

৩। **সলঝিনেতে সিন একটি সাক্ষাৎকার**

৪। **অনুবাদ কবিতা ঃ** দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ঃ একটাকা

দু টি ক বি তা ঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

যখন কাগজ পাতা

দরজার ওপাশে আমার মোড়া
বাগানে ছুটতে ছুটতে কে এসেছিল
পায়ে ডোরাকাটা মোজা রিটায়ার্ড সেই একজন
স্টেশনে রিটায়ারিং রুমে দোতলায় শুয়ে-পড়া দিন
হাত বাড়ালেই শুধু বুগেনভিলিয়া তার কাগজপাতার
ফুলে ছেয়ে দেয় ঐ বুকের আকাশ
পিপাসা মেটে না কিছুতেই
তারই জন্যে বালি দিয়ে কাঠের চৌখুপ্পি ঘরে পর পর জ্বালা
ভেজা-ভেজা জায়গার পিপাসা
কাকে আসতে বলেছিলাম
কে এসেছে, কে বা ফিরে গেছে
মনে হয় এখনো আরম্ভ করা যায়
আমার মোড়ার ওপর কে বসতে এসেছিল
গেট খুলে ছুটতে ছুটতে চৈত্রের বাতাসে
যখন কাগজ-পাতা ঝরে পড়ে
ঝরে ঝরে পড়ে।

এখন প্রতিধ্বনি

এখন প্রতিধ্বনি ধ্বনিহীন
এখন মানুষ তার অন্ধকারে নিমজ্জিত
তুমি শোওয়ার ঘরের ঘুণ-ধরা আলমারি থেকে
চেলী বেনারসী কেন তখনই সরাও নি
যখন সময় ছিল
যখন ধ্বনিরা ছিল, প্রতিধ্বনি ছিল
যখন পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যেত
এখন ঘুম ভাঙলেই তৃষ্ণা
বাইরে মশা মারে কে যেন
গোয়ালে গরুর লেজ মশা তাড়ায়
মানুষের কোন ছায়াই পড়ে না আয়নায়
আয়নাই ঘোলাটে।

দুটি কবিতা ঃ বাসুদেব দেব

দুপুরের মেঘ

লেবুর কোয়ার মত ভেঙে ভেঙে রেখেছ জীবন
ফুলকাটা রেকাবিতে রোদ পড়ে মাছি ওড়ে
নষ্ট হয়
ক্রমশ উচ্ছিষ্ট হয়
জানালার কাছে
বিষণ্ণতা আধশোয়া, কতদিন করেছে অসুখ

ভেঙেছ বস্তুর মান পরমাণু গূঢ়তায় ঢুকে
ভেঙেছ গানের কলি জীবনের ব্যকরণরূপ
গ্রীষ্মের দুপুর এসে খুঁটে নিয়ে যায়
গরীবের স্মৃতি স্বপ্ন
একখণ্ড মেঘ
ছাতে কে টাঙিয়ে যায়
জানালার কাছে
তুমি এসেছিলে নাকি বাতাসের মত
ভালোবেসে

আজকাল

ভালোবাসা ছিল গতকাল
আজ তার হাতে ছুরি ব্যকরণ বই
আর কিছু স্মৃতির কংকাল

পুলিশের মত ফেরে খর্খর আঙ্গুল
ভয়ে সাদা জুলপির চুল
গলে কমফরটার
বেসুরো গানের মত
এ রকমই ভালোবাসা তার

[১২৪ পাতার পর]

অঙ্গে এত রূপ, যেন আনন্দের বিহ্বলতা অলকানন্দা। পাছে, মেয়েটির ধ্যান ভেঙ্গে যায়, তাই গাইড আর আমি তার দোকানে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। কিছুক্ষণ পর এল সেই শ্যামা। চোখ তুলে আমাকে দেখলো। মনে হলো মন্দিরেই সে যেন আমাকে দেখে নিয়েছে। গাইড আগেই জানালো যে আমি আজ চলে যাচ্ছি ধনুষ্কোডি। যাব সাগর সঙ্গমে অবগাহন করতে। মেয়েটি একটি ডাব দেখে ডাব কেটে আমার হাতে তুলে দিল। কিছুতেই দাম নিতে চাইলনা। মনে হল সেই মমতাময়ী নারী, যেন সাক্ষাৎ জগন্মাতা। হাত-জোড় করে কপালে রাখতেই শ্যামশ্রী আমার দিকে এমন করে বিস্ফারিত চোখে তাকালো; নিয়ে এলো আমাকে এক নতুন দেশে। বিহ্বল চোখে দেখছি একটি তামিল মেয়ে আর এক বাঙ্গালী কিশোর উঠে চলছে এক নতুন দেশে। সোপানগুলো দিব্য-আলোক ও ফুলে ছাওয়া। সেখানে বাঙ্গালী বা তামিলে নেই কোন তফাৎ। সম্বিত ফিরতেই দেখি শ্যামশ্রীর চোখ মুদ্রিত।

আমার এবারের যাত্রা ছিল নিজেকে জানার যাত্রা। ধনুষ্কোডি পৌঁছেই দেখি শ্রীলঙ্কাগামী একখানা জাহাজ ছাড়বার অপেক্ষা করছে। কিছু না ভেবেই প্রথম গেলুম জাহাজঘাটায়। ফ্লাটে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়লো এক অপরূপা রূপসী বিদেশিনী। যেমন দেহ সৌষ্ঠব তেমন রঙের জেল্লা। নির্মল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মেয়েটি চিঠি লিখছিল। বয়স বেশী নয়, খুব বেশী হলে পঁচিশ-ছাব্বিশ। আলাপের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলুম। চিঠি লেখা ছেড়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি এগিয়ে আলাপ জুড়ে দিলুম—নিঃসঙ্কোচে। পরিচয়ে জানা গেল তিনি ফরাসী, নাম—মাদাম ফ্রাঁসোয়া। ফ্রান্সের কোনও কলেজে অধ্যাপনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আনাগোনার ফলে ফরাসী নয়, কিছু ফরাসী শব্দ জানা ছিল। কয়েকটি ফরাসী শব্দ প্রয়োগের পর দেখি আমি ইংরেজী বলছি আর হাত মুখ নেড়েই আলাপ জমাবার চেষ্টা করছি। দুপক্ষই সমান ব্যাতিব্যস্ত। ফ্রাঁসওয়া তেমন ইংরেজী জানেন না। কিন্তু দুপক্ষেই ঘনিষ্টতার সম্পর্ক গড়তে কোন বাধাই টিকলোনা। ধনুষ্কোডিতে স্নান করতে এসেছি শুনে ফ্রাঁসওয়া অবাক। বম্বে থেকে এত দূরে স্নান করতে এসেছি ফ্রাঁসওয়া কিছুতেই বুঝতে চায় না। ধনুষ্কোডিতে আর কিছু নেই যে তাকে বলতে পারি। অনেক করে তাকে বোঝালুম যে এ এক পিলগ্রিমেজ। বোঝালুম সঙ্গম স্নানের মাহাত্ম্য। ফ্রাঁসওয়ার মনে যেন কি হল। সেও চেপে ধরলো আমার সঙ্গে যাবে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন সুন্দর রোদ। আকাশ বাতাস মধুময়। সাগর বেলায় হাটুডোবা জল। ফ্রাঁসোয়াত চলছে জল ভেঙ্গে, ছপছপ করে আমার পাশে পাশে। চলছে আমার হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে। প্রকৃতির অবাক ছোঁয়ায় সে আন্দোলিত। খুশিতে ডগমগ। একটি ছোট তামিল মেয়ে আমার পিছু নিয়েছে

পাঁচটি পয়সার জন্য, কত কি যে সে বলছে—বলছে রাজা হবে, সুখ হবে, ঐশ্বর্য হবে; তার শুভ কামনার ফিরিস্তির অন্ত নেই। চলতে তার কোন বিরক্তি নেই। মুখ দেখে সে যেন বুঝেছিল আমি তাকে ফাঁকি দেবনা। ফ্রাসোয়া প্রশ্ন করছে তামিল কন্যার পিছু ধাওয়ার রহস্য, বলাতেই হাসিমুখে সে দশটি পয়সা হাতে দিল। ফ্রাঁসোয়াকে যেন পথ চলার আনন্দ আজ পেয়ে বসেছে।

এবার সমুদ্রে আমার স্নান করার পালা। কাপড় জামা গাইড ছেলেটির হাতে দিয়ে তাকাতেই দেখি ফ্রাঁসোয়া অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। স্নান সেরে কাপড় জামা পরে এসে দাঁড়াতেই ফ্রাঁসোয়া আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি আলোকিত, আত্মস্থ-মহিমান্বিত।

এবার তামিল মেয়েটিকে আমিও দশটা পয়সা দিলুম। মেয়েটি পয়সা পেয়ে খুব খুশী। চোখে তার যেন আনন্দ উপচে উঠছে। কে যেন আমাকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলছে। ফ্রাঁসোয়ার হাত ধরে বললুম "ফ্রাঁসোয়া বিশ্বজুড়ে আমি যেন আনন্দের ঐকতান শুনছি।" ফ্রাঁসোয়া তাৎক্ষণিক উত্তর দিল: Yes, This delight is God.

আমার কি হলো জানি না। যে-আমি একাকী বাথরুমেও তেমন গাইতে সাহস পাইনে সে আমি রবীন্দ্রনাথের,

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে

গানখানি পুরো দুবার গেয়ে তাকে শোনালুম, যখন গাইছিলাম—

চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

মনে হলো ফ্রাঁসোয়া আনন্দে আত্মহারা। সম্পূর্ণ গানটি যেন সে বুঝতে পেরেছে। ধনুষ্কোডির সে সাগর সৈকতে আমার সেই গাওয়া গান আমাকেও কম মুগ্ধ করেনি। ফ্রাঁসোয়াতো মন্ত্রমুগ্ধ। মনে এল জীবনভর শুধু তাঁর কাছে পেয়েই চলছি দেইনি তাঁকে কিছু। আজ যেন কোথা দিয়ে কি হলো; দিলুম যেন কিছু। আনন্দ এল ফিরে আমারই ঘরে। গানটি সাধ্যমতো ফ্রাঁসোয়াকে অর্থ বুঝিয়ে বুঝিয়ে গুন গুন করে আরো কয়েকবার শুনাতে হলো। দুএক কলি সেও আমাকে শোনাতে চেষ্টা করলো।

জাহাজঘাটায় ফিরে এলাম। এবার ফ্রাঁসোয়ার যাবার পালা, জাহাজটার চিমনির কালো ধোঁয়া যেন আমাদের দুজনের মনেই বিদায় ও সমাপ্তির কালো পূর্ণচ্ছেদ টানছে। দু একবার অস্পষ্ট শব্দে ফ্রাঁসোয়া আমি শ্রীলঙ্কা যেতে পারি কিনা জিজ্ঞেস করলো, যাবার কোন পথই ছিল না। দুচোখ তুলে ওকে দেখতে চাইলুম। ওর চোখের জল যেন আমার পাওনা ছিল। গুণ গুণ করে আবার গেয়ে উঠলুম।

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া—
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি—

নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে,
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।

চোখের জল ওর আর মানলনা। গাল চুইয়ে অশ্রুধারা আমার মনকে উদ্বেলিত করে দিল। নিবিষ্ট চিত্তে দেখছি তার সেই অনির্বচনীয় রূপলাবণ্য, এ লাবণ্য যেন তার অন্তরস্থ আত্মিক লাবণ্যের বহিঃ-প্রকাশ। সামনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে যেন ফুলের শোভায় ভরে গেল। হেটে চলেছে এক ফরাসী কিশোরী ও এক বাঙ্গালী যুবক-দুলে দুলে নতুন পথে। দুরত্বের সব দেঁয়াল যেন কে সরিয়ে নিয়ে চলছে। নতুন সুর নতুন উষার আলোকে তারা পুলকিত।

কে যেন পড়ছে :—

"পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্যব্যূহরশ্মীন
সমূহ তেজো
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ
পুরুষঃ সোহহমস্মি।

ফ্রাঁসোয়া আবেগে আমার হাত চেপে ধরলো বিদায় নেবার আগে সে তার একখানা কার্ড আমার হাতে দিয়ে গেল।

১৯৬৪-র ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক বিরাট ঝড়ে রামেশ্বরমের পুলটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ্কোডিও। বম্বে হয়ে তখন আমি কলকাতায়। খবরের কাগজে এই সংবাদ পরে বিশেষ মর্মাহত হয়েছিলুম।

সেই সদ্য দেখা স্মৃতির রীল মনের রুপালী পর্দায় আবার উন্মোচিত হতে শুরু করলে, ছবি গান হয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাবলী যেন একটি লং প্লেইং রেকর্ড হয়ে দেখা দিল।

১৯৭৩-র জুলাই। আমার ছোট মেয়ের বিয়ে। কলকাতায় এসেছি। সুটকেস হাতড়াতে গিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কার্ড খানা হাতে এসে ঠেকতেই চোখ সজল হয়ে উঠল। বিদেশিণী বান্ধবী। আত্মার আত্মিকা।

মেয়ের বিয়ে বেশ ছিম ছাম ভাবেই হল। মন পালতোলা নৌকার মতো হাল্কা। ছোট্ট ছোট্ট আনন্দের ঢেউ মনের নদীতে উঠছে আর উঠছেই। মাঝে মাঝে ফ্রাঁসোয়ার কথা মনে আসছে।

খবর এল বন্ধু পুত্র বরুণ প্যারিস যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাওয়া 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' রেকর্ডখানা কিনে কাউকে কিছু না বলেই পণ্ডিচেরী রওনা হলুম। বরুণকে ফ্রাঁসোয়ার কিঞ্চিৎ পরিচিতি দেওয়ার পর, তার কার্ড ও তার জন্য কেনা রেকর্ডটি তার হাতে দিয়ে দুয়েক দিন আশ্রমে থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলুম।

অনেকদিন পরে প্যারিস থেকে বরুণের চিঠি এল। মাদাম ফ্রাসোয়া পুরনো ঠিকানায় নেই। অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে পাওয়া গেল এক স্যানিটোরিয়ামে; প্যারিস থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সিনন্দীর পারে ডিজ শহরে। ছোট্ট একটি কটেজে।

ফ্রাঁসোয়ার মা মেয়েকে দেখেন। কয়েক বছর আগে ফ্রাসোয়ার স্বামী প্লেন ক্রাশে মারা

গেছেন। সেই থেকে ফ্রাঁসোয়া মেলাঙ্কোলিয়াতে ভুগছে। উপসর্গ জুটেছে টি. বি.। বরুণ পৌঁছে তার মাকে আমার কথা বলে রেকর্ডটি তুলে দিতেই তিনি মেয়ের সামনে রেডিওগ্রামে রেকর্ডটি বসিয়ে দিলেন। গান শুরু হলে ফ্রাঁসোয়া চোখ খুলে উঠে বসতে চেষ্টা করতেই বরুণ তাকে উঠে বসিয়ে দিতে সাহায্য করলো।

বরুণ চিঠিতে তার চোখের জলের কথা লিখতে আমাকে ভোলেনি। আরো বলবার আছে বলে চিঠি শেষ করেছে।

এমনটি ভাবতেও পারিনি। ১৯৭৪-র সেপ্টেম্বর বরুণ কলকাতায় এল। একদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বরুণ আমার হাতে ক্রুশ সহ একটি সোনার চেন গুজে দিয়ে বললো; Perhaps her last gift to you, এবার আমার চোখে জল নামার পালা। চেনটি হাতের মুঠোয় পুরে ভাবনার ছাউনিতে। পা এলিয়ে দিলাম। আমি সেই শয্যালীনার চোখের জল দেখতে পেলাম। সেই দেখার কোন ভুল নেই। স্বর্গীয় ধারায় তখন সুর বাজছে :—আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।

বিদেশীরা খাটি সোনার চেন পরেনা। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার চেন যে খাটি মমতায় ভরা তা আমাকে কে যেন শোনাতে লাগলো। নিয়ে এল নতুন বার্তা। নিয়ে এল আত্মিক স্বর্ণ।

কলকাতায় সোনার গয়না পরে মেয়েরা আজকাল বেরুতে সাহস পায়না। স্ত্রী-মিত্রা তাই ফ্রাঁসোয়ার পাঠানো চেনে তার রুদ্রাক্ষের একটি মালা গেঁথে গলায় পরেছেন। আমি ৬৫ অতিক্রান্ত, আয়ু শেষের কুলে এসে ভিড়িছি, জীবনে অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম। জীবনে অতিলৌকিক অনেক কিছু ঘটে, আবার নাও ঘটতে পারে—

ফ্রাঁসোয়ার দেওয়া হার মিত্রার গলায় দোলে। যতবার সে হার দেখি একটা নতুন আলো মনের আদিগন্তে ছড়িয়ে যায়। সে আলোর সুর চেনা তবুও কেন ধরা দেয়না। মনের অতলে চোখ ফেলে চেয়ে থাকি। কারা যেন নিশব্দ শব্দে পালিয়ে যায়। শুধু যাবার আগে নতুনের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। মনে পড়ে বালক কালের কথা। স্কুলের বোর্ডিঙ-এ থেকে পড়ি। বাবা মা থাকেন দূরে। রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতা চুইয়ে চুইয়ে বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো স্কুলবোর্ডিঙ-এর করোগেটেড টিনের চাল বেয়ে টুপ-টাপ করে মাটিতে ঝরে পড়েছে। গান ছবিতে রূপান্তরিত হল। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছবির ছাপ যেন ছায়াপাত হলো। সেই পাতা ঝরা জলের শব্দ মনের গভীরে দাগ কেটে গেছে। আজও ভাবতে গেলে মনের আয়নায় ষ্টীমারের দিকনির্ণয় যন্ত্রের ছবি ভেসে উঠতে চায়।

মনে পড়ে গ্রামের রেলষ্টেশন 'সাহাতলী' নতুন বৌ তার স্বামীকে বিদায় দিতে এসেছে। স্বামী ডিগবয়ে তেলের খনির কাজ নিয়ে যাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো বৌটির চোখের জলে একটা হীরের তির্যক সৃষ্টি করলো। সেই স্বর্গীয় চমক আজও যেন গায় লেগে আছে। অনেক ভালবাসা

অনেক শুভকামনা যেন বৌটি ছড়িয়ে দিলো দিগ দিগন্তের মানুষের দিকে।

১৯৭৫ জুলাই আমার চোখে ক্যাটারাক্ট্ অপারেশন হবে। দু মেয়েই আমার বিদেশে থাকে শিকাগো আর নিউইয়র্ক। আমাকে দেখতে তারা স্বদেশে এসেছে। বড় মেয়ে সুমনা দমদমে নেমেই মাকে প্রণাম করে মুখের দিকে তাকাতেই গলায় নতুন হার দেখে মাকে জড়িয়ে কি যেন জানতে চাইলো। মা পাড়ীতে ফ্রাঁসোয়ার কাহিনী শুনিয়ে তাকে সোনালী রঙে চুবিয়ে দিল। সে বাড়ী পৌঁছে সুটকেস খুলে আর একটি স্ফটিকের হার তার মাকে পরিয়ে দিল। এ হার উপহার দিয়েছেন মিসেস মার্গারেট ইর্ফাণ (Margaret Irfan) সুমনার নতুন বিদেশিণী মা তার মায়ের জন্যে। সুমনাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। পঁচিশ বছর আগে এঁদের পরিবার বুলগারিয়া থেকে আমেরিকায় আসে, 'ইর্ফাণ', পারিবারিক পদবী। দেশ বিদেশে কত মানবদরদী মানুষ 'নতুন পৃথিবী'র অভ্যুদয়ের আশায় দীপ শিক্ষা জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার গোনাগুনতি নেই কত কথা—কত গল্প, কত আনন্দ সব মিলিয়ে যেন এক নতুন দেশ।

সুমিতা ছোট মেয়ে। বিদেশী ইউনির্ভাসিটি প্রাঙ্গনে অনেকদিন কাটিয়েছে, উজ্জ্বল-উচ্ছল, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সে নিজে খুশিতে ভরপুর, সবাইকে দেখেও সে খুশী, সে যেন এক খুশীর গোলাপফুল। দেশ বিদেশে তার বন্ধুর শেষ নেই। ঘুরেছেও সে প্রচুর। যেন নতুন পৃথিবীর নতুন অ্যাম্ব্যাস্ডাার। দমদম বিমান ঘাটিতেই সে ফ্রাঁসোয়াকে চিনে নিল।

সুমিতা নিয়ে এল কত নতুন ছবি কত নতুন লোকের গল্প। পৃথিবীর এক পুরো য়্যাটলাস যেন ঠেঁসে ভরে দিয়ে গেল আমাদের হৃদয় জুড়ে। দিয়ে গেল এক নতুন দেশের সম্ভাবনা। আমার সেই ছেলেবেলার বোর্ডিঙের রাতভোর বৃষ্টির শেষে মাটির ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টির নক্সাকাটা জলের দাগের মধ্যদিয়ে ভবিষ্যৎজীবন যেন সমস্তরাল ভাবে নৃত্যপর।

সবার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রাঁসোয়া।

বর্তমান প্রসঙ্গ

ভারত সরকারের নূতন জন সংখ্যানীতি

১৯৭৬-এর ১লা জানুয়ারীতে ভারতের জনসংখ্যা ৬০ কোটির সীমানা পেরিয়ে গেছে। বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। এই পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রী ডঃ করণ সিং নূতন জনসংখ্যানীতি ঘোষণা করেছেন। ২০০১ সাল পর্যন্ত দৃষ্টি রেখে এই নীতি রচিত হয়েছে। এই নীতির মূলকথা (১) ১৯৮৪ র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১-৪ ভাগে নামিয়ে আনা হবে. (২) ১৯৭১-এর জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাজ্য বিধান সভার, লোক-সভার এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত করে আইন প্রণীত হবে। রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য, করের ও শুল্কের আনুপাতিক ভাগ ১৯৭১-এর জনসংখ্যার ভিত্তিতেই ২০০১ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত হবে, (৩) সারদা আইন সংশোধন করে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৫ থেকে ১৮তে এবং ছেলেদের বিবাহের বয়স ১৮ থেকে ২১-এ বাড়ানো হবে। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আবশ্যিক করবার কথা ভাবা হচ্ছে, (৪) বর্তমানে কেন্দ্র আবশ্যিক নির্বীজকরণের আইন প্রণয়ন করবে না, বিষয়টি রাজ্যগুলির বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রথম ভারতীয় কৃষিকংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী

নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় কৃষিকংগ্রেসে গত ৯ই এপ্রিল ১৯৭৬ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থাপনার যে আলোচনা হয় তাতে জানা যায় যে পাঁচ দশকের গোড়ায় সমবায় ও অন্যান্য সংস্থা থেকে গ্রামাঞ্চলের চাহিদার মোট তিন শতাংশ ঋণ দেওয়া হ'ত তখন এর পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। ১৯৭৫-৭৬ সালে সমবায়গুলি স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়েছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা এবং মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৩০০ কোটি টাকার বেশী। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর ১৯৭৫ কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি বেড়েছে।

ভাসানীর ফারাক্কা অভিযান

বাংলাদেশে-এর পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার পর স্থির হয়েছিলো, খরার সময় ফরাক্কার বাঁধ থেকে ফরাক্কার খাল দিয়ে ৪০,০০০ কিউসেক জল হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে ক'লকাতা বন্দর রক্ষার জন্য ছাড়া হবে। সেই অনুযায়ী কাজও হয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট থেকে বাংলাদেশ-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর

একদিকে যেমন বাংলাদেশে ভারত-বিদ্বেষী প্রচার বৃদ্ধি পেয়ে-চলেছে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ-এর পদ্মা নদীতে গঙ্গার প্রবার কমে যাবার জন্য ফারাক্কা বাঁধকে দায়ী করে, এই বাঁধদিয়ে বাংলা দেশের নদীতে বার মাস আরও অধিক পরিমাণ জল ছাড়ার দাবীতে বাংলাদেশ-এর পত্র-পত্রিকাগুলি সরব হয়ে ওঠে। মৌলানা ভাসানী তো হুমকি দিয়েই বলেন যে গণ-অভিযান পরিচালনা করে ১৫৬ কোটি টাকার নির্মিত কলকাতা বন্দরের জন্য অপরিহার্য এই বাঁধটি ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশকে রক্ষা করবেন। ১৬ই মে এই অভিযানের দিন ধার্য হয়।

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে মৌলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশ-এ প্রবহমান জলের অপ্রতুলতার উল্লেখ করে এর সমাধান চান। প্রধানমন্ত্রী ৪ঠা মে তারিখে সেই পত্রের উত্তরে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্যার মীমাংসার জন্য অগ্রসর হতে বলেন এবং কোনো হুমকীর কাছে ভারত সরকার নতি স্বীকার করবে না দৃঢ়ভাবে সে-কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। ফারাক্কা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের এক প্রতিনিধি দল ঢাকায় গিয়ে সেখানকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদল ক'লকাতায় এসে পাঁচদিন ব্যাপী সরেজমিনে ক'লকাতা বন্দর, হলদিয়া, সমুদ্রের মোহানা এবং ফারাক্কা দিয়ে বাংলাদেশ-এর জন্য প্রবহমান জলের পরিমাণ তদন্ত করে যান। ভারত সরকার ইতিমধ্যে ফারাক্কা দিয়ে একতরফাভাবে বাংলাদেশ-এর জন্য বেশী জল ছাড়বারও ব্যবস্থা করেছেন!

এ-সত্ত্বেও ভাসানীর অভিযান সংযত করতে বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় দিল্লীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ভারতসরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ সতর্ক করে দেন এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করে কোনো বাংলাদেশী ফারাক্কার দিকে অগ্রসর না হতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। ভারত সরকারও সীমান্তে প্রচুর প্রহরী নিযুক্ত করে ভাসানীর অভিযান প্রতিহত করতে তৈরী হন। ভাসানী রাজশাহীতে এসে যথেষ্ট ভারতবিরোধী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত তার শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং ১৭ই মে সীমান্ত থেকে দশ মাইল দূরে শিবগঞ্জে সভা করে তার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সব চাইতে তাজ্জবের কথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির জল ও বন্যাসংক্রান্ত সামরিক উপদেষ্টা, নৌবাহিনীর প্রধান মোসারফ হোসেন খাঁ ১৪ই মে ঢাকায় এক বক্তৃতায় ভাসানীর আন্দোলনের প্রতি সরকারী সমর্থন জানান। অবশ্য ১৮ই মে বনগাঁ সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর-এর অনুরোধে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠক হয়। কিন্তু যেখানে বাংলাদেশ সরকার

গোড়াতেই ফারাক্কা নিয়ে দুই রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের আলোচনা চলাকালীন ভারত-বিদ্বেষে প্ররোচনা যুগিয়েছে, সেখানে এই ধরণের বৈঠকের ফলাফল খুবই প্রান্তিক হতে বাধ্য। কারণ বাংলাদেশ একটি টেকনিক্যাল সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হতে দিয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন

তিনদিন আলোচনার পর ইসলামাবাদে গত ১৪ই মে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন, উভয় দেশের মধ্যে অসামরিক বিমান চলাচল ও দুই রাষ্ট্রের সংযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আগামী ১৭ই থেকে ২৪শে জুলাই-এর মধ্যে এই সব ব্যবস্থা কার্যকর হবে। গত ২৭শে মার্চ জনাব ভুট্টোর ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি থেকেই এই আলোচনার এবং মীমাংসার সূত্রপাত। ভারতের বিরুদ্ধে অসামরিক বিমান সংস্থার কাছে পাকিস্তানের অভিযোগ তুলে নেবার প্রস্তাব দিয়ে জনাব ভুট্টো ঐ চিঠি সুরু করেন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারীতে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানীরা সেই বিমানটিকে লাহোর বিমান বন্দরে পুরিয়ে দিলে ভারত ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং ভারতের আকাশের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে সে-সময় থেকে পাকিস্তানী বিমানকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে কলম্বো দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ১৯৭১-এর ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

চীনে ক্ষমতাবদল

পিকিং-এর ৭ই এপ্রিলের ঘোষণায় জানা যায় তেংসিয়াও পেংকে সকল সরকারী ও পার্টির পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, কেবলমাত্র পার্টির সদস্যপদ বজায় রেখে, সেই সঙ্গে হুয়া কুয়ো-ফেংকে স্থায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং দলের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে দলের প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন সাংহাইকে র‍্যাডিক্যাল নেতা ওয়াং-হুং-ওয়েন। হুয়ার সমর্থনে কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় দুই লক্ষ লোকের শোভা যাত্রা বার হয়েছিলো। ২৫. ৫. ৭৬

২০৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

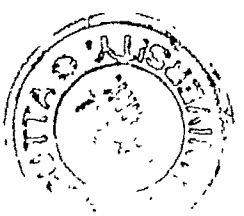

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১৫·০০
পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	৫·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	৩·০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড প্রতিখণ্ড	৩·৫০
বেদুইনের দেশে	৩·০০
নিবেদিতা	১০·০০

মণি বাগচী

বিদ্যাসাগর	১০·০০
শিবরামের কিশোর নাটিক	২·০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪·০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·৫০
বাংলার ঋষি	৫·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবনগড়া	১·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্ধিত সংস্করণ)	

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬·০০

আয়ুরনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ নিবারণ	৫·০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩·০০
শরীর ও শক্তি	৩·০০
সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট প্রতিটি	১·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা - ১২

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/69

Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1·00 with Regtd Postage Rs 3·00 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

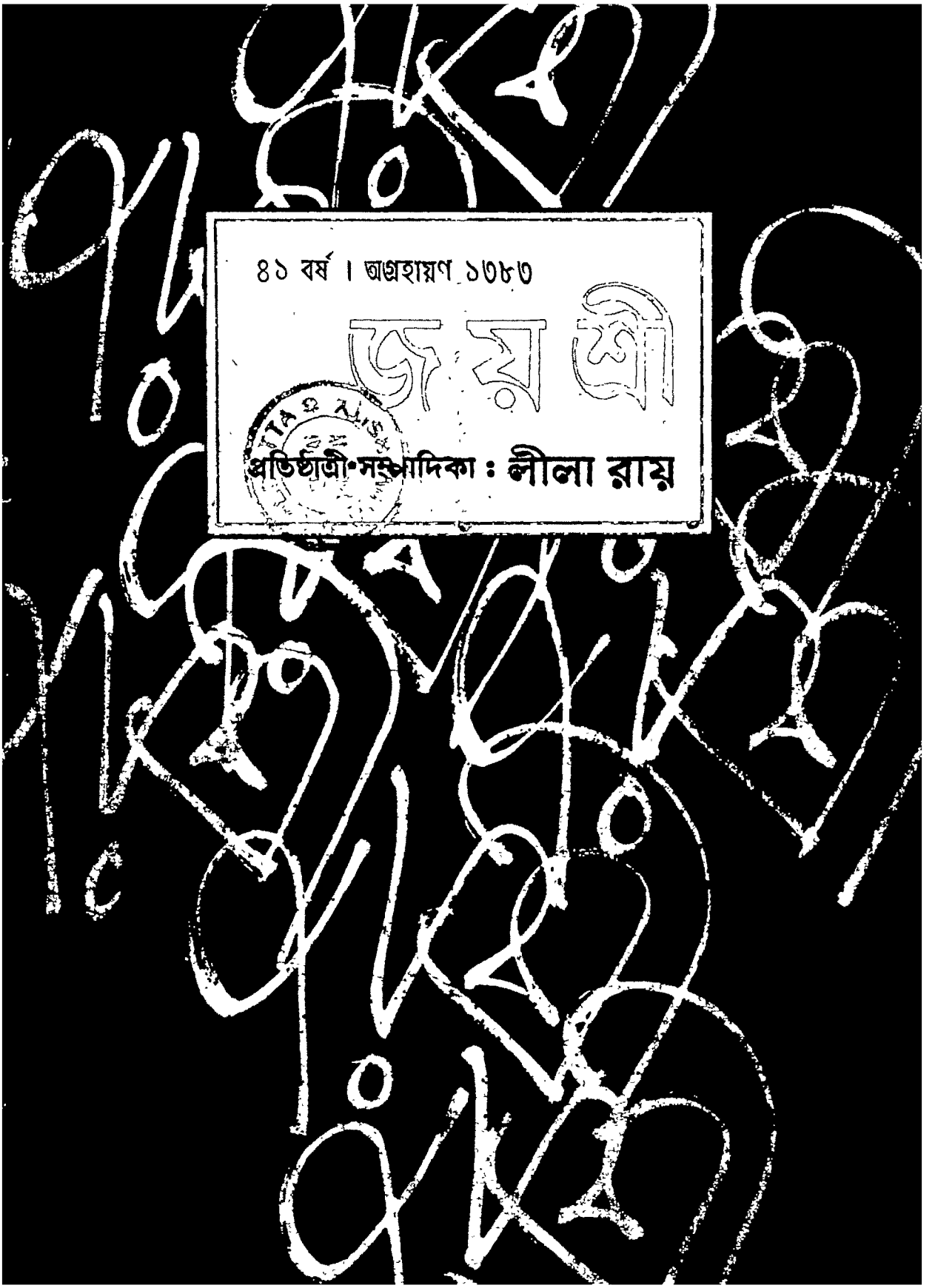

৪১ বর্ষ । অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

ভারতী

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা : লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন
(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

বৃক্ষরোপণ উৎসব
ও
৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিবলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাঁধাই ও ছাপা,

দাম দশটাকা

জয়শ্রী প্রকাশন ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪১ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

সূচীপত্র

বর্তমান প্রসঙ্গ	৪৫৭		
অতীন বসুর প্রথম জীবন	৪৫৯	রাজনীতির অনুপ্রবেশ ॥ একটি	
সমাজ বিস্তার বিজ্ঞানায়ন ॥		প্রতিবাদ পত্র ॥ তীর্থঙ্কর	
ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু ॥	৪৬৩	চট্টোপাধ্যায়	৪৮১
রূপচীন দ্বন্দ্ব ॥ ধারাবাহিক প্রবন্ধ	৪৭৩	স্মৃতির তর্পণ ॥ গল্প ॥	
অভয়শঙ্কর শর্মা		ডঃ অমিয়মোহন বাগচী	৪৮৫
শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণ		কয়েকটি কবিতা ॥ বাসুদেব	
উপলক্ষে অনৈতিহাসিক		দেব	৪৯১

প্রচ্ছদ শিল্পী : খালেক চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

নেতাজী সংখ্যা
পৌষ। ১৩৮৩
একটি সেমিনার
জয়শ্রী
সাম্প্রতিককালে সুভাষ ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা
লিখেছেন
ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন, পবিত্রকুমার ঘোষ,
এছাড়া লিখছেন
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, V. V. Giri, H. V. Kamath,
অমিয় চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।
দাম : তিন টাকা

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

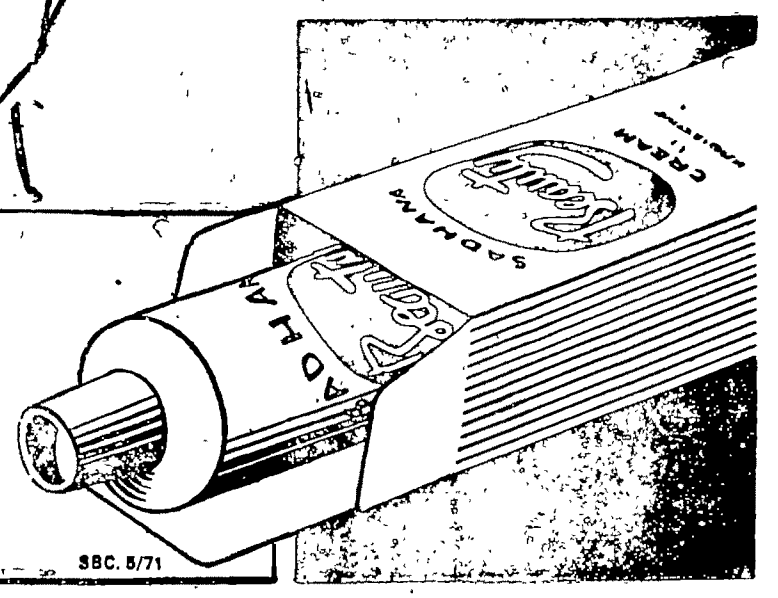

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

৪১ বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

বর্তমান প্রসঙ্গ

গৌহাটিতে এ, আই, সি, সি

গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর গৌহাটিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়ে গেছে। তার পূর্বে ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর সেখানে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়ে যায়। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যুব কংগ্রেস সম্মেলনে ১৩,০০০ যুব-সদস্য যোগদান করেছিলেন, তার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রাজ্য ও সেখানকার কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের সদস্য সংখ্যাই বেশী ছিল। এই সম্মেলনে পঞ্চাশ-ষাট জন বিদেশী সৌভ্রাতৃত্বমূলক সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। যুব কংগ্রেসের আদর্শ মূল কংগ্রেস আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন হলেও, স্বাবলম্বনকে পাথেয় করে তাঁরা চলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সম্মেলনে গৃহীত তিনদফা কর্ম-সূচীর মধ্যে রাজ্যে রাজ্যে শ্রমদান শিবির অন্যতম। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশ দশকের শেষের দিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র গোটা দেশের তারুণ্য-শক্তির মধ্যে পরার্থপরতার ও ত্যাগের বিপুল আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমান ভারতেও তারুণ্যশক্তির সেই মন্ত্রে উদ্বোধিত হবার প্রয়োজন আরও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।

গৌহাটির নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সমাবেশ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের আকার ধারণ করেছিলো, প্রতিটি সংবাদপত্রই এই অভিমত ব্যক্ত করেছে। এগার মাস পূর্বে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনও বিপুল জনসমাবেশে আকীর্ণ-রূপে বর্ণিত হয়েছিলো। এবারকার সমাবেশ তাকেও ছাপিয়ে গেছে—তৃতীয় ফ্রন্টে এই দুই সমাবেশে যারা হাজির ছিলেন, নির্দ্বিধায় তারা এই

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গৌহাটিতে ১৯২৬ সালে একবার এবং দেশবিভাগের পর পঞ্চাশ দশকে আরেকবার কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে-সময় এই অঞ্চলে আসামই একমাত্র প্রদেশ ছিল। এবারকার অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতের উত্তর-পূর্ব পরিষদের (North Eastern Council) অন্তর্ভুক্ত রাজ্য—আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে ভারতের বাইশতম রাজ্য সিকিম গৌহাটি অধিবেশনের আয়োজন করেছিলো। ফলে এই অঞ্চলের সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে সরল পার্বত্য উপজাতিরা তাঁদের জীবনচর্যার বৈচিত্র্য নিয়ে বিপুল সংখ্যায় এই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৮৫·৪৭ ভাগ (মেঘালয়), শতকরা ৯৬·১৫ ভাগ (অরুণাচল প্রদেশ) গ্রামে বাস করেন। এদের অনেকেই নূতন নূতন অভিজ্ঞতার বিস্ময় নিয়ে ফিরে গেছেন। দুই দিনের সমাবেশে বিভিন্ন সময়ে এবং সমাবেশের বাইরে পার্বত্যজাতিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপজাতির মনোমুগ্ধকর পরিচ্ছদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিও এদের বিস্ময়াবেগ বাড়িয়ে তুলেছে।

"এ আই, সি, সি-র অধিবেশনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পার্বত্য রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের কিম্বা কংগ্রেস নেতাদের প্রস্তাব উত্থাপন এবং সমর্থন, কংগ্রেসের সাংগাঠনিক জীবনে এঁদেরও গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেণ্ডুপ দরজি, সমর্থন করেন অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি গোরা পারটিন। রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমাপ্তি-ভাষণ দেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং অংশ গ্রহণ করেন অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেটা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বেনারসী দাশগুপ্ত প্রমুখরা। অর্থনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন মেঘালয়ের সদ্য নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপটেন উইলিয়ামসন সাংমা (Capt Williamson Sangma) এবং সমর্থন করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আর কে ডোরেন্দ্র সিং; R. K. Dorendra Singh, সমাপ্তি-ভাষণ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রাম। অন্যান্য যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-মন্ত্রীদ্বয় প্রণব মুখার্জি ও শঙ্কর ঘোষ। আন্তর্জাতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম খাণ্ডু থুংগাম Prem Khandu Thungam এবং সমর্থন করেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী চাঁদ চুন্থার অনুপস্থিতিতে মিজোরামের এইচ রাঙ্গাইসালো

(শেষাংশ ৪৬৩ পৃষ্ঠায়)

o o o o o o o o o o o o o

অতীন বসুর প্রথম জীবন

জয়শ্রী পত্রিকার উদ্যোগে প্রখ্যাত বিপ্লবীদল "শ্রীসংঘ"-এর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা চলেছে। এই উপলক্ষে "শ্রীসংঘ"-এর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের 'প্রথম জীবন' প্রসঙ্গে তথ্যাদি ও অন্যান্য নানাবিধ ঘটনাবলী সংগ্রহ কল্পে আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ জানানো হয়। এই পরিকল্পনায় অতীন্দ্রনাথ বসুর প্রথম জীবন প্রসঙ্গে প্রাপ্ত একটি রচনা ১২ই অগ্রহায়ণ তাঁর ৬৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে পত্রস্থ হ'ল। অতীন্দ্রনাথ একসময় পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনেই সেদিনকার প্রখ্যাত বিপ্লবীদল শ্রীসংঘে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়ার সময় ত্রিদশকের গোড়ায় গ্রেপ্তার হয়ে বক্সা বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও নেতাজীর অনুগামীরূপে গ্রেপ্তার হয়ে রাজশাহী ও দমদম জেলে আটক থাকেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার এবং রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের 'রীডার' পদে নিযুক্ত থাকাকালীন 'নৈরাজ্যবাদ' সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার উপাদান ও তথ্যসংগ্রহের জন্য লণ্ডনে যান, কিন্তু খুবই বেদনার বিষয় সেখানে গবেষণারত থাকাকালীন অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে অকালে লোকান্তরিত হন। জয়শ্রীতে তাঁর একটি রচনাও পুনর্মুদ্রিত হ'ল এই সংখ্যার (পৃঃ ৪৬৩)।

সম্পাদক, জয়শ্রী

হাওড়া

১৯২০ সালের কাছাকাছি দিনের কথা। হাওড়ার কদমতলা অঞ্চলে এক প্রশস্ত দোতলা বাড়িতে আমরা পাঁচ ভাই ও মা বাবা ছাড়া আরও ছিলেন ঠাকুরমা, কাকীমা ও জনকয়েক খুড়তুতো ভাই। ভাইদের মধ্যে দু জনের অকাল মৃত্যুর পর অতীন বসু তখন তৃতীয়, আমি পঞ্চম। তাঁর জন্ম ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজি তারিখ জানা নেই, বাংলা ১২ অগ্রহায়ণ। স্থান দেশের গ্রাম—মালখানগর, বিক্রমপুর। উনি ছিলেন আমাদের ছোটদা।

আমার স্মৃতির প্রথম দৃশ্য এই কদমতলার বাড়ীতে। অনেকগুলি ছেলে মিলে হৈ চৈ লেগেই ছিল সেখানে। সকালে সন্ধ্যায় দোতলার সামনের বারান্দায় মাদুর পেতে সারি সারি পড়তে বসা। কাছেই ব্যাটরার স্কুলের দেবেন বাবু ও দুর্লভ পণ্ডিত মশায় পড়াতে আসতেন। ইনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তাঁকে আমরা সবাই খুব ভয় করতাম এবং বড়দের কাজ ছিল ছোটদের বেশী করে ভয় দেখানো। পরে তাঁর স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের খোঁজ পেয়েছি, কিন্তু স্কুলের কালী বাবু ছিলেন সত্যিকারের রাগী লোক। তাঁর সম্বন্ধে দাদাদের ভয়ংকর কথাগুলি মনে করে প্রথম স্কুলে যাই ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে।

মাষ্টার মশায়ের কাছে বাড়ির পড়া শেষ হলে দু বেলা আমাদের কাজ ছিল দোয়াত কলম বাতি মাদুর ইত্যাদি ভাগাভাগি করে তুলে আনা, তখন কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে কত হালকা জিনিসটা আগে তুলে নিতে পারে। সন্ধ্যার পড়ার পর অনেক দিন ঘর অন্ধকার করে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখানো হত; লণ্ঠনে কুপির আলো, দেয়ালের গায়ে কাঁপা কাঁপা ছবি বহু বার দেখা, তবু তার আনন্দ কখনও কমে নি। তা ছাড়া বাড়িতে ছিল বিরাট চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন, তার সঙ্গে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' ইত্যাদি অনেক রেকর্ড। এই সব কিছুতে ছোটদার উৎসাহ কারও চেয়ে কম ছিল না।

আর মনে পড়ে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি দেখা, বাড়ির গা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল মার্টিনের ছোট রেল। বাবা ছিলেন এদেরই এনজিনিয়ার।

মালখানগর

সৌভাগ্যক্রমে কালী বাবুর স্কুলে আমাকে বেশী দিন পড়তে হয় নি। অল্প দিনের মধ্যে আমাদের পরিবার দু ভাগ হয়ে গেল, কারণ স্বাস্থ্যের খোঁজে বাবাকে পশ্চিমে বেড়াতে যেতে হবে। আমি ও আমার ছোট বোন বাবা মা'র সঙ্গে উত্তর ভারতে নানা জায়গায় ঘুরে, পদ্মায় বজরাতে কিছু দিন বেড়ালাম। অবশেষে বাবা বোধহয় বুঝলেন দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমাদের গ্রামের বাড়ির টানে সেখানে চলে এলেন। ১৯২৪ সালে নিজের তৈরী সেই বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বড় দু ভাই কলকাতায় কলেজে পড়তেন, আমরা ছোট তিন জন গ্রামের স্কুলে ঢুকলাম। ছোটদার তখন ম্যাট্রিক দিতে দু বছর বাকি, আমি ক্লাস থ্রি-তে। আমাদের দোতলা পাকা বাড়ি, স গ্রামের এক কোণে। অনেকটা হেটে স্কুলে যেতে হত তিন জনকে।

গ্রামে এর পর যে ক'টা বছর আমার কেটেছে তার বর্ণনা দিতে গেলে 'পথের পাঁচালি'র মত শোনাবে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। বাড়ির যে জমি ছিল সেখানে ছোটদার উদ্যোগে আমরা পরম উৎসাহে বাগান করতে আরম্ভ করলাম। কোথার থেকে যেন একটা কুকুরের বাচ্চা যোগাড়

করেছিলেন, লিলি নাম দিয়ে আমরা তাকে পুষতে আরম্ভ করলাম। বড় হয়ে দু দিনের রোগে লিলি মারা গেল, তখন ছোটদার খুবই কষ্ট হয়েছিল।

গ্রামে বাস কালে হঠাৎ এক দিন তাঁর স্বভাবে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা গেল, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের থেকে একেবারে দূরে সরে গেলেন তিনি। দরকারের অতিরিক্ত কথা বলতেন না, পড়াশুনা ছাড়া অন্য কিছুতে সময় দিতেন না। এই সময়ে দোতলায় নিজের ছোট ঘরটিতে জানলার কাছে বসে নিঃশব্দে অধ্যয়নে রত মূর্তিটাই সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। জানলার বাইরেই প্রকাণ্ড এক জামরুল গাছ, তার পর আম বাগান। খাটের উপর বসে দিনে সবশুদ্ধ প্রায় আঠারো ঘণ্টা পড়ায় মগ্ন থাকতেন। এর আগে পড়ার সময়ে তাঁর গলা শোনা যেত, এই সময়ে নিঃশব্দ হয়ে গেলেন।

আমার মনে হয় তখনই তাঁর স্বভাবের ধারাটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যে-ধারার কোনও মৌলিক পরিবর্তন পরে আর ঘটে নি।

ম্যাট্রিকে সব ক'টি বিষয়ে অর্থাৎ ছ'টি লেটার পেয়ে তিনি চতুর্থ হলেন। ক্লাসের আরও দুটি ছেলে পনের ও দশ টাকার বৃত্তি পেল। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের এক অখ্যাত স্কুলের এই কীর্তিতে দেশে বেশ সাড়া পড়ে গেল সে বছর (১৯২৬ সাল)।

কলকাতা

তার পর তিনি কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেনসি কলেজে ঢুকলেন, বিজ্ঞানের শাখায়—যদিও আমার মনে হয় বিজ্ঞানে তাঁর খুব রুচি ছিল না। থাকতেন হিন্দু হসটেলে, অন্যান্য দাদাদের মত বছর বছর বাড়ি আসতেন পুজার সময়ে। আসবার দিন আমরা তাঁদের পথ চেয়ে থাকতাম, প্রথমেই বাক্স খুলে বার করতাম ছোটদের বার্ষিক পত্রিকাগুলি। মাসিক শিশুসাথী ও বার্ষিক পত্রিকা তখনকার দিনে আমাদের মস্ত বড় নেশা ছিল, ওগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, কে কত ক্ষণ পড়বে কড়া নিয়মে তার সময় ভাগ করা ছিল। পুজার আর একটা মস্ত আনন্দ ছিল যাত্রা থিয়েটার। থিয়েটারে ছোটদা প্রায় প্রতি বারই অভিনয় করতেন, অধিকাংশই স্ত্রী ভূমিকায়; এক বার কৃষ্ণ সেজেছিলেন।

প্রসিদ্ধ বেণু পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল, কলকাতা থেকে তিনি আমাদের তার গ্রাহক করে দিলেন। এই সময়েই কলকাতায় তাঁর উপর রাজনীতিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। অবশ্য আমাদের সঙ্গে তিনি ঐ সব আলোচনা কখনও করতেন না, তবে বেণু পত্রিকার দলটা যে তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিল তা আমরা জানতাম। বেণুতে একখানা গল্প (তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী) লিখে তিনি একবার এক পুরস্কারও পেলেন। যত দূর মনে পড়ছে পুরস্কারের মূল্য পাঁচ টাকা। ঐ পত্রিকায় আমাদের রচনাও চার পাঁচ ছত্র ছাপা হয়েছিল; আমরা দুই ভাই মিলে এক ধাঁধা পাঠালাম, কিন্তু খামে যে টিকিট লাগাতে হয় তা জানতাম না। ধাঁধা কিন্তু পরের মাসে ছাপা হল

—এবং ছোটদার ঈষৎ কড়া চিঠির থেকে জানা গেল বেআরিং চিঠির রহস্য ; অর্থাৎ চিঠি যখন পৌঁছায় তিনি তখন বেণু আপিশে উপস্থিত ছিলেন এবং পোস্টাপিশের ছাপ দেখে চিঠি খালাশ করে নিয়েছেন।

কলকাতার ছাত্র জীবন ছিল নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন —তাঁর এই উক্তি পরে শুনেছি আর এক জনের মুখে। তখন যাঁরা তাঁকে ঘন ঘন দেখেছেন তাঁদের কাছেও শুনেছি তিনি বেশী কথা বার্তা বলতেন না।

১৯২৯ সালে আমরা সবাই যখন কলকাতায় চলে এলাম তখন তিনিই সব ব্যবস্থা করে আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। আমরা সকলে একসঙ্গে শ্যামবাজারের ট্রামি ঘাঁটির কাছে থাকতাম। ইতিমধ্যে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ছেড়ে তিনি ইতিহাস অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ঢুকেছেন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন তিন তলায় নিজের ঘরে পড়াশুনায় কাটত। সেটা স্বদেশীয়ানা ও 'সন্ত্রাসবাদের' যুগ। ছোটদার যোগাযোগ সম্বন্ধে বাড়ির সকলেরই সন্দেহ ছিল, ছিল প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ। ১৯৩০ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হলেন।

বাকি ইতিহাসের কয়েক বছর প্রধানত জেল জীবনের কাহিনী। জেল থেকেই এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান পেলেন, সেটা ১৯৩৩ সাল, জেল বাস হেতু অনিয়মিত ছাত্র বলে এক বছর বেশী লাগল। পরে অবশ্য তিনি অর্থশাস্ত্রে পি. এইচ. ডি. উপাধি নিয়েছিলেন (১৯৪২) এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন। জেল থেকে তিনি ফরাসী ভাষায় বি. এ. ডিগ্রি নিয়েছিলেন।

ছোটদা ছাড়া পেয়ে অনেক দিন পর পর বাড়ি আসতেন, তখন তাঁর মধ্যে পারিবারিক স্নেহ মমতার বহিঃপ্রকাশ আবার দেখা যেত। বন্দী অবস্থায় মাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, সকলের খবর নিতেন। আমাদের মধ্যবর্তী ভাইয়ের মৃত্যুর পর যা লিখেছিলেন তার দরদ এখনও মনে পড়ে। এক দাদার বিয়ের পরে অদেখা বৌদিকে সুদীর্ঘ ও সুন্দর এক আবেগপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। সেই সময়ে শালতোড়ায় জেলে তিনি এক বাঘের বাচ্চা পুষছিলেন, সেটা বড় হ'য়ে যাওয়াতে অন্যত্র সরিয়ে দিতে হল, সেই দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল চিঠিখানা। জেলে জেলে নানা জীব জন্তুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন তিনি।

এই সময়ে তিনি দেশকে সম্পূর্ণ আত্মদান করে ফেলেছেন। পরবর্তী ইতিহাস লিখবার যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন অনেকে, ছেলেবেলাকার কথা হয়তো অনেকেরই অজানা।

আমার স্মৃতিশক্তি বরাবরই দুর্বল, জনকয়েক আত্মীয়ের কিছু কিছু সাহায্য পেয়ে থাকলেও তথ্যগত ত্রুটি থাকা আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া যেটুকু মনে পড়ে শুধু তাই লিখতে পারলাম, তাই এ কাহিনী বলতে বলতেই শেষ হয়ে গেল।

সমাজ বিদ্যার বিজ্ঞানায়ন

অতীন্দ্রনাথ বসু

Auguste Comte সমাজবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পরে এ প্রয়াস আর বেশী দূর এগোয়নি। সমাজ-জীবনের মূল বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির অনুসন্ধান না করে আজকাল পণ্ডিতরা বাস্তব সমস্যাগুলোর ওপর মন দিয়েছেন। সমাজবিদ্যা ক্রমশঃ হ'য়ে উঠছে জ্ঞানবিদ্যার একটা পাঁচ-মেশালী, মানব-সম্বন্ধীয় যা কিছু তত্ত্ব বাঁধা কোঠাগুলোর মধ্যে পড়ে না, তাই পড়ছে Sociologyর ফালতু ঝুড়িতে। এরফলে সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে ধারণাটা হয়ে উঠছে ধোঁয়াটে এবং যাঁরা সত্যি সত্যি সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরাও সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না।

বিষয়টা গুরুতর। সমাজবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে আঁটসাঁট করে বসাতে না পারলে অগত্যা মেনে নিতে হয় যে সমাজ ও কৃষ্টি বিজ্ঞানের চৌহদ্দীতে পড়ে না। তাই যদি হয় তবে বাইরের যন্ত্রতন্ত্রে বা মালমসলা বাড়িয়ে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক। সমাজ সংস্কারের বড় বড় পরিকল্পনা (plan) সব ব্যর্থ যদি সমাজের যথার্থ প্রকৃতিটা চিনতে পারা না যায়। বিপদের কথা এই যে আমাদের এই অজ্ঞানতার অবসরে রাষ্ট্রের বাজারে অনেক অর্থনীতিক পরিকল্পনা চালু হয়ে যাচ্ছে যাতে ক'রে হয় ত' কোন দল বা শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধনই হবে, সমাজের কোন মঙ্গল হবে না।

বর্তমান বিজ্ঞানপ্রসূত সভ্যতা এই সঙ্কটের সামনেই দাঁড়িয়েছে। যান্ত্রিক সঙ্গতি ও শিল্পবিদ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু সমাজ হয়ে রইল দিশেহারা। পুরাকালে সমাজ কতগুলো নীতি এবং নির্দেশ মেনে চলতো—অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক বলে নয় আবহমান বলে। আমরা এই সংস্কারগুলোকে যুক্তির আঘাতে নষ্ট করেছি কিন্তু যুক্তির বলে সমাজবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ গড়তে পারিনি। কেন হার মানতে হলো? গত একশো বছর ধরে সামাজিক জ্ঞান ভাণ্ডার অনেক সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি সব ত' পদার্থ বিদ্যার মত সমৃদ্ধি পেয়ে চলেছে? তবে 'সমাজবিজ্ঞান' কেন তৈরী হবে না?

এই বাড়তি মাল-মশলাই হয়েছে বিপত্তি।

বিজ্ঞানকে পরিণত রূপদিতে হ'লে (যেমন পদার্থ বিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বেলায়) আগে অনুসন্ধানের প্রণালীটা আয়ত্ত করতে হয়, তারপর আসে পরীক্ষায় পাওয়া জ্ঞান, আর বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ফন্দীফিকির। সমাজবিদ্যার অগ্রগতি হয়েছে উল্টো। উপাদান বহু জুটেছে, রাতারাতি ফল পাবার ইচ্ছেটাও আছে, কিন্তু অভ্রান্ত প্রণালী খুঁজে পাওয়া যায় নি, সমাজতাত্ত্বিক নৈর্ব্যক্তি সন্ধানী না হয়ে হতে চেয়েছে সংস্কারক এই হয়েছে তার কাল।

আরো এক বিপদের কথা, সমাজবিদ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল দর্শনের সঙ্গে। সমাজতাত্ত্বিকরা তাঁদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লেন নীতিশাস্ত্রে ও দর্শনের অকূল সাগরে। Encyclopœdist, St, Simonian এবং Positivist রা বহু চেষ্টায় সমাজের যে মর্ম্মোদ্ধার করেছিলেন তাকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা, নৈতিক দর্শন বা অনাধ্যাত্ম ধর্ম্ম বললেও চলে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এর প্রতিক্রিয়া চলেছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা আন্দাজী সন্ধান ছেড়ে বাস্তব জীবন থেকে ফর্দ্দি তালিকা (Statistics) সংগ্রহ করতে লাগলেন, যাতে করে প্রত্যক্ষ ফল পাবার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীটা আবিষ্কার করার যে আসল কাজ তা এড়িয়ে যাওয়া হলো এবং সমাজের পরিবর্তে সমাজের বহিরঙ্গ হয়ে দাঁড়াল পঠিতব্য বিষয়।

ইঙ্গমার্কিন সমাজ বিদ্যা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আঠারো শতকের নৈতিক বিশ্বাসের ওপর। নৈতিক অনুশাসক এঁদের সমাজ চিন্তাকে দাবিয়ে রেখেছে। সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে এঁরা গড়েছেন সমাজ-নীতির ব্যবহারিক প্রতিবিম্ব (pragmatic system of social ethics)। ইউরোপের বেত্তারা বিজ্ঞানপন্থী এবং স্থিতলক্ষ্য। কিন্তু তাঁরা মুস্কিলে পড়েছেন আনুষঙ্গিক বিদ্যাগুলোর ও খোদ সমাজবিদ্যার মধ্যে গণ্ডী টানতে গিয়ে। নৃতত্ত্বের প্রতিযোগিতা এঁরা কিছুতেই রুখতে পারলেন না। জ্ঞান জগতের বেওয়ারিশ জমির ওপর এঁরা উভয়েই চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য দখল চালাতে। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব একই এলাকায় গদি পাতলো, কারণ নর নিয়েই সমাজ। শেষ পর্যন্ত একটা কাজ চালানো গোছের রফা হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্ আদিম মানুষ আর তার সমাজ ও কৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামান, সমাজ-তত্ত্ববিদ্ নাড়াচাড়া করেন সাবালক কৃষ্টি আর বর্তমান সমাজ জীবন নিয়ে। নৃতত্ত্বেরই জিৎ হলো, কারণ প্রাচীন উপাদানগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতকটা সহজসাধ্য। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা—যেমন Krœber, Wissler, Lowie, Goldenwieser, এদিকে বেশ কাজ করেছেন। সমাজ-বিদ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হ'লে এঁদের বইগুলো সাহায্য করবে।

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের সভায় ঢুকে পড়লো, সমাজতত্ত্ব রইল বাইরে পড়ে, এর কারণ নৃতত্ত্বের সঙ্গে প্রাগৈতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের কোন বিবাদ নেই, কিন্তু সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের বনিবনা কম। এ শাস্ত্রটা যখন তৈরী হয় তখন ইতিহাস

আছে আসর জুড়ে—বিজ্ঞান হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবে।

ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটা আমরা ধার করেছি গ্রীকদের কাছ থেকে যারা এটাকে অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা অঙ্গ বলে মনে করত। বিজ্ঞানের কারবার নিরপেক্ষ (absolute) অনন্ত সত্তা নিয়ে, ইতিহাস আঁকে কালের ও বিবর্ত্তনের ছবি। Platoর বিশ্বাস ছিল যে বহির্ঘটনা বিকৃতি ও বিবর্ত্তন-সাপেক্ষ, অতএব বিজ্ঞান যতই এদের এড়িয়ে চলবে ততই হবে এর পরিণতি। রেনাসাঁস যুগের বিজ্ঞেরা এই বিশ্বাসটা বয়ে এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আমাদের ইতিহাসে এর ছাপ পড়েছে। পণ্ডিতেরা এখনো বলেন ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কারণ বিজ্ঞান হয় সাধারণ বিষয় নিয়ে, বিশেষ ঘটনা নিয়ে নয়, যা নিয়ে হচ্ছে ইতিহাসের কারবার। Trevelyan বলছেন গ্রীক আদর্শে ইতিহাসকে একটা কলাবিদ্যায় দাঁড় করাতে, (Clio, a muse), Acton চান ইতিহাস থেকে একটা নৈতিক আদর্শ বা শাসন খুঁজে বার করতে, আর Croce দেখেছেন ইতিহাসকে দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির সাথে মিলিয়ে (Theory and History of Historiography)।

আধুনিক ঐতিহাসিকের এর কোনো পথটাই পছন্দ হচ্ছে না। তাঁরা দাবী করছেন ইতিহাস স্বাধীন স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াক। Meyer তাঁর History of Antiquityর ভূমিকায় এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁর চোখ আদর্শের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেলেও বিজ্ঞানের আলো নিতে পারেনি। অন্যান্য সামাজিক বিদ্যা থেকে এঁর পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের ব্যক্তিপরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা মেনে বসে আছেন। তিনি বলতে চান যে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই কতকগুলো সাধারণ সূত্র বার করতে চায় যার মধ্যেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে দৃশ্যমান বিবিধ সামাজিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসের কোন সাধারণ সূত্র বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই—সব ঘটনাগুলোই আকস্মিক এবং মানবেচ্ছাপ্রসূত। গুরুগিরি ছেড়ে এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ পঠন হোল তাঁর মতে ইতিহাসের আদর্শ।

Bury করেছেন আপত্তি। এটি একটা পণ্ডিতী খেয়াল? ঘটনা সংগ্রহ আর ডাকটিকিট সংগ্রহে তফাৎ রইল কোথায়? জ্ঞানীর বৈঠকে পাত্তা পেতে হ'লে সমাজবিদ্যার সঙ্গে এর আত্মীয়তা পাতাতেই হবে।

ইতিহাস বিজ্ঞান, না দর্শন, না শিল্প—এ তর্কটার ভেতর মাথা গলাবার আগে দেখা উচিত আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক ইতিহাস এ দু'এর পরিস্থিতি কোথায়। গ্রীক বিজ্ঞানের মত সনাতন সত্যের মর্ম্মোদ্ধার আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়। শুধু কতকগুলো অব্যবহারিক (abstract) নিয়মকানুন আবিষ্কার করাই এর কাজ নয়—আরোহ (induction) এবং পরীক্ষার (experiment)

জোরে এ প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা ও তথ্যকে আয়ত্ত করতে চায়। অধিকন্তু ক্রমবিকাশবাদ এবং জীবতত্ত্বের নবতম পরিণতি এর মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানগুলো, যেমন উদ্ভিদতত্ত্ব বা পশুতত্ত্ব, এমন কি জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্বও ইতিহাসাত্মক। বিজ্ঞানের সার কথা আজ এই যে, নিখিলের স্থিরত্ব নেই, সনাতনী নেই, কালের ছাপ যেতে যেতে বিশ্ব বিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে।

আবার ইতিহাসও শিল্প চাতুর্য ও নীতিবচনে সন্তুষ্ট নয়—কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জগাখিচুড়ী বলে আত্মপরিচয় দিতেও রাজী নয়। অতীতকে একটা আকস্মিক ঘটনা সমষ্টি রূপে না দেখে এ দেখেছে একটা স্বাভাবিক পরিবিকাশের মূর্ত্তিতে। এ আর এখন রাজনীতিক চালবাজি, আর সন্ধি-বিগ্রহগুলোকে তত দাম দেয় না যত দেয় স্থায়ী সামাজিক আর আর্থিক প্রভাবগুলোকে যা' দ্বারা সাধারণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর একটা জিনিষ এ পেয়েছে নৃতাত্ত্বিকের কাছ থেকে। উনিশ শতকে ইতিহাস রাষ্ট্রকে সমাজের একক (unit) এবং গবেষণার লক্ষ্য বলে মানত, আজকাল ইতিহাস কৃষ্টিকে ব্যষ্টি বলে মানছে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেয়ে কৃষ্টির ঐক্য ব্যাপক এবং গভীর। এ সূক্ষ্ম বুদ্ধির মাথা থেকেও আসেনি রাষ্ট্রীয় জীবনবীজ থেকেও জন্মায় নি। সমাজ-সত্তার এইটেই প্রাণ যা থেকে নতুন নতুন সামাজিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে।

জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক ইতিহাস সমাজপতি বা কৃষ্টির বিকাশকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিচ্ছে। ইতিহাস আর বিজ্ঞানের সত্যিকার বিরোধ নেই এবং ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা বস্তুত পরস্পর মুখাপেক্ষী। সমাজ-বিদ্যাকে বাদ দিলে ইতিহাস হয়ে ওঠে শব্দসার এবং অবৈজ্ঞানিক, আর ইতিহাসকে বাদ দিলে সমাজতত্ত্বকে হ'তে হয় কতকগুলো অব্যবহারিক মতবাদের সমষ্টি। এ পর্য্যন্ত এই ইতিহাস-বিমুখতাই হয়েছে এর দুর্বলতা—এ চেয়েছে ইতিহাসকে এর মতবাদগুলোর অনুগত বাহন করে রচনা করতে। সমাজ-তান্ত্রিকদের বড় বড় পুঁথি খুললে প্রায়ই দেখতে হয় নতুন নতুন ঐতিহাসিক 'তথ্য' যা ঐতিহাসিকরা জানে না,—এবং ঐতিহাসিক সমস্যার সহজ সমাধান, যার দিকে ঐতিহাসিকরাই নিতান্ত ভয়ে ভয়ে এগোন।

বাস্তব পক্ষে এ দু'এর প্রণালী ভিন্ন, বিষয় এক। সমাজবিদ্যা গোষ্ঠিজীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্লেষণ, ইতিহাস সমাজ জীবনের ধারাবাহিক ও বিশদ বর্ণনা। প্রথমটির কারবার সমাজের গঠন নিয়ে দ্বিতীয়টির কারবার এর বিকাশ নিয়ে। জীবনতত্ত্ব এবং জৈব বিকাশের মধ্যে যা সম্বন্ধ এদের মধ্যেও তাই। যেমন গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে হলে, সমাজ-তান্ত্রিক খুঁজবে পুররাষ্ট্রের গঠন, পারিবারিক জীবনের আর্থিক ভিত্তি, সমাজের মধ্যে বৃত্তিভেদে শ্রেণী বিভাগ, সমাজ ব্যবস্থায় দাস প্রথার স্থান ইত্যাদি ; কিন্তু এ সমস্তই করতে হবে ঐতিহাসিকের উপাদানকে অবলম্বন করে, ধারাবাহিকভাবে এবং

গ্রীক কৃষ্টির ক্রমবিকাশকে চোখের সামনে রেখে। ঐতিহাসিক তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত সামাজিক বিশ্লেষণের সাহায্য নেবেন এবং সমগ্র গ্রীক কৃষ্টির সঙ্গে তার যোগস্থাপন করবেন।

সমাজ বেত্তারা এদিকে বিশেষ কিছুই করেননি। কৃষ্টিমূলের (cultural unit) সন্ধান এবং তার সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন নৃতাত্ত্বিকরা। সমাজ-বেত্তাদের নজর উঁচু। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোতে চলতি যে আঙ্কিক এবং পারিমাণিক (quantitative) পদ্ধতি, সেগুলোকে কাজে লাগাবার খেয়াল তাঁদের পেয়ে বসেছে এবং ফলে তাঁরা একটি যন্ত্রবৎ (mechanistic) ও জড়বাদ (determinist) সমাজ বিজ্ঞান খাড়া করেছেন। "Social physics', 'Social energetics' ইত্যাদি কত রকমারি 'বাদ' এলো গেলো, তবু উদ্যোগের বিরাম নেই ; —এরা ইতিহাস বা সামাজিক বাস্তবের তোয়াক্কা রাখে না, এগুলোতে আছে কতগুলি অস্পষ্ট ব্যাপক উক্তি, আর সূত্রগুলো পদার্থবিদ্যা থেকে ধার করা উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়। Carey বলছেন যে সামাজিক বন্ধন আণব আকর্ষণ সূত্রের (law of molecular gravitation) একটি অঙ্ক। Carver ও Ostwald বলছেন যে, কৃষ্টি জিনিষটা সৌরশক্তিকে মানব শক্তিতে পরিবর্তন করবার একটা কল। Winiarsky তর্ক করছেন যে সামাজিক পরিবর্তন thermodynamics এর কানুন মেনে চলে। ঐতিহাসিকের দেখা আছে সমাজের সত্তা কত দুরূহ, জটিল, তাই বেত্তার উপবৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালী দেখে তিনি ক্ষেপে গেছেন বিদ্যেটার উপরেই।

অথচ এ কথাও সত্যি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মানুষ ও সমাজকে বোঝা যায় না। হাজারো রকমে মানুষের জীবন প্রভাবিত হচ্ছে বাস্তব শক্তিদ্বারা। ঐতিহাসিক গতির নীচে, সভ্যজীবনের বাহ্য কাজগুলির আড়ালে—রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের সঙ্গে সমাজের মূল সম্বন্ধগুলি আর পরিবর্তনের অর্থমুখীনতা। সমাজবিদ শুধু সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে কী সম্বন্ধ তাই খুঁজবেন না—পরিবেষ্টনের সঙ্গে মানবজীবনের মূল সম্বন্ধটাও খুঁজে বার করবে, কারণ এখানেই হচ্ছে সকল কৃষ্টির গোড়া। এদিককার কাজে সে দাঁড়াবে জীবতাত্ত্বিকের সঙ্গে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে নয়—কারণ সমাজকে তার প্রাকৃতিক আবেষ্টন আর অর্থকরী অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া, আর জীবাণুকে (organism) তার পরিবেষ্টন ও কার্যকলাপের (function) সঙ্গে মিলিয়ে পড়া—দুটোর মধ্যে বেশ মিল আছে।

Le Play তাঁর একটি বই-এ (Les Ouvriers Europeans.) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন—যদিও তাঁর সমসাময়িক Marx, Spencer বা Buckle-এর মত সম্পূর্ণ জিনিষ তিনি দিতে পারেন নি, এবং অতখানি প্রতিষ্ঠাও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। Marx এর স্বাবলম্ব জড়বস্তুতাবাদ না নিয়েও তিনি সমাজের অর্থমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

Buckle কিম্বা Ratzel-এর চেয়েও যথাযথ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি সমাজ জীবনে ভৌগলিক আবেষ্টনের প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন, Herbert Spencer-এর মত অন্ধ-বৈজ্ঞানিক অর্দ্ধ দার্শনিক ব্যাপকোক্তি না করেও তিনি সমাজ বিকাশের সঙ্গে জৈববিকাশের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তিনি গবেষণা সুরু করেন বিশেষ কোন ভৌগলিক ও আর্থিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থিত কতগুলি পরিবার নিয়ে—অর্থাৎ স্থান ও বৃত্তিভেদে সমাজ জীবন এবং সমাজ গঠন কোন্‌রূপ নেয় তাই ছিল তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়। তিনি প্রামিক জীবন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করলেন—গোটা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন স্তরের আদর্শ শ্রমিক পরিবার বেছে নেন। তাঁর অনুসন্ধান সরকারী নথিপত্র ও যদ্দি-তালিকার সাহায্যে চলেনি—তিনি সরাসরি তাদের ঘরকন্না দেখেছেন—তাদের খরচপত্রের হিসেব নিয়েছেন—এবং এই সব প্রত্যক্ষ উপকরণ দিয়ে পারিবারিক ঘটনাও তথ্যগুলির অর্থ বার করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস বিজ্ঞান সম্মত হলেও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। পরিবার ছাড়া সমাজের ব্যষ্টিবাচক (unit) আর যে সব প্রতিষ্ঠান—যেমন গ্রাম্যগোষ্ঠি সহর ও মিউনিসিপ্যালিটী এবং জাতি ও রাষ্ট্র সেগুলোকেও ঐপদ্ধতিতে পড়া উচিত ছিল—এবং আরও উচিত সমগ্র সমাজের আবহমান কৃষ্টির ও বিকাশের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা। Le Play পুরোদস্তুর বাস্তববাদী ছিলেন না। সমাজ জীবনে নীতি ধর্ম্মের বস্তুস্বাতন্ত্র তিনি বহুক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ প্রভাবগুলো তাঁর কাছে স্থির গতিহীন; সমাজের অন্তর্গত নয়, সমাজ-বহির্ভূত। এখানেই তাঁর আসল গলদ।

কৃষ্টি বলতে শুধু কর্ম ও স্থানভিত্তিক একটা সম্প্রদায়কে বোঝায় না—কতকগুলো বিশিষ্ট ভাবের গ্রন্থি একে বেঁধে রাখে, একটা নিজস্ব সত্তা দেয়। এখানেই খুঁজতে হবে কালোত্তর শিল্পের উৎস, ঋষির দৃষ্টি বুদ্ধি দান। এসব বস্তুর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ বা মাত্রাগত বিশ্লেষণ (quantitative analysis) চলে না বলে সমাজবিদ হয় ত চাইবেন এদের পাশ কাটাতে কিন্তু উপায় নেই। মনের রাজ্যে এই সূক্ষ্ম প্রভাব স্থূল পারিপার্শ্বিকের চেয়ে কম নয়। সমাজবিদ অবশ্য মুখ্যত দেখবেন সমাজের গঠন বা আকৃতি, যার ভিত হচ্ছে বস্তু এবং চুণবালি ভৌগলিক পরিবেশ ও আর্থিক বৃত্তি—কিন্তু এই সমাজগঠনকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে যে কৃষ্টির সৌধচূড়া তার দিকে চোখ বুজে থাকলেও সমাজ-বিদের কাজ হবে না। গ্রীক নগরের সামাজিক সত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে দেখতে হবে একদিকে এ যেমন ভূমিজ অন্যদিকে তেমনি Hellenism এর প্রতীক—ঠিক যেমন Athens এর জনপ্রিয় রাজার Erechtheus বিশ্বমাতার সন্তান আবার Pallas Athene র বরপুত্র।

সমাজ তত্ত্বের মধ্যে এই দুই ভিন্নগুণ পৃথক্ বস্তুর আবির্ভাবই যত বিপদ বাঁধিয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সন্ধান চলে সমগুণ উপাদানের ওপর, দার্শনিকেরও তাই। কিন্তু সমাজবিদ্‌কে কাজ

করতে হচ্ছে দুই অবিচ্ছিন্ন অথচ ভিন্নগুণ উপকরণ নিয়ে।

সহযোগী বৈজ্ঞানিক যখন এগিয়ে চল্লো কদমে কদমে এবং তাঁর সঙ্কটসা হয়ে উঠলো অধীর, তখন সমাজবিদ্ আর তার জটিল উপকরণকে সরল করে নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। দুটো ভিন্ন গতি ধারার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপিত হলো, —একটি হলো উৎস, অপরটি উচ্ছ্বাস।

যাঁরা বস্তুকে উৎস করেছেন তাঁদের, গুরু হচ্ছেন Marx। তিনি বলেছেন—"মানব জীবনের সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও আত্মিক প্রক্রিয়াগুলি নিরূপণ করে, বাস্তব জগতে ধনের উৎপাদন-পদ্ধতি, মানুষের চেতনা তার স্থিতিকে নির্দ্ধারণ করে না, তার স্থিতিই তার চেতনাকে নির্দ্ধারণ করে। আর্থিক ভিত্তির পরিবর্তন হলে সাথে সাথে অতিকায় কৃষ্টিচূড়া রূপ বদলায়" (Zur Kritik der Politischen Oekonomie, Introduction) কৃষ্টিচূড়া যে জড়ভিত্তিক এবং অর্থনির্ভর এককথায় সন্দেহ জাগে না। কিন্তু একথা প্রচার করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া শক্ত যে সমাজের অর্থ নিরপেক্ষ প্রভাব নেই। একদিকে এই মতবাদ ছেঁটে দিয়েছে কৃষ্টির সেই সমস্ত অঙ্গ যা সোজাসুজি ওপর কৃষ্টিমূলক শক্তিগুলোর কোন অর্থনীতির ব্যাখ্যায় পড়ে না, অন্যদিকে অর্থাতীতের এলাকা থেকে অনেকটা জমি দখল করেছে অর্থের গণ্ডীর ভেতর।

এই মতের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন একদল, ভাবকে বস্তুর উৎস করে। Hegel এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে ইতিহাস হচ্ছে নির্বিকল্প চিৎশক্তির (absolute mind) ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ। নিখিলাত্মার ভাবসংঘর্ষ (cosmic dialectic) থেকে এক একটি কৃষ্টি বা জাতি বুদবুদের মত আসে যায় এবং বাস্তব সভ্যতা এই অন্তর্লীন ভাববস্তুরই (immanent idea) প্রতিচ্ছবি। সমাজতাত্ত্বিকের আসরে আজ Hegel এর এই বিশ্বাসের স্থান নেই। কিন্তু Hegelএর আগে রাজত্ব করেছিল যে যুক্তি মিশ্র আদর্শবাদ—Burke এবং de Maistre এর কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু ব্যঙ্গ, আক্রমণ সত্ত্বেও সে তার প্রতিষ্ঠা নষ্ঠ হতে দেয় নি। এর মূলে আছে দুটো অটল বিশ্বাস। প্রথম, সমাজ এক অবিচ্ছিন্ন প্রগতির নিয়ম (absolute law of progress) মেনে চলে। দ্বিতীয়, যুক্তিবোধ সমাজকে পরিবর্তন করবার শক্তি রাখে। স্বাধিকার, বিজ্ঞান, যুক্তি, ন্যায় বোধ—এসব কতগুলো নিছক হাওয়াটা কল্পনা নয়—সমাজের প্রগতি ও কৃষ্টির রূপান্তর ঘটাতে এরা সমর্থ। এমতের প্রভাব যদিও সুধি সমাজে আজও কিছু কিছু আছে তবু বিজ্ঞানপন্থীরা কোনমতেই এঁদের অন্ধবিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারেন না *

Simmel ও Wiese একটা নতুন মধ্যপথ

---

* Pareto এদের বিশ্বাসকে সমাজতত্ত্বের মধ্যে না এনে ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ঠাঁই করে দিয়েছেন—Trattato di Socialogia generale,

ধরেছেন। সমাজকে তাঁরা বুঝতে চান সরাসরি—বস্তু ও ভাব-নিরপেক্ষ করে,—অর্থাৎ তত্ত্বকে অন্তঃসারশূন্য করে, শূন্য গর্ভ ন্যায়শাস্ত্রে পর্যবসিত করে। Emile Durkheim এর হাতে সমাজ হয়েছে স্বয়ম্ভু—এক স্বাধীন আত্মিক শক্তি যা হ'তে উদ্ভূত হচ্ছে তার বস্তুজীবন ও ভাবজীবন। এক কথায় সমস্ত সমস্যার জট খুলে গেলো—সমাজ-বিদ্যা তাল ঠুকে বিজ্ঞানের খাস কামরায় হাজির হলো।

সমাজ-বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে হলে এত অধীর হওয়া চলবে না। যেমন Pareto বলছেন,—কার্য্যকারণ সম্বন্ধটাকে এক তরফা দেখাটা ভুল,—সমাজের বহিরঙ্গ কতগুলি মিশ্র এবং পরস্পর নির্ভরশীল প্রভাব থেকে রূপ নেয়। বাস্তব আবেষ্টন, সামাজিক গঠন, আধ্যাত্মিক কৃষ্টি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, আর সমবেতভাবে চালাচ্ছে সামাজিক জীবনধারা;—এর মধ্যে একটাকে সর্ব্বে-র্ব্বা কর্ত্তা ও অন্যগুলোকে কর্ম্ম করা চলবে না।

জাপানী সামুরাই প্রথাটাকে নজর দিয়ে দেখলে একথাটা বোঝা যায়। ওখানকার সমাজে এর কার্যকলাপ বেশ পরিস্ফুট এবং স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। তবু এই অনুষ্ঠানটীর স্বরূপ বুঝতে হ'লে শুধু জাপানী জমিদার তন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং জাপানী সমাজের আর্থিক গঠন বুঝলে চলবে না,—যে জটিল নৈতিক বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসগুলি এর মধ্যে মূর্ত্তি ধরেছে সেগুলোর খোঁজ নিতে হবে। এর মধ্যে স্বদেশী, কনফুসিয়, বৌদ্ধ সব রকম উপাদানই আছে,—যার সঙ্গে জাপান ও তার সামরিক ঐতিহ্যের দূর আত্মীয়তা রয়েছে। এ সব মিলিয়ে যে নৈতিক আদর্শ ও সংস্কৃতির রূপ দেখা যাচ্ছে, তা অতীতের কঙ্কালমাত্র নয়—জাপানী সমাজের মধ্যে এ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং একে বাদ দিয়ে জাপানী রাজনীতি এবং তার চিন্তা ভাবনা বোঝা অসম্ভব।

অতএব সমাজের পাঠ ধর্ম্ম ও দর্শন বাদ দিয়ে চলে না। কেউ কেউ আরো দশ পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মধ্যে সমাজতত্ত্বের ধ্বজা নিয়ে ঢুকেছেন। তাঁরা বলতে চান—সমাজবাদ দিয়ে যখন আত্মিক কৃষ্টি হয় না, তখন "আত্মিক বিজ্ঞানের" (Geisteswissenschaften) স্বাতন্ত্র্যের দাবীও টেকে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শুধু সমাজ দেহের ক্রিয়া নয়, এদের একটা স্বতন্ত্র নীতি ও লক্ষ্য রয়েছে। সমাজের মাটিতে এদের জন্ম, কিন্তু এদের দৃষ্টি ব্যবহারিক জগতের দিগ্বলয় পেরিয়ে চ'লে যায়। Comteর সময় থেকে আদর্শ-পরায়ণতার চাপে ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সংস্কার সুরু হয়েছে। সমাজ-তান্ত্রিকের খেয়াল চেপেছে ধর্ম্ম সংস্কার করবার,—যেন তাঁদের ছাঁচে ঢালাই ধর্ম্মমত থেকে তাঁদের মনের মত সমাজ তৈরী হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন এটা বৈজ্ঞানিকের রীতি নয়।

বিশ্বময় দেখা যাচ্ছে কার্য্যকারণের যোগসূত্রটী একটা মালার মত—এর সুরু নেই, শেষ নেই। বীজ

থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ। 'আত্মিক বিজ্ঞানের' শিকড় সমাজের বুক থেকে রস টানছে—আবার সমাজকে দিচ্ছে ছায়া, জল, ফল। সমাজবিজ্ঞান ও 'আত্মিক বিজ্ঞানের' মধ্যে এই চক্রাকার সম্বন্ধটা বুঝতে পারলেই আর খেয়াল মাফিক ধর্ম্ম-সংস্কার করার উৎসাহ থাকবে না।

গ্রীক রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে জন্মেছিল তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ ও ঔদার্য্যের, নৈতিক আদর্শ, কিন্তু এরাই আবার তাদের পুরপ্রতিষ্ঠানের ওপর একটা বিশিষ্ট ছাপ দিয়েছিল। বর্ত্তমান স্বাধিকার বোধ ও গণতন্ত্রের, আদর্শ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। Max Weber দেখিয়েছেন যে পুঁজিতন্ত্র শুধু একটা নির্জলা আর্থিক পরিবিকাশের মধ্যে বেড়ে উঠেনি। রিফর্মেশনের পর প্রটেস্টাণ্ট ইউরোপে শিল্প ও সঞ্চয়ের প্রতিধর্মের যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—সেখান থেকেও এ জীবনের রস টেনেছে। আবার এই রিফর্মেশন—যাকে আমরা ধর্মের যুদ্ধ বা ধর্মের নামে গোঁড়ামীর যুদ্ধ বলে জানি খোঁজ করলে দেখা যাবে যে আসলে তার উৎস হচ্ছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, জাতীয় রেষারেষি ইত্যাদি।

মনোবিকলন যেমন ব্যক্তির সামনে তার অবচেতন দ্বন্দ্ব ও অবদমন (repression) গুলো এনে দেয়, তাকে আত্ম সচেতন করে, সমাজ বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক নীতিও হবে তেমনি। সমাজকে ও যথার্থ লক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেবে, এর কার্যকলাপের যথার্থ প্রেরণা সম্বন্ধে অবহিত রাখবে—এর সংঘর্ষদ্বন্দ্বের স্বরূপ এর কাছে পরিষ্কার করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর বিপরীত ধারা। আমরা সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে না দেখে একটা আদর্শের চশমা লাগিয়ে দেখি।

এই আবছায়া দৃষ্টি অতীতে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে করবে আরো অনেক বেশী। কারণ রাষ্ট্র ক্রমশ সামাজিক জীবনের ওপর তার অধিকার বাড়াচ্ছে। সঞ্জির পরিবার, উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান সব একে একে রাষ্ট্রের আওতায় আসছে। এমন কি সমাজের গড়ন, আদিক সম্বন্ধ, কৃষ্টির দান সব কিছু রাষ্ট্র প্রয়োজনের তাগিদে নতুন করে গড়তে লেগে গেছে। আজ কোন রাষ্ট্রবিদ চাইবেন যুদ্ধ বন্ধ করতে, কেউ চাইবেন যুদ্ধ বন্ধ না করতে, কেউ চাইবেন দারিদ্র্য দূর করতে, কেউ চাইবেন জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করতে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মশলা দরকার তা নাই। রাষ্ট্রের ধুরন্ধররা শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করছেন অথবা কতজোর বাস্তববাদ ও নীতিবাদের একটা জোড়াতালি দিয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। Marx এর সমাজ-তন্ত্রবাদ যে এতটা লোক প্রিয় হয়েছে তার কারণ এ অন্তত একটা স্ব সম্পূর্ণ সমাজবিদ্যাখাড়া করেছে; যদিও বা তার মধ্যে ত্রুটি বা ফাঁক কিছু থাকে।

জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব যেমন ভিত্তিক বিদ্যাকে

নবজন্ম দিয়েছে—আমরা চাই সমাজ বিজ্ঞান তেমনি রাজনীকে রূপান্তরিত করবে। এই নববিজ্ঞানের কাজ হবে বিভ্রান্ত সভ্যতাকে সচেতন করা, সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এ কাজ positivist দের মত আধ্যাত্ম ও দর্শণকে বেদখল করে হবে না অথবা নৈতিক ও আত্মিক সম্পদকে উড়িয়ে দিয়েও হবে না। যতদিন পর্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে সেতু না উঠবে, এ ব্যবধান যতদিন "লম্ফ" দিয়ে উত্তরণ না করে উপায় নেই, ততদিন পর্য্যন্ত একটিকে সূত্র করে বিজ্ঞান দাঁড়াবে না—তা মানুষের দেহবিজ্ঞানই হোক বা সমাজের দেহ বিজ্ঞানই হোক। এই যুগ্মধারার প্রভাব স্বীকার করে সমাজবিজ্ঞান তৈরী হলেই তা থেকে জন্মাবে রাষ্ট্রনীতির ব্যবহারিক বিজ্ঞান (applied science of poltics)—মানুষের ভবিতব্যের ওপর হাত দিতে রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক তখনই হবে অধিকারী।

পুনর্মুদ্রণ জয়শ্রী আশ্বিন ১৩৪৫

চাই ভালো লেখা—চাই নতুন লেখক

শক্তিশালী নতুন লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা প্রকাশের সুযোগ 'জয়শ্রী'তে সর্বাগ্রে।

প্রবন্ধ হবে তথ্যবহুল মননশীল আনুমানিক তিন হাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ শেষে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব লেখাই স্পষ্ট হস্তাক্ষর বা টাইপে এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবেন। রচনার মাথায় শব্দ সংখ্যা লিখে দেবেন॥ রচনার সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biodata) পাঠাতে ভুলবেন না।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক, জয়শ্রী

ধারাবাহিক প্রবন্ধ
আশ্বিন সংখ্যার পর
কিস্তি ১০

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভয়শঙ্কর শর্মা

রুশ-চীন সশস্ত্র সংঘাত

১৯৬৩ সালে মস্কোতে রুশ-চীন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। তার পূর্বে ১৯৬৩-এর ১৪ই জুন চীনারা রুশদের কাছে ২৫ দফা তত্ত্ব সম্মলিত একটি বয়ান পাঠিয়ে দেয়। বয়ানে ছিল কম্যুনিষ্ট কৌশল সম্পর্কে নানা সময়ে সোভিয়েত রুশের উপস্থাপিত সুপরিচিত বক্তব্যসমূহ এবং বয়ানটির নাম দেওয়া হয় 'A proposal concerning the General Line of the International Communist movement.' বয়ানটি রুশীরা তাদের পত্র-পত্রিকায় না ছেপে, চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু চীন দূতাবাসের পাঁচজন চীনা, সোভিয়েত রুশের অভ্যন্তরে এই ছাপানো বয়ানটি বিলি করবার অভিযোগে রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং পিকিং-এ ফিরবার পর তাদের বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। শেষপর্যন্ত সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদসহ চীনা বয়ানটি ১৯৬৩র ১৪ই জুলাই তারিখের 'প্রাভদায়' ছাপিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট দলকে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙনের জন্য এবং রুশকে শ্বেতজাতিরূপে চিহ্নিত করে এই বিতর্কে বর্ণবিদ্বেষের কলুষ আমদানী করবার জন্য দায়ী করা হয়।

ইতিপূর্বে ১৯৬৩র ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'প্রাভদায়' সোভিয়েত রুশ দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে চীনাদের সঙ্গে আলোচনায় সম্মতি জানায় এবং আরো বলে যে আলোচনা যে কোনো স্তরে, যে কোনো জায়গায় হতে পারে— 'on any level and at any time'। ১৯৬২র ৭ই এপ্রিল চীনাদের পক্ষ থেকে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির আর একটি সম্মেলনের জন্য অনুরোধের ফলে, সোভিয়েত রুশের এই

সম্মতি। সোভিয়েত রুশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সম্মতিজ্ঞাপক একটি চিঠি সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও সে-তুং-এর হাতে ১৯৬৩র ফেব্রুয়ারীতে পৌঁছে দেয়। ১৯৬৩র ৭ই মার্চ মাও ক্রুশ্চেভকে পিকিং-এ আমন্ত্রণ জানালেন এবং বিকল্প প্রস্তাবরূপে পিকিং-এ সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে বলেন আর তা না হলে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোতে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে যেতে পারে।

১৯৬৩র ৩০শে মার্চ মস্কো থেকে প্রস্তাব এলো, হয় মাও মস্কো আসুন, অথবা একটি চীনা প্রতিনিধিদলকে যেন মস্কোতে পাঠানো হয়। ১৯৬৩র ৫ই জুলাই মস্কোর ক্রেগুশিপ ষ্ট্রীটের অতিথি ভবনে আলোচনার দিন ও স্থান নির্ধারিত হ'ল। চীনা প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন তেং সিয়াও-পিং, পেং শেন, কাং শেং এবং সোভিয়েত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন সুশলভ। দুই পক্ষে চৌদ্দদিন ব্যাপী তুমুল বিতর্ক চলে, মার্ক্স-লেনিন তত্ত্বের খাঁটি ব্যাখ্যাতা কারা, কারাই বা এই তত্ত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করছেন এবং তার বাস্তবায়নে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন। কোনো পক্ষই অপরপক্ষের কাছে হার মানবার নয়। তাই ক্রেগুশিপ ষ্ট্রীটের বৈঠক চৌদ্দদিন পর ভেঙ্গে গেলো এবং বৈঠক চলাকালীন লেনিন-পাহাড়ের ওপর চীনা দূতাবাসের কাঁচের দরজা জানালা চীন বিরোধী রুশীয় ছাত্র-বিক্ষোভকারীরা এসে ভেঙ্গে দিয়ে দুই দলের পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বুকে তীব্র বিরোধের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলো। ক্রেগুশিপ ষ্ট্রীটের কাঁচের ভাঙ্গা জানালাগুলি বিশ্ব-কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙনের স্মারক হয়ে রইলো।

এর পর তাত্ত্বিক-বিরোধও যেমন প্রচণ্ডভাবে দানা বেঁধে উঠলো, তেমনি সীমান্ত-বিরোধও তীব্রতর হয়ে উঠলো। ১৯৬৪র ১৫ই অক্টোবর ক্রুশ্চেভের ক্ষমতাচ্যুতির পরও বিরোধের গতিবেগ হ্রাস পেলো না। ক্রুশ্চেভ-বিদায়ের পর ১৯৬৫র মার্চে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট ঐক্য সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির নামমাত্র বৈঠক করে দায়সারা হ'লো। ঐক্য সম্মেলনও অনির্দিষ্ট হয়ে রইলো, কারণ ইতালী, রুমানিয়া এবং ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টিও চীনকে বাদ দিয়ে কোনো ঐক্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার বিপক্ষে পূর্বে থেকেই সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সতর্ক করে দিলো।

১৯৬১র অক্টোবরে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেস বর্জন করে চৌ এন-লাই বাইরে এসে রেড-স্কয়ারে রক্ষিত ষ্ট্যালিনের শবাধারে শেষবারের মত মাল্যদান করে পিকিং-এ ফিরে আসেন। ১৯৬৬র মার্চে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ চীনারা ও আলবানীয়রা সরাসরি অগ্রাহ্য করে। "শোধনবাদী" কংগ্রেসে তারা হাজির হবেন না, এটাই তাদের প্রধান যুক্তি। অর্থাৎ, প্রবল তাত্ত্বিক-বিরোধ তাদের অন্তরায়। এ-ছাড়া রুশ-চীন সীমান্ত সমস্যাও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে

মঙ্গোলীয় ও সোভিয়েত সীমান্তবর্তী ষ্টেশন, নৌশ্‌কীতে (Naushik) সোভিয়েত গার্ড ও শ' খানেক চীনা যাত্রীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গেছে। চীনারা সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের জন্য সোভিয়েত রুশে প্রবেশ করতে চাইলে দুই দলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ-ছাড়া হাজার হাজার চীন বংশোদ্ভূত নয়, এমন চীনা নাগরিকদের সিনকিয়ং থেকে প্রলুব্ধ করে সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশীয় অঞ্চলে নিয়ে যাবার অভিযোগও চীনারা সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে। বহির্-মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বরাবরই খারাপ। ১৯৪৯ সালে চীনা রিপাবলিক ঘোষিত হবার পর মাও সে-তুং এর সঙ্গে ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎকারের সময় মাও বহির্মঙ্গোলিয়া চীনকে ফিরিয়ে দিতে বললে, ষ্ট্যালিন তা অস্বীকার করেন। সে-অবধি বহির্-মঙ্গোলিয়া রাশিয়ার অন্যতম সামরিক ঘাঁটি এবং বোধহয় সেই কারণেই অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশে ষ্ট্যালিনের মূর্তি অপসারিত হলেও সোভিয়েত ব্লক অধ্যুষিত একমাত্র এলাকা বহির্মঙ্গোলিয়ায় রাজধানী উলান বাটোরের (Ulan Bator) একটি স্কয়ারে ষ্ট্যালিনের একমাত্র মূর্তি শোভা পাচ্ছে। পিকিং-উলান বাটোর-মস্কৌ এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিচালনা নিয়ে চীনাদের সঙ্গে মোঙ্গলদের সংঘাত হয়ে গছে এবং চীনারা এই ট্রেনটিকে সোভিয়েত বিরোধী প্রচারে ব্যবহার করে, এই অভিযোগে একদিকে চীনাদের ও অপরদিকে রুশ-মোঙ্গলদের এক ডিভিশন সামরিক বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি সংঘাতের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েও গেছে। মোঙ্গলরা আবার তিন গোষ্ঠিতে বিভক্ত। আধা-স্বাধীন (রুশ তাঁবেদার) বহির্মঙ্গোলিয়ায় ১৩ লক্ষ মোঙ্গলের বাস, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বুরিয়াট (Buryat) অটোনমাস সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকে বাস করে প্রায় ৮ লক্ষ বুরিয়াট মোঙ্গল (Buryat Mongol) আর চীন অধিকৃত আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় (Inner Mongolia) বাস করে ১৫ লক্ষ মোঙ্গল। চীনকে নিরাপদ করবার জন্য চীনাদের অনুসৃত নিরাপত্তা নীতির ফলে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় হান-বংশীয় চীনাদের প্রভাব খুব বেশী। সোভিয়েত রুশের দিকে অবশ্যি প্রচার রয়েছে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় চীনারা গণহত্যার পদ্ধতিতে মোঙ্গলদের উৎসাদন করেছে। তবে এই অভিযোগের সমর্থনে রুশীরা কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারে নাই। বহির্মঙ্গোলীয়া ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত সুদৃঢ়ভাবে ১৯৬২ সালে বন্ধ করে দেবার পূর্বে বহির্মঙ্গোলীয়রা আভ্যন্তরীণ মোঙ্গলদের জীবনধারায় প্রবলভাবে আকৃষ্ট হোতো। তার কারণ আভ্যন্তরীণ মোঙ্গলরা তাদের নিজেদের হরফ, পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি চীনাদের উদার নীতির ফলে বজায় রাখতে পেরেছে এবং চীনাদের উৎসাহে মোঙ্গল জাতীয় জীবনের পরম শ্রদ্ধার বস্তু জেঙ্গিস খাঁর স্মৃতি-উদ্‌যাপনে সাহায্য পেয়ে এসেছে। অথচ উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদের তাঁরা একদা রুশ আক্রমণকারী

জেঙ্গিস খাঁর অবাঞ্ছিত স্মৃতি বহির্মঙ্গোলিয়ায় পযুর্দস্ত হয়েছে।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন পিকিং-এ এসে সে-বার অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে চীন-রুশ সীমান্ত সম্পর্কে মৃদুভাষায় আলোচনা করতে চাইবার উদ্দেশ্যে মাও বৈঠকে মৃদুভাষায় 'Rectification of frontiers' প্রসঙ্গটি তুললে ক্রুশ্চেভ তাকে আদৌ আমল না দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। মাও-এর পক্ষে ক্রুশ্চেভের এ ধরণের আচরণ হজম করা সহজ ছিলোনা। তাই বলতে গেলে কম্যুনিষ্ট চীন ও সোভিয়েত রুশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের সূচনা সেদিন থেকেই। এর পর ১৯৬০ সাল থেকেই রুশ-চীন সীমান্তে ছোট-খাটো সংঘাত বেধে গেছে। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে রুশ-চীন সীমান্ত বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও, সেই অবসরে চীন অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলছে। অবশ্য এই বিরোধ-নিষ্পত্তির থেকে বাদ পড়ে ১৯৬২ এর অক্টোবরে চীনের সামরিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। তারই দুই বছর পূর্বে ১৯৬০-এর ১লা অক্টোবর চীন বর্মার সঙ্গে তার সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলে চুক্তি সম্পাদন করে। সে বছর ডিসেম্বর মাস থেকেই এই চুক্তি কার্যকর হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনার ক্রম-পরিণতি রুশ-চীন সম্পর্কে এবং এই দুই রাষ্ট্রের সীমান্তবিরোধে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। সোভিয়েত রুশ, ১৯৫১ সালেই চীনকে আণবিক বোমা তৈরীর মন্ত্রগুপ্তি দিতে অস্বীকার করেছে, ১৯৬০ এর আগষ্ট মাসে চীন থেকে সোভিয়েত রুশের সকল স্তরের কারিগরী বিজ্ঞানী এবং চীনে বৃহৎ শিল্পায়নের জন্য সকল রকমের সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতালীয় সুইস রেডিও থেকে ১৯৬২র ৩রা আগষ্ট চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈর (Marshal Chen Yi) সঙ্গে প্রচারিত একটি সাক্ষাৎকারে—:"The Chinese Govt is begining to arm its forces with nuclear weapons, but it will take some time before we have atomic bombs."—'চীনা সরকার তার সেনাবাহিনীকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করবার এবং চীনাদের আয়ত্তে আণবিক বোমা পৌঁছাতে আরও কিছু সময় লাগবে'—বলার পর দুই রাষ্ট্রের পাস্পরিক সম্পর্কের উত্তাপ যেন আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। ১৯৬৩র ২১শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রুশ এই উত্তাপ আর চেপে রাখতে না পেরে সখেদে বলে ফেললো যে চীন যে কোনো মূল্যে আণবিক অস্ত্র আয়ত্তে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৫০০০ বার চীন সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। তার মাস দুই পূর্বে, ২৭শে জুলাই, চীনের একাডেমী অফ সায়েন্সের সভাপতি কুয়ো মো জো (Kuo Mo Jo) বলেছেন যে সেদিন দূরে নয়, যখন চীন আণবিক অস্ত্র প্রস্তুতির কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনবে' এরপর ১৯৬৪র ২রা সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রুশ তাদের পত্রিকা 'প্রাভদা'য় রুশের ওপর ভূখণ্ডের

চীনা দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিলো। তার পূর্বে ৩০শে জুন বহির্মঙ্গোলীয়ার রাজধানী উলান বাটোর এ চীন মঙ্গোলীয় সীমান্ত সমস্যা মীমাংসার জন্য একটি ফর্মুলা চীনা এবং বহির্মঙ্গোলীয়দের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। আর সে বছর ১৬ই অক্টোবর চীনের প্রথম আণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীতে পঞ্চম আণবিক শক্তি যেমন আত্মপ্রকাশ করলো, তেমনি রুশ-চীন শক্তি বিন্যাসে একটি নূতন উপাদান সংযুক্ত করে দিলো। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দুই দেশের আলোচনা যে টুকুই বা অগ্রসর হচ্ছিল ১৯৬৪ সালে তাতে ছেদ পড়ে গেলো, চীনের আণবিক বিস্ফোরণ এই আকস্মিক ছেদের নেপথ্য-ভূমিকা রচনা করে থাকবে বা রুশ প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন আর একবার সচেষ্ট হলেন পিংকিং-এর সঙ্গে আর একটা বৈঠকে বসা যায় কিনা। এই উদ্দেশ্যে মস্কো থেকে হ্যানয় যাবার পথে ১৯৬৫র ফেব্রুয়ারী কোসিগিন পিকিং-এ চৌ এন-লাই-এর এবং ফেরবার পথে ১১ই ফেব্রুয়ারী মাও সে তুং-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশ্য ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আলোচনা জরুরী ছিল। এ-ছাড়া ক্রুশ্চেভ বিতাড়নের (১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৪) পূর্বে আলোচিত বিশ্ব কম্যুনিষ্ট ঐক্য সম্মেলনের আর একবার প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তাবিত মূলতুবী প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকের প্রসঙ্গও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। কারণ চীনের মত নয় এ-ধরণের কোনো বৈঠক আর শীগ্‌গরই অনুষ্ঠিত হয়। কারণ বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের গোড়ায়ই গলদ রয়েছে। সেখানকার তত্ত্বগত বিরোধ মীমাংসা না করে এ ধরণের বৈঠক ডেকে সোভিয়েত রুশের খবদারীর প্রতিষ্ঠা চীনের কাছে একেবারে অবাঞ্ছিত। কিন্তু চীনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মস্কোতে ১৯৬৫র ১লা মার্চ তাঁরা প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক হয়ে গেলো। তারপরই পিকিং-ও "আধুনিক শোধনবাদীদের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান সুরু করে দিলো।

ক্রুশ্চেভ বিদায়ের পর সোভিয়েত রুশে ক্রুশ্চেভের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে 'সংশোধনবাদের প্রচার মাও সে-তুং অব্যাহত রাখলেন। দুই দলের তাত্ত্বিক বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। আর ঠিক সেই সময় চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির যারা মাও-এর চোখে ক্রুশ্চেভের-এর 'শোধনবাদ' অনুকরণ করে দলের বৈপ্লবিক চরিত্রে কালিমা লেপনে অগ্রসর হয়েছেন, খাস চীনে মাও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলেন দলের বৈপ্লবিক প্রখরতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য, ১৯৬৫-এর নভেম্বরে এই অভিযানের সুরু এবং ১৯৬৬র এপ্রিলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) শিরোনামে সরকারীভাবে সেনাবাহিনীর পত্রিকায় যার অভিব্যক্তি। এই বিপ্লবের লক্ষ্য মাওবাদীদের চোখে দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদী নেতা চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ শাও-চি এবং তার অনুগামীরা মাও-এর আশীর্বাদধন্য হয়ে ১৯৬৬র ১লা জুন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়ো বড়ো হরফের প্রাচীরপত্রে শোধনবাদীরা চিত্রিত ও নিন্দিত হলো এবং তারপর ১৮ই আগষ্ট পিকিং তিয়েন আন্

মেন স্কয়ারে মাও সে তুং-এর উপস্থিতিতে 'রেড গার্ড'দের প্রথম আবির্ভাব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আঘাতে চীনের সরকারী ও জনজীবন প্রায় অচল হয়ে গেলেও, কারখানার উৎপাদনে ি স্ন সৃষ্টি হতে থাকলেও, দলীয় 'শোধনবাদী'দের বিরুদ্ধে দুরন্ত আক্রমণের মুখেও চ'ন যে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিতে অবিচল রয়েছে, তা প্রমাণ করলো চীনে পর পর আণবিক বিস্ফোরণ। ঘরের 'ক্রুশ্চেভ'দের—সাংস্কৃতিক বিপ্লবীরা, লিউ শাও-চির নামকরণ করেছিলো 'চীনা ক্রু শ্চভ'রূপে—শুধু নয় বাইরের ক্রু শ্চভদের সতর্ক করে দেবার জন্য চীন দ্বিতীয় আণবিক বি স্ফোরণ সম্পাদন করে ১৯৬৫র ১৪ই মে এবং তৃতীয় বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৬র ৯ই মে। চতুর্থ বিস্ফোরণের সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ২৭ অক্টোবর এই চতুর্থ আণবিক বি স্ফোরণে উৎক্ষিপ্ত রকেটের মুখে আণবিক বোমা যন্ত্র পরিচালনা করে দূরে পৌঁছে দিতে চীন সক্ষম হয়ে আণবিক লক্ষ্যবস্তুকে নিক্ষেপের কৌশলটিও করায়ত্ত করলো। তার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর, একটি শক্তিশালী আণবিক বিস্ফোরণে চীন সাফল্য দেখালো। এটি পঞ্চম আণবিক বিস্ফোরণ। আর তারপরই ১৯৬৭র ১৭ই জুন চীনের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ পৃথিবীর শক্তিধরদের, বিশেষভাবে চীনের তাত্ত্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত রুশের, বিস্ময় সৃষ্টি করে বিপদ-সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে সে-বছরই ২৪শে ডিসেম্বর সপ্তম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। ১৯৬৮র ২৭শে ডি সম্বর নিয়ে এলো অষ্টম আণবিক বিস্ফোরণ আর তারই অব্যবহিত অনুষঙ্গরূপে প্রথম চীন-রুশ সামরিক সংঘাত আনবার্যরূপে দেখা দিলো। এই রক্তাক্ষরা সংঘাত সংঘটিত হ'ল উসুরী নদীর দুই তীরবর্ত্তী চীনা ও রুশ সীমান্ত প্রহরীদের মধ্যে ১৯৬৯র ২রা ও ১৫ই মার্চ উসুরী নদীর টেক্‌নাপো-ডামানস্কি দ্বীপে।

এই সংঘাতে দুরন্ত রকেট যুদ্ধে দুই পক্ষের স্বীকৃত হতাহতের সংখ্যা ছিল ২০০, যদিও আনুমানিক হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী। এই সংঘাতের পর ২৯শে মার্চ তারিখে সোভিয়েত রুশ-চীনের কাছে এক লম্বা নোট পাঠিয়ে ইতিহাস শেখাবার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে আরও জানায় যে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৬৪ সালে যে আলোচনায় ছেদ পড়ে তার সূত্র ধরে আবার আলোচনা সুরু হোক। চীন অবশ্যি সোভিয়েত রুশের বিষয় বস্তুর উত্তরে ৩১শে মার্চ জানায় যে রাশিয়া তার নোটে যা বিবৃত করেছে, তা মিথ্যার ঝুড়ি মাত্র। সো ভিয়েত রুশ সে সময় একদিকে যেমন সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে, তেমনি চীনের সাধারণ মানুষের মনে পর্যন্ত আতঙ্ক ঢুকে গেছে, যে সোভিয়েতের চীনের ওপর আণবিক আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠেছে। আর সেই আশঙ্কার সমর্থনের জন্যই যেন ১৯৬৯ এর শরৎ কাল পর্যন্ত রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। সশস্ত্র সংঘাত যে শুধু উসুরী নদীর দ্বীপেই হয়েছে তা নয়, সংঘাত হয়েছে

আমুর নদীর তীরে, আর সব চাইতে বিপজ্জনক সংঘাত হয়েছে ১৯৬৯র আগষ্টে সিনকিয়াং-কাজাখাস্তান সীমান্তে। একদিকে চীন সীমান্ত অপরদিকে সোভিয়েত রুশ-বহির্মঙ্গোলীয় সীমান্ত বরাবর ৭৫০০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সজ্জাই বুঝিয়ে দিল সঙ্কটের গভীরতা। সে সময় তো মঙ্গোলীয়ায় খোলাখুলি সোভিয়েত শস্ত্রসজ্জা প্রসারিত হয়েছে। চীনের উপর সীমান্তে প্রায় দশ লক্ষ সোভিয়েত রুশের সেনাবাহিনী সারি সারি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—আমুর ও উসুরীর তীরে ক্রেংকিটের তৈরী গভীর খাদে, মঙ্গোলিয়ায় গবি মরুভূমির দক্ষিণে চলমান ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিতে বৈকাল হ্রদের পূবে সামরিক তাৎপর্যপূর্ণ বিমানক্ষেত্রে। খালকিন-গল-এর নিকটবর্তী সাঁজোয়াবাহিনীর আস্তানায়, মঙ্গোলিয়ার পাহাড়ে অবস্থিত রকেট-উৎক্ষেপণের আধারগুলিতে এবং পূর্ব-কাজাখাস্তানের পোক্ত ঘাঁটিগুলিতে। এই গোটা প্রস্তুতিই চলে সোভিয়েত রুশের সামরিক তত্ত্বাবধানে এবং সর্বত্রই তারা শস্ত্রসজ্জা, বিমান এবং সেনাবাহিনী পর্যাপ্ত সংখ্যায় পৌঁছে দিচ্ছে।

এই ব্যাপক এবং ভয়াবহ সামরিক প্রস্তুতি কেবল মঙ্গোলিয়ার জন্যই নয়; সোভিয়েত রুশের সাইবেরিয়া অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী খাবরাঅভস্কে (Khabraovsk) অবস্থিত সোভিয়েত সৈন্যাধ্যক্ষের প্রধান দপ্তরের দক্ষিণে ও পূবের সকল এলাকার জন্য এবং খাবরাঅস্কের পশ্চিমেও, যে জন্য, চীনের পশ্চিমসীমান্তবর্তী প্রদেশ সিনকিয়াং-এর সীমান্তসমূহে সৈন্য পরিচালনায় সংহতি সাধনের জন্য আলমা আটায় একটি নূতন সৈন্যাধ্যক্ষের দপ্তর গঠিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের কোয়াংটাং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরণের সৈন্য সমাবেশ করে এই সীমান্তের সে সময়কার রুশ সেনাপতিদ্বয় মার্শাল রডিন ওয়াই মালিনভস্কি (Marshal Rodin Y. Malinovsky) মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীন জাপানের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন।

এবারকার সঙ্কটের সময়ও সোভিয়েত সামরিক মুখপাত্ররা চীনের বিরুদ্ধে ঐ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের এবং আনবিক অস্ত্র প্রয়োগের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। এ-ছাড়া ক্রেমলিন থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপে সকল কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এই বলে সতর্ক করে সেই সময় এই দুই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র একেবারে সামরিক সংঘাতের সীমানা থেকে ফিরে আসে ভিয়েতনামের অবিসম্বাদী নেতা হো চি মিন-এর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এন্ত কূটনৈতিক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে। হো চি মিন-এর শেষ ইচ্ছা ছিল বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বিভেদ যেন দূর হয়ে যায়। হো চি মিনের সেই অন্তিমবাণীর আবেগে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট নেতারা মস্কো ও পিকিং-এর নেতাদের কাছে শেষবারের মত একবার আপোষের চেষ্টায় আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন হ্যানয় থেকে মস্কোর ফেরার পথে পিকিং পৌঁছায়।

কোসিগিনের কাছে পিকিং-এর আমন্ত্রণ পৌছায় যখন তেল নেবার জন্য তার বিমান তাদঝিকিস্তানের (Tadzhikistan) দ্যুয়াশাম্বে (Dyushambe) বন্দরে এসে নামে। সুতরাং কোসিগিনের প্রায় ২৫০০ মাইল পথ পিছনে গিয়ে পিকিং পৌছে। পিকিং বিমান বন্দরে চৌ এন লাই এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনঘণ্টা একটি ওয়েটিং রুমে আলোচনায় রুশ চীন বিরোধ মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষই আর একবার কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বসতে সম্মত হন। ১৯৬৯-এর অক্টোবরের শেষে উভয় পক্ষ আলোচনা বৈঠকে বসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে (agenda) একমত হতে না পারায় আলোচনা অচল হয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদার মেয়াদ যাঁদের শেষ হয়েছে, তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে মণি অর্ডার বা চেক-এ দের চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গ্রাহক চাঁদা—
বার্ষিক ১২.০০, ষাণ্মাসিক ৬.০০
ম্যানেজার জয়শ্রী

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs. 250·00
Half Page :	Rs. 150·00
Quarter Page :	Rs. 80·00

Special Position : 15% extra

Cover Page

Second Cover :	Rs. 350·00
Third Cover :	Rs. 400·00
Fourth Cover :	Rs. 600·00

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.

Enlisted with DAVP for
Central Govt. advertisements

Contact : Manager, Jayasree
Office : 20A Prince Golam Md. Road
Calcutta—26
Phone : 46-4116

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে

অনৈতিহাসিক রাজনীতির অনুপ্রবেশ

প্রখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'শরৎ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাটি'তে (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ-এর "শরৎদার স্মৃতি" শীর্ষক স্মৃতিচারণ (পৃঃ ৫৫৫-৫৬১) পড়ে আনন্দ পেলাম। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার গোড়ার কথায় কয়েকটি অনৈতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ দেখে প্রাসঙ্গিক ইতিহাস-সম্মত তথ্য দিয়ে তাকে সংশোধন করা যে কোনো ইতিহাস-নিষ্ঠ পাঠকের অনিবার্য কর্তব্য মনে করে কিছু, লেখার দায়িত্ব বোধ করছি।

শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন : "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমার দল মুক্তি সঙ্ঘ স্থাপন করি। এই দলেরই পরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি, ভি, নাম দিই।". আজ পর্যন্ত কোনো সরকারী দলিলে বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে "মুক্তি সংঘে"র উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

অপর এক শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা ৺মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বাংলা ১৩৫৪ সালে তাঁর নিজস্ব বিপ্লবী দল "অনুশীলন সমিতি" সম্পর্কে স্মৃতিচারণ "জেলে ত্রিশ বছর" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালের পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৯৬২ র জানুয়ারীতে। এই গ্রন্থের ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে ২ ৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রন্থকার অনুশীলন সমিতি ব্যতীত বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দল-এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। তার মধ্যে কোথাও "মুক্তি সঙ্ঘ"-এর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ২৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ২৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "শ্রীসঙ্ঘ—ঢাকার" ইতিবৃত্তে গ্রন্থকার লিখেছেন : "শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষের অন্যতম সহকর্মী শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্তী এই দলের প্রসারে সহায়তা করেন। অল্পকালের মধ্যেই এই দলের ঢাকার নেতৃত্ব "অনিলচন্দ্র রায়ের উপর অর্পিত হয়। ক্রমশঃ এই দলের প্রভাব কলিকাতা, ত্রিপুরা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জেলায় ছড়াইয়া পড়ে এবং সমস্ত দলের সংগঠন—নেতৃত্বের দায়িত্ব অনিলচন্দ্র রায়ের উপর বর্তায়।.....

.....“১৯২৮ সালে এই দল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ‘শ্রীসঙ্ঘ’ ও ‘বি ভি,’ নামে খ্যাতিলাভ করে। বি, ভি,র নেতৃত্ব শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীসঙ্ঘর নেতৃত্ব অনিলচন্দ্র রায় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা লীলা নাগ (রায়) এই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং দলের দ্বিধা-বিভক্তির পর শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব অনিলচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার উপরও আসিয়া পড়ে।”

১৯৬২ সালে ৺মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থে উল্লিখিত ‘শ্রীসঙ্ঘে’র ইতিবৃত্ত আরও পূর্ণতর ভাবে “শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষের অন্যতম সহকর্মী শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্তী মাসিক পত্রিকা “জয়শ্রীর” ১৩৭৯-এর ফাল্গুন সংখ্যায় (১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারী) “পুরাণো কথা” শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রমথ চক্রবর্তী, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দলের গোড়াপত্তনের নেতা শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ এবং আরও কয়েকজনের কারান্তরালে অনুপস্থিতিতে এই দলের পুনর্গঠনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি বার বার বলেছেন ‘এই দলের সেদিন কোন নামকরণ হয় নাই।’

এ-ছাড়া ভারত সরকারের তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইনটেলিজেন্স মিঃ এইচ ডব্লু হেইল (Mr. H. W. Hale) তাঁর গ্রন্থে (Political Trouble in India 1917-37) বাংলার কয়েকটি বৈপ্লবিক দলের মধ্যে “শ্রীসঙ্ঘে”র উল্লেখ করেছেন, ‘মুক্তি সঙ্ঘ’ নামে কোনো বৈপ্লবিক সংগঠনের উল্লেখ করেন নাই।

আমেরিকার জর্জিয়া স্টেট ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড লাউসে (David Laushey) দিল্লী এবং কলকাতায় এসে (১৯৬৪-৬৫ সালে) ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধারা, বিশেষভাবে ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে বাংলাদেশে এই সংগ্রামের গতিবেগ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান এবং গবেষণা পত্রটি ‘Bengal Terrorism and the Marxian left’ : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-42 নামে একটি গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করেন। ডেভিড লাউসে বহু সরকারী দলিল ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন এবং কোথাও ‘মুক্তিসঙ্ঘে’র উল্লেখ করেননি এবং ‘শ্রীসঙ্ঘ’ দ্বিখণ্ডিত হবার পূর্বে অখণ্ড দলকে “Revolutionary Fraternity” রূপে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে ‘জয়শ্রী’র ১৩৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (১৯৭৬ এর মে সংখ্যা) বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের মূল্যায়ন শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিবৃতির লেখক ‘শ্রীসঙ্ঘ’ ও তার দ্বিখণ্ডন থেকে ‘বি, ভি, র উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ‘৺মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর’ “জেলে ত্রিশ বছর” গ্রন্থে ‘শ্রীসঙ্ঘে’র প্রতিষ্ঠাতারূপে শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের এবং ১৯২৮-এ ‘শ্রীসঙ্ঘে’র দ্বিধাবিভক্তির পর ‘বি, ভি, র উদ্ভবের উল্লেখের

তিন বছর পর ১৯৬৫ সালে সাপ্তাহিক বসুমতীতে (২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) '৺ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'সবার অলক্ষ্যে' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম 'মুক্তিসঙ্ঘের উল্লেখ করলে তাঁর অব্যবহিত পরেই তাঁরই প্রাক্তন ১১ জন দায়িত্বশীল বিপ্লবী সহকর্মী শ্রীকালিদাস ঘোষ, শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ শৈলেশচন্দ্র রায়, কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, ক্ষিতীশ রায় ডাঃ নরেন সরকার, অমলচন্দ্র রায়, সুনীল দাস প্রমুখরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে (৩৮ সংখ্যা ১২ই ফাল্গুন ১৩৭২, ২৪শে আগস্ট ১৯৬৬) বিবৃতি দিয়ে বলেন 'মুক্তিসঙ্ঘ' নামে কোনো বৈপ্লবিক সংগঠনের কথা তাঁদের দীর্ঘ বৈপ্লবিক জীবনে কখনও শোনেন নাই এমন কি 'শ্রীসঙ্ঘ' দ্বিধাবিভক্তির পরও শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ-এর নেতৃত্বাধীন একান্ত বন্ধুরাও ইতিপূর্বে জেলের বাইরে কিম্বা জেলের ভেতরে কোনোদিন 'মুক্তিসঙ্ঘে'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নাই। এই একান্ত বন্ধুদের মধ্যে ভূপেনবাবু সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম।

১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে, বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের অকাল প্রয়াণের পর 'জয়শ্রী'র অনিল রায় স্মৃতি সংখ্যায় (জয়শ্রী, নবম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৫৮) পৃঃ ৪২২-৪২৪, '৺ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন, সেই প্রবন্ধে তিনি নিজেকে একই দলে '৺অনিল রায়ের অনুগামীরূপে চিহ্নিত করেছেন। 'ভূপেনবাবু এই স্মৃতি তর্পণে লিখেছেন:—বিদ্যাবুদ্ধি, সাহস-শৌর্য এবং সর্বোপরি নেতৃত্ব শক্তি কৈশোরকাল থেকেই সমবয়সীদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশী তাঁর মধ্যে ছিল বলেই দলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই 'ইনার সার্কেলে' তাঁর স্থান হয়ে যায় এবং অল্প বয়সেই স্বীয় গুণে ও অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতার প্রভাবে তিনি দলস্থ নেতৃবৃন্দের অন্যতমরূপে পরিগণিত হন।" এ কোন্ দল? "৺অনিল রায় ১৯২০ সাল থেকেই শ্রীসঙ্ঘের সর্বাদিসম্মত নেতারূপে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সুতরাং "৺ভূপেনবাবু ১৯৫২ সালের স্মৃতিতর্পণে সেই দলে অনিল রায়ের সহকর্মীরূপে নিজেকে স্থাপন করেছেন এবং দলের সর্বময় কর্তৃত্বের অন্যতমরূপে ৺অনিল রায়ের স্থান নির্দেশ করেছেন।[৭]

১৯২৯ সালে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, শ্রীসত্যভূষণ গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ প্রমুখরা "শ্রীসঙ্ঘ"-এর সঙ্গে সেদিন তাঁদের সম্পর্ক-ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। কেন? তাঁরা যদি সেদিন শ্রীসঙ্ঘের সদস্যরূপেই নিজেদের গণ্য না করতেন, তবে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্ন কেন এসেছিলো? ১৯৭০-এর জুলাই মাসে অর্থাৎ ১৩৭৭-এর আষাঢ় সংখ্যায়,—যা লীলা রায় স্মৃতি সংখ্যারূপে (৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭১) প্রকাশিত হয়েছিলো—শ্রীপুলকেশ দে সরকার তাঁর "বিপ্লবী প্রতিমা লীলাবতী" শীর্ষক প্রবন্ধে সরকারী দলিল থেকে এই তথ্যটি উদ্ধৃত করেছিলেন। সেদিন ভূপেনবাবু জীবিত ছিলেন সেই স্মৃতি সংখ্যায় তিনিও দেশনেত্রী লীলা রায়-এর

প্রতি 'শ্রদ্ধা নিবেদন' করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কৈ সেদিন তো ভূপেনবাবু শ্রীপুলকেশ দে সরকারের পরিবেষিত তথ্যের কোনো প্রতিবাদ করেন নাই? কিম্বা 'শ্রীসঙ্ঘে'র দ্বিখণ্ডনের পর এই সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ত্যাগের সূত্রে 'মুক্তিসঙ্ঘ'-এর কোনো উল্লেখও তো করেন নাই।

এই প্রবন্ধে আর একটি অনৈতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করে এই নিবন্ধটি শেষ করবো। আলোচ্য প্রবন্ধ (৫৬১ পৃঃ) "বেণু" পত্রিকাকে শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ "আমাদের বি, ভি, দলের কাগজরূপে" বর্ণনা করেছেন। 'বেণু' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন 'শ্রীসঙ্ঘের' তৎকালীন তরুণ তীক্ষ্ণধী নেতা 'রেবতী বর্মণ,' ১৯২৬ সালে ৯১১ এফ বৈঠকখানা রোড থেকে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণপদক বন্ধক রেখে "বেণু"র জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন এবং কলকাতায় "শ্রীসঙ্ঘে"র অন্যান্য তরুণ সদস্যদের মধ্যে ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ নরেন সরকার প্রমুখরা "বেণু" পরিচালনায় "রেবতী বর্মণের সহকারী ছিলেন। কলকাতায় সে-সময় দলের গোড়াপত্তনের নেতা শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মতান্তরের ফলেই ৺রেবতী বর্মণ "বেণু" পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে ৺ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় 'বেণুর' সম্পাদনার ভারগ্রহণ করেন। তখনও দল দ্বিধাবিভক্ত হয় নাই এবং "বেণু" "শ্রীসঙ্ঘে"র তারুণ্যশক্তির মুখপাত্ররূপেই বাংলা দেশ-এ সুপরিচিত ছিল। "শ্রীসঙ্ঘ" দ্বিখণ্ডনের ফলে 'বি, ভি,'র উদ্ভবের পর "বেণু" 'বি, ভি,'র পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধে 'বেণু'র উল্লেখ প্রসঙ্গে "বেণু"র এই তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসটি চাপা পড়ে গেছে।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তির স্মৃতিচারণে বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রসঙ্গ স্বাভাবিক-ভাবেই এসে পড়তে পারে কারণ শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের একজন অকৃত্রিম মরমী সুহৃদ ছিলেন। তবে দলীয় রাজনীতির বিতর্কিত প্রসঙ্গ শরৎ-স্মৃতিচারণে নিয়ে এলে সেটা কতকটা খাপছাড়া মনে হতে পারে পাঠকদের কাছে, কারো কাছে অবান্তরও বা মনে হতে পারে। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিতে প্রবীণ বিপ্লবী নেতার বর্ষীয়ান মন হয়তো বা ক্ষণিকের জন্য অনভিপ্রেত অপ্রাসঙ্গিকতায় চিন্তার বাঁধুনি হারিয়ে ফেলেছে।

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
২৯. ১০. ৭৬

গল্প

স্মৃতির তর্পণে

ডাঃ অন্নদামোহন বাগচী

সাধন, অজয় আর আমি সেই খুব ছোটবেলা থেকে এক সাথে বড় হয়েছি। একই পাড়ায় প্রায় পাশাপাশি আমাদের বাড়ী ছিল। তিনজনে আমরা প্রায় একই বয়সী, দুইচার মাসের এদিক ওদিক হতে পারে। বড় গাছার দুর্গাপণ্ডিতের পাঠশালায় একসাথে পড়েছি। সেখান থেকে আলাইপুর এম, ই ইস্কুলে, আর সব শেষে মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ হাই স্কুলে। সেখান থেকে আমরা তিনজনে একই বছরে ম্যাট্রিক পাশ করি—প্রথম বিভাগে। সাধন আমাদের মধ্যে পড়াশুনায় ভাল ছিল। অঙ্কে ওর দারুণ মাথা। ম্যাট্রিকে অঙ্কে লেটার পেল। কিন্তু হলে কী হবে? ভীষণ বদরাগী। মুখের উপরে দুই কথা শুনিয়ে দিতে—ও লঘুগুরু মানত না। ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই—আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হল। তিনজনে তিনদিকে ছিটকে পড়লাম। অজয় হোষ্টেলে থেকে কলেজে ভর্তি হল, সাধন চলে গেল ওর মামার বাড়ীর দেশে। সেখানে এক মামা কলেজের প্রফেসার। আর আমি কলকাতায় চলে গেলাম ডাক্তারী পড়তে। কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল না। মাঝে মাঝেই আমরা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে পরস্পরের খোঁজ খবর নিতাম। আর ছুটিছাটায় বাড়ীতে এলে তিনজনে আবার একসাথ হতাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে যোগসূত্রের দূরত্বটা ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে—একদিন সূত্রটা কখন যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বুঝতেই পারলেম না।

আমি ডাক্তারী পাশ করে প্র্যাক্‌টিস শুরু করলাম—কলকাতারই উপান্তে। অজয় ওকালতি পাশ করে ইন্‌কামট্যাক্সের উকিল হয়ে সুন্দর পশার জমিয়ে তুলল। আর সাধন—বি, এস, সি পাশ করে ইস্কুল মাষ্টার হল। কিন্তু কোন একটা স্কুলে বেশিদিন স্থির হয়ে বসতে পারল না। বছর পনেরোর মধ্যে প্রায় দশটা স্কুলে সে পর্যায় ক্রমে ঘুরে বেড়াল। অঙ্কের টিচার হিসাবে ছেলেরা ওকে খুবই পছন্দ করত। শেখানোর কায়দাটা ওর খুব সুন্দর। কঠিন বিষয়কে সহজ আর রসালো করে ছেলেদের বোঝাতে পারত। কিন্তু পারলে কী হবে? বড্ড খুঁতখুঁতে আর অসম্ভব জেদী। যা পছন্দ

নয়—তার প্রতিবাদে সব সময়ে মুখর। ওর ঐ আপোষহীন মনোভাবই বেশিদিন ওকে কোথায়ও এক নাগাড়ে টিকে থাকতে দেয় না। একবার এক মফঃস্বলের হাই স্কুলে ইনস্‌পেকটার এলেন স্কুল পরিদর্শনে। সারা স্কুল জুড়ে সাজোসাজো রব পড়ে গেল। সবাই তটস্থ। সাধন তখন ঐ স্কুলে ম্যাথামেটিক্সের সিনিয়র টিচার। ক্লাশ নাইনে তখন অঙ্কের পিরিয়ড চলছিল। সাধন ব্ল্যাকবোর্ডে একটা জিওমেট্রির প্রব্লম ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল ছেলেদের। ছেলেরা একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। আর ঠিক সেই সময় হেড-মাষ্টারের সাথে ইন্‌স্পেক্টার এসে ঢুকলেন ক্লাশে। ছেলেরা একযোগে উঠে দাঁড়াল। সাধন দরজার দিকে পিছন দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে, তাই সে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। ছেলেরা হঠাৎ সবাই একযোগে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে, হাতের চকপেন্সিল আর ব্রাশটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে হাত ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সে করজোড়ে নমস্কার করল ইনস্‌পেকটার কে। ওর ঐ ধীরে সুস্থে অভিবাদন জানানোটা বোধ হয় ইনস্‌পেকটারের মনঃপুত হয়নি। তিনি সাধনের আপাদমস্তক একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন: আপনি ম্যাথামেটিক্সের টিচার?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: কী পড়াচ্ছিলেন?

: জিওমেট্রি।

সাধনকে আর কিছু না বলে তিনি সোজা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে একটা মানসাঙ্ক দিয়ে বললেন: দুই মিনিট সময়। এটা কষে দাও। দেখি কেমন অঙ্ক তোমরা শিখেছ।

ছেলেরা হচকচিয়ে গেল। এ সব কী আর এখন তাদের মনে আছে? বাঁ হাতে মাথা টিপে ধরে খাতায় চোখ রেখে ছেলেরা স্থানুর মত সবাই বসে আছে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল। ইনস্‌পেক্টার বাঁকা চোখে একবার সাধনের দিকে তাকিয়ে কুটিল হাসি হেসে বললেন—

: কী শিখিয়েছেন মশাই—একটা ছেলেও তো পারলনা? সাধন নীরব। ইনস্‌পেক্টার অপমানের বিষ মাখানো আর একটা তীর ছুঁড়ে মারলেন সাধনকে লক্ষ্য করে: কী মশাই, একেবারে বোবা হয়ে গেলেন যে? আপনি নিজে পারবেন তো?

সাধনের চোখের কোণে এক লহমায় একটা বিদ্যুৎ যেন চমক দিয়ে গেল। সে টেবিল থেকে চকপেন্সিলটা উঠিয়ে নিয়ে পায়ের জুতো খুলে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে চকটা বসিয়ে দিয়ে পা দিয়ে ঘরের মেঝেতে ঝটপট অঙ্কটা কষে দিল। হেডমাষ্টার ভয়ে বিবর্ণ। আর ইনস্‌পেক্টার অপমানে আরক্ত। ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে মুখটিপে হাসছে। আর একটি কথাও না বলে ওঁরা দুজনে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর সাধন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে সামনের একজন ছেলের খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খচখচ করে ইস্তফা পত্র

লিখে নিয়ে, সোজা হেডমাষ্টারের ঘরে ঢুকে সেটা তাঁর টেবিলের উপরে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে, কাউকে কিছু না বলে জীর্ণ ছাতাটি বগলদাবা করে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। এর পরে আর কোন স্কুলে সে চাকরির চেষ্টা করেনি। আজ ছয় সাত বছর যাবত সকালে বিকালে গোটা পাঁচেক টিউশানি সম্বল করে কোন মতে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। সংসারও একেবারে ছোট নয়। চারটি ছেলেমেয়ে আর স্বামী-স্ত্রী। টিউশানি থেকে মাসে পায় আড়াইশো তিনশো টাকার মত। মাসের পনেরো দিনের পরে সংসারের চাকা আর চলতে চায় না।

সাধনের স্ত্রী নয়নতারা খুবই বুদ্ধিমতী। এটা সেটা করে কোনমতে সেই ভদ্রমহিলা—এই ফুটো নৌকা নিয়েই দরিয়া পারাপারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাধন খুব ভোরে ওঠে। তার বউকে তারও আগে উঠতে হয়। উঠে সে কয়লার তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের জল চাপায়। এক বাটি চা আর এক খাবলা মুড়ি কোন মতে চিবিয়ে নিয়েই সাধন ছোটে তার প্রথম ছাত্রের বাড়ী। সেখানে সে ছটার মধ্যে হাজির হয়।...নয়নতারা আগের দিন রাতেই উনুন সাজিয়ে রাখে। যাতে ভোরে উঠে কোন অসুবিধা না হয়।

সেদিন রাতে উনুন সাজাতে গিয়ে নয়নতারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কয়লা বারন্ত। এতরাতে এখন কয়লার গুদামও বন্ধ। সে তাড়াতাড়ি পাশের বাড়ীতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটা কয়লার চাপড়া চেয়ে নিয়ে এল। কিন্তু ভাঙতে গিয়ে তার চক্ষু স্থির। কয়লা তাতে সামান্যই ও বাকি সবটাই প্রায় পাথর। যেটুকু যা পেল—তাই দিয়েই কোনমতে উনুন সাজিয়ে রাখল।' পাথরটা রাগ করে উঠানে ছুঁড়ে দিল। সাধন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। বৌর মুখে সব শুনে একটা ক্ষোভের হাসি হাসল। কোন মন্তব্য করল না। পরদিন দুপুরে সে ছেলে পড়িয়ে বাড়ী এসে দেখল, পাথরটার গায়ে কতকগুলো ফুল পাতা চাপিয়ে আর সিন্দুর মাখিয়ে ওটাকে ঠাকুর বানিয়ে তার ছোট ছেলে আর মেয়ে মিলে দিব্যি পুজো শুরু করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় বেরুবার সময়—উঠানে কাছে ভিতে ছেলেমেয়ে কাউকে না দেখে সে মনের আক্রোশে ঐ কালো পাথরটাকে এক লাথি মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল। রাতে সাধারণতঃ তার ফিরতে এগারোটা বেজে যায়। তাদের এঁদো গলিটা ঘুঁটঘুটে অন্ধকার। কোনদিনই সেখানে আলো জ্বলে না। অত রাতে সব বাড়ীরই দরজা বন্ধ। রাস্তায় নজর চলে না। তাই রাতের বেলায় পথ-দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য সাধন ছোট একটা টর্চ পকেটে নিয়ে বের হয়। সেদিন যখন ফিরছিল, এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বাড়ীর দরজার সামনে এসে টর্চের আলো ফেলতেই সহসা এক পলকের জন্য তার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গেল। একটা জায়গা থেকে অসংখ্য রঙ বেরঙের তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ হতে দেখে, কৌতূহলী হয়ে সে এগিয়ে এসে আবার টর্চ জ্বাললো। কালো পাথরটা

দরজার সামনে তেমনি পড়ে আছে। আর—কী আশ্চর্য, অসংখ্য আলোর ঐশ্বর্য ঠিকরে পড়ছে তার পদাঘাতে লাঞ্ছিত ঐ কালোপাথরটার পাষাণ অংগ থেকে। ব্যাপারটা রীতিমত চমকপ্রদ। ওটা কাঁচ না পাথর ভাল করে দেখবার জন্য—সাধন বাঁ হাতে সেটা তুলে নিল। তারপর ঐ অবস্থায় ধরে নিয়ে ভিতরে এসে হাল্কা গলায় বৌকে বলল: একটা ভেল্কি দেখবে তারা? এই দেখ—বলেই টর্চ টিপে ধরল পাথরটার গায়ে। আর সংগে সংগে সাতরঙা তীব্র আলোতে অন্ধকার বারান্দাটাকে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নয়নতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে—হতবাক। সাধন পাথরটা ঘরের এক কোণে রেখে দিয়ে বলল: কাল ভাল করে দেখব। মনে হচ্ছে এটা আতস কাঁচ।

পরদিন রবিবার। সাধনের ছুটির দিন। সে বিকালে পাথরটা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে হাজির। অনেক দিন পরে ওকে কাছে পেয়ে বড় ভাল লাগল। অনেকদিন পরে দুজনে একসাথে বসে চা জল খাবার খেতে খেতে অনেক গল্প করলাম। আমি ওকে ঠাট্টা করে দুর্বাশা বলে ডাকতেম। হেসে বললাম: আর সব সমাচার কহ মুনিবর।

: একটা কাজে তোর কাছে এলাম ভাই ডাক্তার।

: অসংকোচে কর নিবেদন।…

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে কাগজে মোড়া পাথরটা বের করে সে বলল: এটা নিয়ে এখন কী করি বল্ তো?

দেখে শুনে আমিও বিস্মিত হলাম। কিন্তু এই অলৌকিক রহস্যের কোন অর্থ আমিও খুঁজে পেলাম না। বল্লাম: চল্ যাই অজয়ের বাড়ী। ওর বড় ছেলে তুষার ডি, এস, সি, হয়েছে। সে হয়তো কিছু বলতে পারে;

কথাটা সাধনের মনে ধরল। দুজনে অজয়ের সাদার্ণ এ্যাভিন্যুর বাড়ীতে গেলাম। অজয় বাড়ীতেই ছিল। সে আমাদের দুজনকে একসাথে দেখে আনন্দে হৈ চৈ শুরু করে দিল। অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে সব কথা খুলে বলে পাথরটা দেখালেম। সে ছেলেকে ডাকল। সে ধীরে সুস্থে অনেকক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখে নিয়ে তার ষ্টাডি রুমের মিনিল্যাবরোটারিতে নিয়ে গিয়ে একটা বড় বেসিনের মধ্যে কী কতকগুলো আরক ঢেলে তার মধ্যে পাথরটা চুবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সেটা যখন তুলল,—দেখা গেল পাথরটার গা থেকে একটা মোটা অংশ গলে ঝরে গিয়েছে। টিকে আছে মারবেলের আকারে একটা ঝকঝকে সাদা পদার্থ। জিনিষটা কী হতে পারে—আমরা তিনজনে মিলে তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছি, হঠাৎ তুষার গম্ভীর গলায় বলে উঠল: কাকাবাবু, মনে হচ্ছে এটা ডায়মণ্ড?…

ঘরের মধ্যে আচম্বিতে বাজ পড়লেও হয় তো এত চমকে উঠতাম না। বিস্ময়ে আমরা তিনজনেই যুগপৎ হতভম্ব! তুষার বলল: এটা কোন

একজন ভাল জুয়েলারকে দিয়ে যাচাই করিয়ে দেখা দরকার।

: জুয়েলার! আচ্ছা দেখছি—বলেই অজয় আমার দিকে তাকিয়ে বলল: চমনলাল ঠাকুরদাস জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নাম শুনেছিস তো? সারা ভারতজোড়া নাম! ফরেনে জুয়েল এক্সপোর্ট করে। ওদের প্রপ্রাইটার চমনলাল বাবু আমার মক্কেল। দেখি তো ওঁর সাথে একবার কথা বলে।

অজয় ফোন তুলে ডায়াল করতেই এক ডাকে সাড়া পাওয়া গেল। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল অজয় স্বয়ং চমনলালের সাথেই কথা বলছে। কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রেখে অজয় বলল: উনি নিজেই আসছেন। বলছিলেন একটা বড় অর্ডার আছে আমেরিকা থেকে, কিন্তু ডায়মণ্ড পাচ্ছেন না। হয় তো অর্ডারটা ক্যানসেল করতে হবে। দেখা যাক—উনি এটা দেখে কী বলেন।

দ্বিতীয় প্রস্থ চা-পর্ব শেষ হতে না হতেই মস্ত বড় একটা গাড়ী এসে ভিড়ল গেটের সামনে। অজয় 'ঐ এসেছে' বলেই তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল গাড়ীর কাছে। চমনলাল বাবু ওঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন। তারপর অজয় আমাদের পরিচয় দিতেই রীতিমত আন্তরিকতার সাথে করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক সুন্দর বাংলা বলতে পারেন দেখলাম। সঙ্গে যে দুজন এসেছে—তাদের একজন বাঙালী, অন্যজন মারোয়াড়ী। সেও দেখলাম বেশ বাংলা জানে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পাথরটা ড্রয়ার থেকে বের করে টেবিলের উপরে রাখল অজয়। চমনলাল ক্ষিপ্রহস্তে সেটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে হেসে অজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন: উকিলবাবু, এটা হীরাই ঠিক।

তারপর পাশের বাঙালীটির দিকে ওটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: দেখে নিন।

সে হাতের ব্যাগের মধ্যে থেকে ছোট বড় অনেকগুলো যন্ত্রপাতি আর মস্তবড় একটা ম্যাগনি-ফাইংগ্লাস বের করে, অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে ঐগুলি দিয়ে বারংবার পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে—চোখ তুলে চমনলালকে বলল: সেকেণ্ড গ্রেড।...

তারপর সে পাথরটা সোজা এগিয়ে দিল পাশের মারোয়াড়ীটার দিকে। সেও আবার অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—গায়ে আলো লাগিয়ে—অনেক কায়দা কসরৎ করে দেখে নিল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা খাতা আর নিক্তি বের করল। এবার পাথরটা নিক্তিতে চাপিয়ে ওজন করল। হল—দুই ভরি এগারো রতি। তারপর খাতাটার ভিতর থেকে একটা চার্ট বের করে অনেকক্ষণ ধরে কী সব মিলিয়ে দেখে নিয়ে খাতাটা খুলে দেবনাগরী অক্ষরে অঙ্ক কষতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাটাকুটি করে,—অবশেষে সে খাতাটা মেলে ধরল চমনলাল বাবুর সামনে। উনি দ্রুত চোখ বুলিয়ে এক ঝলক সেটা দেখে নিয়ে বললেন: ঠিক আছে।

তারপর আমাদের সমবেত কৌতূহলী মুখগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অজয়কে লক্ষ্য করে বললেন: এটার জন্য আমি ষাট হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। গ্রেড ওয়ান হলে একলাখ টাকার উপরে দাম হত। এটার ম্যাক্সিমাম সেলিং প্রাইস পঁচাত্তর হাজার টাকা। মিড্‌ল ম্যানকে দিতে হবে পাঁচ হাজার। টেন থাউজেণ্ড আমার প্রফিট।

আপনি আরও দুই এক জায়গায় দেখতে পারেন, এর বেশি কেউ দেবে না।—তারপর হেসে বললেন: আমার তো মনে হয়—কমই দিতে চাইবে। ইট ইজ নাউ আপটু ইউ টু ডিসাইড।...

আমাদের কারও মুখে কথা নেই। কয়েকমুহূর্ত থেমে চমনলাল হেসে বললেন: উকিল বাবু, হুকুম করুন। কী?...দেবেন?....

অজয় সাধনের বিহ্বল বিমূঢ় মুখের দিকে তাকাল—অনুমোদনের জন্য। কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হল না। শুধুমাত্র আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে এক ঝলক অজয়ের দিকে তাকিয়ে সে একবার ঘাড় নাড়ল মাত্র। অজয় এবারে আমার দিকে তাকাল। আমি ইশারায় সম্মতি জানালেম।

: বলুন এবারে—কী নেবেন, ক্যাস না চেক? চেক হলে এখনই দিতে পারি। কিন্তু ক্যাস নিতে হলে আমার সাথে গদিতে যেতে হবে। কিন্তু বাবুজী, ওটা ডিউ রিস্ক। জামানা বহুত খারাপ।

অজয় ভয় পেয়ে বলল: না না...ও সব ক্যাস ফ্যাসের ঝামেলায় যেতে চাই না। আপনি চেকই দিন। কাল ক্যাস করা যাবে তো?

: জরুর।...

: তা হলে তাই দিন। নাম লিখুন—সাধন চন্দ্র ভট্টাচার্য। কী-রে সাধন,—এই ব্যবস্থাই ভাল হল, কী বলিস?

সাধন কোন কথা না বলে একবার কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে তাকিয়ে, মাথাটা চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে অসীম আলস্যে চোখ বুঁজল।

একচল্লিশ বছরের নির্ভীক সৎ ঐতিহ্যময় পত্রিকাকে বাঁচানোর
আপনার কি কিছু করণীয় আছে?
'জয়শ্রী' বাঁচাতে বিজ্ঞাপন, গ্রাহক ও লেখা দিন

বাসুদেব দেব

একুশটি কবিতা

মিঠুর জন্য

তোমাদের কাছে আরো কাছে যাবো বলে
নিজেকে দু হাতে ভাঙি অঙ্কুরের মত
দুখণ্ড ব্যর্থতা থাকে দুদিকে পাথরের মত
মাঝখান দিয়ে আমি তোমাদের দিকে যেতে চাই
পাহাড়ী ঝর্ণার সহচর

যে রকম বৃষ্টি যায় ঘাসের শিকড়ে
স্বপ্ন আর স্মৃতি যায় উড়ন্ত ভাইরাস যায় মানুষের দিকে
বৃষ্টি ভিজে ভিজে আমি সে রকম যাই
তোমাদের কাছে আরো কাছে যাবো বলে

বৃষ্টিতে বাগান ভেজে ঘাসের ওপর খোলা
কবিতার সংকলন বই ভেজে প্রিয় কবিগণ
তারা খোঁজে অমরতা কমপক্ষে বিনামূল্যে ছাতা
আমি ভিজে হেঁটে যাই
তোমাদের কাছে আরো কাছে যাবো বলে

উপনিষদ থেকে

উপনিষদ থেকে মুখ বাড়িয়ে সেই গাছটি
ঝুঁকে পড়ে আমার ফাটাফুটা বুকের ওপর
দোলায় তার শাশ্বত ছায়া আর দেখে
দেখে আমার ঘর সংসার ভুল ত্রুটি

অপাপবিদ্ধ গ্রাম থেকে উড়ে আসে পাখি
এসেই সে ঠোকরাতে থাকে আমার চোখে
ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে চুণবালি
আমার আসক্তি আর আলস্যের মাঝখানে
হঠাৎ এসে বসে, গান গায়
মন্দিরের মাথায় চাঁদ গ্রামের শেষে নদী
স্বপ্নের ভিতর থেকে এক আলাভুলো রাখাল
সবাই চলে আসে ঘন হয়ে

উপনিষদ থেকে মুখ বাড়িয়ে সেই গাছটি
ঝুঁকে পড়ে এই সব দেখে
আর তার শিকড় বৃষ্টির মত
মাটির খুব ভিতরে ছড়াতে থাকে
আমার খুব ভিতরে

ফেরিঘাট

চাঁদের লণ্ঠন হাতে ম্লান কুয়াশায়
তুমি কি আমার জন্য জেগে আছ
এত রাত

ট্রাফিকের কোলাহল থেকে
আমার চীৎকার শোনো 'যাই আমি যাই'
ট্রেনের বাঁশিতে সেই করুণ আকুতি
'যাই আমি যাই'
জন্ম ভিটে ছেয়ে আছে আগাছায় ঘাসে
ভেঙে গেছে পুরোনো সে সাঁকো

কার্তিকের হিম
শান্ত করে রাখে সব কোলাহল
নির্জন পিদিম
তুমি কেন জাগো
এতরাত

আসবে আসঙ্গে ক্লান্ত
অনুমতি দাও
শুতে যাই

পতঙ্গ

কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছ
পতঙ্গ হে
ঐ দিকে যে আগুন জ্বলে আগুন
আমার পতঙ্গ হে

এই দিকে এর গূঢ় আঁধার
মায়ার কানন রূপবতীর
মধুর আদর
এ সব ফেলে
কিসের টানে কোথায় যাচ্ছ
কোথায় যাচ্ছ পতঙ্গ হে
তুফানমেলে
জলের ধারা নিম্নমুখী
ভৃঙ্গ কি
জলের স্রোতে বাইরে থাকে
তোমায় ডাকে তেমনি নাকি
অন্য কোন আসঙ্গ কি

কোথায় যাচ্ছ এসো বুকে
ঢেকে রাখি
পতঙ্গ হে

[বর্তমান প্রসঙ্গ—৪৫৮ পৃষ্ঠার পর]

(H. Rangaisalo) ; সমাপ্তি ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াই ভি চ্যবন। প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শরণ সিংও প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রী অধিবেশনের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ভাষণ দেন।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে পার্লামেণ্টের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব, লোকসভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং জরুরী অবস্থার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ১৫ই নভেম্বর ভূপালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেটা সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী বিলের (৪৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলের পরিবর্তিত নাম) আলোচনার জন্য বিরোধীদের ঘরোয়া বৈঠকের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ওম মেটার এই স্বীকৃতিই বলে দিচ্ছে যে জাতীয় বিতর্কের national debate যে কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন সীমিত এবং সঙ্কুচিত সুযোগে সে উদ্দেশ্য পূরণ হয় নাই।

অর্থনৈতিক প্রস্তাবে ভারতীয় অর্থনীতির শতকরা ৬.৫ ভাগ বৃদ্ধির হারের, (rate of growth), ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টন (এগার কোটি আশি লক্ষ) খাদ্যশস্য উৎপাদনের, ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্য ভাণ্ডার মজুদের, ১৯৭৫-৭৬ সালে শতকরা ১৮ ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধির, দুই হাজার (২০০০) কোটি টাকার ওপর বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সঞ্চয় এবং পরিকল্পনা সুরু হবার পর এবারকার পরিকল্পনার বরাদ্দে শতকরা ৩১ভাগ বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষের দু'বছরে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা এই পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের বিনিয়োগকে ছাড়িয়ে যাবে। এজন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর কঠোর শৃঙ্খলা আরোপের কথা বলা হয়েছে। সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ের বিনিয়োগের উপর উপযুক্ত লাভের কথা বলা হয়েছে, মাথাপিছু আয় ও জীবন-মান বৃদ্ধির জন্য পরিবার পরিকল্পনার স্বার্থক রূপায়ণের এবং এই কর্মসূচীকে গণ-আন্দোলন পরিণত করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক বিবৃদ্ধির জন্য সমাজ সচেতন ব্যক্তিগত শিল্প-ব্যবসায় স্বীকৃতি পেলেও এদের জাতীয় জীবনে নির্ধারিত অগ্রাধিকার মেনে চলতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধ করতে হবে শ্রমিকদের অযৌক্তিক ছাঁটাই, লক আউট ও লে-অফ বন্ধ করতে হবে। রুগ্ন শিল্পে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য, যে সব অর্থনৈতিক সংস্থা থেকে এরা অর্থ সাহায্য পেয়েছে, সেই সব সংস্থার প্রতিনিধি এই ধরণের শিল্পে পরিচালনা নিযুক্ত করবেন, যারা শিল্প পরিচালনার কুশলতা বৃদ্ধির ও নূতন নূতন কারিগরী উদ্ভাবনের দিকে নজর রাখবেন। শহরে দারিদ্র্য হ্রাসের এবং শহরে পরিবেশ উন্নয়নের দিকেও নজর দিতে হবে। শহরে জমির উপর সিলিং আইন প্রয়োগ করে দরিদ্র জনসাধারণের এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার

জন্য স্বল্প সংগৃহীত জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে হবে। নারীসমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির এবং জাতীয় জীবনের সকল উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তাদের জড়িয়ে নেবার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

বৈদেশিক সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা নির্বিচারে আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানের ও কারিগরী বিদ্যার সঙ্গে ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কথাও এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

প্রস্তাবে অর্থনৈতিক বিবৃদ্ধি, প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং অর্থনীতির ওপর রাশ টেনে রাখবার কথা বলা হলেও গত মার্চ মাস থেকে যে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, তার অনুল্লেখ চোখে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যি তার প্রারম্ভিক ভাষণে সমবেত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলেছেন নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ঘাটতি নাই, তবুও মূল্যবৃদ্ধি কেন? তাই তিনি রাজ্যসরকারগুলিকে মূল্যের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল্যস্তর কমিয়ে আনবার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। বহু সভা-সমিতি পত্র-পত্রিকায়, পার্লামেন্টে ইতিপূর্বে একটি জাতীয় বেতন ও মূল্য-নীতি গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবার তার প্রারম্ভিক ভাষণে এই নীতি গ্রহণের ওপর জোর দেওয়ায় অর্থনৈতিক প্রস্তাবে এই নীতিটি সংযোজিত হয়েছে।

কিন্তু মূল্যস্তরের সূচকের ক্রমবৃদ্ধিও আবার মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) আশঙ্কা সম্পর্কে গত ১৫ই নভেম্বর পুনেতে (Pune) কলেজ অফ এগ্রিকালচার এণ্ড ব্যাঙ্কিং-এর উদ্যোগে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি (Regional Rural Banks) অফিসারদের ট্রেনিং-এর প্রারম্ভিক কর্মসূচির উদ্বোধনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর ডঃ আর কে হাজারি (Dr R. K. Hazari) যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এই আই, সি, সির অর্থনৈতিক প্রস্তাব উপলক্ষ্যে আলোচনায় তার কোনো বিশেষ রেখাপাত দেখা যায় নাই। ডঃ হাজারী বলেছেন মুদ্রার যোগান শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭৬-এর মার্চ থেকে পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক শতকরা এগার ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা আমরা জয় করেছি, এটা অপরিপক্ক মনের ধারণা,—"The belief that we have conquered inflationary trend is immature.

আন্তর্জাতিক প্রস্তাবে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির সার্থকতা, দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে ভারতের সীমান্তবর্তী দেশের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্মার সঙ্গে ভারতের কোনো সমস্যা নাই, পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা অনেক দূর এগিয়েছে, চীনের সঙ্গেও বিরোধের জট খুলতে শুরু করেছে। একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেই ফারাক্কার জল নিয়ে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, যা ভারতের

মতে অনায়াসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মীমাংসা হতে পারে।

গৌহাটির নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিপুল সমাবেশের বিবরণী পাঠ করে বহু ভারতবাসীর মনে পড়বে জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী এই উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ইম্ফল প্রান্তরে মৈরাংঙ্গে ১৯৪৪-এর ১৪ই এপ্রিল সর্বপ্রথম স্বাধীনতার তেরঙ্গা পতাকা-উত্তোলন করেছিলেন। জাতীয় জীবনের এই অমেয় অভিব্যক্তির গাঁথা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সমবেত নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের কারুর কণ্ঠে, উচ্চারিত হ'লে প্রস্তাবে গৃহীত ভারতীয় জীবন চর্যার'—'Indian way of life' —অব্যবহিত অপরূপ প্রয়োগ, সম্মেলনে একটি অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে যেতো।

জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট

গত ২রা নভেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী জিমি কার্টার চলতি প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান প্রার্থী ফোর্ডকে পরাজিত করে সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ১৯৩২ সালে সে-সময়কার চলতি প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার (Herbert Hoover) ডেমোক্র্যাট প্রার্থী রুজভেল্ট-এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ফোর্ডও নিক্সনের মনোনীত ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ধাক্কায় নিক্সন পদত্যাগে বাধ্য হলে, বিনা নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু নিক্সনের অপরাধ ক্ষমা করার পর ফোর্ড-বিরোধী জনমত গড়ে ওঠে। নির্বাচনের সময়ও তার রেশ বজায় ছিল। আমেরিকায় নিক্সনের আমল থেকে ইনফ্লেশন ও বেকার-সমস্যা নির্বাচনের মূল বিতর্কের বিষয় হয়েছিলো।

জিমি কার্টার আমেরিকার দরিদ্র দক্ষিণী অঞ্চলের অধিবাসী। দক্ষিণী এক রাজ্যে কিছুকাল গভর্ণর থাকলেও আমেরিকার জাতীয় জীবনে কার্টার একেবারে অজ্ঞাত, অখ্যাত হওয়ার দরুণ তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু ছিলো না, জাতীয় প্রশাসনে অনভিজ্ঞতার অভিযোগ ছাড়া। আমেরিকার ভোটাররাও রিপাবলিকান শিরোমণি নিক্সনের ছল-চাতুরীর জুয়াচুরীতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এই ধরণের অজ্ঞাত, অখ্যাত লোকের দিকে ঝুঁকে থাকবেন। কার্টার ১৯৭৭-এর ২০শে জানুয়ারী ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিবের এবং অন্যান্য সচিবদের পদে নূতন মুখ দেখা যাবে। কার্টারের নির্বাচনে সোভিয়েত রুশের উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রেজনেভ আরও কার্যকর 'more effective'—সোভিয়েত-মার্কিণ সহযোগিতার জন্য কার্টারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কার্টার কেবলমাত্র দুই 'বৃহৎ শক্তি জোট'র উপর নির্ভর না করে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কমজোরী রাষ্ট্রের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন, জাপান এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলবেন, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে

নিকট সম্পর্ক স্থাপন করবেন, ইসরাইলকে একচোখা সমর্থনের নীতি বর্জন করবেন। ভারত মহাসাগরে নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রণের জন্য সোভিয়েত রুশের সঙ্গে চুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, 'বৃহৎ শক্তি' হয়েও নীচু পর্দায় আমেরিকার সুর বাঁধবেন, আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গ শাসন চান, তার হাতে সোভিয়েত মার্কিণ বোঝাপড়া বা দাঁতাত-এর গতিবেগ শ্লথ করবেন এবং আমেরিকার অস্ত্র-বিক্রেতার ভূমিকা সঙ্কুচিত করে আনবেন। ইতিমধ্যে কার্টার অ-কম্যুনিষ্ট শিল্প প্রধান দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিয়ে একটি তৃতীয় অর্থনৈতিক শীর্ষসম্মেলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। কার্টারের পরামর্শদাতা ব্রেজেজেনস্কি (Brzezenski) কার্টারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে সে একজন আদর্শ-নৈতিক যুগোত্তর রাজনীতিক, যাকে কোনো মতবাদের খোঁয়াড়ে পুরে রাখা যাবে না'—"new post-ideological politician who does not fit into any doctrinal pigeonhole."

কার্টারের নির্বাচনে ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি আশা করায় কার্টার গরীব দক্ষিণ গ্রামীণ রাজ্যগুলির—একমাত্র ভার্জিনিয়া ছাড়া —একজোট সমর্থন পেয়েছেন। ইলেকটোলার কলেজের মোট ৫৩৮টি ভোটের মধ্যে কার্টার পেয়েছেন ৩০৩টি, ফোর্ড ২৩৫টি,—তার মধ্যে একমাত্র কালিফোর্ণিয়া থেকেই ৪৫টি —আর প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫১ ভাগ কার্টার। শতকরা ৪৮ ভাগ ফোর্ড পেয়েছেন। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ-এ ২৯১ জন ডেমোক্র্যাট এবং ১৪৪ জন রিপাবলিকান এবং সিনেটে ডেমোক্র্যাট ৬১ জন। রিপাবলিকান ৩৮ জন এবং নির্দল ১ জন নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের উভয় কক্ষতেই প্রেসিডেন্টের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছেন। এবারকার ভোটারদের শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগ ভোট দিয়েছে এবং ছয় লক্ষ ভোটার এবারকার নির্দল প্রার্থী প্রাক্তন ডেমোক্রাট সিনেটর ইউজেন মাকার্থীকে (Eugene Mc Carthy) ভোট দেয়। মাকার্থী প্রার্থী না থাকলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটের ফলাফল কি হ'ত বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে পেছিয়ে কেন ?

খোদ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী টি, এ, পাই-এর অভিযোগ: কেন্দ্র গত তিন-চার বছরে পশ্চিম বঙ্গকে যে-সব শিল্প লাইসেন্স দিয়েছেন তার অনেকগুলি কাজে লাগানো হয় নাই। রাজ্য সরকার ৪৬১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার নূতন শিল্প প্রস্তাব কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠালে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স এবং লেটার অফ ইনটেন্টগুলি কাজে না লাগানোর কারণ অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ১৯৭২ সালে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে ৫৫টি লাইসেন্স দিয়েছিলো, কাজে লাগানো হয়েছে ৪৩টি, ১৯৭৩-এ মঞ্জুরী হয়েছিল ৪৫টি, কাজে লাগানো হয়েছে ২৯টি, ১৯৭৪-এ মঞ্জুরী হয়েছিল ১০৯টি,

কাজে লেগেছে ৪৯টি আর ১৯৭৫-এর হিসাব যথাক্রমে ৭৪ ও ১৬। এ-ছাড়া কয়েকটি আংশিক কাজে লাগানো হয়েছে। অকার্যকর লাইসেন্সগুলির বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের ক্ষেত্রে (Private Sector) মঞ্জুর করা হয়েছিল। রাজ্য যোজনা পর্ষদও মনে করেন যে, গত চার-পাঁচ বছরে শিল্পায়নে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ কোনো কাজ হয় নাই। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের ওপর সরকারী তদারকির শৈথিল্যই কী এই পরিস্থিতির কারণ?

শিক্ষায় অপচয়

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের উপরাষ্ট্রমন্ত্রী ডি. পি. যাদব (D. P. Yadav) পাঞ্জাবের জলন্দরে বলেছেন: 'আমাদের দেশে তিন কোটি ছাত্র রয়েছেন, কিন্তু কলেজে রয়েছেন মাত্র ত্রিশ লক্ষ। এতেই তো বোঝা যায় অজস্র সংখ্যক ছাত্র স্কুলের স্তরেই তাদের শিক্ষা জীবনে ছেদ টেনে দেয়।' এই কারণেই তিনি বলছেন দশ ক্লাশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশ্র পাঠক্রমের 'Composite education' ব্যবস্থা করা হয়েছে। দশ-ক্লাশের এই পাঠক্রমে শিক্ষা লাভ করলে, সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা কেবলমাত্র ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, হিন্দি, ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষা গুলিই শিখবে না, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মৌল সূত্রগুলির সঙ্গেও সুপরিচিত হয়ে আগামীদিনের সামাজিক, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতির ফলশ্রুতিগুলি চোখ মেলে গ্রহণ করতে পারবে। এই সিদ্ধান্তের একটি শর্ত হ'ল স্কুলের পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মূলসূত্রগুলি বুঝবার মানসিক গড়ন শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই ছেলে-মেয়েদের করায়ত্ত হয়েছে এবং দশ এবং দশম-ক্লাশের পাঠক্রমের পরবর্তী শ্রেণীগুলিতে সহজবোধ্য পঠন-পাঠনের ফলে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মৌল-সূত্রগুলি তাদের আয়ত্তাধীন হয়ে পড়বে। এই সর্তপূরণে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়, যার ফলে একদিকে যেমন বহু ছাত্র-ছাত্রী সেই স্তরেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়, অপরপক্ষে যারাও বা প্রাথমিক স্তরের সীমা অতিক্রম করে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছালেন, তাদের শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরের কাঁচা ভিত্, মাধ্যমিকের ক্রমশ জটিল বিষয়ে প্রবেশের পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে কোনোক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান ক'রে তোলে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক্। এখানে প্রাথমিক স্তরেই শতকরা ৩০ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদে বাধ্য হয়। শতকরা ৯৫ জন ছেলে-মেয়ে পরিবারের নানা কাজের চাপে নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। হাজার হাজার ছাত্র প্রথম পুরুষে লেখাপড়া শিখছে। এই স্তরে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবও শিক্ষার কাঁচাভিতের অন্যতম উপাদান। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবেশের দরজা থেকে প্রতিহত হয়। বিজ্ঞান ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রেই এটা

বেশী নজরে পড়ে। অবশ্য প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের এই অপূর্ণতার মূলে দেশের দারিদ্র্য বড়ো স্থান জুড়ে রয়েছে। ফলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে এটা সমাজের 'বাছাই করা' ছাত্রদের জন্য —'elitist education'। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্‌কে কাঁচা রাখতে সহায়ক হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমন্বিত উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষায় অপচয়ও বন্ধ হবে না এবং Composite education' অর্থাৎ পাঠক্রমের পরিপূর্ণতার সুফল সমাজের গোড়ায় চুইয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন সমৃদ্ধ করবে না।

বিপ্লবী সুশীলকুমার সরকার

স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী সুশীলকুমার সরকার গত ২০, ১০, ৭৬ তারিখে উটকামণ্ড-এ সহসা হৃদরোগে ও অন্যান্য উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে অকালে পরলোকগমন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ কমিটির পশ্চিমবঙ্গীয় প্রতিনিধিরূপে চলচিত্র-বিষয়ক একটি 'সেমিনার-এ যোগদানের জন্য তিনি সেখানে যান। বিপ্লবী দল শ্রীসংঘ-এ তিনি 'গুর্খা' নামে পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী সচীশ সরকার, ওরফে তারু, তাঁর অগ্রজ। বিপ্লবী সমাজবাদী নেতা অনিল রায় ও বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর সংগ্রামী আদর্শে তিনি নিজের জীবন উৎসর্জন করে প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে বহু নির্যাতন বরণ করে ছিলেন।

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩০. ১১. ৭৬

ত্রুটী স্বীকার: মুদ্রণ যন্ত্রের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কার্তিক ১৩৮৩ সংখ্যার নানা অংশ দুষ্পাঠ্য হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক, জয়শ্রী।

২০৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০ ৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১৫·০০
পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	৫·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের

রক্ত তুর্কী	৩·০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড প্রতিখণ্ড	৩·৫০
রেডইনের দেশে	৩·০০
নিবেদিতা	১০·০০

গণি বাগচী

বিদ্যাসাগর	১০·০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২·০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪·০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·৫০
বাংলার ঋষি	২·৫০
বাংলার বিদুষী	৬·৫০
বাংলার মনীষী	১·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৩·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবনগড়া	১·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্ধিত সংস্করণ)	

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬·০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ নিবারণ	৫·০০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
		সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩·০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩·০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট প্রতিটি	১·০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা - ১২

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদালঙ্কার

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/66

Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1·00 with Regtd Postage Rs 3·20 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

জয়শ্রী

NETAJI NUMBER
নে তা জী সং খ্যা
৪১ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮৩

বীর-বন্দনা : অমিয় চক্রবর্তী

সুভাষিত বাক্য যাঁর, সমুজ্জ্বল প্রসন্ন ললাট
সর্বস্ব ত্যাগের বীর্যে, চিত্তযোগী, সেবায় সম্রাট
তাঁর কথা মনে পড়ে, কতবার জীবনের পথে
দেখেছি বিজয়ী মূর্তি, অক্লান্ত দেশাত্ম চর্যাব্রতে
উদিত প্রভায় তাঁর খুলে গেছে দিগন্ত বিরাট
বহুজনতার বক্ষে, নেতাজি নেতাজি ধ্বনিস্তবে
ধন্য হল শুভদিন জাতীয় গৌরবে
মিলিত কর্মের মহোৎসবে।
লাহোরে দিল্লীতে দেখা, কলকাতায় দীর্ঘ প্রতিবেশী
সান্নিধ্য এল্‌গিন রোডে—মধ্যে দূরদেশী
গেছি সিংধ কার্লসবাডে, ছিলাম তাঁরি যে অতিথি
সে বরেণ্য স্নেহধন্য শৈলগাঁথা স্মৃতি
পথচারী আলাপের রত্ন আজো রয়েছে নিভৃত।
তার পরে যুদ্ধ এল, প্রলয় ছড়ালো দেশে দেশে—
নিষ্ক্রমণ পর্ব তাঁর, ভারত-মুক্তির চিরোদ্দেশে,
একাকীর অভিযান, কোথা সুরু, কোথা লগ্নশেষে
বীর-ভাগ্যে কী পরীক্ষা, ইতিহাসে অস্পষ্ট গ্রথিত
এখনো কাহিনী কেন ; পশ্চিম-পূর্বের মিশ্র পটে
শুধু এক বার্তা এল "দিল্লী চলো", দারুণ সংকটে
ভয়হীন জয়বাণী "জয়হিন্দ্‌"—মাতৃভূমি ফিরে
পেল না সন্তান তাকে, তবু তীরে তীরে
"জয় হিন্দ্‌" "জয় হিন্দ্‌" যুগে যুগে তাঁরি কণ্ঠে জাগে—
কোটি ভ্রাতা ভগ্নী জানে সেই মন্ত্র-রাগে
নতুন দিনের পথ ; মহাজাতিসদন—বন্দনে
রবীন্দ্রনাথের উর্মি মিলেছিল তাঁরি উদ্বোধনে ॥

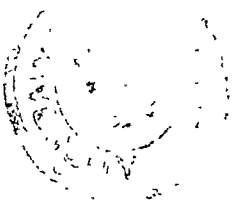

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা : লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন
(সাধারণ মূল্যে আনুমানিক ১২·৫০)

বৃক্ষরোপণ উৎসব
ও
৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাধাই ও ছাপা,

দাম দশটাকা

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

Sulekha®
your pen friend

Available in following colours

ROYAL BLUE ● BLUE-BLACK
NAVY BLUE ● BLACK ● RED
GREEN ● BROWN ● VIOLET

THE LARGEST IN SALE

THE HIGHEST IN QUALITY

SULEKHA WORKS LTD.
CALCUTTA ● GHAZIABAD

নতুন কলকাতার কথা

পর্যবেক্ষক

কলকাতার হালচাল বেহাল অবস্থায় পড়েছিল সেদিন পর্যন্ত। নগর প্রকল্পবিদদের তোয়াক্কা না করেই ইতস্ততঃ ছড়ানো ঘনবসতি গড়ে উঠেছে মহানগরীতে, ফলে বাড়তির পথে বাসিন্দার চাহিদা এলো, ঘাটতির পথে এগোল পুরব্যবস্থা, হ'ল নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত।

রাস্তার কথাই ধরুন না কেন, পথে যাতায়াত? যানবাহন ও যাত্রীর পক্ষে বিভীষিকা, একটু বর্ষাতেই হাঁটুজল রীতিমত স্বাভাবিক, নয় কি? পরিশ্রুত জলের বরাদ্দে চলছিল টানাটানি, জল পেতনা বহু এলাকাবাসী। বস্তীর নারকীয় পরিবেশ বস্তীবাসীর মত আমাদেরও চোখ সওয়া হয়েছিল।

এখন এসেছে পটপরিবর্তনের সূচনা। নতুনভাবে পুরনো এলাকা নিয়ে নতুন এলাকাভুক্ত নয়া কলকাতা গড়ে উঠেছে।

রাস্তা চওড়া হচ্ছে, সড়কসেতু, সাবওয়ে হল, ফ্লাইওভার, বাইপাশ, একসপ্রেসওয়ে ও সড়ক সেতুর কাজ চলছে বিস্তীর্ণ এলাকায় আরো বেশী লোক বেশী পরিমাণে জল পাচ্ছেন, বস্তীগুলোর পরিবেশ উন্নত হচ্ছে। জল ও মল নিকাশী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটছে।

এর কৃতিত্ব প্রাপ্য সি, এম, ডি, এ-এর এবং বিশেষ করে এই সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী ভোলানাথ-সেনের। দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ব্রতী শ্রীসেনের কাছে অনুরোধ তাঁর নেকনজরে যেন কলকাতার পূর্ব গৌরব ফিরে পায়।

With Best Compliments of :-

KMB Scientific Glass Works

Manufacturers of : **Ampoules, Vials, Test Tubes, Scientific Instruments, Glass Ware, Etc.**

Bombay Office :
116, Himalaya House, Paltan Road, Bombay-400 001.
Phone : 26 50 26

Head Office & Factory :
1/3 Harimohan Roy Lane, Calcutta-15.
Phone : 24 02 97

জল ॥ অপচয় করবেন না। আপনি অপচয় করলে আপনার প্রতিবেশীর অভাব হবে।

টিকা ॥ নিতে দেরী করবেন না
কলেরার ও বসন্তের টিকা সময়মত নিন।

ময়লা ॥ যথাস্থানে ও সময়মত ফেলুন; আপনাদের সকলের কল্যাণের জন্য শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মহামারী মুক্ত রাখতে

পৌর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করুন

জনসংযোগ বিভাগ ঃ কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান।

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪১ বর্ষ ১৩৮৩ পৌষ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সুভাষ-চরিত্রের উপাদান ৪৯৯

কবিতা

আসিবেনা তুমি ॥ সমর গুহ ॥ ৫০৬

My Association with Netaji Subhas Chandra Bose : V.V. Giri ৫০৭

Economic Planning of Netaji Subhas & Role of Public Sector in India : B.K. Saha ৫০৯

সেমিনার

বর্তমানে সুভাষ ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ৫১২

ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বভারতী ৫১৪

অমূল্যভূষণ সেন, অধ্যাপক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৫২৩

পবিত্রকুমার ঘোষ ৫৩৩

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি ॥

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ॥ বিনয়কুমার বসু ৫৪৬

পুস্তক পরিচয় ৫৫৯

শ্রদ্ধার্ঘ্য-অনুষ্ঠান ৫৬৫

প্রচ্ছদ : বীরবন্দনা (কবিতা) অমিয় চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্র

সম্পাদক : সুনীল দাস

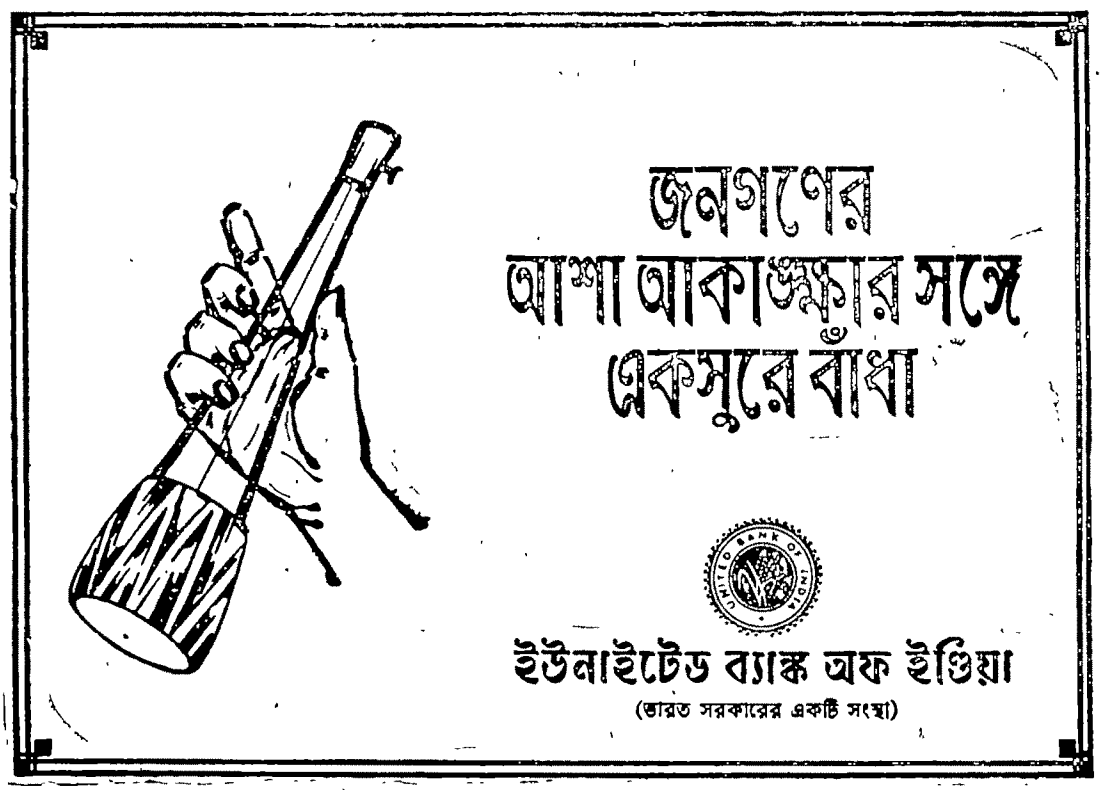

DEVELOPMENT CONSULTANTS

for comprehensive consultancy services in every field of engineering activity

For more than 25 years we have been providing technical consultancy services from start to finish. For every aspect of engineering, involving power generation and distribution, paper, fertiliser, cement, steel, other ferrous and non-ferrous metals, mining, material handling, textile, docks and harbours etc. involving architectural, structural, mechanical, electrical and project-development-construction-management-operation activities.

From feasibility studies and project reports through design engineering and supervision to successful commissioning, our veteran engineers bring all their experience and know-how to the task, assisted by computerised technology to turn your proposals into working projects.

In the international field also, we are providing technical consultancy service in a big way—Thailand, Philippines, Nepal, Syria, Egypt, Iraq, Kenya and Venezuela being some of the countries where we have already exported our service.

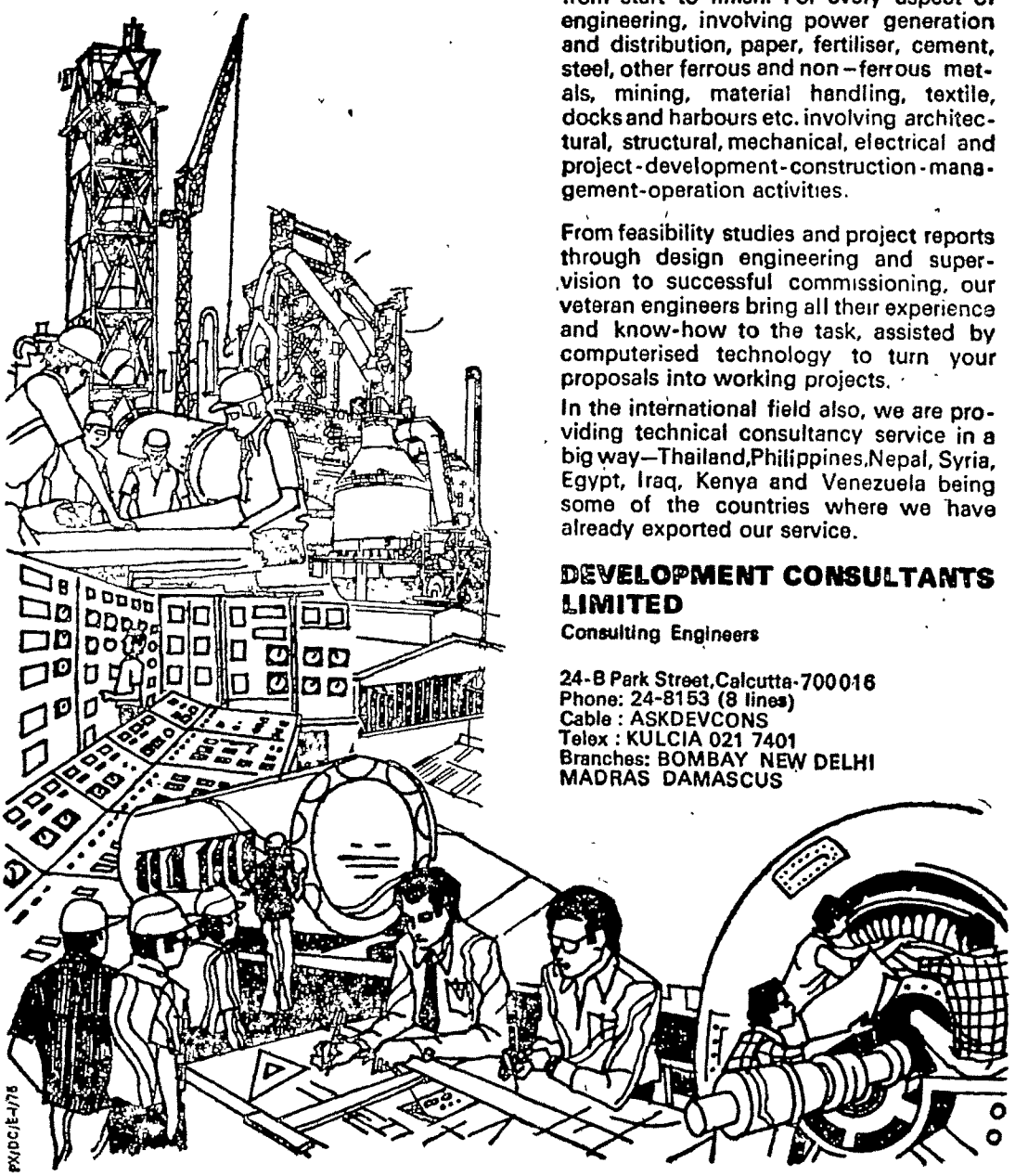

DEVELOPMENT CONSULTANTS LIMITED

Consulting Engineers

24-B Park Street, Calcutta-700016
Phone: 24-8153 (8 lines)
Cable : ASKDEVCONS
Telex : KULCIA 021 7401
Branches: BOMBAY NEW DELHI
MADRAS DAMASCUS

PX/DC/E-J/78

WE ARE SOLE DISTRIBUTORS
IN EASTERN INDIA FOR :

DEPEND
ON
US...
YOUR
SOUND
COMPANION

MURPHY
Radio

AHUJA
P. A. Equipment, Stereo-gram, Stereo Amplifier, Tape Recorder

TELEVISTA
Television

U. M. S.
Electronic Calculator

MECOM
Car Radio

ARCEY
Car Aerial, Condenser Suppressor

★ ★ ★ ★ ★ ★

DEBSONS PRIVATE LIMITED
CALCUTTA • PATNA • JABALPUR
CUTTACK • GAUHATI

• BBVA6/763

Your Goodwill is our strength

NTC's other strength is its quality fabrics and exclusive designs.

For a comparatively young public enterprise entrusted to run 18 sick textile mills spread over West Bengal, Bihar, Assam and Orissa, we have already achieved a remarkable record of efficiency and reliability. Our range of product is wide—extending upto Suitings, Shirtings, Printed Dress Materials and Ready-made Garments that have earned a reputation for durability and favourable prices.

Buy NTC Fabrics

Help Growth of the Nation

National Textile Corporation

(West Bengal, Assam, Bihar & Orissa) Ltd.,

7, Jawaharlal Nehru Road,
Calcutta-700 013.

আপনার মেয়ে পরের বৌ হ'বার যুগ্যি তো ?

সব বাবা মায়েরাই স্বপ্ন দেখেন তাদের মেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, আলোক ঘর সংসার করবে, সুখ স্বচ্ছন্দ বড় হবে। কিন্তু আপনার মেয়েকে কোন দরদে মাইনর পরীক্ষা বড় করে তুলে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই কি সে হয় সফল হবে ? আপনার মেয়ে কিশোরী — সংসারের দায়, ঘরতীর দায়িত্ব তুলে নেওয়ার ক্ষমতা তার এখনও তৈরী হয়নি। তার জন্য তার বয়স কমপক্ষে আঠারো হওয়া উচিৎ। আঠারো বছর বয়সে মেয়েদের দেহ ও মনের পরিপূর্ণ গঠন হয়। তখনই তৈরী হয় সাংসারিক জীবনের গুরু দায়িত্ব তুলে নেবার ক্ষমতা। বয়স্কাকেই ঘরণী হওয়া সাজে কিশোরীকে নয়। তাই দেখবেন— আপনার মেয়ে যেন দেহে, মনে ও বয়সে পরিপূর্ণ হওয়ার সময় হয়। তার আগে বিয়ে নয়।

দেহ মনের পূর্ণ গঠন মেয়ের বয়স আঠারো যখন

davp 76/500

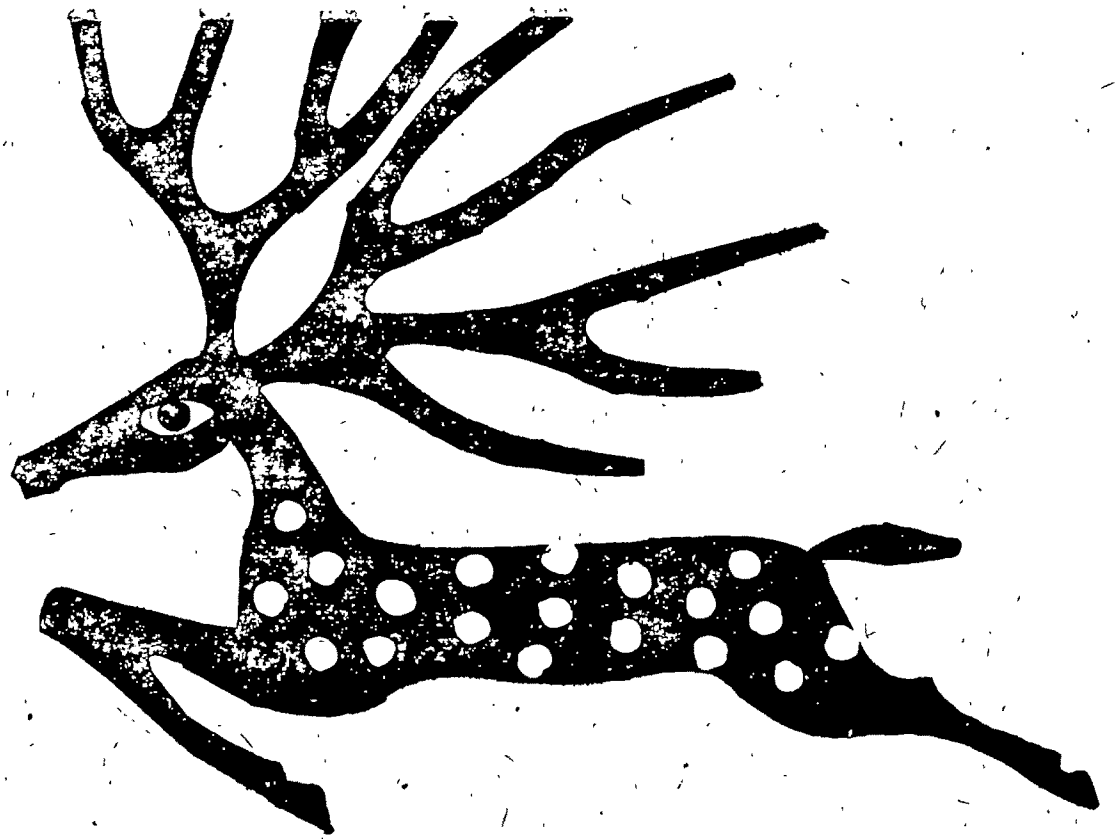

ছুটন্ত কলকাতা

কলকাতা ছুটতে চায়।
বনের হরিণ যেমন করে ছোটে বনে
ব্যগ্র এবং বাধাহীন। কিন্তু পারে না।
শহরের এলাকার তুলনায় বাড়ন্ত জনসংখ্যা,
জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প যান-বাহন,
যান-বাহনের তুলনায় সংকীর্ণ সড়ক
স্বভাবতই তার অগ্রগতির পথে বাধা।
আমরা জানি, কলকাতার মানুষ আজ
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে
সেই গতিময় যানটির দিকে,
যার নাম ভূগর্ভ রেল।
কারণ, ভূগর্ভ রেলের হাতেই সেই ভবিষ্যৎ,
যখন ছুটন্ত কলকাতা এক দৌড়ে পৌঁছে যাবে
তার সিদ্ধি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে ;
ব্যগ্র এবং বাধাহীন।

medium

MTP

কলকাতার নতুন মানচিত্র
রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

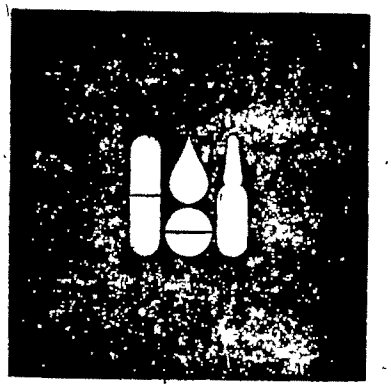

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্

আপনাদের সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৩

EPC-AD-14 BEN

YEARS OF SERVICES TO THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

KISHORE INDUSTRIES

Head Office : 174, Dr. D N Road, Bombay 400001.
Grams : CONEYARNS Phone : 264139,

Factory : Samrat Silk Mills Compound, L.B.S Marg,
Vikhroli, Bombay 400079 Phone's 582067,

TOP QUALITY NEUTRAL GLASS PHARMACEUTICAL CONTAINERS

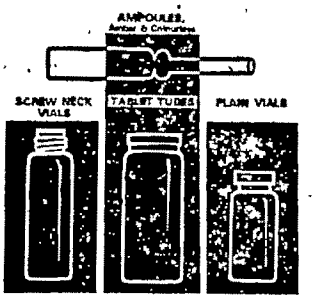

FOUNDER: LATE SHRI N. K. MEHRA

এ কথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থ-নৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্য পূরনে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ৯,৯০৯টি মৌজায় (১০,৪৪৭টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের ঘতিয়ান আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৪৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাঙলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩×২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটিং সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্যে।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট— বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের দশের সার্বিক উন্নতি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

প্রগতির চাবিকাঠি বিদ্যুৎ

TCP/WB888 349 A1/76

with
compliments
from

IOL

Indian Oxygen Limited

With Compliments from

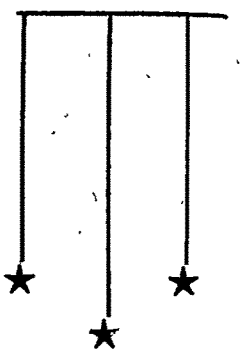

Sree Saraswaty Press Ltd.

Calcutta-700009

PASSENGERS

Our effort on the 20-point Economic Programme needs a helping hand: YOURS

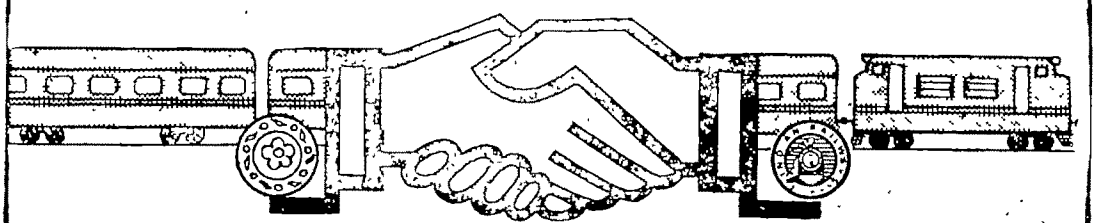

The Prime Minister's 20-point programme is so designed that everyone has a role to play to make it totally fruitful.

We are no exception. Nor are you, as our passenger. In fact, the 20-pt. programme has given us special impetus to improve our service in every sphere of our operation

One example is our record punctuality. 97% in case of Mail and Express trains, 95% for Passenger trains.

Apart from ensuring punctuality, we have introduced new trains. Extending the railway network. Doing everything feasible to make railway journeys safer and more comfortable. Plus, ensuring quicker movement of freight traffic.

We want to maintain this enviable record—and we need your help.

Here's what you could do :

Buy/book your ticket in good time. Avoid the last minute rush.

Avoid pulling the alarm chain except in case of emergency. Help keep the station and the compartments clean. Keep an eye on ticketless travellers and alert the authorities. Don't carry inflammable items. Do everything possible to avoid accidents.

In fact, there are many areas where you could co-operate.Won't you please?

Help us implement the 20-point programme.

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

NFC-5

জয়শ্রী

নে তা জী সং খ্যা

৪১ বর্ষ । নবম সংখ্যা । পৌষ ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

সুভাষ-চরিত্রের উপাদান

সুভাষ-চরিত্রের উপাদান নিয়ে ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে কতই না মতের অমিল দেখা যায়। সম্প্রতি এরকম দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। জহরলাল নেহেরুর সাম্প্রতিক এক জীবনী-কার, সর্বপল্লী গোপাল, তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মূল্যায়ন করে লিখছেন : "সুভাষচন্দ্র একজন মানুষ, হেরে যাওয়ার জন্যই যাঁর জন্ম।" অদ্ভুত মূল্যায়ন বটে। সর্বপল্লী গোপাল ভারতবর্ষেরই মানুষ, সুভাষ-চরিত্রের সকল উপাদানগুলিই খোলা-পাতার মত তার চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে। সুভাষ-চরিত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে পরোক্ষ জ্ঞান দিয়ে সুভাষ-চরিত্রের সামগ্রিক দিকটি উপলব্ধি করা তার পক্ষে খুব আয়াসসাধ্য ছিলো না। দার্শনিক-রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-এর পুত্র সর্বপল্লী গোপাল-এর বোধহয় এখানেই পদস্খলন হয়েছে, যেজন্য সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে পেরেছেন "...হেরে যাওয়ার জন্যই যাঁর জন্ম।"

সর্বপল্লী গোপালের মূল্যায়নের বিপরীত মেরুতে সম্প্রতি আর একটি ইতিহাসবিদ্‌কে দেখা গেছে, বলা যেতে পারে। মাস কয়েক পূর্বে ইতিহাস-গবেষক লিওনার্ড গর্ডনকে (Leonard Gordon) বলতে শোনা গেছে, গত আঠারো বছর যাবৎ সুভাষ-চরিত্রের বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে এখনও এই দুর্লভ-চরিত্রের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করার যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। লিওনার্ড গর্ডন বিদেশী, ভারতীয়-মানসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়সূত্রে সম্পর্কিত নন, বাঙালীমানসের সঙ্গে তো নয়ই। তাছাড়া হয়তো বা সর্বপল্লী গোপালের মত বিশ্লেষণী-প্রতিভার অধিকারীও তিনি নন। সর্বপল্লী গোপাল হয়তো বা পিতার ঐতিহ্যসূত্রে ভারতীয়-মানসের অন্তরতম প্রদেশের স্বকীয় সম্পদটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাঙালী-মানসের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য? সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বাঙালী-মানসের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বোত্তম বিকাশের সময় বাঙালী-মানসের পরিবেশে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে তার সঙ্গে একটা আত্মিক যোগও স্থাপন করেছিলেন। সর্বপল্লী গোপালের সে সুযোগ হয়নি এবং লিওনার্ড গর্ডনের মত দীর্ঘকালব্যাপী সুভাষ-চরিত্র উপলব্ধি করবার জন্য গবেষণাও তিনি কী করেছেন? সুভাষ-চরিত্রের উল্লিখিত মূল্যায়নে সে-সংশয় থেকে যায়।

সঙ্কল্প সম্পাদনে হার-জিৎকে সুভাষচন্দ্র কোনদিন যেমন উপেক্ষা করেননি, তেমনি হার-জিৎটাই তাঁর জীবনে কোনদিনই শেষ কথা হয়ে দেখা দেয় নাই। হার-জিতের ঊর্ধ্বে অসাধ্যসাধনের হাতছানি তাঁকে চিরজীবন পরিচালিত করেছে।

বাল্যে কটকের খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত পি, ই, স্কুলে ভর্তি হবার অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজীতে কথা বলতে অনভ্যস্ত এবং অনভিজ্ঞ হয়েও নীচের ক্লাশে সে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে 'Ranendra mot I shor' বলে—ফিরিঙ্গি সহপাঠিদের উপহাসের পাত্র হওয়া থেকে সুরু করে প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল আজাদহিন্দবাহিনী কর্তৃক মুক্ত স্বাধীন ভারতভূমিতে সর্বপ্রথম ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে ও গোটা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ-হিন্দবাহিনীর ও আজাদ হিন্দ সরকারের ভাগ্য বিপর্যয় পর্যন্ত, হার-জিতের ঊর্ধ্বে সেই অসাধ্য-সাধনের হাতছানি সুভাষচন্দ্রের জীবনে আকীর্ণ হয়ে আছে। সেদিন ইম্ফল সংলগ্ন নিরাভরণ মৈরাঙ্গ গ্রামে বিকাল ৫-৩০টায় স্বাধীন ও ইংরেজশাসনমুক্ত ভারতীয় এলাকায় আজাদ-হিন্দবাহিনীর রক্তলাঞ্ছিত ভূমিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন পতাকা উত্তোলনের বিজয়-উৎসব, কয়েক মাসের মধ্যে অন্তর্হিত হলেও, ইম্ফলের প্রান্তরে সুভাষচন্দ্র কী অসাধ্যসাধনের অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন যার পরিমাপ তো? হার-জিত দিয়ে করা যায় না? তারপর আবার নিরুদ্দেশের যাত্রা! সেও কী অনন্তের অভিসারে, অসাধ্য-সাধনের আর এক পর্যায়ে?

'অনন্তের হাতছানি'!—সে এক পরম বিস্ময়! ভারতের অধ্যাত্মসাধকদের জীবনে বার বার অনন্তের হাতছানি মূর্ত হতে দেখা গেছে। ভারতীয় বিপ্লবসাধকদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠা পেয়ে বিপ্লবসাধনার শিখরে পৌঁছেছেন, অনন্তের হাতছানির মাধুর্য তাঁদের অপ্রতিহত গতিতে আকর্ষণ করে সেখানে নিয়ে গেছে, সুভাষচন্দ্র তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। এঁদের কাছে লাভ-ক্ষতির হিসাব বার বারই তুচ্ছ হয়ে গেছে। অনন্তের হাতছানি, জীবন-জিজ্ঞাসারই নামান্তর বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখেছিলেন, "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে... জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?' এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।.....লোকের সকল জীবনের পরিশ্রমের এইশেষ ফল; এই একমাত্র সুফল।"...

সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই জীবন-জিজ্ঞাসা অনবরত তাঁকে অঙ্কুশবিদ্ধ করে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বীয় রূপরেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করেছে। ছাত্র-সুভাষ অনন্তের সন্ধানে একবার গৃহত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত মনের গহনে তাঁর মানসিক-আত্মিক সাধনা অবিচল ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। তারই বহিঃস্ফুরণ দেখা গেছে মাঝে মাঝে। তাঁর কৈশোর-জীবনে আত্মজিজ্ঞাসু মনের দরজায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, তাই তাঁর মানস-চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে, তাঁর অধ্যাত্মচেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর জীবনে

অজানার সন্ধানে দুর্গম পথে নিরুদ্দেশ-যাত্রার দুর্দম আবেদন তারই পরিণত ফল।

জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির মসৃণ পথ বার বার তাঁর কাছে অবারিত হয়েছে, বার বার সে-পথ প্রত্যাখ্যান করে তিনি দুর্গম পথকে আপন করে নিয়েছেন। সহজাত মেধার গুণে ভাল ছাত্রের শিরোপা তাঁর করায়ত্ত হলেও দুঃসাধ্যব্রত সাধনকেই জীবনের স্তরে স্তরে তিনি জয়মাল্যরূপে বরণ করে নিয়েছেন। যে মেধাবী ছাত্র স্কুলজীবনেই সহপাঠিদের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে দেশের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামকে সহপাঠিদের শ্রদ্ধার চোখে দেখাতে শেখালেন, যে ছাত্র কলেজের সহপাঠিদের বর্ণবিদ্বেষী অধ্যাপকের দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ইশারা দিয়ে যান এবং পরিণামে সে জন্য লাঞ্ছনাবরণে এগিয়ে যান, সেটা কী দুর্গমের পথে অভিযাত্রার জয়ের মহড়া নয়? কটকে র‍্যাভেন্‌শ স্কুলে শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মবিলয়ের দিন ১১ই আগষ্ট তারিখে ছাত্রদের গণঅনশনের নেতৃত্বে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ওটেন-পর্বই এখানে উল্লেখ করা হ'লো। তারপর মাত্র কয়েক মাস পড়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ স্থান অধিকার করেও অনায়াসে আই. সি. এস. পদমর্যাদার চাকুরীর আর্ষকণ উপেক্ষা করে দেশের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে যোগদানে দেশবাসীর এবং জাতীয় নেতৃত্বের উদ্বেলিত অভিনন্দন যাঁকে অভিভূত ক'রলো, সেটা কী তাঁর আগামী দিনের জয়ের সূচনা নয়? যে-মানুষ সেবার ও সংগ্রামের দীক্ষা দিয়ে দেশের তারুণ্যশক্তিকে আত্মদানের ও জনসেবার পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে দিলেন, যাঁকে দেশের তারুণ্যশক্তি যৌবনের যুবরাজরূপে গ্রহণ করে ধন্য হ'লো, জয়-পরাজয়ের নিরিখেও কী তার বিচার চলে?

আসলে হার-জিতের মাপকাঠিটা কী? জীবনের মসৃণ পথে সুখ-সমৃদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বারোহণ যাদের কাছে জয়ের মাপকাঠি, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা গতানুগতিকতায় মুক্তি পেলেই, অনেক পাওয়ার আত্মপ্রসাদে ভরপুর হয়ে পড়েন। আপস-রফার পথই যাদের অবলম্বন, তারা সে-পথের শেষে পাওনাটাকেই বড় মনে করেন। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেও সেই প্রশ্ন বার বার দেখা দিয়েছে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্য আরব্ধ বিপ্লবের বাঁকে বাঁকে। গান্ধীজী ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা। আর ভারতবর্ষে বিপ্লবের অবিসম্বাদী জনক ঋষি অরবিন্দ। কেউ কেউ লোকমান্য তিলককে সে-মর্যাদায় স্থাপন করতে চাইবেন। এ কথাও সত্য মহারাষ্ট্রে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ-প্রদর্শক, তিলকের ক্ষুরধার লেখনীই তাদের প্রভাবিত করেছে। কিন্তু অরবিন্দ চৌদ্দ বছর বিলেতে প্রবাসের পর পুণার পত্রিকা 'ইন্দু-প্রকাশে' 'New Lamps for the Old' শীর্ষক প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় সে-সময়কার কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, যার অনিবার্য পরিণতি সশস্ত্র সংগ্রামে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী সংগ্রামের পৃষ্ঠভূমিতে অরবিন্দের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জোয়ার বাংলাদেশে প্রবলভাবে প্রবাহিত হ'লো, ১৯০২ সালে যে-সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। আলিপুর বোমার মামলার পর বিপ্লবের জনক অরবিন্দ, ঋষি অরবিন্দে রূপান্তরিত হলেন। বিপ্লবী অরবিন্দের হার হ'ল, ইতিহাস কী এই অর্বাচীন সিদ্ধান্ত দেবে বিপ্লবী অরবিন্দের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়নে?

দেশের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে যোগদানের জন্য আই, সি, এস-এর চাকুরী প্রত্যাখান করে সুভাষচন্দ্র ১৯২১

সালের মে মাসে দেশে ফিরলেন আর দেশের বাইরে জাতীয়-স্বাধীনতার বিপ্লবের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করবার সঙ্কল্প নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে অন্তর্ধান করলেন। এই বিশ বছরে কারাবাস, নির্বাসন, শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে বিড়ম্বিত করেছে কিন্তু বিপ্লবের আপসহীন পতাকা সর্বদাই তিনি ঊর্ধ্বে উত্তোলিত রেখেছেন। এমন কী পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে গান্ধীজীর সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতে তিনি অবিচলিত থেকেছেন। ১৯২৮ সালের ক'লকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হলেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সেদিন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিকল্প নেতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। মাথা গুণতিতে সুভাষের প্রস্তাব সেদিন পরাজিত হলেও তাঁর নৈতিক জয় ছিল অবিসম্বাদী। গান্ধীজীর বুঝতে অসুবিধা ছিলো না যে সুভাষের প্রস্তাব বেশীদিন অগ্রাহ্য করা যাবে না। তাই পরের বছরই কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে জহরলালকে সভাপতি করবার পর, গান্ধীজী জহরলালকে বাগ মানিয়ে নিলেও সুভাচন্দ্রকে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি করেও তাঁকে বাগে আনতে পারেন নি; সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষহীন মনোভাব বজায় রেখে চলেছেন। যার প্রমাণ ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়কে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ। গান্ধী-বিরোধিতার জন্য অবশ্যি সুভাষচন্দ্রকে চরমমূল্য দিতে হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হ'ন। তার পূর্বে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃষ্ঠভূমিকায় জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম সাফল্যের জন্য ইংরেজকে ভারতত্যাগের জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম চরমপত্র দিতে জাতীয় নেতৃত্বকে বারবার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। পৃথক দল গঠন করে রামগড়ে ১৯৪০ সালে সারাভারত আপস-বিরোধী সম্মেলন বসিয়ে জাতীয় সংগ্রামে আর একটি বৃহৎ পদক্ষেপ জুড়ে দিলেন এবং শেষপর্যন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রায় গোপনে দেশত্যাগ করলেন, দেশের বাইরে জাতীয় বিপ্লবকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চূড়ান্ত পরিণতি দেবার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায় গান্ধীজী ইংরেজের আনুকূল্য করতে চেয়েছেন। কংগ্রেস ইংরেজের যুদ্ধ ও শান্তির উদ্দেশ্য নির্ণয়ের অপেক্ষায় রইলেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা-সাপেক্ষে যুদ্ধে সাহায্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া মুলতুবী রাখলেন। কংগ্রেসের মধ্যেও যুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলো, বিশেষ-ভাবে ১৯৪১-এর ২২-এ জুন জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের পর। সে সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের এক গোষ্ঠি, এই যুদ্ধকে ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধরূপে চিহ্নিত করে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহায়তায় ঝুঁকতে চাইলো কিন্তু অন্য গোষ্ঠির এবং দেশের জনমতের চাপে তা সম্ভব করে তুলতে পারলো না। জহরলাল ছিলেন এই গোষ্ঠির অন্যতম। অবশ্যি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে হিটলার-স্তালিন অনাক্রমণ চুক্তির সময় কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই গোষ্ঠির মধ্যে জার্মান ফ্যাসীবাদী-দের সঙ্গে রুশী কম্যুনিষ্টদের মৈত্রীতে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় নাই। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী নীতিকেই গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমটায় ১৯৪১-এর অক্টোবরে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে না এক পাই, না এক ভাই'-এর একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করে-বিনোবা ভাবে ছিলেন যার প্রথম সৈনিক—তারপর অনিবার্যভাবে ১৯৪২-এর আগষ্টে "ইংরেজ ভারত

ছাড়ো" সংগ্রামের ডাক দিলেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে ১৯৩৯-এর মার্চে ছয়মাসের চরমপত্র দিয়ে। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় বিপ্লবের যে অন্তিম পরিণতির দিকে দেশকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন, ১৯৪২-এর আগষ্টে গান্ধীজী ও কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত সে-পথে পা বাড়ালেন। এটা সুভাষচন্দ্রের হার না জিত?

নিরুদ্দেশের অভিযাত্রী সুভাষচন্দ্র চিরকালই দুর্গমের পথকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর নিজেরই ভাষায় এই পথে দেশবাসীকে ডাক দিয়ে তিনি বলছেন; "There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in the search of the unknown. In such a life there may be suffering, but there is joy as well; there may be hours of darkness, but there is also the hours of dawn. To this path, I call my Countrymen" আনন্দ-বেদনা-মথিত, আঁধারে-আলোয় চমকিত এই অজানা পথের দুর্গম যাত্রায়, সুভাষচন্দ্র জীবনের বীর্যবান পৌরুষের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছেন। দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মাসারিক এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সেনাবাহীনীর তৎকালীন অফিসার দ্যগল বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সব ঘটনা ইউরোপের পরিচিত পরিধির মধ্যেই ঘটেছে। লেনিনের কর্মকাণ্ডও সেই পরিচিত পরিধির মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে পরিবেশ, পরিস্থিতি সবই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবশ্য সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩-৩৪ সালে ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে সেখানকার বহু রাষ্ট্রনায়কদের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রস্তাবটি তাদের সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছিলেন। তবুও ১৯৪১-৪২-এর যুদ্ধরত জার্মানী-ইটালীতে ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অনুকূল অনুরণন তোলা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিলো না। তবুও জার্মানীতে পৌঁছবার এক বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই জার্মানীর হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে ১৯৪২-এর জানুয়ারীতে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া লিগেশন'-এর প্রথম বাহিনী গঠন করে ফেলেন। ১৯২৮ সালের ক'লকাতা কংগ্রেসে নিজের অধিনায়কত্বে সামরিক কায়দায় যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেছিলেন, ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া লিগেশনে'র বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা পেলো। কলেজ জীবনে অনন্তের হাতছানিতে গৃহত্যাগ করে গুরুলাভে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরবার পর কঠিন রোগশয্যা থেকে আরোগ্য-লাভের সময় স্বাধীন ভারতের, স্বাধীন সেনাবাহিনীর যে স্বপ্ন সুভাষচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করেছিলো, সে স্বপ্নও সার্থক হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের জন্য অন্য কোন নেতাই এই ধরণের দূরদর্শিতার কোনোও পরিচয়ই দিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে, ক'লকাতা কংগ্রেসের সামরিক কায়দায় গঠিত স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীকে উপহাস করে কোনোও নেতা সেই বাহিনীটাকেই 'ফিলিপস্ সার্কাস' বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। ১৯৪৩-এর আগষ্টে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ বাহিনীর পূর্ণতমরূপ দান এবং সে-বছর অক্টোবরে আজাদহিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা, সুভাষ-চন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে ইতিহাস ১৯২৮ সালে সামরিক কায়দায় গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে 'ফিলিপস্ সার্কাস' রূপে উপহাসের জবাব দিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ সরকার এবং আজাদ বাহিনীর ভূমিকায় ছেদ পড়লো। কিন্তু ১৯৪৫-এর নভেম্বরে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ বাহিনীর তিন অধিনায়কের বিচারের সময় আজাদহিন্দ বাহিনীর শৌর্য-বীর্য-আত্মদানের কাহিনী বিদ্যুচ্ছটার মত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শকে ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্বের আসনে স্থাপিত করলো। '৪২-এর বিপ্লবের পর ঝিমিয়ে-পড়া জাতীয় জীবনে, আজাদহিন্দ বাহিনীর কীর্তিগাঁথা অভূতপূর্ব্ব গতিবেগ সঞ্চারিত করলো, যার ফলে ইংরেজ পরিচালিত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সকল শাখার সর্বস্তরে স্বাধীনতার স্পর্ধিত আবেদনে ত্রস্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দ্রুত ভারত ত্যাগে বাধ্য হ'ল। কিন্তু বিদায় নেবার পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার হানাহানিতে কলুষিত করে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে খণ্ডিত-ভারত রেখে গেলো, জাতীয় নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে। এমন কী গান্ধীজীও দেশবিভাগের প্রবল বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির চূড়ান্ত অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধি-দের কাছে দেশ-বিভাগের পর ক্ষমতা গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, তাকে অনু-মোদনের সুপারিশ করে কার্যত নৈতিক পরাজয় বরণ করে নিলেন। সুভাষচন্দ্র এখানে অনন্য। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেশ-বিভাগের বিরোধিতার জন্য জাতীয় নেতৃত্বের কাছে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গেছেন। দূরদর্শী সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে দেশ-বিভাগ করে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। দেশ-বিভাগ ছিল সে সময় অন্যান্য নেতার স্বপ্নেরও অগোচর। আর তারও দুই বছর পর ১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তানের' প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হার-জিতের ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ-দৃষ্টি এই মহাবিপ্লবী, মহাসাধকের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল : 'আমার যে সব দিতে হবে'। পরার্থপরতায়, জনসেবায়, স্বাধীনতার জন্য আত্মদানে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া ছিল সুভাষচন্দ্রের চারিত্র্যশক্তির উপাদান ; হার-জিত দিয়ে যাকে পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা। ১৯৪৪-এর আগষ্টে ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদহিন্দ বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর ব্যাকুল এক সেনাধ্যক্ষ নেতাজীকে প্রশ্ন করলেন : 'যুদ্ধে তো পরজায় সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, আর যুদ্ধ করবার রইলো কী?' নেতাজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন : "To pay the price of India's liberty"—'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিয়ে যেতে হবে।' কয়েকমাস পর সেই সেনাধ্যক্ষর কাছে একই বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন "....Whether we live and work or whether we die fighting, we must under all circum-stances, have complete confidence that the cause for which we are striving is bound to triumph. It is the finger of God that is pointing the way towards India's freedom. We have only to do our duty and to pay the price of India's liberty"—আমরা বেঁচে থেকে কর্ত্তব্য পালন করি কিম্বা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করি, সকল অবস্থাতেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে আদর্শে পৌঁছবার জন্য আমরা তার প্রতি অবিচল

আস্থা নিয়ে চলেছি, তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি বিধাতার অমোঘ ইসারা আমাদের পরিচালিত করছে। আমাদের কেবলমাত্র কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিয়ে যেতে হবে। আদর্শের জন্য সর্বস্বপণ সংগ্রামের পথে নেতাজীর যে চারিত্র্যশক্তি বিকশিত হয়েছিলো, তারই মধ্যে নিহিত ছিল একটি পরাধীন জাতির শৃঙ্খলমোচনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণার অবাধ অধিকার। সেই কারণেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদহিন্দ বাহিনীর যুদ্ধ ঘোষণায় উদ্দীপিত হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর এশিয়া ও আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের আঘাতে বহু সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলো। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের পক্ষ সমর্থন করে সামরিক বিচারালয়ে সেদিনকার কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীভূলাভাই দেশাই পরাধীন জাতির শৃঙ্খলমোচনের জন্য যুদ্ধঘোষণার মৌলিক অধিকারটি বিবৃত করে বলেছিলেন: "What is on trial before the court now is the right to wage war with immunity on the part of a subject race for their liberation." সুভাষচন্দ্রের চারিত্র্যশক্তি পরাধীন জাতির এই মৌলিক অধিকারটির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, আজাদহিন্দ বাহিনী তারই বাহক। স্বাধীনতার বেদীমূলে সর্বস্ব সমর্পণের আত্মিক মাধুর্য কিপলিং-এর একটি ভাষান্তরিত কবিতার ছন্দে, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে প্রায়ই গুণগুনিয়ে উঠতে শোনা গেছে। কবিতাটিতে বলা হচ্ছে:

আমাদের সকলের সম্মুখে একটিই মাত্র
কর্তব্য রয়েছে;
প্রত্যেককেই একটি মাত্র জীবন দিতে হবে।
যদি স্বাধীনতার অবসান হয়, তবে রইলো কী?
যদি ভারতবর্ষ বেঁচে থাকে, মৃত্যু হবে কার?

—"There is but one task for all
one life for each to give.
What stands if freedom fall?
who dies if India live?

সুভাষ-চরিত্রের উপাদানের এটাই হল মর্মবাণী, হার-জিতের সংকীর্ণ পরিধির ঊর্ধ্বে ইতিহাসে যা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জয় হিন্দ্

"In this mortal world, everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives"

NETAJI

আসিবেনা তুমি। সমর গুহ

আসিবে না ফিরে? হে পথিক হে দুর্নিবার?
কী প্রতীক্ষায়, কী বেদনায় জেগে আছে জননী তোমার।
কবে সেই বহ্নি-বন্যা অকস্মাৎ জয়ধ্বনি করি
বজ্ররোলে দেবে ডাক—বাজিবে দুর্জয় ভেরী
ভেসে যাবে কলুষের জীর্ণ জরা ভাঙ্গি চারিধার
তারি প্রত্যাশায় অনির্মেষ আঁখি জননী তোমার।

নাগিনীর অট্টহাসি বিকট নিঃশ্বাসে
তীব্রজ্বালা বিষাক্ত আঘাতে কত প্রাণ ক্লান্ত হয়ে আসে।
প্রেতের দানব নৃত্যে কী উল্লাস কী ব্যাভিচার
কী ক্রন্দন। শুনিবে না তুমি দগ্ধ জীর্ণ শত আত্মার
কলুষে কলুষে ক্ষিন্ন জ্বালা কত প্রাণ মূহ্য হাহাকার?
চেয়ে দেখো, আনত নয়নে কাঁদে, জননী তোমার।

হে রুদ্র, হে তাপস, ধ্যান ভাঙ্গি দাও ডাক
তোমার তাণ্ডব হুংকারে সব ভেঙ্গে যাক,
বহ্নিস্রোতে উঠুক আহ্বান দীপ্ত দুর্ণিবার
নাগিনীর লালসায় লাগুক আগুন। জাগুক আবার
মৃত্যুঞ্জয়, চিরঞ্জয় অশান্ত সহরী অভয়ংকর বাণী
স্মিত হোক শীর্ণ আঁখি তোমার জননী।

কতকাল মগ্ন রবে সমাধি বিলীন?
মন্থনের আবর্তে আসুক প্রলয়ের দিন
ভেসে যাক কলংকের পঙ্ক ছায়া,—আঁখি মেলি চাও
নতুন অংকুরে জাগুক সুবর্ণ আশা, তারি ডাক দাও।
জননীর বাণী তব সত্য হোক। সত্য হোক নব অভ্যুদয়।
জাগো তুমি, জয়রথে এসো ফিরে হে পথিক হে জ্যোতির্ময়।

কিন্তু এ স্বপ্ন কি সত্য হবে? আশা-
নিরশার দোলায় কত কাল গেল,
তবু স্বপ্ন যেন স্বপ্নেই বিলীন, এ বেদনা
আমার, তোমার, সবাকার, শুধু
বিধাতাই জানেন কি উত্তর।

আগষ্ট, ১৯৭৬
রোহতক জেল
হরিয়ানা

My Association with Netaji Subhas Chandra Bose

V. V. Giri

I am happy to have been asked to contribute to a special number of Jayashree on the occassion of his birthday in January.

"The Red Fort indeed occupies a pride of place in the annals of INA. To Netaji, unfurling the National Flag on this Fort symbolised India's freedom. The March of INA through the jungles of Burma with the slogan "Delhi Chalo" stirred India deeply. Netaji's clarion call on the eve of INA's march into Indian soil found an echo in every patriotic heart who can forget the immortal words of Netaji I quote (India is calling). India's metropolis Delhi is calling. We have no more time to lose. There, in front of you, is the road, that our pioneers have built. We shall march along that road. We shall carve our way, through the enemy's ranks, or if God wills, we shall die as martyrs. And in the last sleep, we shall kiss the road, that will bring our army to Delhi. The road to Delhi, is the road to freedom. Onward to Delhi."

I congratulate the Azad Hind Fauj Association, on its determination to spread Netaji's ideology among the people. More than ever before, today the country needs the message of unity and purposeful action taught by Netaji. I am sure the birthday celebrations will remind our people of the life and work of this eminent son of India. I deem it a great privilege to have enjoyed Netaji's friendship. He was a valued comrade and a leader of the Freedom Movement. In the organization of the Working Classes, we stood shoulder to shoulder with the sole thought of making India free and to assure everyone equality of opportunity. In the Trade Union Movement, in the twenties, we worked together, whether it was in organising the labour in the mines, steel industry or in the Railways. I recall to my mind his spirit of selflessness, patriotism, discipline and dedication, In the many fields of nation-building activity that we worked together. I found him to be a real leader of men devoting every minute to the political freedom and economic salvation of the people.

In 1938, when I was Minister of Madras under Provincial Autonomy I felt that only through Planning we could make India a real Socialist State and I approached Netaji who was then the distinguished President of the Indian National Congress. Subhas himself was thinking along these very lines and his response was spontaneous. He encouraged me in every possible way and extended in full

measure his co-operation. We got the support of Sir M. Visweswarayya, of revered memory, and thus we formed a Provisional National Planning Committee, as a preliminary step to the formation of the All India National Planning Committee. As President of the Indian National Congress, Netaji secured the blessings of the Congress Working Committee in July 1938 at Wardha. Thereafter, he presided over the Conference of the Industries Ministers of the Congress Provinces held at Delhi in October 1938 to evolve a scheme for planning industrial development of India. After the spade work was over, Subhas felt that Pandit Jawaharlal Nehru's Chairmanship of the Planning Committee would get together all sections and thus render the functioning of the committee more effective and he wanted me to cable Panditji, who was then in U.K., requesting him to accept the position. Subhas relegated himself to the background : in all probability it may be, he had a premonition that his future activities would take him beyond the shores of India.

The very remembrance of Netaji, originator of the magical words "Jai Hind" conjures up in our minds the visions of the sage of the supreme sacrifice and the epochmaking deeds of the INA functioning under the Provisional Government of Azad Hind. The heroism of the INA commanded by Netaji will ever remain enshrined in letters of gold in the annals of India. Indeed, Netaji's life reads like an epic. He undertook all these activities unmindful of the grave risks and the consequences involved. He was a firm believer in the maxim enunciated by Lord Krishna in the Bhagwad Gita : "Action is superior to inaction." Netaji thus played a pivotal role during a very crucial phase of India's historic march towards national liberation. The emergence of the Indian National Army may be reckoned as a significant landmark in India's struggle for Independence, and it was, indeed, a part of the freedom movement. By creating a rather demoralising influence on the British Army, the INA produced a salutary impact on the tempo of our freedom fight. The British felt that once the loyalty of the Army was disturbed, the British Raj which depend on the military strength would give way.

We salute this great soldier of India's freedom struggle. His valour and courage will always remain an inspiration for generations to come. The best tribute that we can pay to the memory of Netaji, is to forge unity and strength in our country and make India achieve its rightful place in the comity of Nations. JAI HIND.

Economic Planning of Netaji Subhas & Role of Public Sector in India

B. K. Saha

Netaji Subhas Chandra Bose is a symbol of flaming patriotism and dynamism. His life and message is an inspiration for generations to come.

By the magnitude of his conception, by the examples of his burning zeal, his tenacity, his personal courage and sacrificial patriotism, Subhas Chandra Bose imbibed thousands to fight for freedom of the country.

Not only he fought for the freedom of the country but also moved ahead for reconstruction and development of the country. By appointing a planning commission, he ushered in a new era in the Industrial Horizon of India. Subhas Chandra Bose first advocated for National Economic Planning in his presidential address at the Haripura Congress in 1938. Planned economic development or National Planning was by then introduced only in Soviet Russia and Nazi Germany. The most progressive Congress President recognised the fundamental problems of the country—poverty, unemployment, national defence and other economic hurdles and came to the conclusion that the emancipation of the teeming million of Indians would come only through the planned development of the country on socialistic lines.

Immediately after Haripura Congress he launched a strong propaganda in favour of national planning. He emphasized in the student conference at Lucknow the problem of reconstruction after the attainment of Swaraj and declard that real work would begin only after swaraj was achieved.

He declared in the conference of the industrialists at Bombay that India would have to be pragmatic and would be developed in keeping with developments in other advanced countries of the world.

He said, "A systematic planning was essential for ordered progress and the congress had therefore set before itself this task as is done in all progressive countries of the world like Russia and Germany."

It was suggested to Subhas Bose by some leaders to make Sir M. Visveswarayya as the Chairman of the planning committee. But he wanted to make

he economic planning mass-based and nass-appealing. So he made Pandit awharlal Nehru, the Chairman of the National Planning Committee.

Not only he appointed National Planning Committee but also chalked out the industrial policy which will be followed by the Planning Committee and the National Govt. He declared he path which is to be followed in the reconstruction and rejuvenation of the country.

He said "We can at best determine whether this revolution, that is Industrialisation, will be comparatively gradual one, as in Great Britain or a forced march as in Soviet Russia, I am afraid it has to be a forced march n this country."

In order to ameliorate and uplift he lot of the teeming millions of India, ie declared in the Haripura Congress :

"Moreover, if after the capture of political power national reconstruction akes place on socialistic line, as I have no doubt it will, it is the have-notes who will benefit at the expense of the naves and the Indian masses have to be classified as the have-nots".

In order to raise the standard of iving of the masses of India, he declared in the third session of Science News Association :

"Our salvation lies in increased productivity per head and in equitable distribution of the benefits of such increased productivity so that the have-nots are really benefitted."

On analysing the above declarations of Subhas Chandra Bose we find that he wanted

(1) Forced march---rapid industrialisation to ameliorate and uplift the lot of the teeming millions of India.
(2) Such rapid industrialisation can only be executed by the State on socialistic lines.
(3) Equitable distribution of the fruits of industrialisation for the benefit of the teeming millions of India can be achieved through State Projects or Public Sector in all basic, strategic and infrastructure industries.

In the light of the socio-economic objectives chalked out by Subhas Chandra Bose, Govt. of India in its industrial policy framed in 1948 and modified in 1956 decided to set up Public Sector Enterprises in India to achieve the following objectives :

(1) To promote self-reliance in strategic and national defence.
(2) To develop basic, mineral, communication industries on forced march as rapidly as possible.
(3) To provide infrastructure facilities for promoting a balanced and diversified development in all spheres of national economy.
(4) To prevent concentration of eco-

nomic power in the hands of a few persons.

(5) To avoid lopsided development and to reduce regional disparities.

(6) To create quick employment opportunities.

(7) To generate and plough back the profits/surplus for more and more investment and employment.

At the time of attaining independence, India had very little investment in public sector. India has also not started public sector by nationalising private industries as in Great Britain but we have set up new industries in public sector on socialistic pattern.

From a small investment of Rs. 290 million in 1951 in public sector, the investment has increased to Rs. 24,150 million in 1966 and Rs. 62,370 in 1973-74. We hope by this time our investment in public sector has increased to Rs. 80,000 million.

Public sector industries were set up mainly in core and basic industries like steel, heavy engineering, transportation and mining equipments, petroleum, chemicals, pharmacuticals, paper, cement and all defence and strategic materials.

The following table will show the significant development made by Public Sector in India :

Rupees in million

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
1. Investment	43,010	46,820	50,520	55,710	62,370
2. Turnover	29,960	33,090	39,740	52,990	67,770
3. Gross Profit (before payment of interest & tax)	1,390	1,460	1,725	2,450	2,730
4. Net Profit (before tax)	140	200	220	830	1,449
5. Net profit (after tax)	(−) 50	(−) 30	(−) 190	180	640
6. Internal Resources (generated)	1,940	2,040	2,150	2,600	3,870
7. Return on Capital %	·42	·39	·39	·51	·52
8. Employment (in million)	·613	·660	·701	·932	1·310

It is evident that the investment in public sector has been increasing steadily. Production, though lacking behind schedule in the initial stages, has now picked up.

We are following the path of mixed economy. Private Sector in India need not be afraid of public sector. In fact public sector in India is the generator of private sector. The tremendous investment made by the public sector in steel, minerals, power generation, fertilisers, petroleum, water

[Continued on page 571]

সে মি না র

'Relevance of the ideology of Subhas Chandra to-day'

বর্তমানে সুভাষ ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা

দক্ষিণ কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের যৌথ উদ্যোগে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটেয় শিবানন্দ হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। আলোচনার উদ্বোধন করেন সুনীল দাস। আর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক অমূল্য ভূষণ সেন অধ্যাপক সমর গুহ, পবিত্রকুমার ঘোষ, নন্দ মুখোপাধ্যায়, ও ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ।

আলোচনার উদ্বোধন কবতে গিয়ে সুনীল দাস বলেন :

"ভারতীয় বিপ্লব প্রতারিত হয়েছে। তার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষে বর্তমান সর্বাত্মক সঙ্কট। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দের সদস্যরা ও সেনাবাহিনীরা ভুলে গিয়েছিলেন, কে কোন সম্প্রদায়ের, কার কোন জাত। কিন্তু প্রাতাবপ্লবের রন্ধ্রপথে জাতীয় বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেলো এবং জাতায় সত্তায় ফাটল ধরিয়ে মাতৃভূমির ভাগবতসত্তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো—"Our Divine Motheriand shall not be cut up"—১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করে—সেই সঙ্গে বিপর্যস্ত হোলো বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের দুর্জয় সংগ্রামে অর্জিত মুল্যবোধের অক্ষয় সম্পদ। গত ২৭ বছরে সেই বিপর্যস্ত মুল্যবোধ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, দুর্নীতির কলরোলে দেশ মুখরিত। মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্কের স্থলবর্তী হয়েছে হিংস্রতা, নির্মম শোষণে অগণিত মানুষ দারিদ্র্য বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে, আর সন্ত্রাসে আর হত্যার শিকার হয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামোত্তর যুগে—all privileges, distinction and vested interests will have to be abolished, so that a reign of perfect equality may be established in our Country". কার্যত তার বিপরীত হয়েছে। পরিখার দুই পাশে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের নামে যারা শাসন করছেন এবং যারা তাদের বিরোধিতা করছেন উভয় পক্ষই দরিদ্রের বঞ্চনা, পীড়ন, লাঞ্ছনায় দিনগুলি দীর্ঘায়িত করছেন। ভারতবর্ষে ১৮শ শতকের ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন বিশৃঙ্খলতা দেখা দিতেপারে যদি ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামোত্তর নেতৃত্ব, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন—এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র।

সমসাময়িক পরিস্থিতিতে বর্ত্তমানের অনৈতিকতা, আবিলতা, স্থূলতা, আত্মসর্বস্বতা এবং শুধুমাত্র বর্তমানকে স্বীকার করে নৈতিক মূল্যবোধের ধ্বংসযজ্ঞে মত্ত হয়ে জাতীয় জীবনে ভয়াবহ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সুভাষ-চন্দ্রের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আদর্শে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এসেছে কিনা সেটাই আজ বিচার করতে হবে। এই দায়িত্ব বর্তেছে বিশেষভাবে দেশের তারুণ্যশক্তির উপর, যারা যুগে যুগে আদর্শের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করে এসেছেন। যুবশক্তি আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এলে বুঝতে হবে, দেশে সবার অলক্ষ্যে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রতারিত অসমাপ্ত ভারতীয় বিপ্লব সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাবে কিনা, সে-প্রশ্নেরও মীমাংসা হবে সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লাবক জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

ভারতবর্ষের সীমান্তের কাছাকাছি কোনো আন্তর্জাতিক সংঘাত দানা বেঁধে উঠলে সে সংঘাতে লিপ্ত দেশগুলি ভারত-বর্ষকে নিজ নিজ শিবিরভুক্ত করতে উদ্যোগী হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাই ঘটেছিল। একদিকে ইংরেজ ও সোভিয়েত রুশ এ-বিষয়ে অগ্রণী ছিল, অন্যদিকে জার্মানী ও জাপান। সেই সঙ্কটে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে, বৈদেশিক শক্তিগুলির শিবির থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখার জন্য বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী ভারতের তৃতীয় শিবির গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন আর দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ আঘাত হানবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সেদিন ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩ সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—'We the Indian people, waited all our life for an international crisis of this sort, are determined to make the fullest use of this opportunity for achieving the final emancipation of our country.' এবারকার সম্ভাব্য সংঘাতের মুখেও সময় থাকতে ভারতীয়ত্বের শিবিরের বনিয়াদ তৈরী করতে হবে। সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা, সমকালীন জাতীয় সঙ্কটে দেশের মানুষের কাছে এই ইশারা বহন করে আনছে।"

১. বক্তা : ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বভারতী

এই সভার আলোচ্য বিষয় ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে, 'Relevance of the ideology of Subhas Chandra to-day.' তার বাংলা প্রতিরূপ ভাবতে গিয়ে বিব্রত বোধ না করে উপায় থাকেনি। বাংলা, তথা ভারতবর্ষ জুড়ে কূটনীতি আর কারচুপির চাপে কথারও কালোবাজারি চলেছে ; আর কালোবাজারে সবকিছুরই দাম আকাশ ছোঁয়া ; কথার দাম কেবল এসে ঠেকেছে তলানিতে। সুভাষচন্দ্র একসময়ে বলেছিলেন, 'আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটি বাণী প্রচারের জন্য।'[১] জীবনের মূলীভূত উদ্দেশ্যকে শব্দার্থের বাহনে মর্মে সঞ্চালিত,—চেতনায় আন্দোলিত করে তোলাই ভাষার দায়িত্ব। একালের উদ্দেশ্যরহিত লাভ-লোভাতুর কেবল-কথার বেসাতি ভাষার মূল হতে শব্দার্থ-মথিত সেই 'বাণী'-শক্তিকে হারিয়ে বসে আছে। এমন পরিবেশে প্রথমেই ঠেকতে হল 'ideology' কথার বাংলা খুঁজতে গিয়ে।

অনিল রায় প্রায় তিন দশক আগে 'চিন্তাধারা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন[২] ; সার্থক সে প্রয়োগ আজও সুপ্রচলিত, অথচ আজ তা কত অর্থহীন! চিন্তা' শব্দের মূলে উপলব্ধি আর মনন-গভীরতার যে অনিবার্য দ্যোতনা রয়েছে, আমাদের নির্মূল ভাবনা থেকে একালে তা অন্তর্হিত। শহীদমিনার-তলার স্ফীতবাক শারীরিক কসরৎ থেকে গড়ের মাঠের এ-পার-ওপারে রম্যতা-বিলাসী জনসংঘট্টের স্তরে স্তরে 'চিন্তাধারা'র যে বিকাশ প্রতিনিয়ত দেখি, তারপরেও সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে ঐশব্দটির প্রয়োগ অসাধ্য হলে আপনারা আমায় মার্জনা করুন। আর 'আদর্শ' তো আজ বক্তৃতা-ব্যবসায়ীর অতি, আর অপ-প্রয়োগে অসাড় নিঃস্পন্দ!

এই অ-স্বাভাবিক প্রতিবেশে নিজের কথার রূপ-রেখাটি ছকে নিতে হয়েছে নিজের মনে ; তাছাড়া বিজ্ঞাপিত বিষয়ের বিস্তার এবং গভীরতাও তো একটি মাত্র আলোচনার পক্ষে দুস্তর হতেই পারে! আমি আজ তাই কেবল ভাবতে চাইব 'সাম্প্রতিককালে সুভাষচন্দ্রের ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা।' 'ভাবাদর্শ' শব্দে ভাবালু কাব্যগন্ধিতা আর মেরুদণ্ডহীনতা প্রকটতর হতেই পারে। তবু অভিধান ঘেঁটেও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রযোজ্য এর চেয়ে সার্থক 'বাণী' আর কিছু খুঁজে পাই নি। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভাব' শব্দের একটি অর্থ নির্দেশ করেছেন 'অন্তঃকরণধর্ম'[৩] ; আর ব্যুৎপত্তি-সূত্রেই 'আদর্শ' মানে হল 'আয়না' ; যার মধ্যে ঐ অন্তঃ-

(১) সুভাষচন্দ্র—'তরুণের স্বপ্ন (১৯৭০) পৃ ৯।
(২) অনিল রায়—'নেতাজীর জীবনবাদ (১৯৫৩) পৃ : ৭৬।
(৩) দ্র, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়-বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৬৭) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ১৬৭১।

করণের ধর্মের প্রতিবিম্বটিকে অনাড়ষ্ট স্পষ্টতায় প্রত্যক্ষ করতে পারি।

মনে করে দেখুন, বয়ঃসন্ধিপীড়িত তরুণের অসহ্য অন্তর্দাহের স্মৃতি:—'এমন একটা আদর্শের তখন আমার প্রয়োজন ছিল, যার উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব—এমন একটি আদর্শ খুঁজে বার করা সহজ ছিল না। প্রধান শিক্ষক মশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক বোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেন নি, যা আমার সমগ্রসত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।'[৪] আমরা সবাই জানি, সেই দুর্লভ 'সাধন-ধন' তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু এখানে সব কিছু ছেড়ে লক্ষ করব, সুভাষচন্দ্রের পক্ষে 'আদর্শ' কেবল সৌন্দর্যবোধ বা নীতি-চেতনার অনুপ্রেরকমাত্র নয়,—'সমগ্র সত্তা'র মন্থনজাত 'অন্তঃকরণ ধর্মে'র সার সত্য, অন্যত্র যাকে বলেছেন—এক 'অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য, আমাদের ব্যর্থ জীবনকে যা 'সার্থক করিয়া তোলে',—'ধ্যানের দ্বারা কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা'[৫] তাকেই সুভাষচন্দ্র আবিষ্কার করতে চেয়েছেন নিজের মধ্যে। এই অন্তরঙ্গ 'অন্তঃকরণ ধর্মে'র অনুধ্যান আবিষ্কার ও প্রযুক্তিই সুভাষচন্দ্রের 'ideology'র সত্য স্বরূপ; অভিভূতিকর কেবল-কথার কোনো তরঙ্গ-প্রবাহ নয়।

এইসব ভাবনা সূত্রেই সুভাষচন্দ্রের 'ভাবাদর্শ'টুকু খুঁজতে বেরিয়েছি আজ। একালের পরিভাষায় তাকে 'মূল্যবোধ' বলাও যেতে পারত। মাছ যেমন জলে বাস করে, বিশেষার্থে মানুষেরও অধিবসতি তেমনি তার ভাবাদর্শের গহনে, অন্তঃকরণধর্মে কিংবা স্থায়ী মূল্য-চেতনায়। মানুষের সকল ভাবনা, উদ্যম, কর্মের তাৎপর্য ঐ মূল্যবোধের নিরিখেই। 'ওথেলো' নাটকে প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেও নায়ক ওথেলো আমাদের সমান্তরিকতা-(ampathy)-ভাজন, অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-স্পৃহাতুর আয়াগো হল অবিসংবাদী দুর্বৃত্ত। অনুষ্ঠিত কর্ম নয়, তার মূলনিহিত 'অন্তঃকরণধর্মে'র অনুসারেই এই চরিত্রের মানবিক-মূল্যায়ণ!

আর মৌল স্বভাবে সুভাষচন্দ্রের 'অন্তঃকরণ ধর্ম' প্রধানত ছিল তিনটি উপাদানে গড়া;—(১) প্রাচ্য প্রকৃতি (২) অভিব্যক্তি-সচেতনা এবং (৩) আধুনিকতা-গ্রহ। আসলে এ-সবই অভিন্ন ব্যক্তিত্বের গভীরে সংবৃত এক অখণ্ড অস্তিত্ব—যে ত্রিধাতুতে গড়া একই সাধনপীঠ। কেবল 'ভাবাদর্শে'র চরিতার্থতা সাধনে নয়, সামগ্রিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রেও সুভাষচন্দ্র স্বামিজীর অনুশাসনে ছিলেন স্বভাব-বৃত; গুরুর মতই অন্তরধর্মে তিনি দর্শনের ছাত্র—দার্শনিক; আচরণে অক্লান্ত অনাবিষ্ট কর্মযোগী, আর পরিণামী জীবন-সত্যের সন্ধানে অতন্দ্রতপস্বী। প্রবল-প্রবাহিত এই ত্রিস্রোতা আত্মশক্তির জারক রসে জারিত হয়ে সুভাষ-চন্দ্রের 'অন্তঃকরণধর্মের' সকল উপাদান এক অখণ্ড সত্তা ও সত্যের দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল তাঁর জীবনে—ভাবে ও সংগ্রামে।

প্রাচ্য প্রকৃতির প্রতি অবিচল আস্থার 'বাণী'টি আযৌবন পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে তাঁর কথায়, এবং কর্মেও। 'তরুণের স্বপ্ন'-তে বার বার বলেছেন, 'ভারতের একটা বাণী আছে', ভারতের শিক্ষা বিশ্ব-

(৪) সুভাষচন্দ্র—'ভারত পথিক' (১৩৫৫) পৃ: ৪২-৪৩।
(৫) দ্র: সুভাষচন্দ্র—'তরুণের স্বপ্ন' পৃ ৯।

মানবের দরবারে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত 'বিশ্বসভ্যতার প্রবৃত উন্মেষ হবে না,' ঐ সূত্রেই এসেছে ভারতের বিশেষ 'mission'-এর কথাও[৬];—এই প্রাথমিক ভাবনা একেবারেই যেন বিবেকানন্দ বাণীর প্রত্যুচ্চারণ। তাতেও কিছু এসে যায় না; গুরুকে আসলে স্বী-কৃত (assimilate) করেছিলেন সুভাষচন্দ্র নিজের প্রবণতা ও সাধনার অনুমত করে। তারই ফলে টোকিও-বক্তৃতাতেও বিশ্ব-ইতিহাসের অশ্বারোহী সংগ্রাম-প্রদীপ্ত কণ্ঠের অবিচল ঘোষণা শুনি—'আমরা আমাদের নিজস্ব পথেই কাজ করতে চাই। স্বভাবতই আমরা অন্যান্য দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুধাবন করে দেখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতীয় পারিপার্শ্বিকতার অনুযায়ী ভারতীয় পন্থায়।'[৭]

এই ভারতীয়, তথা প্রাচ্যপন্থার চরিত্র রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছিলেন—এমনকি প্রতীচ্য প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেই—'...য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র।.... পূর্ব-দেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্য-তন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে।' বস্তুত রাষ্ট্রতন্ত্রী য়ুরোপ জীবনটাকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তাই ধর্মসাধনার দিন রবিবারটি তার জীবনে কর্ম্ম-সম্পর্কচ্যুত; য়ুরোপে ধর্ম-কর্মের মিল হল না কখনো; আর ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যভূমিতে ধর্মই কর্ম; কিংবা কর্ম ধর্ম। য়ুরোপ বিচ্ছেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রে বিরোধকে ডেকে আনে জীবনে; প্রাচ্য দৃষ্টির সকল সাধনা সমন্বয়মুখী। এই সমন্বয়ী ভারতীয় প্রকৃতিই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রথমতম অন্তঃকরণধর্ম—'জীবন এক সামগ্রিক সত্তা।....মানুষের জীবনকে কক্ষ-উপকক্ষে বিভক্ত করা অসম্ভব'[৯] এই প্রত্যয় ছিল আজীবন তাঁর পথের দিশারি। রাজনীতিক সংগ্রামও তাঁর কাছে তাই সামগ্রিক জীবন সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অভিব্যক্তি।

সমন্বয়ী সামগ্রিক চেতনা আর বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব-পার্থক্য মানবজীবনে স্বতঃস্ফূর্ত। বিবেকানন্দের কথাই স্মরণ করুন আবার; 'সাম্য' এবং বিশ্ব-'সৌভ্রাত্র্যে'র আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকেই প্রতীচ্য পৃথিবীতে আগুনের হল্কার মত মুখে মুখে ফিরে আসছিল। তবু আরো একশো বছরেরও পরে ঐ অগ্নিগর্ভ ভারতীয় সন্ন্যাসীর কণ্ঠে 'ভ্রাতা ও ভগিনী' শব্দ দুটি মাত্র শুনে বৃহৎ প্রতীচ্য ভূমণ্ডল অমন আ-চেতন উল্লাসে ফেটে পড়েছিল কেন? সে ঐ ভারতীয় প্রত্যয়ের অমোঘ ঝোঁকের—অভাবিতপূর্ব emphasis-এর বশে। বিবেকানন্দ সেদিন তাঁর তপস্যাপূত 'বাণী'-শক্তিবশে আমেরিকা-বাসীর আত্মাকে স্পর্শ করেছিলেন—তাঁর কণ্ঠে সেদিন ছিল আত্মিক সম্বোধনের পরিভাষা।

একালেও অসাড় কণ্ঠে আমরা থেকে থেকে উচ্চারণ করি, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। আধ্যাত্মিকতা শব্দের অর্থ জীবন-বিমুখ ঈশ্বর-মনস্কতা নয় কিছুতেই; অধ্যাত্মমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মুমুক্ষু বিবেকানন্দের প্রাথমিক তিরস্কারে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

(৬) দ্র: সুভাষচন্দ্র—তদেব, পৃ. ১৫, ১৬।

(৭) Subhas Chandra Bose—Fundamental Questions of Indian Revolution (Tokyo University Speech) P. 80,

(৮) রবীন্দ্রনাথ—'সমাজভেদ' (স্বদেশ) র.র. (বি) ১১—পৃ: ৪৮৫

(৯) Selected Speeches of Subhas Chandra Bose (1962) P. 53 (অনুবাদিত)

বস্তুত 'অধি' অর্থাৎ গভীরভাবে যা আত্মার সম্পর্কিত—তথা 'আত্মিক', তাকেই আধ্যাত্মিক বলব। আর মানুষের মধ্যে দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সমবেত সমন্বিত পরিণাম, এবং এই সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে থেকেও তদতিরিক্ত যে সত্তা আমূল মানুষকে ধারণ করে রয়েছে, তাকেই বলি আত্মা। ভারতবর্ষীয় সাধনার পাদপীঠ হতে তপস্বী বিবেকানন্দ সেই আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন, এবং প্রতীচ্য আত্মার সাড়া পেয়েছিলেন সেদিন। এই দেওয়া এবং পাওয়াই ভারতের নিজস্ব পন্থা; সুভাষচন্দ্রের সকল কর্মযজ্ঞের মূলে এই ভাবাদর্শই ছিল প্রথম প্রেরণা; অন্তঃকরণ-ধর্মে তিনি এক আপোষহীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী।

কিন্তু সেই একই সঙ্গে তিনি প্রবল আধুনিকতা-গ্রহীও। আধুনিকতার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, কার্য-কারণমূলক দৃঢ় বিচার-বুদ্ধি-সূত্রে যার উৎসার। সুভাষচন্দ্র 'সাম্যবাদী সঙ্ঘ'র পরিকল্পনা করেছিলেন ১৯৩৩-এই; আর সেই সঙ্ঘের 'নীতিশিক্ষা সমর্থ' কর্মি-দলের কাছে দফায় দফায় বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দাবি করেছেন পুনঃ পুনঃ[১০], সাম্প্রতিক ভারতের অধঃপতনের কারণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিকাশের প্রতি তার অন্ধ অনীহা'[১১]; জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন, 'আমরা এক আধুনিক ভারতবর্ষকে চাই, যা অবশ্যই হবে অতীত-ভিত্তিক।...তাই আধুনিকতার ওপরই আমরা আমাদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।'[১২]—বলেছেন, 'ভারতবর্ষের প্রগতির পথে আধুনিক য়ুরোপ এবং আমেরিকায় অনুষ্ঠিত সকল সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রভাব পড়বেই।'[১৩] বলেছেন আরো অনেক কিছু।

আধুনিকতার প্রতি সুভাষচন্দ্রের এই আকর্ষণ কেবল তার বৈজ্ঞানিক যাথাযাথ্য বা বিচার-সহতার জন্য নয়। আধুনিকতা আসলে এক মানসিক প্রবণতা, অপ্রতিহত নিরন্তর গতিস্রোতে যা দেশে-কালে সর্ব-ব্যাপী, এবং সর্বপ্লাবীও। তাই প্রাচ্যের তপস্যার সঙ্গে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানাগ্রহের মেলবন্ধন এই আধুনিক মানসিকতার জারক রসেই পূর্ণায়ত হতে পারে। এই সূত্রেই 'অভিব্যক্তি-চেতনা'রও প্রাসঙ্গিকতা। অবিচল প্রত্যয়ে অভিব্যক্তি-সচেতন সুভাষচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন, সৃষ্টির প্রবাহ চিরপ্রকাশমান; অন্তহীন অভিব্যক্তির খাতে কখনো তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে না। নিত্য-নূতন বিচিত্র, বিভিন্ন এমনকি অজস্র নিরোধী ধারায় তার উৎসার অবারিত থাকবেই।[১৪] আর এই অশেষ প্রবাহকে অবিরাম সমন্বিত সংহত করেই এগিয়ে চলবে অভিব্যক্তির অন্তহীন ধারা। এই মূল্য-চেতনা বশেই সুভাষচন্দ্র অন্তঃকরণধর্মে ভারতীয় হয়েও আবেদন বৈশিষ্ট্যে বিশ্বজনীন।

বস্তুত সৃষ্টির অক্ষুণ্ণতা তো পরস্পর-বিপরীত উপাদানের নিরন্তর সংঘাতেই। কিন্তু সংঘাত আর সংগ্রামই একমাত্র হলে সৃষ্টি তার অজ্ঞাত জন্মলগ্নের

---

(১০) দ্র, S.C. Bose : Fundamental Questions of Indian Revolution (London Speech) P 30;

(১১) S.C. Bose : 'Indian Struggle' (1964) P 114. (অনুবাদিত)।

(১২) S. C. Bose : Fundamental Questions of Indian Revolution (Tokyo Speech) P 77 (অনুবাদিত)।

(১৩) S. C. Bose—Indian Struggle P 315 (অনুবাদিত)।

(১৪) দ্র. তদেব P 313 এবং অপরাপর গ্রন্থ।

অদূরেই স্বয়ং-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ত। আসলে অন্তহীন বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে খুঁজেই জীবন ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ; এই অর্থেই জীবনের অস্তিত্ব দ্বান্দ্বিকতাভিত্তিক। জীবনের পীঠভূমিতে 'প্রতিজ্ঞা ও বিপ্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে সমাধান করতেই হবে। দ্বান্দ্বিকতার নীতি এই দাবিই করে ;'[১৫]—সুভাষচন্দ্রই একথা দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন,—শুধু ঐ একবার নয়, অথবা বারবারই কেবল তিনি এ-কথা ঘোষণাই করেন নি, আসলে ঐ সমন্বয়নীতি ছিল তাঁর জীবন-'বাণী'। আর সে জীবন-বাণীর সাধনায় সুভাষচন্দ্র পরিপূর্ণ এক ভারতীয়। আপন সাধনাদর্শের নাম দিয়েছেন তিনি 'সাম্যবাদ', বলেছেন, 'এ হল একটি ভারতীয় শব্দ যার সঠিক অর্থ সমন্বয় বা সমতাবাদ'।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে এই প্রসঙ্গে ঃ—

অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেই তো তোমার ভালো।'[১৭]

দ্বান্দ্বিক বিকাশ-দর্শনের পরিণামিতাই অভিব্যক্তি-সমর্থিত বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ এই শাশ্বত ভারতভাবনাকে আধুনিকতার পরিভাষায় বাণীরূপ দিয়েছেন, আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন আধুনিকতার ইতিহাসে শাশ্বত ভারতমূর্তির নির্মাতা।

তাহলেও এখানেই আসে সাম্প্রতিক কালে সুভাষচন্দ্রের গ্রহণীয়তার প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়ে থাকে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়ে পৃথিবী যখন তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনার মুখে আপন অস্তিত্বের মূল অবধি কম্পিত, এই দুঃসময়ের অদ্বিতীয় সমস্যা তো হল বিভেদহীন নিরঙ্কুশ এক-মাত্র তার ভিতটুকুকে খুঁজে পাওয়া! কিংবা বিপরীত কোটি থেকে বলা যেতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি যেখানে মহাকাশ-জোড়া নৈকট্যের আসন বিছিয়ে চলেছে, তখনো জাতীয়তাবাদের অন্ধ সংকীর্ণতা দাঁড়াবার ঠাঁই পাবে কোথায়?

রবীন্দ্রনাথও একদা 'ন্যাশন্যালিজম'-এর অন্ধতাকে তিরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে-অর্থে ভারতীয়, 'ন্যাশন্যালিজমে'র সংকীর্ণতার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তাঁর ভাবাদর্শ জীবনের বাস্তব নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ; তিনি বলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি ভারতীয় পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে, যা ভারতীয় মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী হবে।'[১৮]

দেশকালের পার্থক্য হেতু জীবনের বিকাশও পৃথক্ কিংবা বিচিত্র হয়েই থাকে, উদ্ভিদ এবং প্রাণি-জগৎ সম্পর্কেও একথা সমান সত্য। মানুষের পক্ষে তার অতিরিক্ত সম্পদ হল মন-বুদ্ধি-আত্মার পূর্বেতিহ্য। ফলে মানুষের জগতে পার্থক্যটি আরো দুস্তর। একে অস্বীকার করতে গেলে বৈজ্ঞানিক জীবনধর্মকে অস্বীকার করতে হয় ; গ্রীষ্মের মরুভূমিতে কমলালেবু আপেল, কিংবা হিমালয়-চূড়ায় আমের ফসল ফলাবার মত সে এক 'অকথ্য কথন'। কিন্তু

(১৫) S. C. B—F. Q. I. R. (Tokyo Speech) P. 87 (অনুবাদিত)
(১৬) S. C. B—Indian Struggle—P 314.
(১৭) রবীন্দ্রনাথ—গীতবিতান, র র (প. ব. স) ৬, পৃ ১১০।
(১৮) S. C. B—F. Q. I. R (Tokyo Speech) P 80 (অনুবাদিত)।

পার্থক্য মাত্রই বিভেদের আকর নয়, ভারতবর্ষ বিভিন্নতা এবং বিচিত্রতার মূলগত তফাৎটি ধরেছে ; য়ুরামেরিকা তা পারে নি। বিভেদহীন ঐক্যের নামে সভ্যতাকে তারা বৈচিত্র্যহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করেছে, আজকের ভারতবর্ষও সেই জড়তাচ্ছন্ন। অথচ তাহলেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই ভারতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। উপনিষদের সেই শ্লোকটি, স্মরণ করুন, তিনি এক এবং অবর্ণ, কিন্তু বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণমাধ্যমে নিহিতার্থ দান করেন।'[১৯] প্রাণের সেই অন্তর্নিহিতার্থ টিকে ভারতবর্ষের হয়ে সুভাষচন্দ্র অধিগত করেছিলেন। তিনি জানতেন, 'গেল তিন হাজার বছর ধরে বাইরে থেকে কত জাতি ভারতবর্ষে এসেছে নূতন ভাবকল্পনা নিয়ে, কখনো বা সম্পূর্ণ নূতন সংস্কৃতি নিয়েও। সেই সব নূতন প্রভাব,—ভাবকল্পনা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয় জীবনে আত্মীকৃত হয়ে গেছে, যার ফলে হাজার হাজার বছরের পুরাতন সংস্কৃতি এবং সভ্যতার অভিন্নতা নিয়েও আমরা কালের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে পরিবর্তিত এবং অগ্রসর হয়ে গেছি।'[২০] প্রগতির ধর্মকে কেমন আশ্চর্য করে আবিষ্কার করেছেন সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জীবনে।

বস্তুত স্থিতির মধ্যে গতি, বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্য সাধনই ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ফসল। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছিলেন 'ধর্মবোধ', আর সুভাষচন্দ্রের কথাই, 'ঠিক ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যা গ্রহণ করলে 'বিশ্ব সভ্যতার প্রকৃতি উন্মেষ হবে না।'[২০]

এ কেবল ভাবাবেগের কথা নয়, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্তের অগ্নিপরীক্ষা আজও চলেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই রাষ্ট্রতন্ত্রী য়ুরোপের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, '...ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে, স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় শক্তির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমনকি সে গতির মধ্যেও স্বার্থবোধ যেখানে প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।...য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্স-এ একপক্ষ আর-পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে।'[২১]

অন্যপক্ষে জীবনের পূর্বাহ্ণ-সীমায় মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র সহকর্মীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যত লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে।"[২২]

আজ আমরা সুভাষচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করি, তিনি কেবল-রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না ; তার কারণ ভারতবর্ষের রাজনীতি-জগৎ আজ অন্ধ প্রতীচ্য ভাবধারা-প্লাবিত। সুভাষ-চন্দ্রের ঐতিহাসিক বিচরণভূমি তবু রাজনীতিরই ক্ষেত্রে, আসলে তিনি ভারত, সাধক শ্রেষ্ঠ জননায়ক। অন্যপক্ষে আমাদের-ভারতীয়তা ভ্রষ্ট রাজনীতি-চারণ

---

(২০) S. C B—F. Q I. R (ibid) P 66 (অনুবাদিত)।
(২১) রবীন্দ্রনাথ—'স্বদেশ' (ধর্মবোধ) র র (বি) ১১, পৃ ৫৯৩।
(২২) সুভাষচন্দ্র বসু—পত্রাবলী পৃ : ১৯৯।

উপরিধৃত রবীন্দ্র ও সুভাষৎকথার ভয়াবহ প্রতিরূপ হয়েই দেখা দিয়েছে আজ।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যত বড় চিন্তা-নায়কই হোন না কেন, জীবনাচরণে তিনি কর্মযোগী। তাই তাঁর চিন্তা-ধারা কিংবা ভাবাদর্শের সার্থকতম অভিব্যক্তি তাঁর কর্মচর্যাতেই। বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও আসলে তাঁর সামগ্রিক সত্তার পক্ষে অধ্যাত্মজীবন-সাধনার অপরিহার্য সোপান। তাই রাজনৈতিক কর্মীর প্রথম ধাপ তাঁর পক্ষে হল 'নৈতিক প্রস্তুতি'।[২৩] এমনকি একটি যথার্থ সৈনিকের দুটি আবশ্যিক গুণ হল তাঁর চোখে 'সমর বিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা'; আর শেষোক্ত গুণের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করেছেন,—'প্রত্যেক সৈনিকের নিজের প্রতি থাকবে অশেষ আস্থা, শত্রুর তুলনায় নিজের প্রচুরতম শ্রেষ্ঠতার ধারণা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাকে, মৃত্যুর সম্পর্কে হতে হবে ভয়শূন্য, এবং প্রয়োজন হলে যে-কোনো চরম অবস্থায় স্বাধীন উদ্যমের সক্ষমতা থাকা চাই।'[২৪]

আমাদের কালের আত্ম-ভাবনাচ্যুত নীতিরাহিত্যের অন্ধতায় এই বিশেষ মূল্য-চেতনার তাৎপর্য অনুধাবন করে দেখবার মত। অন্যত্রও সুভাষচন্দ্র বলেছেন, জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টায় 'প্রথম কাজ হবে এমন কিছু নরনারীকে গোষ্ঠিবদ্ধ করা যাঁরা ব্রত-সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ত্যাগ এবং ক্লেশবরণে প্রস্তুত।'[২৫] আজাদ হিন্দ-এর বীর সৈনিকদের ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় মানব মনের কল্পনা-সাধ্য শ্রেষ্ঠ ব্রতটি গ্রহণ করেছ। এই ব্রতের সম্পূর্ণতা বিধানে যে-কোনো ত্যাগই বড় নয়, এমন কি জীবন বলিদানও নয়।'[২৬] লক্ষ করতে হয়, চূড়ান্ত রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনকেও সুভাষ ব্রত-সিদ্ধির সমতুল্য বলে বিশ্বাস করেছেন; এবং ত্যাগ,—সর্বস্বপণ জীবন-সমর্পণ-প্রতিজ্ঞা সেই ব্রত উদ্‌যাপনের মন্ত্র বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষের ত্যাগব্রতী জীবন-সাধনার এইটি মূলমন্ত্র; ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের কথা স্মরণ করুন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধিমূল্যে তা আমাদের সর্বজন পরিচিত।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এ-বিষয়ে কেবল ধ্যানীর মতই নয়, কবির মতও গভীর, নিভৃত-নিবিড়।—'Suffering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে—তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দ-বোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই; সে ব্যক্তি দুঃখকষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে।...আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগ থেকে।'[২৭]

সাম্যবাদী সংঘের সম্ভাব্য কর্মিগোষ্ঠি থেকে আজাদ হিন্দবাহিনীর যুযুধান সৈনিকবৃন্দ পর্যন্ত জনে জনে প্রত্যেককে সুভাষচন্দ্র 'আদর্শানুরাগে' উদ্বোধিত করে দুঃখবরণের পরিণামী আনন্দে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন।—এইখানেই তাঁর রাজনীতি-সাধনা অধ্যাত্ম জীবন সাধনার-সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর মনে পড়ে: '...কো হি এবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষো আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। ...আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব

(২৩) দ্র. S. C. B—F. Q. I. R—P 30.
(২৪) Selected Speeches of Subhas Chandra Bose P 183 (অনুবাদিত)
(২৫) Op cit P-28 (অনুবাদিত)
(২৬) Op cit P-184 (অনুবাদিত)

সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। অতএব দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে।'[২৮]

আর মান্দালয় জেলের অগ্নিতপ্ত যন্ত্রণার দিনগুলিতে সুভাষচন্দ্র বন্ধুকে লিখছিলেন, suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত; তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাইরে থেকে suffering বলে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়।'[২৯] —আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কবি আর কর্মীর তফাৎ কেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে! উপলব্ধি যেখানে গভীরতার তুঙ্গসীমায় উত্তীর্ণ, মানবধর্মের বহিরঙ্গীন ভেদরেখা সেখানে লুপ্ত একাকার হয়েই যায়, রবীন্দ্রনাথ যদি 'কবির্মনীষী' হন, সুভাষচন্দ্র মহাজীবনের কর্মিস্থপতি।

কিন্তু এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালের জীবন-পরিবেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন! বণিকবৃত্ত রাজনীতিচর্চা আজ দেশজোড়া লোকের ফাঁদ পেতে স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় উন্মত্ত,—তারই সঙ্গে কত মিথ্যাচার, কত অনাচার, কত চরিত্রহনন,—সর্বোপরি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আত্মঘাতনের সে কী ভয়াবহ মহামারী! সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠির কথা মনে পড়ে,—লিখেছিলেন, 'Social service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো। শুধু দান করা organised Ehority-র উদ্দেশ্য হতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ-করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—ভাবটা গরীব সাহায্যপ্রার্থীদের মনে জাগানো উচিত।"[৩০]

আজ গরিব-ধনী নির্বিশেষে আমরা গোটা জাতি এই অপমানকর অবস্থার বলি হয়ে বসে আছি লালসাজীবী রাষ্ট্রতন্ত্র-ব্যবসার অবাধ প্রসারে। নিরক্ষর বুভুক্ষুর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভোজবাজি-সূত্রে পাঁচ বছর অন্তর একটি করে ভোটের বিনিময়ে গোটা জাতি দিনের পর দিন অন্তহীন লোভের শিকারে পরিণত হয়েছে। তার মুখে শুধু 'চাই চাই' রব—উদ্বাস্তু শিবিরের হাততোলা দানে বিভোল ভিখারির ক্ষুধার্ত হিংস্র দৃষ্টি তার চোখে, মুখে। সমস্ত জাতির জীবন হতে স্বাধীন উদ্যম-উৎসাহের সকল সুযোগ অপহৃত; ক্ষমতামত্ত নেতৃত্বজীবিকান্ধ গুটিকয় মহাভারতীয় শকুনিবৃত্ত ছাড়া গোটা জাতি আজ চিত্তলোকে নির্জলা বেকার হয়ে বসে আছে আর্থিক বেকারির হিসাব-নিকাশে পরিসংখ্যানের ভূরিপরিমাণ স্তূপীকৃত হতে থাকে, কিন্তু সার্বভৌম আত্মিক বেকারির হিসাব রাখবে কে?

এইখানেই স্থায়ী মানবিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গটি আসে। মানুষও আসলে মনোময়, কিংবা স্পষ্টতর অর্থে অধ্যাত্ম-স্বভাব জীব। জৈবধর্ম জন্মমৃত্যু, তথা দেহধারণের দেশকাল-সীমায় বদ্ধ। রুদ্ধ জনার অসংখ্য কিলবিলকরা জীবাণুর মত ঐ সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণরসকে নিঃশেষে উপভোগ করে নিতে সে অধীর! তাই একফোঁটা ফেলে দেবার, ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে পাবার কল্পনাতেও সে আমূল বিচলিত হয়। ঐ থেকে জাগে ঈর্ষা, সন্দেহ, হিংসা—পাছে

(২৮) রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্যের পথে' (কবির কৈফিয়ত) র র (বি) ২৩ পৃ: ৩৭১।
(২৯) সুভাষচন্দ্র—পত্রাবলী পৃ: ২৩১।
(৩০) তদেব

দবটুকুর একটুও অপরের ভাগে জুটে যায়। সদ্যোজাত নেকড়ে-শাবক মা'র দেওয়া অঢেল খাবারটুকুও ছড়িয়ে ফেলবে, তবু ভাগ করে নেবে না! হিংস্র ঈর্ষায় জৈব প্রকৃতি এমনই অন্ধ।

তাহলেও জৈবতাই মানবিক অস্তিত্বেরও ভিত্তি; দেহ ছাড়া মন-বুদ্ধি-আত্মার অস্তিত্ব আকাশকুসুম। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান-দৃষ্টি সভ্যতার ইতিহাসে সেই ভিত গড়তেই লেগেছে। বিজ্ঞান অর্থে বিশেষিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নয় যে দৃষ্টিভঙ্গী—প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, কিংবা অর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞান-নির্বিশেষে মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের অভ্যুদয় সন্ধান করে ফিরছে কার্যকারণাত্মক গাণিতিক পরিসংখ্যান নিয়ে, তাই। সে-দৃষ্টি অত আত্মম্ভরিতালুব্ধ, পরবিমুখ, জীবনকে সে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দেখে। অণুবীক্ষণের তলায় একটি বিচ্ছিন্ন জীবকোষ দেখে সমগ্র জীবনের চরিত্র নির্ধারণের চেষ্টার মত সে অসাধ্য সাধন। সারা পৃথিবীর মত সাম্প্রতিক ভারতবর্ষও এই সামগ্রিকতা-বোধহীন বিচ্ছিন্ন স্ব-চেতনার জৈবতাচ্ছন্ন।

অথচ জীবনের চরিত্র—কেবল মানবিকতার ক্ষেত্রেই নয়—দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন—নিয়ত প্রকাশমান। অভিব্যক্তির তত্ত্ব জীবজগতে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আত্মার অভিব্যক্তি-প্রবাহের পরিমাপ করবার নিরিখ সে তত্ত্বের হাতে নেই। তার জন্যে চাই দেশ-কালে অপ্রতিহতগতি সামগ্রিক জীবন-ধর্মকে অবধারণ-ক্ষমতা। ঐটুকু বিচারবুদ্ধির আয়ত্ত নয়, উপলব্ধির। বিষয় তার জন্যে চাই ধ্যানদৃষ্টি—গভীর 'অন্তঃকরণ ধর্ম'। ভারতবর্ষে সে সম্পদ ঐতিহ্যাগত, আর সুভাষচন্দ্রের চেতনায় তা ছিল প্রায় জন্মগত। দেশবন্ধুকে বিলেত থেকে লেখা সেই প্রাথমিক চিঠির কথা স্মরণ করুন। বলেছিলেন, হয়ত কথা উঠবে, কংগ্রেস তখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র ভাঙতে ব্যস্ত; কিন্তু ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে গড়তে হবে। এরই নাম synthesis—জীবনধর্মের শাশ্বত সমন্বয় প্রয়াস। পুরাকালীন ভারতবর্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সমন্বয়-সত্যের সাধনা করে এসেছে। কিন্তু অগ্রে দেখেছি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি অতিশয় ঝোঁক দিতে গিয়ে জীবনের জৈবিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে মধ্যযুগের ভারতবর্ষ আকাশকুসুমের চাষ করতে বেরিয়েছিল; তাই সে ব্যর্থ হয়ে গেল; এ অনুযোগ পুনঃ পুনঃ করেছেন সুভাষচন্দ্রও।

আধুনিককালে য়ুরোপ যখন এলো ভারতবর্ষের দ্বারে—প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষসূত্রেই আবার সমন্বয়ের প্রশ্নটি প্রবল হয়ে উঠল,—পাশ্চাত্ত্যের জৈবিক অভ্যুদয়ান্ধ বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে প্রাচ্যের 'ধর্মবোধে'র প্রশান্ত আত্মিক উদারতার সমন্বয় সাধনের। সে পথে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী এগিয়েছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনা করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'৩১

সুভাষচন্দ্র গুরুর কর্তিত পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন,—অভিব্যক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে অধ্যাত্মধ্যানী উপলব্ধির সমন্বয়ে রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আত্মিক মুক্তির সাধনা করে গেছেন তিনি—সে সর্বাত্মক মুক্তি একবার আয়ত্ত হলে বর্ষার

(৩১) র র ১২ পৃঃ ২৬৬।

তরানদীর মত ভারতবর্ষের কূল ছাপিয়েও সারা পৃথিবীকে পরিপ্লাবিত করতে পারত। আত্মামুক্তির সামগ্রিক এই সাধনাই বিশ্বমুক্তিরও একমাত্র সোপান—আধুনিক যুগে বিশ্বমানবিকতার ঐটুকুই চূড়ান্ত পাথেয়। সুভাষচন্দ্র আধুনিকতার ওপরে নিজের অবস্থানভূমি গড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কাম্য হল তাই, 'যা শাশ্বত-ভাবে আধুনিক।' সুভাষচন্দ্রের 'ভাবাদর্শ' এবং কর্মসাধনা শাশ্বত আধুনিকতার ধর্মে দীপিত বলই কেবল সাম্প্রতিককালের নয় সর্বদেশকালের মানবেতিহাসেরই পরম ধ্যেয়।

জয়হিন্দ

২. বক্তা ঃ অমূল্যভূষণ সেন, অধ্যাপক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ইডিওলজির নির্গলিতার্থ ভাবগত বা আদর্শগত কোন তত্ত্ব বা মতবাদ। সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শনকে কোন ভাবলোকের দ্যোতনা উদ্ভাসিত করেছে, তাঁর অপূর্ব কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতাকে কোন্ আদর্শের অবিচ্ছিন্ন ধারা বিধৃত করে রেখেছে, কোথায় তাঁর মতবাদের অনন্যতা—এ সবের অনুশীলনেই নেতাজী সুভাষের জীবনদর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা প্রতিভাত হবে।

কোন রাষ্ট্রনায়কের বিশেষ করে দেশের মুক্তি ব্রতী কোন মহানায়কের জীবন দর্শনে একটি বিশেষ মতবাদ (ইজম)-এর অপরিমেয় প্রভাব থাকে। বর্তমান যুগের দুইটি বিপরীত মতবাদের মূর্ত প্রতীক্ দুই অসাধারণ নায়কের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে রাশিয়ার লেনিন ও ভারতের গান্ধি। আন্তর্জাতিক মার্ক্সীয় দর্শন সঞ্জাত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা, জড়বাদের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব (ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্), শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী রূপ-রেখা মেহনতি জনতার স্বৈর শাসন—এসব রাশিয়ার সার্থক বিপ্লবের এবং বর্তমান সাম্যবাদী রুশ জাতীর অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গী। লেনিন রুশ জাতির মুক্তিকল্পে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান স্থপতি। এটাই লেনিনবাদ, যার প্রভাব আজিকার বিশ্বে অপরিসীম। অপর দিকে অহিংসার ঋষি, অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যাখ্যাতা ও প্রয়োগশিল্পী মহাত্মা গান্ধি ঐহিকতা ও জড়বাদকে তুচ্ছ করে আত্মিক শক্তি ও অধ্যাত্ম বিদ্যার মালমশলা দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামেরও ইংরেজ শাসনমুক্ত ভারতের রূপরেখা এঁকেছেন। গান্ধিবাদের এটাই মৌলদর্শন, যার প্রভাব আজ এই দেশের চৌহদ্দিকে ছাড়িয়ে গেছে।

অপর একটি ইজমও বর্তমান যুগের ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়াকে কম প্রভাবিত করেনি। এই ইজমের ভিত্তি উগ্র জাতীয়তাবাদ, সামরিক শক্তির দম্ভে একদা হিট্‌লার যাকে জার্মানির নাৎসিজম বা ফ্যাসিজমে বলিষ্ঠ রূপ দিয়ে বিশ্বত্রাস হয়েছিলেন। এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় ক্ষেত্র আপাত দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া ভার।

কিন্তু নেতাজী সুভাষের জীবনদর্শন যদি অনুধ্যান করি তবে শুধু উপরিউক্ত দুটি বা তিনটি নয়, আরও যতো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মতবাদ ও ভাবধারা বিশ্বের ইতিহাসকে

প্রভাবিত করেছে—তাদের সমন্বিত মিলন ভূমি চক্ষুগোচর হবে। এখানেই সুভাষবাদের অনন্যতা। ভারতেতিহাসের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ ও সমন্বয়। ইতিহাস-সচেতন সুভাষ প্রত্যেক মতবাদের গুণাগুণ বিচার করেছেন প্রত্যেক মতবাদের এক-দেশদর্শিতার ও গোঁড়ামির আতিশয্যকে বর্জন করেছেন এবং ভারতের নিজস্বতার সঙ্গে তারপর তা সমঞ্জসীভূত করেছেন। তারপর সম্মুখে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গতিশীল পরিবর্তনশীল জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের চলার পথ নির্দেশ করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শনে 'মানুষ' সবচেয়ে বড়ো কথা। সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষই তার প্রয়োজনে গড়ে তোলে। মানুষের জীবন তার লক্ষ্য খুঁজে পেলে তবেই একটি দেশের ভৌগলিক পরিবেশে মানুষ গড়তে পারে স্বাধীন শক্তিশালী আদর্শনিষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্র। যুগান্তকারী রুশবিপ্লব এবং শক্তিমান রুশজাতির ঐহিক জীবনে সার্বিক ও সুসম উন্নতির কর্মসূচী সুভাষচন্দ্রের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কতগুলি নির্বস্তুক ছকে ফেলে মানুষের বিচারকে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাকে শুধু গণিতিক চিহ্ন ধরে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের মার্ক্সীয় প্রবণতাকে সুভাষচন্দ্র কখনও মেনে নিতে পারেন নি। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে তিনি অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাত দুষ্ট মনে করতেন। আর নাৎসিবাদের অসহিষ্ণু উগ্রতাকে তিনি পরম জাতীয়তাবাদী হয়ে ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য ভাবতেন।

তারপর গান্ধিবাদের কথা। ব্যক্তিগত জীবনে সুভাষ ছিলেন আত্মিক শক্তিতে পরম বিশ্বাসী। অধ্যাত্মবিদ্যা ছিল তাঁর মজ্জাগত ও সকল শক্তির উৎস। তাই তিনি রাজনৈতিক জীবনে অনেক অঘটন ঘটাতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অধ্যাত্মবাদী সত্যাগ্রহী গান্ধিজীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি গান্ধিজীকে জনগণের অধিনায়ক রূপে অসীম শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের ঐহিক সমস্যাবলীর সমাধানে গান্ধিজীর দ্বারা আধ্যাত্মিকতা প্রয়োগের আতিশয্যকে তিনি আক্রমণ করেছেন। গান্ধিজীর অহিংসার আতিশয্যকে, ঐহিতাকে তুচ্ছ করাকে, একই মানদণ্ডে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতার সরলীকরণকে সুভাষচন্দ্র কঠোর সমালোচনা করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ও অন্তরঙ্গ সহকর্মী মনীষী বিপ্লবীনায়ক অনিল রায় সুভাষবাদকে তাই চিহ্নিত করেছেন 'জীবনবাদ' রূপে। মানুষকে কেন্দ্র করে 'জীবনবাদ' আবর্তিত। মানুষের ঐহিক প্রয়োজন ও আধ্যাত্মিক জীবন, দেহ ও আত্মা জড় ও চৈতন্য—এদের সুসমঞ্জস রূপায়নে 'জীবনবাদ' গতিশীল ও ব্যঞ্জনাময়। এবং জীবনবাদের ধারক ও পোষক ভারতের ঐতিহ্য ও শাশ্বত মূল্যবোধ। বস্তুত নেতাজীর জীবনবাদ ভারতবাদেরই নামান্তর। বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ আর বহুকে একের মধ্যে সমন্বিত করা—এই তো ভারতেতিহাসের মর্মবাণী।

যদিও সাধারণ ইতিহাস পাঠকের চোখে তা সহজে পড়ে না। এই সমন্বয় ধর্ম যখন লুপ্ত হয়েছে, সমন্বয় সূত্রটি যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, নবনব ভাবের বন্যায় যখন ভারতের নিজস্বতা ভেসে গেছে তখনই এসেছে ভারতের সামগ্রিক পতন। অর্থনীতি, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতি—এদের মধ্যে কোন একটি শক্তির আতিশয্য বা অভাব তখন জাতীয় জীবনের ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে, এদের পারস্পরিক সম্বন্ধে প্রচণ্ড ফাটল সৃষ্টি করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নিশ্ছিদ্র তমসায় যখন ভারতের ভাগ্যাকাশ এমনি আবৃত হয়েছিল তখুনি সুচতুর, সুযোগ সন্ধানী বিজ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান ইংরেজবণিক তার প্রভুত্বকে এদেশে প্রসারিত ও সুদৃঢ় করলে। ভারতের ধর্ম তখন লুপ্ত ; আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে স্খলিত হয়ে ধর্ম তখন কতগুলি কদাচার ও কুসংস্কারের পর্যবসিত। ভারত তখন একটা ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্র, একটা প্রসারিত বদ্ধজলাশয় মাত্র।

তারপর বাংলার তথা ভারতের নিদ্রাভঙ্গ ও পুনর্জাগরণের প্রয়াস, যার পরিণতি ভারতের নিজস্বতার আধুনিক জড়সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কার ও সমৃদ্ধি। প্রাচীন ও নবীনের পূর্ব ও পশ্চিমের সামঞ্জস্য সাধনের জোয়ার ভাঁটা অবশ্য চললো উনবিংশ শতাব্দীতে কিছুকাল ধরে। সমাজ জীবনের নানা শাখায় একাধারে সত্যসন্ধ ভারত-বাদী ও পশ্চিমের জড়সভ্যতার অনুরাগী মনীষী ও কর্মবীরবৃন্দ ভিড় করে এলেন। এক আশ্চর্য্য নীরব বিপ্লব ঘটে গেল। পশ্চিমের বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কৃতি ও ঐহিক উৎকর্ষের ফলশ্রুতি যুক্ত হল ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে। সুচিত হল জাতীয়তাবাদ ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ। এই নীরব বিপ্লবের প্রারম্ভিকায় রয়েছে রামমোহনের মহাজীবন এবং পরিপূর্ণতাকে বিধৃত করে রেখেছে সমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণর সাধনালব্ধ ভারতের চিরন্তন মহাসত্যটি—'যতমত, তত পথ।

এবং রামকৃষ্ণ সূত্রের জীবন্ত ভাষ্যকার, রামকৃষ্ণ ভাবের বলিষ্ঠ সম্প্রসারণ স্বামী বিবেকানন্দ, অধ্যাত্ম ভিত্তিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ভূমির উপর ভারতের জাতীয়তাবাদের রূপরেখা অঙ্কন করলেন। সাত্ত্বিক চিন্ময় ভারতের সঙ্গে তামসিকতায় আচ্ছন্ন অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য শোষণ ক্লিষ্ট মৃন্ময় ভারতের বৈসাদৃশ্য মহামানবের অন্তরে পরম বেদনার সঞ্চার করলে এই বেদনাই তাঁর অপূর্ব ভারতপ্রেমের জননয়িত্রী। বীর সন্ন্যাসীর জপের মালায় দু'টি মাত্র শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—'শিব শিব, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ।' ঐহিক জীবনের দেনা পাওনা মেটানো হল ধর্মের অঙ্গীভূত, যুগধর্মের বার্তা ঘোষিত হল—'মূর্খদেবো ভব, দরিদ্রদেবো ভব'। দেহের চাহিদা না মেটাতে পারলে শুধু দেহ দুর্বল হয়না, আত্মাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দেহের প্রয়োজন মেটাতে রয়েছে বিজ্ঞান ও তার নব নব প্রয়োগ ক্ষেত্র। পশ্চিম এখানে দাতা। আত্মার ক্ষুধা মেটাতে রয়েছে যুগযুগব্যাপী ভারতের

সাধনালব্ধ অধ্যাত্মবিদ্যা। দেহ ও আত্মার এই মিলনে বা সমন্বয়ে যুগধর্ম রচনা করলেন স্বামীজী। সমন্বয়ের ধর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে স্বামীজী দণ্ড এই অভিনব পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে সুভাষ হলেন স্বামীজীর উত্তর সাধক।

স্বামীজী বলতেন 'খালি পেটে ধর্ম সয় না'। তিনি ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের সাধনাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ হোক। মানুষের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি লাখো নরকে যাইতে প্রস্তুত।" স্বামীজীর সুরে সুর মিলিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন—"আমাদের গৌরবোজ্জ্বল যুগগুলিতে আত্মা ও দেহের, চৈতন্য ও জড়ের দাবির মধ্যে একটা মধ্যপথ বা সমন্বয় বের করা হয়েছিল। আত্মা ও দেহের মধ্যে এমন একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে যার দরুণ দেহকে তুচ্ছ করলে কেবল দেহেরই ক্ষতি হয় তা নয়, পরিণামে অধ্যাত্ম জীবনেও মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। আজকাল ভারত কেবল দৈহিক শক্তি-হীনতায় নয়, আধ্যাত্মিক ক্লান্তিতেও ভুগছে।—যদি আবার আমাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে হয় তবে দৈহিক ও আত্মিক এই দুই ক্ষেত্রে আমাদের এক সঙ্গে এগুতে হবে।" (নেতাজীর জীবনবাদ-পৃঃ৮)।

সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেননি। ১৯০২ সালে যখন তাঁর মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স তখন স্বামীজী মহাপ্রয়াণ করেন। কিন্তু সুভাষ তাঁর সমগ্র সত্তার মধ্যে—তাঁর সংস্কারের মধ্যে তাঁর আত্মার মধ্যে স্বামীজীকে লাভ করেছিলেন। ইটালির জাতীয় ঐক্যসাধনের দ্রষ্টা ও পুরোহিত ম্যাট্‌সিনির মস্তিষ্ক ও দার্শনিক মননে নাকি জন্ম হয়েছিল গ্যারিবল্ডির —যিনি শৌর্যে ত্যাগব্রতে ও দেশপ্রেমে সুভাষের সঙ্গে তুলনীয়। সুভাষও বুঝি জন্ম নিয়েছিলেন ভারতমন্ত্র উদ্গাতা স্বামীজীর ধ্যানমগ্ন চিত্তে। ২৩শে জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে সুভাষের জন্মক্ষণে অভিনব পাশ্চাত্য বিজয়ী বিবেকানন্দ শ্রীলঙ্কার জাফনাশহরে সর্বাবয়ব বেদান্ত আলোচনা কচ্ছিলেন। বনের বেদান্তকে যিনি ঘরে নিয়ে এলেন যিনি মূর্ত বেদান্ত, তাঁরই মানসপুত্র সুভাষচন্দ্র।

ভারতমন্ত্রও কি স্বামীজী এভাবেই দিয়েছিলেন তাঁর মানস পুত্রকে? অধ্যাত্ম জগতে মহাতাপসের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য পরিমাপের কোন যন্ত্র আছে আছে কিনা জানিনে। শুধু এটুকু জানি, কটকে পিতৃগৃহে সুভাষচন্দ্র যখন মাতৃস্তন্য পানরত কয়েক-দিনের শিশু মাত্র তখন (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭) মাদ্রাজ শহরে বিপুল জনসমাবেশে স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-এর উপর। মহাশিল্পী কথার বলিষ্ঠ তুলির সাহায্যে অধ্যাত্মবিদ্যার জনয়িত্রী চিন্ময় ভারতের ছবি এঁকে যখন ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাবনা বর্ণনা কচ্ছিলেন, তখন তাঁর চিত্তপটে শৌর্য, প্রেম ও ত্যাগের সংহত ভাবঘন একটি মূর্তি ভারতের মুক্তি দাতারূপে ভেসে উঠেছিল। কেন এই ভারতের ত্রিশ কোটি সন্তান ইংলণ্ডের চার কোটি অধিবাসীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ-তার গভীরে প্রবেশ করে অপূর্ব বিশ্লেষণ দান করলেন স্বামীজী। তারপর বললেন—"ভারতের ভবিষ্যৎ

উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তখুনি, যখন আসবে সংহতি—যে সংহতি যোগাবে শক্তি, ঘটাবে বিভিন্ন ইচ্ছা শক্তির মিলন। সংকল্পই জগতের অশেষ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষের দেহ হতে এক আধ্যাত্মিক তেজ নির্গত হয়ে স্তরে স্তরে তা প্রভাবিত করে অপরের চিত্তকে সমগ্র জাতি হয়ে ওঠে অলৌকিক শক্তির আধার। আবির্ভাব হোক সেই আশ্চর্য শক্তিধর পুরুষের।" (ভাবানুবাদ লেখকের)

স্বামীজীর কণ্ঠে এ কার আবাহন গাথা? 'নেতাজী'র কাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁদের মনে হবে এতো তাঁরই অন্তরঙ্গ ছবি! একি আঁকা হয়ে গেল তাঁর জন্মকালেই? মহাপ্রয়াণের পূর্বে স্বামীজী নাকি আপন মনে বলে উঠেছিলেন—বিবেকানন্দ কী করে গেল, তা দেশবাসী বুঝবে সেদিন, যখন আর একজন বিবেকানন্দ আসবে। বিবেকানন্দ আবার এসেছিলেন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষের রূপ ধরে। বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাবঘন মূর্তি, সুভাষ ভারতের শৃঙ্খল মোচনের রণক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠতম কার্যকর রূপ।

স্বামীজী ওই সভাতেই বজ্রনির্ঘোষে ভারতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। "আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরে (১৮৯৭-১৯৪৭) আমাদের গরীয়সী ভারতজননী একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের ভুলে গেলে কোন ক্ষতি হবে না। তোমার স্বজাতিরূপে যে দেবতা, তিনিই একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্র তাঁর হস্ত প্রসারিত সর্বত্র তাঁর কর্ণ পরিব্যাপ্ত। কোন অকেজো দেবতার সন্ধানে তুমি ছুটে চলেছো? তোমার চতুর্দিকে পরিদৃশ্যমান যে দেবতা—সে বিরাটের পূজা কেন করতে পারছো না? সেবা নয়, পূজা—বিরাটের পূজা। তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যারা রয়েছে তাদের পূজা। তোমার স্বদেশবাসীরাই তো প্রথম উপাস্য।"

(ভাবানুবাদ লেখকের)

স্বামীজী সুভাষের জীবন দর্শনের ছক্ এভাবেই বেঁধে দিয়ে গেলেন। স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান—'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'—তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নেতাজীর কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত মহত্তম স্বদেশমুক্তিকল্পে জীবন বিসর্জন মন্ত্রধ্বনিতে 'তুম্ মুঝে খুন দেও, ম্যয় তুম্কো আজাদী দেউঙ্গা'। প্রাণ দেবার জন্য হাজার হাজার মুক্তি সৈনিকের মধ্যে সেদিন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। নেতাজী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়দের একতার রাখীবন্ধনে বেঁধেছিলেন,—হিন্দু নয় মুসলমান নয়, শিখ নয়, খৃষ্টান নয়—বাঙ্গালী নয়, মারাঠা নয়, হিন্দুস্থানী নয়, মাদ্রাজী নয়—শুধু গর্বিত ভারতবাসী পরিচয়ে তারা যখন নেতাজীর আহ্বানে সানন্দে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত হোলো, তখনও তাঁর কণ্ঠে অন্য সুরে অন্য ভাষায় স্বামীজীর বাণী—'বলো ভাই, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই.....ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের

দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ'।

এ'তো সম্ভাব্য ক্ষমতা ও অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে সাময়িক প্রয়োজনে চুক্তি করা নয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। ত্যাগ ও বিসর্জনের মহান বেদিতে এ সমবেত হবার আহ্বান। প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন নেতাজীর দেহ থেকে আধ্যাত্মিক তেজ নির্গত হয়ে অপরের চিত্তকে এভাবেই প্রভাবিত করলে, ঘটালে বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির অপূর্ব মিলন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ মাত্র একবারই ঘটেছিল। স্বামীজী মন্ত্র, সুভাষ তাঁর অনন্য প্রয়োগ শিল্পী। স্বামীজী বাণী, সুভাষ তার অপূর্ব মূর্তি। সুভাষচন্দ্রের জীবন-দেবতা তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুস্তর পথে হাতছানি দিয়ে বার বার টেনে নিয়ে গেছেন। অবশেষে তাঁরই ললাটে পরিয়ে দিয়েছেন দীপ্ত জয়শ্রীর রাজটিকা স্বয়ং ভারত ভাগ্যবিধাতা। ইতিহাসের সত্য এই যে নেতাজীর আজাদ হিন্দ তার ব্যর্থতা ও ছত্রভঙ্গ হওয়ার মধ্য দিয়েই ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতাকে শুধু সম্ভব করেনি ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁর 'দিল্লী চলো' অভিযান সার্থক হোলো অভিনব ভাবে। দিল্লীর লালকিল্লায় বিচার হোলো নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুগামী বন্দী সেনানায়কদের—এই বিচারই হোলো ভারতে ইংরাজ শাসনের কাল। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তা জানেন। —নেতাজী সত্যই ভারত পথিক, ভারতের উদ্দাম পথিক।

নেতাজীর জীবন দর্শনের সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্র বিন্যাসে বোধহয় খানিকটা প্রসঙ্গচ্যুত হলাম। প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদের বা ভারতবাদের মূলে সযত্নে জল সিঞ্চন করেছিলেন কৈশোরে তাঁর শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাশ। যৌবনে ব্রিটিশ রাজত্বের স্বর্গজাত সিভিল সার্ভিসের মোহ অনায়াসে ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র ঝাঁপদিলেন গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে। কর্মগুরু রূপে পেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যিনি ত্যাগব্রত প্রেমের সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট, যিনি পরম বৈষ্ণব কবি, প্রেয় ও শ্রেয় যাঁর মনন রাজ্যে ও কর্মপ্রবাহে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, যিনি নারায়ণকে খুঁজতেন চাষীর কর্ষণরত লাঙ্গলে, মুটে মজুরের কর্মক্লান্ত অবয়বে।

কংগ্রেসের প্রথম সমাজবাদী নেতা দেশবন্ধু নিবিড় সান্নিধ্যে থেকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর দেশপ্রেমের সঙ্গে সমাজবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এ সমাজবাদ কিন্তু জড়বাদের ভিত্তিতে পশ্চিমী রীতিতে নয়; এ ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রেমের ভিত্তিতে। শিবজ্ঞানে 'জীবসেবা' রামকৃষ্ণের এই প্রেমের বাণী কর্মযোগী স্বামীজীর রূপায়নের মাধ্যমে সুভাষের ভারতীয় সমাজবাদী আদর্শের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বস্তুত ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম সমাজবাদী চিন্তা ও কর্মনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর দেশহিতৈষীর সংজ্ঞার মধ্যে সমাজবাদের আদর্শই বর্ণিত হয়েছে। "তোমরা

কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক—অর্ধাশনে কাটাইতেছে। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এসকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি-স্পন্দনের সহিত কি ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এ ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি-এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এইরূপ হইয়াছে কি?" সুভাষচন্দ্রের এইরূপই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গোরার মতো সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন—"ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরেজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে"। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুভাষচন্দ্র বললেন একটা জাতির ইতিহাসকে ও ভূগোলকে বাদ দিয়ে কোন আদর্শই ফলপ্রসূ হতে পারে না। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব-ধারায় সমাজতন্ত্রবাদকে রূপ দেবে। এরজন্য রাশিয়া থেকে মার্ক্সবাদ কিম্বা অন্য কোন পাশ্চাত্য মতবাদ অন্ধের মতো অনুকরণ করা একেবারে নিরর্থক। 'পরানুবাদ পরমুখাপেক্ষা।'—এসব দাসসুলভ দুর্বলতা মাত্র, একটা ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা মাত্র। ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর এই সাবধানবাণী সুভাষচন্দ্রের সর্বদা স্মরণ ছিল। রঙপুরের বিখ্যাত ভাষণে তিনি বললেন—"ভারতীয় সমাজতন্ত্র কার্ল মার্ক্সের পুঁথিতে জন্ম নেয় নি। এর উৎস ভারতের যুগযুগ বেয়ে আসা চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত।

আমরা আমাদের ইতিহাস হারিয়ে ফেলেছি, তাই তাকিয়ে আছি মার্ক্সের দিকে। কিন্তু কোন চিন্তাধারাই অভ্রান্ত কিম্বা শাশ্বত নয়।—আমাদের নিজস্ব আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে আমাদের সমাজ ও রাজনীতি গড়বো।"

তা বলে যদি আমরা মনে করি যে সুভাষচন্দ্র বাইরের দানকে অস্বীকার করে শুধু ভারতের সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে তাঁর সমাজবাদী জীবন দর্শনকে ভাষা দিয়েছেন, তবে মারাত্মক ভুল হবে। সমন্বয়ের কৌশল ও বহুকে একের মধ্যে মিলনের সূত্রটি তাঁর সম্যক আয়ত্তে ছিল। দেশী বিদেশী সকল ভাব ধারার সারটুকু সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করে এবং তাকে ভারতের নিজস্বতার সঙ্গে সমন্বিত করে তিনি ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের রূপ রেখা নির্ধারণ করেছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতিতো অচলায়তন কোন বস্তু নয়। জগৎ অবিরাম চলেছে, পরিবর্তন ঘটছে যুগে যুগে, নব নব ভাবের সমন্বয় সমৃদ্ধ হচ্ছে ভারতের সংস্কৃতি তার নিজস্বতাকে বিসর্জন না দিয়ে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯৩১ সালের ভাষণে সুভাষ বলেছেন—"নানা মতবাদের সংঘর্ষে ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীরা বিভ্রান্ত হয়ে যান, কোন পথে চলবেন বুঝতে পারেন না। একদিকে রয়েছেন

দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীরা (যারা বিপ্লবকে ভয় পান), অন্যদিকে রয়েছেন মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা (যাঁরা মস্কোরীতিতে শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী আঁকড়ে আছেন)। এই দুই-এর মাঝখানে রয়েছেন আর একটি দল, যারা সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে মানেন যারা চান যে ভারতবর্ষ তার স্বকীয় ধারায় এবং নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রকে রূপ দেবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মুক্তির পথ এই সমাজতন্ত্রে। ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয় পাঠ গ্রহণ করবে, কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী ভারতকে তার নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করতে হবে।"

নেতাজীর জীবনবাদের অনন্য ভাষ্যকার অনিল রায় গান্ধিবাদের আতিশয্য ও মার্ক্সবাদের আতিশয্য —এই দুই আতিশয্যের বাইরে সমন্বয়ের ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্রের এই নয়া সমাজতন্ত্রকে বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ রূপে তুলে ধরেছেন। ভারতের জাতীয় রাজনীতির এক সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন আপসকামী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে তীব্র সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী বামপন্থী নেতৃত্বের প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। যখন 'সকল ক্ষমতা থাকবে জনগণের হাতে'—এই মন্ত্রে ভারতের আপসবিরোধী বামপন্থী দলের অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে (১৯৩৯) সকল সমাজবাদী ও মার্ক্সবাদীদের সহযোগিতায় ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—তখন কিন্তু কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দল ও মার্ক্সবাদী দল সমূহ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গেই হাত মেলালো। সমন্বয়ের ভিত্তিতে ভারতের সংগ্রামী সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদ সংহত হবার সুবর্ণ সুযোগ হারালো। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা এতটুকু হতোদ্যম না হয়ে সংগ্রামে নেমে পড়ে ইতিহাস রচনা করলেন। সুভাষের জীবনবেদে অবসাদ বা উদ্যমহীনতার কোন স্থান ছিল না।

মার্ক্সবাদের অন্ধ অনুকরণের বিরোধী হলেও সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার বিপ্লব ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী থেকে কিছু নিয়ে ভারতীয় সমাজ-বাদে সাঙ্গীকরণে কুণ্ঠিত হতেন না। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্প ও কৃষ্টির বিজ্ঞান ভিত্তিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে এবং এই দেশের অফুরন্ত ঐহিক সম্পদ সমবণ্টনের উদ্দেশ্যে সমাজবাদের কাঠামোতে রাশিয়ার ধারায় প্রথম পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন। ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি সমিতির সভাপতির পদ সমাজবাদী নায়ক জওহরলালকে অর্পণ করেন। স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের সেটাই আদি কথা।

চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল পার হয়ে ভারত আজ পঞ্চম পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সুভাষচন্দ্রের ত্যাগাদর্শ ও সমাজবাদী জীবন দর্শন থেকে বর্তমান পরিকল্পনার চরিত্র ও রূপায়ন মূলত তফাৎ। ভারতের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুসম ও সুসমঞ্জস উন্নয়নের

পরিবর্তে সৃষ্ট হয়েছে এক প্রচণ্ড ভারসাম্যহীনতার বিভ্রাট।

এই বিভ্রাট সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল স্তরে আজ পরিব্যাপ্ত। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে, ভারতের জয়যাত্রা পুনরায় আরম্ভ করতে হলে নেতাজীর জীবন দর্শনকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠার অর্থ তো প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ করা। কারণ ভারতবর্ষের সমন্বয় প্রাণ ইতিহাসের ধারা অনুসরণেই ভারতের এই মহাশূর তার মাতৃভূমিকে তুলে ধরেছেন জীবন দর্শনে। ভারতীয়ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পী নেতাজী। জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত বাইরের জগৎ থেকে ঐহিক জীবনের স্বাচ্ছল্য বিধানে তিনি বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন এবং সমন্বিত করেছেন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সঙ্গে। এই তো ভারতের চির পুরাতন চির নূতন বাণী। এই বাণীরই বলিষ্ঠতম রূপায়ন নেতাজী। যতদিন ভারত—ভারত, ততদিন নেতাজীর জীবন দর্শন শুধু প্রাসঙ্গিক থাকবে না, তাতে থাকবে বিকল্পবিহীন রাজপথের দ্যোতনা।

পঁচিশ বৎসর ব্যাপী (১৯২১-১৯৪৫) স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত পটভূমিতে বিভিন্ন বিচিত্র স্তরে ক্লান্তিহীন সংগ্রামী নায়ক সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, সাফল্যের গৌরব এবং আপাতদৃষ্টিতে অসাফল্যের ততোধিক গৌরবের পরিপ্রেক্ষিতে এই অগ্নিহোত্রী তাপসের জীবনদর্শনের মধ্যে সমন্বয় প্রাণ শাশ্বত ভারত অনুপম বজ্রনির্ঘোষে বার বার কথা কয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধেয় অনিল রায় তাঁর অনন্যগ্রন্থ—'নেতাজীর জীবনবাদ'-এ ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে এক অভূতপূর্ব নূতনের সূচনা দেখেছেন। অনিল রায় নিজে সুভাষচন্দ্রের আঁকা পথের একজন বলিষ্ঠ পথিক, দৃষ্টি তাঁর কবি জনোচিত, ত্যাগের গৈরিক রঙে উদ্ভাসিত হয়ে বিপ্লবের অগ্নিরথের গর্বিত আরোহী তিনি, সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—"সুভাষচন্দ্র শুধু ব্যক্তি নন, তিনি সঞ্চিত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের যুগমূর্তি।" নেতাজীর জীবনদর্শন ভারতধর্মের ও সমন্বয় তত্ত্বেরই একটা ঐতিহাসিক রূপায়ন।

আজও গণমানসের পরতে পরতে সেই স্বধর্ম অবিকৃত, নেতাজী আহ্বান তাই আজও গণ-মানসকে 'প্রকাশ-ব্যাকুল' করে তোলে। নেতাজীর ভাবমূর্তির উন্মাদনা জনচিত্তে আজিও অব্যাহত। ২৩শে জানুয়ারী যখন বৎসরে একবার ঘুরে আসে, তখন সেই উন্মাদনা ফেটে পড়ে সমগ্র দেশ জোড়া অপূর্ব জন্মোৎসবের অগণিত মণ্ডপে। ঠিক এমনটি আর কারো জন্মোৎসবে দেখা যায় না।

আজ আদর্শচ্যুতি, পরানুকরণ, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে আমাদের সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠেছে। অনিল রায় বলতেন —সংস্কৃতির দুর্গতি একটা জাতির সবচেয়ে বড়ো দুর্গতি। ক্রমবর্ধমান সেই দুর্গতির অন্ধকারের মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা যায় বটে, কিন্তু ভয় হয় সে বুঝি আলেয়ার আলো। যে উন্মাদনা

আজও নেতাজীর নামে জনচিত্তকে প্রকাশ-ব্যাকুল করে তোলে। তা সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু বোধ হয় না। তাকে স্থায়ী করে রাখতে কর্ম, প্রয়োজন বাক্য ও মননের সুস্থ সুষ্ঠু খাতে সংহত করে স্রোতস্বিনীর মতো প্রবহমান রাখা। যিনি তা পারেন সেই নব ভগীরথ আজও তো অনাগত।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসের ভাঙাগড়া চলেছে নেপোলিয়ান লিজেন্ডকে (ঐতিহ্যকে) বাহন করে। ইতিহাসের অনন্যপুরুষ নেপোলিয়নকেও ছাড়িয়ে গেছে তাঁর ভাবমূর্তি, তাঁর লিজেন্ড্। নেপোলিয়ন ব্যক্তিটির কীর্তির চেয়ে তাঁর ভাবমূর্তি আরোও পরীয়ান। নেতাজীর কীর্তি কাহিনী আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি অনন্য অধ্যায়। কিন্তু তাঁর আদর্শঘন ভাবমূর্তিটি আরও উজ্জ্বল, আরও মহৎ। বর্তমান ভারতের অপ্রকৃতিস্থতা দূর করতে পারে শুধু সুভাষ লিজেন্ড্। কিন্তু সুভাষ লিজেন্ডের বিজয় কেতন ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে কে? ভারতের মুক্তিপথের বলিষ্ঠতম দিশারী নেতাজী সুভাষ, ভারতেরই মর্মবাণী দিয়ে গড়া তাঁর জীবন দর্শন। এই তো বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার আমাদের বুঝে নেবার সময় কি আজও হয়নি? আর কতকাল তা ধূলায় পড়ে থাকবে?

১. ৩. ৭৫

চাই ভালো লেখা—চাই নতুন লেখক

শক্তিশালী নতুন লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা প্রকাশের সুযোগ 'জয়শ্রী'তে সর্বাগ্রে।

প্রবন্ধ হবে তথ্যবহুল মননশীল আনুমানিক তিন হাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ শেষে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব লেখাই স্পষ্ট হস্তাক্ষর বা টাইপে এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবেন। রচনার মাথায় শব্দ সংখ্যা লিখে দেবেন॥ রচনার সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biodata) পাঠাতে ভুলবেন না।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক, জয়শ্রী

৩. বক্তা : পবিত্রকুমার ঘোষ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শ আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক কিনা এই প্রশ্নটি বিচার করার আগে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগেও এই একই প্রশ্ন উঠেছিল এবং সে সময়ের প্রথিতযশা সমালোচকদের অনেকেই বলেছিলেন তাঁর আদর্শ নীতি ও কর্মপন্থা সবই ভ্রান্ত ও বর্জনযোগ্য। তবু কেন তাঁকে অনুসরণ করেছিল এবং তিনিও সমকালীন নেতাদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হতে পেরেছিলেন। তিনি জাতীয় ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং বিশ্ব রণাঙ্গনেও একটা নিজস্ব উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যখন তাঁর সমালোচক নেতারা কেউ কারাগারের নিষ্ক্রিয়তায় কেউ বাইরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায় কালাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শ তাঁর জীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলেই তার প্রাসঙ্গিকতা বাস্তব জগতে সমালোচকদের মতামতকে উপেক্ষা করেই আজও বর্তমান। তাঁর মতাদর্শের উৎস তাঁর জীবন দর্শন। তিনি কৈশোর-যৌবনে জীবনের মৌল প্রশ্নগুলি নিয়ে বহু ভেবেছেন, পড়েছেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কলেজে তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দর্শন ও মনোবিদ্যা ছিল; তিনি সিলেবাস-বহির্ভূত দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও মনোবিদ্যা সংক্রান্ত বহু বই পড়েছিলেন। ইংলণ্ডে আই, সি, এস হতে গিয়েও তিনি দর্শন ও নীতিশাস্ত্র নিয়ে আলাদাভাবে পড়াশুনা করেছিলেন;—মান্দালয় থেকে লেখা চিঠিগুলি, যা Correspondence 1924-32 বইতে গ্রথিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় তিনি ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র নিঃশেষে পড়েছেন। ইয়োরোপীয় দর্শনেও ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। এর সঙ্গে, সকলেই জানেন, যুক্ত হয়েছিল তাঁর তীব্র সত্যানুসন্ধানের বাসনা—যেজন্য তিনি একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে হিমালয়ের অভিমুখে গিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র দার্শনিক প্রতীতির ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন হেগেলের দার্শনিক মতবাদকে—এবং তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কাছাকাছিও এসেছিলেন। বেদান্তের মায়াবাদকে তিনি স্বীকার করেননি পাশ্চাত্য বস্তুবাদকেও নয়। তিনি লীলাবাদে আস্থা স্থাপন করেছেন এবং বিশ্বলীলার মূলে অনুভব করেছেন প্রেম। জগৎ ভালোবাসায় গঠিত—জ্ঞান বলো, শক্তি বলো তার অন্তিম সার্থকতা প্রেমে। সুভাষচন্দ্র মনে করেন ব্যক্তির জীবন গঠিত হয়নি মাত্র অণু-পরমাণু সমবায়ে—ব্যক্তিসত্তা একমাত্র দেহ বিবর্তনের পরিণাম-জাত নয়; তার মধ্যে নিহিত আছে একটা উদ্দেশ্য ও মিশন। তাঁর কথায়:

I see purpose and design in nature; I discern an increasing purpose in my own life. I feel that I am not a mere conglomeration of atoms. I perceive, too, that reality is not a fortuitous combination of molecules.—My Faith Philosophical.

সুভাষচন্দ্র গতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তিনি জগৎকে স্থিরস্থিত পদার্থ মনে করেন না। তিনি বলছেন শেষ বিচারে জগৎ ও জীবন ideaর প্রকাশ; idea মরেনা, অনশ্বর। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত idea জীবন্ত থাকে। বার্মার ইনসিন জেল থেকে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্রে তিনি এমনকি তাঁর রাজনৈতিক সংঘাতমূলক কর্মধারাকেও ideaর প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছিলেন:

The longer I live in goal, the stronger does the conviction grow within me that the struggles in this world are at bottom conflicts of ideas—conflicts between false ideas and true—or as some would like to say, between different degrees of reality or different degrees of truth. Ideas are the stuff of which human movements are made and they are not static but dynamic and militant. They are as dynamic as the Absolute Idea of Hegel, the Blind will of Hartmann and Schopenhaur, the 'elan vital' of Henri Bergson. Ideas will work out their own destiny and we who are but clods of clay encasing sparks of the Divine Fire have only got to consecrate ourselves to these ideas. (১৬. 5. 27-এর চিঠি, Correspondences pp 361)

তিনি এই সঙ্গে আরও বলেছেন, আমার এ দেহ থাক বা যাক আমি যদি এভাবে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারি তাহলে আমার জীবন সার্থকতামণ্ডিত হবেই। আমি যে idea-র জন্য দাঁড়িয়েছি তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই আমার শারীরিক স্বাস্থ্য বা ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তো কোনো বস্তুগত লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করছি না। আমি দাঁড়িয়েছি স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ নিয়ে।

এই চিঠি তিনি যখন লিখছিলেন তখন মৃত্যু তাঁর শিয়রে, যক্ষ্মায় শীর্ণ তাঁর দেহ, সুদূর প্রবাসের কারাগারে বিনা চিকিৎসায় তিনি জীবনপাত করছেন। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার দাবী উঠেছে, বিপদাশঙ্কায় সকলে কাতর এবং সরকারও শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব পেশ করেছেন। শর্তহীন মুক্তির দাবীতে তিনি সরকারী

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন মরে যাব তবু আমার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবনা। এই সভার মতো, আরামপ্রদ ঘরে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা বিচার করা এক কথা, আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিজের সত্যোপলব্ধির প্রতিষ্ঠা দান করা আর এক কথা; সুভাষের দার্শনিক প্রতীতির ভিত্তি কত দৃঢ় ও মজবুত তার সাক্ষ্য তাঁর আচরণ। কাহিনীর উপসংহারে বলি, সরকার সুভাষচন্দ্রের দাবী মেনে নিয়েছিলেন।

হেগেলের মতের সঙ্গে এইখানে আছে সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক প্রত্যয়ের মিল: উভয়েই বলেছেন যে বিশ্বক্ষেত্রে Idea—নিজেকে অভিব্যক্ত করে চলেছে; এবং সংঘাত ও সংগ্রাম এই অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই এসেছে। গোটা বিশ্বই গতিবিধৃত; সুভাষচন্দ্র হেগেলের এ-কথায় সায় দেন না যে প্রাশিয়ান রাষ্ট্রে পৌঁছে সে গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, কিংবা সত্যোপলব্ধির চূড়ান্ত দশা এসে যাবে মার্ক্সীয় মতবাদে পৌঁছেই। না, বিশ্বের বিবর্তন কোথাও কোনদিন থামবে না; তা চরৈবেতি চলবে। আর সত্যের উপলব্ধিরও শেষ নেই। ব্রহ্মের ইতি নেই; যেমন বলেছেন রামকৃষ্ণ।

অনন্ত সত্য অনন্ত জীবনধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে—ব্যক্তি সেই প্রবাহেরই জাতক; আসলে ব্যক্তি অভিব্যক্তিরই একটি স্বাক্ষর। সাধারণ মানুষও তার অন্তশ্চেতনায় এ কথাটি জানে। তাই সে প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়, আমরা বলি যাকে গড্ডালিকাপ্রবাহ। সাধারণ মানুষ তাতেই নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ পুরুষের মধ্যে আত্মচেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে, সে গতানুগতিক প্রথায় জীবন বহন করতে পারে না; তার মধ্যে প্রশ্ন জাগে, তার জীবনের অর্থ কী, এই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, এবং জীবনের সার্থকতা দাবী করছে কোন পরিণতি, যে মানুষ সচেতন বলে নিজেকে দাবী করে এই মৌল প্রশ্নগুলি থেকে তার অব্যাহতি নেই।

সুভাষচন্দ্র এই প্রশ্নগুলি নিজের জীবনে উত্থাপন করেছিলেন বেশ গোড়ার দিকেই। এবং তিনি এই অবিচল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর জীবনের একটা গভীর তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য বা mission আছে; বিশ্বজীবনের ছন্দের সঙ্গে তাঁর নিজ জীবনের ছন্দকে সুষমার মধ্যে মিলিয়ে দিতে পারলেই সে mission পূর্ণ হবে; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তথা নিরবধি প্রবহমান কালের ছন্দের সঙ্গে তাই তাঁর হৃদয়-বীণার ছন্দ বেঁধে নিতে হবে। এক কথায় তাঁকে হতে হবে বিপুলা বিশ্বের জীবন পথের পথিক।

তিনি কবি বা রসপিপাসু দর্শকের মতো জীবন-সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে শুধু রস গ্রহণে তৃপ্তি পাননি। কারণ তাঁর সত্তার মূল উৎস থেকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছে প্রেমের প্রবাহ—ভালোবাসায় আলিঙ্গন করেছেন তিনি জগৎকে। সে এমন ভালোবাসা যার কাছে সব লাভক্ষতি সম্ভব-অসম্ভবের ভাবনা তুচ্ছ হয়ে ভেসে যায়। সে তেমন ভালোবাসা

যার প্রেরণায় আর নিজের নির্বাণ নিয়ে তৃপ্তচিত্তে বসে থাকতে পারেন নি বুদ্ধদেব, ছুটে এসেছেন দুঃখপিষ্ট জরাক্লিষ্ট মানবসংসারে; সে এমন ভালোবাসা যার প্রেরণায় ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে দুর্ভাগ্য জীবের বেদনাবিষ কণ্ঠে ধারণ করে ক্যান্সারে আত্মাহুতি দিলেন রামকৃষ্ণ।

সেই যে এক শীতরজনীতে হিমালয়ের তুষারাবৃত পথ ডিঙিয়ে অজানা ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র সে প্রেম ছাড়া আর কিসের প্রেরণায়? রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা মানুষকে অবলীলাক্রমে এমন ত্যাগবরণে উদ্বুদ্ধ করে না। ত্রিপুরী কংগ্রেসের আবিল ও ক্রুর ঘটনাবলীর আঘাতে ভেঙে পড়া মন নিয়ে রোগ শয্যায় কাতর সুভাষচন্দ্র একদিন ভাবছিলেন, আর কেন এই রাজনীতি? আমার জীবনে সত্যতর হিমবন্তের আহ্বান—ধ্যানে সমাধিতে তলিয়ে যাওয়াই আমার স্বভাবধর্ম; কেন এই ধূলিমালিন্যে পড়ে থাকি তবে? অমনি তাঁর হৃদয়ের ভিতর আর একটি স্বর বলে উঠল: চল্লিশ কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর কী হবে? তাদের বাঁচার সমস্যা নিয়ে কে ভাববে? তুমি কি তাদের ত্যাগ করে যাবে?

সুভাষ অতল নৈরাশ্যের মধ্যেও প্রেমের এ ডাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না—ফিরে এলেন নিষ্ঠুর কঠোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে। জীবনের এই অভিজ্ঞতার সারাৎসার তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই কয়টি কথায়:

I come to the conclusion that essential nature of realtty is love. I have come to this conclusion partly from a rational study of life in all its aspects—partly from intuition and partly from pragmatic considerations. I see all around me the play of love. I perceive within me the same instinct. I feel that I must love in order to fulfil myself and I need love as the basic principle on which to reconstruct life. জীবনের মূল সূত্র রূপে, আমি অনুভব করতে চাই, প্রেমকে—কার উক্তি? আপসহীন সংগ্রামের কথা যিনি বলতেন এ তেমন একজন মানুষের উক্তি।

তবে কি স্ববিরোধ আছে তাঁর উপলব্ধি ও তাঁর কর্মের মধ্যে? নেই। গণশক্তির জাগরণ ঘটানো ও দুর্দমনীয় শক্তির দমন মহাপ্রভুর কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল একথা ভোলা চলে না। যারা ঋত-চ্ছন্দের উপাসক তাঁদের রীতিই ঐ;—ইন্দ্রের মতো বজ্র হানতে হবে তাঁদের ছন্দ অপহারী সুর-বিনাশীদের দুর্ভেদ্য দুর্গের ওপর। বিশ্বের সুষমাকে যারা নষ্ট করে, ছন্দ পতন ঘটিয়ে দেয় তারাই দানব, দৈত্য ও অসুর। তারা বিশ্বের অকল্যাণকারী, প্রগতির হন্তারক; তারা চরৈবেতির মন্ত্রকে দিতে চায় ম্লান স্তব্ধ করে। ঋত পথকে তারা অবরুদ্ধ করে। তারাই সাম্রাজ্যবাদী, জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেয় অন্যায়। তাদের সবলে অপসারণ করে ন্যায়ের

পথ বাধামুক্ত করলেই বিশ্বের ভারসাম্য ফিরে আসবে, ফিরে আসবে জগতের কল্যাণ, ছন্দ ও সুষমা। যুগে যুগে এই একই সত্য প্রবাহিত হয়ে আসছে।

সুভাষচন্দ্র ইনসিন জেল থেকে লেখা তাঁর পূর্বোক্তত পত্রে লিখেছিলেন, বিশ্বের বাজারে পণ্যের কেনাবেচা করতে আমি আসিনি, আমি লাভের কাঙাল নই। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছি আমি। ন্যায় ও সত্য ;—বেদে একই কথা বলা হয়েছে এতে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর সমকালে ঋত পথের বিরোধী শক্তিদের আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা পরাস্ত করে অপসারণ করতে ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তারই অঙ্গ মাত্র।

অনেকের ধারণা সুভাষচন্দ্র নিছক জাতীয়তাবাদী। হাঁ জাতীয়তাবাদী তিনি ছিলেন, কারণ জাতির আত্মবিকাশ মানবজাতির আত্মবিকাশের সোপান ও অঙ্গ। কিন্তু বারবার তিনি মানবমুক্তির ব্রতের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এমন কি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই, কারণ জগতের শোষণ-মুক্তির জন্যই তার দরকার। কাবুল থেকে লিখে পাঠানো তাঁর প্রবন্ধ Forward Bloc—Its Justification এ তিনি বলেছিলেন, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য ; ভারতের মুক্তি চাই কেননা বিশ্বজনের চিরন্তন প্রবাহে আর সব জাতির সঙ্গে ভারতেরও আপন অবদান রাখতে হবে। উল্লেখনীয়, এই কথাগুলি তিনি লিখেছিলেন ভারত থেকে দুর্গম পথে পশ্চিমের রণাঙ্গনে যাবার সময়। ঐ সঙ্কটলগ্নে তিনি তাঁর উপলব্ধির সারাৎসার লিখে রাখছিলেন—অলীক উক্তির সেখানে অবকাশ ছিল না।

এই পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবন-দর্শনের যে পরিচয় পেলাম,—আমার জিজ্ঞাসা, আজকের দিনে তা কি অপ্রাসঙ্গিক ? এই সব প্রশ্ন, এই সব উপলব্ধি, এই সব প্রত্যয় মানুষের চিরন্তন সম্পদ ; চিরকাল এইগুলি মানবজীবনে ফিরে ফিরে আসবে, ফিরে ফিরে চাইব আমরা। যে দর্শনই আমরা গড়ে তুলি, যেমনই হোক আমাদের প্রত্যয়, এই মৌল প্রশ্নগুলি চিরকালই আমাদের কাছে উত্তর দাবী করবে। এবং একথা অনস্বীকার্য যে সুভাষচন্দ্র যে বলিষ্ঠ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশ্নগুলির বিচার ও মীমাংসা করেছেন সে দৃষ্টিভঙ্গীও চিরকালই প্রাসঙ্গিক থাকবে।

সুভাষচন্দ্রের সমাজ ভাবনা, রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক চিন্তা তাঁর জীবনদর্শন থেকে উৎসারিত হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন তিনি একজন চিন্তানায়ক ছিলেন না, ছিলেন কর্মবীর। এ ধারণা জন্মাবার কারণ তিনি বসে বসে পুঁথি লেখেননি, কর্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন। অনেকেই লক্ষ্য করতে ভুলে যান যে সুভাষচন্দ্রের রচিত বইগুলি বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে এবং তাঁর রচনা ও বক্তৃতাবলী মুদ্রিত হলে তার ভার কম হবে না। স্বামী বিবেকানন্দও বেশি পুঁথি

লেখেননি। তাঁর বইগুলির অধিকাংশই তাঁর বক্তৃতার সংকলন। সেজন্য কেউ কি বলেছেন যে স্বামীজী একজন চিন্তানায়ক ছিলেন না? সুভাষচন্দ্র নিজেই তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন: "আমার মনে হয়, প্রথমে এবং সর্বাগ্রে চিন্তাবিদ হবার জন্যই প্রকৃতি মূলতঃ আমাকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের পাকে পড়ে আমার জীবন হয়ে ওঠে অশান্ত রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার জীবন।" (১৯৪০ সালের ২৯শে নভেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলে লেখা প্রবন্ধ।)

তাঁর এই উক্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত;—তাঁর সমকালে মননশীলতায় তাঁকে আর কোনো জাতীয় নেতা অতিক্রম করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি। দেশবন্ধুর জীবনের শেষ চার পাঁচটি বছর তাঁর চরম রাজনৈতিক সাফল্যের কাল; গান্ধী-বৃত্তের বাইরে এসে তিনি সেসময় সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং গান্ধীজীকে পরাজয় স্বীকার করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতেও হয়েছিল। দেশবন্ধুর এই সাফল্যের পর্বে তাঁর প্রধান ও ঘনিষ্ঠতম সহচর ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সকল বিষয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধুর পরামর্শ চলত এবং দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি গঠনের সময় ও পরে যেসব রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার উদ্ভাবনে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধী প্রভাব সারা দেশে ধীরে ধীরে আবার ব্যাপ্ত হয়েছিল; এমন কি স্বরাষ্ট্র দলের অন্যতম স্তম্ভ মতিলাল নেহেরুও গান্ধীজীর ছত্রছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় সমগ্র ভারতে মৌলিক নীতিগত ভিত্তিতে গান্ধীজীর বিকল্প নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন একা সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর এ ভূমিকা কোনোদিনই ক্ষণতরেও ম্লান হয়নি। সমৃদ্ধ মননশীলতার অধিকারী না হলে এ ঘটনা কি সম্ভব হত? আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি, আজাদ হিন্দ সরকার পরিচালনা বা তাঁর যুদ্ধনীতি চিরকাল তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা কতদূর মৌলিক ছিল আজ সে প্রশ্ন আলোচনা করব না। কারণ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা আজও কতটা প্রাসঙ্গিক সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের দেশের প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে সমাজে, রাষ্ট্রে নয়। তিনি সমাজশক্তির জাগরণ ঘটাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সমাজের জাগরণ তাঁরও কাম্য ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের বৃহৎ ভূমিকা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্র তাদের মধ্যে এখন অগ্রাধিকার লাভ করছে, ভারতে সমাজ শক্তিশালী ছিল, রাষ্ট্র নয়। আমাদের জাতীয় ঐক্য সাধিত হয়েছিল সংস্কৃতির ভিত্তিতে —রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধিত হয়নি, হলেও তা স্থায়ী

হয়নি। অথচ ভারতের ইতিহাসের ভিতর রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিধানের তাগিদ ছিল না তা নয়। পৌরাণিক কালেও রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজচক্রবর্তীত্ব প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতির মূল প্রেরণা এসেছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার তাগিদ থেকে। তবু ভারতের প্রতিভা বিশাল ভারতে এক অখণ্ড রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং সেই রন্ধ্রপথে বারবার এসেছে রাজনৈতিক পরবশ্যতা। রাজনৈতিক পরাধীনতা দেশের প্রাণশক্তিকে শুকিয়ে এনেছে; তার ফলে আমাদের সংস্কৃতিতে এসেছে অবক্ষয়, আমাদের সামাজিক বিবর্তন হয়েছে রুদ্ধ। জাতিগতভাবে আমরা পঙ্গুতা বরণ করেছি।

সুভাষচন্দ্র ভারত-ইতিহাসের এই গতি ও পরিণাম লক্ষ্য করে লিখেছিলেন যে স্বাধীনতা লাভ করার পর আমাদের সর্ব প্রযত্নে একটা শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে স্থায়ী ভিত্তিতে। একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের কী কী থাকা দরকার? আধুনিক সমরাস্ত্রসম্ভার সমৃদ্ধ ও আধুনিক রীতিতে গঠিত একটি দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী; দৃঢ় ও মজবুত প্রশাসন, দক্ষ ও সৎ সরকার এবং সন্তুষ্ট ও উদ্যমশীল জনসাধারণ। এই সব বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সমকালীন নেতাদের মতবিরোধ হয়েছিল। গান্ধীজী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নীরব, তাঁর প্রধান শিষ্যদের অনেকে সৈন্যবাহিনী তুলে দেবার পক্ষে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন খুব স্পষ্ট ভাষায়: যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে সেই মুহূর্তে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেব ভারতের স্বাধীনতা যাতে সুরক্ষিত হয় সেজন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। আমরা সেজন্য আধুনিক সমর শিল্প গড়ে তুলব যাতে প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় অস্ত্র আমরা নিজেরাই তৈরী করতে পারি। এবং সেজন্য শিল্পায়নের একটা বড় কর্মসূচী নিতে হবে। সুভাষচন্দ্রের এই চিন্তাধারা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক কি না ১৯৬২ সালের মর্মন্তুদ আঘাতের পর চোখের জলে সেকথা স্বীকার করে গিয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন।

টোকিও বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন প্রতিরক্ষার পরই দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবে বেকার সমস্যা দূর করার কর্মসূচী। Our second most important problem will be how to give employment to the millions of unemployed in India and how to relieve the appalling poverty which now exists among the masses of the Indian people—১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন, আর এখনও ভোট-যুদ্ধে পরীবী হঠাও-এর শ্লোগান দিয়ে আমাদের নেতারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক কি না তা বিচার করার আগে ভাবতে হবে সারা ভারতে এখন ৭০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই এক কোটি, প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি।

এমন কি ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৭৫ সালে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং ১৯৪৩ সালে বাংলায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পর ১৯৭৪ সালে সারা ভারতে বহু ব্যাপক প্রকৃত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্ভিক্ষ যাতে না দেখা দেয় দেশে, দারিদ্র্য না থাকে, বেকার না থাকে—সেই লক্ষ্যকে সুভাষচন্দ্র প্রতিরক্ষার পরই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের সরকার তা দেননি। তার নীতি যথার্থ? দেশের পক্ষে কার নীতির প্রাসঙ্গিকতা বেশী!

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবে শিক্ষার সমস্যা। শতকরা একশজনকেই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে হবে, সাধারণ লেখাপড়ার সুযোগ সবাইকে দিতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্যতা যার আছে তাকে সে সুযোগও দিতে হবে। দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতের সরকারগুলির কানে এ বার্তা সম্ভবত পৌঁছায়নি। আজ সারা ভারতে শিক্ষা-সংস্কারের দাবী উঠেছে। সরকার শিক্ষার সমস্যা নিয়ে বিব্রত নন। নিরক্ষরতার প্রসার বাড়ছে, উচ্চ শিক্ষা ভেঙে পড়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাও কলুষতায় আবিল হয়ে উঠেছে। মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার সুযোগ দিলে তাকে "যুগ যুগ জীও" ধ্বনি দেবার নির্বোধ মিছিলে সামিল করা যায় না; কর্তৃপক্ষ তাই শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে অনাগ্রহী হতে পারেন, কিন্তু জাতি গড়ে ওঠে না।

সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা, দারিদ্র্য অপসারণ ও জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার এই কর্মসূচী সফল করব কিভাবে? তাঁর মতে, বেসরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে প্রধান ভূমিকা নিয়ে। দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির আধুনিকীকরণ আমাদের দেশে খুব দ্রুত চাই। যত শীঘ্র সম্ভব দেশের মানুষ যাতে নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে সে দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র বলছেন, প্রশ্নগুলিকে দেখতে হবে জনগণের দিক থেকে। দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি এলেও তার ভাগ যদি জনগণ না পায় তা হলে চিয়াং কাই-শেকের চীনে যে বিভ্রান্তি এসেছিল ভারতে তাই আসবে। কুও মিং টাং পার্টি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করলে চীনে গৃহযুদ্ধের দরকার হত না। সুভাষচন্দ্র বলছেন, স্বাধীন ভারত যেন চিয়াং কাই শেকের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করেছে জনগণের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে; দেশবন্ধুও বলেছিলেন স্বরাজ মুষ্টিমেয়ের জন্য নয়, কৃষক শ্রমিক তথা জনসাধারণের জন্য। যদি ভারতের জাতীয়তাবাদীরা জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত না করে তাহলে ভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ ও বিপ্লব আসবে। ১৯৪৪-এর এই উক্তি কি সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলল? ভারতের আকাশে বাতাসে সর্বাত্মক বিপ্লবের ধ্বনি তো গুঞ্জরিত হতে সুরু করেছে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর যৌবনকাল থেকে গণরাজ্যের আদর্শের কথা প্রচার করে এসেছেন। তিনি

অসংখ্য সভায় বলেছেন যে তিনি গণতন্ত্র চান, রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি সেই সঙ্গে সর্বদাই বলতেন যে বৃটিশ পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রই যে তিনি চাইছেন তা নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ আমাদের দেশে ছিল। রিপাবলিক ছিল, আজও সে ঐতিহ্যের অবশেষ আছে আদিবাসীদের মধ্যে। আসামে বোরো উপজাতিদের বিধি-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তাধারা সাময়িক ডিক্টেটরশিপ তথা অথরিটারিয়ান ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে ছিল। ত্রিশের দশকের দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ইয়োরোপে ছিলেন, তখন তিনি চোখের সামনে দেখেছেন হিটলারের উত্থান ও সাফল্য। ইতালির ফাসিস্ত সরকারের শক্তি সংহতি ও গঠন দক্ষতা, এবং রাশিয়ার স্তালিনী শাসনের দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্রকাঠামোর সংহতি সাধন। সুভাষচন্দ্র কোনোটারই পুরো সমর্থক ছিলেন না, না বা ছিলেন অন্ধ বিদ্বেষী। এমন কি ফ্যাসিজম ও বোলশেভিজমকে তিনি আদৌ বিপরীত ধর্মী মতবাদ মনে করেন নি। জওহরলাল নেহেরু যখন বলেছিলেন ভারতকে বেছে নিতে হবে ফাসিজম ও বোলশেভিজমের মধ্যে; সুভাষচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, মানব-প্রগতির শেষ কথা ঐ দুটি মতবাদেই নিঃশেষে বলা হয়ে যায়নি; আমরা ভারতের নতুন মতবাদের কথাও ভাবতে পারি, যার মধ্যে অবশ্যই স্বীকৃত হবে ফাসিজম ও বোলশেভিজমের ইতিবাচক অবদানগুলি। তাঁর এই কথা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু ইংলণ্ডে রজনী পামী দত্তকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, তিনি ফাসিজম বা কমিউনিজমের পক্ষে ওকালতি করেননি; কিন্তু জার্মানী ইতালি বা রাশিয়ার কর্মসাধনার প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকতেও চাননা। টোকিও বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে সমস্যার সমাধান করব: We will, naturally, study experiments made in other countries—but, after all, we hnve to solve our problems in an Indian way and under Indian conditions. এই কথাটায় আজ আর বিতর্ক সৃষ্টি হবে না আশা করি; কারণ কমিউনিষ্ট চীনও দেশগঠনের কাজে রাশিয়ার পথ পরিহার করেছে; মাও সে তুঙ স্তালিনী পদ্ধতি, যথা মুখ্যত ভারী শিল্পের ওপর জোর দান—মানতে চাননি বলেই ১৯৬০-এর দশকে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধিতা সুরু হয়েছে। চীন চীনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চীনা পথ নিয়েছে। স্বাধীন ভারত না নিয়েছে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্রের পথ, না সমাজতান্ত্রিক পথ না একটা প্রকৃত ভারতীয় পথ। বিদেশের ঋণ, ডেফিসিট ফিনান্স, অসহনীয় করভার—এই তিনের সহায়ে স্বাধীন ভারতে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়েনি; রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্পগুলির ভাগের মা গঙ্গা পায়না অবস্থা; এই

অর্থনীতি প্রসব করেছে রাশি রাশি কালো টাকা, মুদ্রাস্ফীতি ; অসম আঞ্চলিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক —সামাজিক অসাম্য। সুভাষচন্দ্র সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, কেতাবী বুলি ও নকল নবীশী বিদ্যা দিয়ে দেশ গড়া যাবে না। পণ্ডিতজী আদৌ সে কথায় কর্ণপাত করেননি। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তই এখন চলেছে।

ভারতের কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে জাতির অবনমিত মানসিকতা, ভাষা ধর্ম ও বর্ণজাত সংঘাত, বহু সংখ্যক দেশীয় রাজ্যের অবস্থিতি, জনগণের ব্যাপক অশিক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে স্বাধীন ভারতের প্রথম দিকেই ওয়েস্টমিনিস্টার-মার্কা গণতন্ত্র সুফলপ্রদ হবে বলে সুভাষচন্দ্র আশা করেননি। স্পেনের বিপ্লব ও ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি দেখেছিলেন। স্পেনে সোস্যালিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেই নারীদের ভোটাধিকার দিয়েছিল। নারীরা নির্বাচনে গীর্জা ও পুরোহিত-নির্ভর দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলিকে দলে দলে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিল—স্পেনে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে তার ফলে গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। ফ্রান্সে যুক্তফ্রন্টের পরিণতি হয়েছিল প্রায় পশ্চিমবঙ্গের বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির মতো : শ্রমিক কর্মচারী ও জনতা সেখানেও গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে রোজ বেতন বৃদ্ধি, কাজ-না-করা, ঘেরাও, উশৃঙ্খলার আবরণের অধিকার মনে করেছিল ; তার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল, দক্ষিণপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটল। সুভাষচন্দ্র স্পেন ও ফ্রান্সের এই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেই লিখেছেন স্বাধীন ভারতের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করার উদ্দেশ্যে অথোরিটারিয়ান চরিত্রের একটি রাষ্ট্র দরকার হবে। কিন্তু তার একটা সর্তও আছে। সে রাষ্ট্রকে হতে হবে জনগণের প্রতিষ্ঠান, জনগণের সেবক। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বা ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র হলে চলবে না।

যুদ্ধকালে জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন বা কথাবার্তা বলেছেন তাতে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের জাল বিছানো থাকবে দেশে। ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে জনগণের হাতে—All power to the Indian people, এই তাঁর সুবিখ্যাত দাবী। জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে তারা বাধাও পাবেনা, এটা সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যভিচার। জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধি এইগুলি তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। অথোরিটারিয়ান রাষ্ট্রের যে চেহারা তিনি জার্মানী বা ইতালিতে দেখেছিলেন তা তিনি সমর্থন করেননি। কিটি কুর্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে নাৎসী-বাদ ও ফাসিজমের কঠোর সমালোচক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। নাৎসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

ধিক্কারজনক, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রয়োজনে আমাকে করতেই হবে। স্তালিনীয় স্বৈরতন্ত্রের ও তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়ার যে সকল দিকের প্রশংসা করেছেন তিনিও ততটুকুই পক্ষপাতী, সার্বিক স্বৈর দমন নীতির নয়। লণ্ডনে ভারতীয়দের তৃতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতে আমরা যে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই তার ভিত্তি হবে ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা। ভারতের জনগণের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা আমরা প্রতিষ্ঠা করব—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। It will wage a relentless war against bondage of everykind till the people can become really free. জনগণ যেন প্রকৃত স্বাধীনতা পায় সেজন্য যে কোনো রকম, বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর পার্টি নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। সে সময় তিনি কংগ্রেসের ভিতরই সাম্যবাদী সংঘ নামে একটি পার্টি গঠনের প্রস্তাব করছিলেন।

সাম্যবাদী সংঘ গঠিত হয়নি, ফরোয়ার্ড ব্লক হয়েছিল। দেশত্যাগের পর কাবুলে উত্তম চাঁদ মালহোত্রার বাড়িতে বসে লেখা Forward Bloc—Its Justification প্রবন্ধে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র কোন চরিত্রের হবে এবং অর্থনীতির কাঠামোই বা কী হবে সে সম্পর্কে আটটি পয়েন্ট তিনি লিখেছিলেন :

(১) পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে রাষ্ট্র।

(২) সম্পূর্ণ আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে।

(৩) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উৎপাদন যাতে হতে পারে সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

(৪) উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের উপরই থাকবে সামাজিক মালিকানা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

(৫) ব্যক্তির ধর্মীয় উপাসনা স্বাধীনতা থাকবে।

(৬) প্রত্যেক ব্যক্তি সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করবে।

(৭) ভারতের প্রত্যেক ভাষাভাষী জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হবে —নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাবার স্বাধীনতা সবারই থাকবে।

(৮) স্বাধীন ভারতে যে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে তার ভিত্তি হবে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের।

শাখারভ বা সলঝেনিৎসিনও এই ঘোষণাগুলিকে পরীক্ষা করলে সুভাষচন্দ্রকে স্তালিনের সর্বাত্মক দমননীতির সমর্থক বলতে পারবেন না। বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা এই ঘোষণায় সুরক্ষিতই হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র যে অথোরিটারিয়ান রাষ্ট্রতন্ত্র অন্তত সাময়িকভাবে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাকে স্বৈরাচারতন্ত্র বলা চলে না, সর্বাত্মক স্বৈরাচারতন্ত্র তো নয়ই। তার ভিত্তি হবে জনগণের স্বাধীনতা, কিন্তু

একটা দৃঢ়চেতা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশ শাসন করবে, যে সরকার হবে জনগণের সেবক। "We must have a Government that will function as the servant of the peoplo and will have full powers to put through new reforms concerning industry, education, defence, etc, in Free India." (Tokyo speeeh)

স্বাধীন ভারতে এ পর্যন্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রোগ-নির্ণয় ও পথ্য প্রদানে সুভাষচন্দ্রের সুপারিশ ভ্রান্ত ছিল না। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করেনি। তাদের দারিদ্র যত বাড়ে তত বাড়ে করভার। বৈধ ও অবৈধ অত্যাচার, প্রকাশ্য ও গোপন উৎপীড়ন জনগণের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। খাদ্যাভাব বেড়েছে। শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম। জনগণের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও জীবিকার দাবী মেটাতে পারেনি বলেই ভারতের গণতান্ত্রিক সৌধের ভিতর থেকে ধ্বস নেমেছে—জনগণের শ্রদ্ধা হারিয়েছে সংসদ।

আমি মাওবাদের সমর্থক নই। কিন্তু চীনের অথোরিটারিয়ান রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভারতের চেয়ে অধিক মাত্রায় সাফল্য লাভ করেছে এ তো গ্যলব্রেথ প্রমুখ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকরাও বলছেন। শক্তিশালী দেশ ও জাতি গড়তে গেলে প্রাচ্যের পশ্চাৎপদ দেশে সাময়িকভাবেও শক্ত হাতে দেশের পরিচালনা-ভার নিতেই হবে সরকারকে। লাইসেন্স পারমিট ঘুষ কমিশনের ও দুর্নীতির দুর্বল, শিথিল ও কলুষিত পরিমণ্ডল যদি দেশে পড়ে ওঠে গণতন্ত্রের নামে তবে জাতির মেরুদণ্ডে পচন ধরবে, ধরেছে। শিথিলতা পরিহার্য, ক্লীবতাও। শত শত শতাব্দীর পর যে জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে প্রথমেই দরকার তার জাতীয় চরিত্র গঠন; সে কাজ নিষ্পন্ন হবার আগে যাতে জাতীয় চরিত্র এলায়িত হয়ে পড়ে; জাতির মন নরম মসৃণ কিন্তু চালু পথে গড়িয়ে যায় পাতাল মুখে সে ব্যবস্থা আমদানী করে লাভ কী? লাভ হয় না তা এখন তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আমরা বুঝছি। রামমনোহর লোহিয়া এম, পি বলেছিলেন: সংসদীয় গণতন্ত্র? ওটা কিছু নতুন জমিদার সৃষ্টির উপায় মাত্র। কথাটা পুরোপুরি অহেতুক নয়।

হরিপুরায় কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: আমরা সমাজতান্ত্রিক নীতিতে দেশের পুনর্গঠন করব, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত দল থাকবে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।—পরন্তু, the democratic basis of the party will ensure that leaders are not thrust upon the people from above, but are elected from below, কংগ্রেস বা ভারতের

যেসব রাজনৈতিক দল সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারায় ফাসিজমের গন্ধ খুঁজে বেড়ায় তারা এ নীতি অনুসরণ করে কি? পার্টি তহবিলে বা কোনো কোনো নেতার ব্যক্তিগত তহবিলে টাকা জমা দিয়ে নির্বাচনের সময় প্রার্থী রূপে মনোনয়ন পাওয়া যায় একথা সবাই জানে। পার্টি-মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে আসা ছাড়া জনগণের আর কোনো কর্তব্যও নেই, অধিকারও নেই—এই কি প্রকৃত গণতন্ত্র? সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা বর্তমান ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি প্রাগ্রসর, একথা মানতেই হবে।

হরিপুরার ভাষণে সুভাষচন্দ্র জাতীয় প্লানিং কমিশন গঠনের কথা বলেছিলেন এবং তাঁর সভাপতিত্বকালে তাঁরই উদ্যোগে প্রথম জাতীয় প্লানিং কমিটি গঠিত হয়েছিল। তিনি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে পরিকল্পিত অর্থনীতি এদেশে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধও দেখা দেয় সেজন্য। তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল যে সব কারণে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল এই প্লানিং কমিশন গঠন। অথচ ভারত স্বাধীন হলে জওহরলাল প্লানিং কমিশন গঠন করেছিলেন ও পঞ্চবার্ষিকী যোজনা প্রচলন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে এজন্য তিনি ঋণী এবং আমরাও।

হরিপুরা ভাষণে আরও একটা কথা তিনি বলেছিলেন প্রায় ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো:

The first thing to do is to change the composition and character of the bureaucracy. If this is not done, the Congress Party may come to grief. মন্ত্রীরা আসে যায় কিন্তু স্থায়ী আমলারাই প্রশাসন চালায়। আমলাতন্ত্রকে পুনর্গঠিত করে না নিলে সরকারের প্রগতিশীল নীতিগুলি কার্যকর করা যায় না। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও ১৯২৪-২৯ সালে ইংলণ্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসে এই প্রয়োজনীয় কাজটি করেনি বলে তাদের অনুতপ্ত হতে হয়েছে। জওহরলাল থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত কেউই সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেননি;—ইংরেজের রেখে যাওয়া আমলাতন্ত্র যা মুখ্যত আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল, উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের জন্য নয়—তাই বজায় রইল, বরং নানা শাখায় উত্তরোত্তর তারা বেড়েছে, কিন্তু তাদের চরিত্রগত অধোগতি ছাড়া উন্নতি কিছু হয়নি। তার ফলে সরকারের ঘোষিত সাধু নীতিগুলি কার্যকালে ভিন্ন আকার ধারণ করে এবং সরকারী উদ্যোগগুলি শিব গড়তে গিয়ে বানরের অবস্থা লাভ করে। সরকারী দলের প্রগতিশীলরাও আজকাল এই কথাটা প্রায়ই কবুল করে থাকেন।

সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আমি উল্লেখই করতে পারব না, কারণ আলোচনার জন্য বরাদ্দ সময়-সীমা অতিক্রম করে নিয়েছি! অনেকেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

কিন্তু জীবনে সেই নীতি ও আদর্শ পালন করেন না। ঘোষিত আদর্শ ও জীবনের আচরণ প্রায়ই সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী দেখতে পাই। তার ফলে সব ঘোষণাই শুধু কথামাত্র পর্যবসিত হয়ে যায়। এই ভাবে কথার মূল্য ক্ষয়ে যায়। সেই বাণীই মূল্যবান ও ফলবান যার পিছনে আন্তরিক বিশ্বাস আছে ও নিষ্ঠা সহকারে সেই বিশ্বাসের প্রয়োগ আছে। সুভাষচন্দ্র এমন কোনো নীতি ও আদর্শের কথা বলেননি যা তিনি বিশ্বাস করেন না এবং যে নীতি ও আদর্শকে তিনি বাস্তবে অনুসরণ করেননি। তাঁর রচনাবলী ও বক্তৃতার শব্দবন্ধ এমনকি যতি স্থাপনেরও পিছনে তাঁর জীবন্ত হৃদয়ের উত্তাপ আমি অনুভব করতে পারি। আজাদ হিন্দ ফৌজের আবিদ হাসান লিখেছেন: আমরা তাঁকে দেখে ভেবেছি: এ কি একজন মানুষ? এ যে চোখের সামনে দেখছি আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি! তিনি আমাদের মহত্ত্বের পথে আহ্বান জানালেন ও নিজের মহিমা আমাদের মধ্যে সঞ্চার করলেন—তারই ফলে আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আচম্বিতে উন্নত শিরে।

যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, নিম্নতম সৈন্যটিও তখন জেনে গিয়েছে যে ওরা পরাজিত, জয়ের কোনো আশাই নেই। কোহিমার রণাঙ্গন থেকে ওরা ফিরে যাচ্ছে বার্মার দিকে; পাহাড়ী রুক্ষ পথ, মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু বিমান। খাদ্য নেই; ঘাস পাতা খেয়ে সবাই ব্যাধির শিকার। বার্মাও গেলো। নেতাজী সেই দিগন্ত বিস্তৃত ধ্বংস ও পরাজয়ের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বললেন: যুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে আমরা পরাস্ত হয়েছি, কিন্তু আরও অনেক রাউণ্ড যুদ্ধ আমরা করব। কোনো পরিস্থিতিতেই আমি পরাজয় বরণ করে নেব না।

সর্বস্বান্ত হাজার হাজার সেনানী ও নাগরিকের হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রস্বরে স্পন্দিত হয়ে বলে উঠল: হাঁ, পরাজয় মানবনা কোনো কালে। আবার যুদ্ধে যাব; আবার দেব রক্ত—যত চান ভারত জননী। কিসের এ মন্ত্রপ্রচার? এ মন্ত্র প্রভাবের মূল রহস্য হল যিনি আহ্বান জানালেন, সর্বাগ্রে আত্মদান করেছেন তিনি নিজেই। সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শ কতগুলি কথার সমষ্টি নয়; তা জীবনে রূপায়ণের জন্য; অন্তত তিনি তো তাঁর আদর্শের বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেছেন।

যে মতাদর্শ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং যে মতাদর্শকে রূপায়ণের জন্য জীবন নিবেদিত হয়েছে সে মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা এত অল্প দিনে ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় বলে আমার জানা নেই। বরং মনে হয় সুভাষচন্দ্রের কথাগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আজই আরও ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। এবং তাঁর বাণী আরও বহুদিন আমাদের পথ দেখাতে পারবে।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি

বিনয়কুমার বোস

১৯০০ সালের মার্চ মাস হবে মনে হয়। একদিন ঢাকার 'রায়সাহেব' বাজারের নিকট "সুপতিদার" (শ্রীসুপতি রায় [১]) সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে ডেকে বললেন,—তুমি তো বেশ মোটর গাড়ী চালাতে পার। তোমাকে কিন্তু একটি ভাড়ী কাজ করতে হবে। এই কথা শুনে আমি অবাক বিস্ময়ে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে বললাম,-অক্ষয় বসু [২] পি. কে. বোসের ছেলে আমাকে শিখিয়েছে। আর বেশী কথা "সুপতিদার" সাথে হল না। এই কথার পর আমরা দুজনে দুদিকে চলে গেলাম। দল ভাগাভাগির (১৯২৯ এ শ্রীসঙ্ঘ দ্বিখণ্ডিত হয়ে বি. ভির উৎপত্তি হয়) পর "সুপতিদার" সাথে আমার সাক্ষাৎ এই প্রথম।

এর কয়েকদিন পরে আবার দেখা হোল "সুপতিদার" সাথে 'পাত্‌লাখাঁ' গলির মুখে সন্ধ্যে বেলায়। প্রাথমিক কথার পরে "সুপতিদাকে আমি বললাম—সুপতিদা, আমরা একজন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টারের বাড়ী থেকে পুরানো মডেলের বড়

একটি রিভালবার সরিয়েছি। ওটা নিয়ে এসেছে আমাদের দলের (শ্রীসঙ্ঘ) দুটি বোন—শান্তিলতা দাশগুপ্তা ও আশালতা দাশগুপ্তা। ওটার কোন বুলেট ছিল না। রিভলবার এর 'বোর' দেখে মনে হয় ·৪৫ হবে। আমাকে একটা ·৪৫ বুলেট দিতে পারেন? দেখবো ·৪৫ রিভলবার কিনা। তিনি সব শুনে বললেন—আচ্ছা দেখবো।

প্রায় ১০-১২ দিন পর রাত্রি ৯টার সময় "বিনয়দা" (বিনয় বোস [৩]) আমাদের বৈঠকখানা পার হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতেই আমি চট্ করে তাঁর পিছু ছুটলাম। আমাদের আলোবিহীন বারান্দায় আমার হাতে একটি কাগজের প্যাকেট দিয়ে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় কেউ ছিল না—প্যাকেটটি খুলে দেখি দুটো ·৪৫ বুলেট, আনন্দে বুকটা নেচে উঠলো। তখুনি জামাটা গায়ে দিয়ে মিউনিসিপাল রোড-এ ব্যারিষ্টার পি, কে. বসুর বাসায় ছুটলাম। ঐ বাসায় গিয়ে পি.

কে. বোসের ছোট ছেলে দলের সভ্য "জগৎ বসুর[৪] কাছে বুলেট দুটি রেখে এলাম।

এবার আবার দেখা হলো সুপতিদার সাথে গেণ্ডারিয়া দলের সদস্য "শিশির দত্তের"[৫] বাড়ী আমাদের আস্তানায় (গেণ্ডারিয়া শ্রীসঙ্ঘের আস্তানা) আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি।

বঙ্গেশ্বর[৬] ও আমি সেদিন সকালের দিকে শিশির দত্তের বাড়ীর দিকে আসছি। ডাইনে রজনী চৌধুরীর বাগিচার দেয়াল দিয়ে ঘেরা আর ডাইনেই মোড় নিয়ে বাম দিকে থেকেই উল্টো দিকের দেয়ালের সমান্তরাল ভাবে শিশির দত্তের বাড়ীর দেয়াল। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে রেল লাইনের দিকে। দু দিকেই বহু গাছ পালা। রাস্তাটা প্রায় অন্ধকার নির্জন। দুটোরই সীমানা রেল লাইন থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরেই শেষ হয়েছে। এই দেয়ালের শেষ সীমা থেকে ১০-১২ হাত শিশির দত্তের বাড়ীর দিকে দেয়ালের দিকে পঠ দিয়ে সুপতিদা ও নেপালদা[৭] (শ্রীনেপাল নাগ) আলাপ করছিলেন। অদূরে বিনয়দা, (বনয় বোস) দাঁড়িয়ে। আমরা দুজন দাদাদের থেকে কিছু দূরে থাকতেই 'সুপতিদা' 'বিনয়দা' ইসারায় ডাকলেন। কাছে এলে সুপতিদা ডান হাতটা 'বিনয়দার' দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'বিনয়দা' তাঁর কটিদেশ থেকে একটি ৩২০ বোড়-এর রিভলবার 'সুপতিদার' হাতে দিলেন। ওটা 'সুপতিদা' 'নেপালদার' হাতে তুলে দিলেন। আমরা দুজনে সবই দেখলাম। 'নেপালদা' নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর 'সুপতিদার' সাথে 'নেপালদার' কয়েক মিনিট কথা হলো। ইতিমধ্যে রিভলবারটি যথাস্থানে চলে গেছে।

এই আলোচনার যতটুকু পরে জানতে পেরেছি, সংক্ষেপে তা হলো, ঐ 'অস্ত্রটা' অত্যাচারী হাড্‌সন এস. পি. অব ঢাকার মারণাস্ত্র। এই কর্মকাণ্ডের বিদ্রোহী বীর 'বিনয়দাই' হবেন। একদিন পল্টন মাঠে 'হাড্‌সন' কে ঘোড়ার উপর পেয়েছিল কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারে নি।

তারপর সেই অবিস্মরণীয় ২৯শে আগ শুক্রবার ১৯৩০ সাল। আমি ১০ নং ডিগবাজারের বাসায় আছি সহরের মাঝখানে। সকাল তখন দশটা—১০॥ টা হবে, একটা গুঞ্জন কানে এলো ইসলামপুরের দিকে, কি জানি একটা ভীষণ গোলমাল হয়ে গেছে। আজ সকাল ৯টা ৯॥০ টা নাগাদ।

বেলা ১১ টা ১১॥০ টার সময় সাইকেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম সংগে সংগে আমাকেই ডাকলো। বাইরে গিয়ে দেখি সাইকেলটা সামনে রেখে সিটে তার কনুইটা ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুকে বড়-সুপতিদা (সুপতি ঘোষ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই খুব নিকটে ডেকে বললেন—তুমি আজ সন্ধ্যের সময় "করোনেশন" পার্ক-এ 'নর্থব্রুক' হল এর দিকটায় থেকো। আর বললেন—আজ এখন বাসায় থাকিস। এই বলে বড় সুপতিদা সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। সহরে গোলমালের আভাস পেলাম।

আমার বড় কাকাবাবু শ্রীশশাংককুমার বসু কোর্টে চলে গেলেন। শশাংকবাবুর মেজ ছেলে খোকা (শ্রীসুধেন্দুকুমার বোস) গেছে ইউনির্ভারসিটিতে আর আমি আই. এস,সি. পরীক্ষা দিয়ে বাসায় আছি। খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুপুর বেলা "বড় সুপতিদার" সংক্ষিপ্ত খবর ধরে বাইরের ঘটনার সূত্র খুঁজছি। এমন সময় আবার সাইকেল বেলের আওয়াজ। দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি বড় সুপতিদা সেই আগেকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললেন—নদীর পার 'করোনেশন' পার্কে যাবে না। ঠিক সন্ধ্যা ৬॥ টা—৭টার মধ্যে সঙ্গৎটোলা 'দীপালী' স্কুলের (লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় প্রথম বেসরকারী হাইস্কুল) সোজা যে গলিটা চলে গেছে সীংটোলায়, তার মাঝখানে সুপতি (শ্রীসুপতি রায়) তোমার সাথে দেখা করবে। বড় সুপতিদার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

বৈকাল তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ পাড়ার দু একজনের মুখে শুনতে পেলাম ঢাকা "মিটফোর্ড" হসপিটালের সামনে দু জন সাহেবকে গুলি করে মেরেছে। তার মধ্যে একজন ঢাকার এস. পি. হাডসন সাহেব। কেউ ধরা পরে নি।

ঠিক সময় মত 'সঙ্গৎটোলার' সেই গলিতে ঢুকে ৫-৭ পা এগিয়ে দেখি উল্টো দিক থেকে ছোট খাটো মানুষটি সাদা সার্ট গায়ে দিয়ে তার স্বভাব-সিদ্ধ ডান কাঁধটী নামিয়ে আমার দিকে আসছেন। 'সুপতিদার' সঙ্গে "সীংটোলার" ঐ রাস্তাটার প্রায় মাঝামাঝি দেখা মাত্রই কাছে এসে বললেন আজ রাত (২৯শে আগষ্ট) দশটায় বিনয় আসবে। থাকবার জায়গা ঠিক্ কর। আর কাল (৩০শে আগষ্ট) সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে "গেণ্ডারিয়া" ষ্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জে "বিনয়কে" পৌঁছেদেবার সব দায়িত্ব তোমার। আমি তখুনি বললাম আমার সাথে রিভলবার নেব কী? একটু চুপ করে থেকে বললেন, না। আর বললেন—ওঁকে আমি ঠিক দশটার সময় এখানে নিয়ে আসবো। আমি বললাম আচ্ছা। সুপতিদা যে দিক থেকে এসেছিলেন সে দিকেই বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি তখুনি ঐ গলির মুখে শ্রীসংঘ দলের সদস্য দত্ত বাড়ী ঢুকে পরে ভক্তু দত্তকে ডাকলাম। ভক্তু দত্ত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্র। বাড়ীর সব ছাত্র যুবকই দলের সদস্য। ভক্তু দত্ত এলো। সে পথে শুনে এসেছে আই. জি. অব পুলিশ মিঃ লোম্যান ও এস, পি. অব ঢাকা মিঃ হাডসন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ। আমি ভক্তুকে বললাম,-আজ রাত দশটায় আমি ও আর একজন রাত কাটিয়ে আগামী কাল (৩০শে আগষ্ট ১৯৩০) যে কোন সময় চলে যাব। সব যেন ঠিক থাকে ভাইদের সজাগ করে রাখবেন। আমি বাসায় ফিরে গেলাম। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের পথ ১০ নং ডিপবাজার।

রাত্রে বাসার খাওয়া-দাওয়া সেরে, ঠিক পৌনে দশটায় ভক্তুদের বাড়ী পৌঁছে ভক্তুকে বললাম বিনয় বোস আসছেন। এ কথা বলে বাইরে চলে

এলাম ১০ টার দু মিনিট আগে। বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে মোড় নেয়া মাত্র দেখি আমার সম্মুখ দিক থেকে, বলিষ্ঠ তেজদৃপ্ত সুপুরুষ অতি সাধারণ পরিধেয় গায়ে দিয়ে এগিয়ে আসছেন।

গেট থেকে কিছুটা দূরে দোচালা টীনের ঘর, মেঝে বাঁধানো। দুখানা তক্তাপোষ জোড়া করে পাতা। আর কিছু দূরে আর একজোড়া। বিনয়দা ঘরে ঢুকেই একটিও কথা না বলে সার্ট খুলে খালি গায়ে তার সুঠাম তেজস্বী দেহখানা গুটানো বিছানায় মাথা রেখে পাটির ওপর বাঁদিকে ঘুরে শুয়ে পড়লেন। আমিও কোন প্রশ্ন না করে তাঁর পেছনে শুয়ে পড়লাম। আর ভক্ত নিঃশব্দে দূরের জোড়া তক্তাপোষে গা এলিয়ে দিল। টেবিলের ওপর একটি নিবু নিবু কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে।

রাত গভীর হয়ে চলেছে। আমি জেগে আছি। একমাত্র চিন্তা পাশের তেজস্বী যুবকের, যার আদর্শ, 'গোলামীর চেয়ে শহীদি দর্জা অনেক বড়'। অন্য সব ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমার পরদিনের বিরাট দায়িত্বের কথা।

গভীর রাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহখানা নিদ্রামগ্ন দেখলাম। যে এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করলো তার দেহখানা গরম কিনা জানবার ভীষণ ইচ্ছা হলো। আস্তে আমার ডান হাতটা বিনয়দার সুন্দর গ্রীবার কাছাকাছি দুটি হাতের মাঝ খানটায় রেখে ধীরে শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে বুলিয়ে দিলাম। আশ্চার্য্য! শরীরে উত্তাপ স্বাভাবিক। এই সুন্দরের স্পর্শে আমার অন্তর আবেগে, স্নেহে, মমতায়, সাহসে ও শৌর্য্যে ভরে উঠলো। আজ এ কথা মনে করে আর এক সুন্দরের পূঁজারীর বলিষ্ঠ মধুর কণ্ঠ নিসৃত দুকলি গান কানে বাজছে—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হলো অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।

এই সুন্দরের পূঁজারী শ্রদ্ধেয় অনিলচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন সকল অসুন্দর কে নির্মুল করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা, চেয়েছিলেন সাহারার বুকে ফুল ফোটাতে। চেয়েছিলেন শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে। তাইতো সব তেজস্বী বিপ্লবী-সুন্দর ও বিভূতির সমাবেশ করেছিলেন তিনি। সংগ্রহ করেছিলেন মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা।

সূর্য্যের প্রথম আলোর রশ্মি আমার সম্বিত ফিরিয়ে আনলো। আস্তে 'বিনয়দার' পাশ থেকে উঠে গিয়ে ভক্ত বাবুকে বললাম আমি চলি। সকাল বেলায় দোতলায় নিয়ে যাবেন। স্নান খাওয়া-দাওয়া যেন দুপুর ১২ টার মধ্যেই শেষ হয়। আমি যে কোন সময় এসে যাব।

বাসায় ফিরে এলাম। প্রাতকৃত্য সমাধা করে জামাটা গায় দিয়ে সকাল ৭টা নাগাদ গেণ্ডেরিয়া নেপালদার (শ্রীনেপালচন্দ্র নাগ) নিকট ছুটলাম আমাদের আস্তানায়।

নেপালদাকে পূর্বের সব ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বললাম। আরো বললাম 'মহাবীরকে' নারায়ণগঞ্জে পৌছে দিতে হবে আমাদের। কোথায় দিতে হবে

জানি না। তার জন্ত সব ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।

নেপালদাকে ব্যবস্থাগুলি এক দুই করে বললাম।

এক নং—আমি আজ যে কোন সময় বিনয়দাকে নিয়ে এখানে চলে আসবো। আপনি দুপুর ১২টার পর সব সময় এখানে থাকবেন।

দুই নং—ওঁর সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা। ছয়টার গাড়ীতে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যেতে হবে।

তিন নং—সাথে কে কে থাকবে ঠিক করে দেবেন।

চার নং—সুপতিদার নির্দেশ সাথে রিভালবার থাকবে না।

পাঁচ নং—চারখানা 'চাষহাড়ার' ষ্টেশনের টিকিট করার ব্যবস্থা করবেন।

ছয় নং—কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা।

সাত নং—ষ্টেশনে নজর রাখা।

এই সব বিস্তারিত আলোচনা নেপালদা ও 'বঙ্গেশ্বরের' সঙ্গে করে আমার বাড়ী ১০ নং ডিগবাজার। প্রায় ১১ টা ১১৷৷০ টার সময় ফিরে এলাম।

রাস্তার লোকজন একটু আতঙ্কিত, কখন কি হয়। সহর একেবারে থমথমে দু' দুটো সাহেব গুলি বিদ্ধ হয়েছে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কে বা কারা এই দুর্ধর্ষ ঘটনা ঘটাল তা কিন্তু এখনো কারো মুখে নেই।

আমি বাসায় গিয়ে স্নান ও দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। এখন আমার একমাত্র চিন্তা কি করে কোন রাস্তা দিয়ে কখন গেণ্ডারিয়া আমাদের আস্তানায় 'বিনয়দাকে' নিয়ে যাব। তক্তাপোষে শুয়ে শুয়ে এ কথাই ভাবছি। আর ভাবছি ২০ শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে একাই দুটো মানুষ-রূপী পশুকে খতম করার আর কোন নজীর নেই।

আবার আমার চিন্তা ফিরে এলো এই মহাশক্তি-ধর পুরুষ সিংহকে কখন কী ভাবে গেণ্ডারিয়া নিয়ে যাই। ভীষণ দায়িত্ব। হঠাৎ মনে হলো আজতো শনিবার ঘোড় দৌড়। শুনেছি আজই নাকি গভনারস্‌কাপ খেলা হবে। অতএব সব টিকটিকিদের তো সেখানেই জমায়েৎ। তিনটা নাগাদ ওঁকে নিয়ে রওনা হলেই ভাল। কোন রাস্তায় যাব—(১) দয়াগঞ্জ হয়ে রেল লাইন এর ধার দিয়ে যাব। (২) না সুত্রাপুর হয়ে কাঠের পুল পেরিয়ে ভাটিখানা দিয়ে 'শিশির দত্তের' বাড়ীতে পৌঁছাব। এই সব ভাবনা ভাবছি তখন দেখি চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। ছিটকে বাইরে গিয়ে দেখি আকাশে এক খণ্ড ঘন কালো মেঘ। জামাটা গায়ে দিয়ে একখানা ছাতা নিয়ে খালি পায়ে দে ছুট 'সঙ্গতটোলা'। যাওয়ার পূর্বে বৈঠকখানার ঝোলানো ঘড়িটায় দেখি দুপুর দেড়টা। তখন একটু বৃষ্টি পড়ছে।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতেই 'শশাঙ্ক দত্ত'[১০] ভক্তুর ভাই আমাকে দ্বিতলে নিয়ে গেল। 'বিনয়দা' ও 'শশাঙ্ক' দুজনেই কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। গিয়ে দেখি মহাপুরুষটি একখানা টুলে জানালার ধারে

বসে আছেন। দেখেই মনে হলো স্নান খাওয়া সব শেষ। আমি বললাম এই সময়েই চলুন। 'শশাঙ্কের' নিকট হ'তে একখানা ছাতা চেয়ে নিলাম।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। 'বিনয়দাকে' বললাম হাটুর কাছাকাছি ধুতি উঠিয়ে কোমড়ে বান্ধ দিয়ে কাপড় পরুন, খালি পায়ে চলুন। রাস্তায় নেমে ছাতাটি নাবিয়ে ধরুন যাতে মুখ দেখা না যায়। দুজনেই রাস্তায় নেমে পড়লাম। দুই "বিনয় বোস" পাশাপাশি চলতে শুরু করলাম। বাড়ীর গেট পার হয়ে সাজিয়াল নাগের ডাইনে মোড় নিলাম অর্থাৎ লক্ষ্মীবাজার গলির মধ্য দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। নারিন্দার পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছি. বৃষ্টি প্রায় তখন থেমে গেছে। আমরা ছাতা দিয়ে মুখ ঢেকে দয়াগঞ্জ দিয়ে রেল লাইনের ধারে উঠে গেলাম। পথে বিশেষ লোকজন ছিল না। রেল লাইনের ধার দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই রেলঘুন্টি ঘর ঘেঁষে ডাইনে মোড় নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে আমাদের আস্তানা "শিশির দত্তের" বাড়ী। এই রাস্তাটা সব সময় নির্জন থাকে। দু দিকে বড় বড় গাছ দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা থাকে। এই রাস্তা ধরে "ডেমরা" চলে যাওয়া যায়। রাস্তাটা 'বিনয়দার' খুব পরিচিত। তাই পথে একটি কথাও না বলে সরাসরি চলে এসেছেন।

আজ ভাবলে অবাক লাগে ও আফশোষ হয় যে এতটা সময় ওঁর সাথে রইলাম এত সময় পেলাম কিন্তু একটি কথা কিম্বা প্রশ্ন করিনি কেন?

নেপালদার নিকট বিনয়দাকে দিয়ে আমার একক ভীষণ গুরুদায়িত্ব শেষ করলাম। এখন থেকে শুরু হলো যৌথ-দায়িত্ব।

এবার একটু পেছনের ঘটনার দিকে তাকাই।

২৯ শে সকাল। বিনয়দার হৃদ-কমলে বড় ধুম। আজ একটি রক্তজবা, লাঞ্ছিতা মাতাকে সে দেবেই। মনে পরে সেই সুন্দরের পূজারীর কণ্ঠ-নিসৃত গানটি—

মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়.
দেখে মা সাধ হয়েছে আমি দেব একটি জবা॥

নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবার চিন্তায় মসগুল হয়ে "হডসন" সাহেবের মারণ অস্ত্রটী পকেটে নিয়েই সকাল বেলা বিনয়দা মিটফোর্ড স্কুলে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের ছাত্র।

অসুস্থ জল-পুলিশের সুপারিটেণ্ডেণ্ট 'মিঃ বার্ট' সাহেবকে দেখতে মিঃ লোম্যান আই. জি. অব পুলিশ মিডফোর্ড হসপিটালে এসেছেন। সাথে এসেছেন এস, পি, অব ঢাকা মিঃ "হডসন"। "বিনয়দা" এটা দেখতে পেয়ে তখুনি তার সঙ্গী পার্টি সদস্য "গোপাল সেনকে"[১১] বললেন। আমি চললাম। গোপাল সেন দৃশ্যটি দেখবার জন্য কিছুটা এগিয়ে গেলেন।

বিনয়দা হসপিটালের গেট এর দিকে গিয়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে মিঃ "হডসন" কে গুলি করলেন। হডসন এর নিতম্বে (Buttock) গুলি লাগলো পড়ে গেল "হডসন"। তার পর "লোম্যান কে তাক করে ট্রিগার টিপলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। লুটিয়ে পড়লো সে।

কাজ সমাধা করে "বিনয়দা" সরে পড়বার সময় সরকারের কনট্রাকটার ঘৃণ্য "সত্যেন সেন" ধরবার চেষ্টা করে। "বিনয়দা" তাঁর বজ্র মুষ্টি দিয়ে সজোরে সত্যেন সেনের চোখমুখে এক ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বড় রাস্তায় পরে "পিকচার হাউসের" দিকে চলতে লাগলেন। সেখান থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে একেবারে "বক্সী বাজার" দলের সদস্য "মনি সেনে"র[১২] বাসায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী লীলা নাগের বাসার অতি নিকটে।

"মিটফোর্ড" মেডিকেল হসপিটালের গেটের সম্মুখের এই দুর্ধর্ষ ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী সর্বশ্রী গোপাল সেন ও "ক্রনিক্" ছাত্র বিলায়েত হোসেন।

'মনি সেনের' দর্জায় টোকা দিতেই সে কপাট খুলে দেখে তার প্রিয় বন্ধু "শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু"। 'বিনয়দা' 'মনি'কে দেখেই বলে,—ফুটুস্! মনি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে ওঁকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পরে।

'মনি সেন' বন্ধুর থাকবার বন্দোবস্ত করে পাশের একখানা ওদেরই বাড়ীতে। মনি ছোটে টাকার জন্য "লীলাদির" (শ্রীমতী লীলা নাগ) নিকট। 'লীলাদি' সব শুনে দ্বিধাহীন চিত্তে টাকা দিয়ে দেন। প্রাণভরা আশংকা ও উদ্বেগ নিয়ে বললেন—'দেখো সাবধানে থাকে যেন'।

বক্সী বাজার থেকে 'সুপতিদার' হেফাজতে, তারপর সন্ধ্যায় 'সীংটোলার' মেসে জগন্নাথ কলেজের' কেমিস্ট্রির ডিমনেস্ট্রেটার "শ্রীমনোরঞ্জন ব্যানার্জী" তত্ত্বাবধানে মেসটি ছিল মনোরঞ্জন বাবুরই। তারপর ঐ দিন রাত্র দশটার সময় "বিনয়দাকে" পরদিন নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল দায়িত্ব এলো ছোট 'বিনয় বসু'র উপর।

এখন পূর্বের ঘটনায় ফিরে আসা যাক।

নেপালদা নিখুঁতভাবে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। শিশির দত্তের বাড়ীর উল্টো দিকে রজনী চৌধুরীর বাগানে দলের সদস্য ক্ষিতীন মিত্রের[১৪] তদারকে-রাখা একটি খালি একতলা বাড়ীতে বিনয়দাকে নিয়ে গেলেন। তার কাছ থেকে পূর্বেই নেপালদা চাবিটা এনে রেখেছিলেন। সেখানে একটী ঘরে একটি পাটি ও বালিশ দিয়ে বিনয়দাকে রেখে এলেন।

এদিকে নেপালদা তাঁর মাকে ভাত ডাল ভাজি ও ডিমের তরকারী রান্না করতে বলে গেলেন। 'বিনয়দা' ডিমের কারী খেতে নাকি খুব ভালবাসতেন। নেপালদা মাকে বলেননি কে খাবেন। মাও ছেলেকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন তার মা জানতে পারলেন সেদিন, কে খেয়েছিল তখন আমাদের ভীষণ গাল-মন্দ করতে লাগলেন, আর অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মা বলে যেতে লাগলেন—আমি নিজে হাতে ওকে নিজের মত করে খাওয়াতে পারলাম না: আর কান্না। তোরা বড় নিষ্ঠুর।"

অন্য দিকে 'বঙ্গেশ্বর রায়' বিনয়দার জন্য একটি ময়লা সার্ট-এর ব্যবস্থা করতে সরকার বাড়ী (ঢাকার প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র সরকারের

বাড়ী) প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন একটি মেট্ মেটে রং এর খাঁকি সার্ট ঝুলছে। বেশ প্রমাণ সাইজ। এটাকেই নিয়ে এলো বঙ্গেশ্বর। সার্টটা ছিল আমাদের "ক্যাবলাদার", জ্যোৎস্না সরকারের[১৫] বড় ভাই আর শ্রীশচীশ সরকারের[১৬] খুড়তোতো ভাই।

এই সব কাজের মাঝে গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে নজর রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিল এবং তার ভার ছিল "ক্ষিতীন"-এর উপর। আর তার ওপর দায়িত্ব ছিল "চাষহারা" ষ্টেশনের চারখানা টিকিট করার। ষ্টেশনে পুলিশের নাম গন্ধ নাই।

নারায়ণগঞ্জের গাড়ী গেণ্ডারিয়া থেকে ছাড়বে ৬.৩০ কি ৪০ মিনিটে। এখানে গাড়ী 'ক্রসীং' হবে।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ গামী গাড়ীর আসার সময় হয়ে এলো। 'বিনয়দা' খাওয়া দাওয়া শেষ করে খাঁকি হাফ্ সার্টটা গায়ে দিয়ে ধুতি হাঁটুর কাছাকাছি উঠিয়ে কোমড়ে বান্ধ দিয়ে ছাতা ও গামছা হাতে নিয়ে একবারে প্রস্তুত। আমরা চারজন 'বিনয়দা', 'বঙ্গেশ্বর,' 'বকুল ও 'ছোট বিনয়' রওনা হয়ে গেলাম গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন অভিমুখে, ডাইনে মোড় নিয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে। 'বিনয়দা' আগে আমরা তিনজন একটু পেছনে। বিনয়দার হাতে টিকিট দেয়া হয়ে গেছে। আমাদের টিকিট এখনো পাই নি রেল কামড়ায় উঠলে পাব। ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার।

ঢাকার গাড়ী এসে গেল। নারায়ণগঞ্জ থেকে আর একখানা ঢাকাগামী গাড়ী আসছে, তার ধোঁয়া ও বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ-গামী গাড়ীখানা গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে থামলো। আমাদের ষ্টেশনের পুলিশ-ঘর পর্য্যন্তও যেতে হলো না। বিনয়দা তাঁর সম্মুখের কামড়ায় উঠে পরলেন। আমরাও তাকে অনুসরণ করে সেই কামড়ায় উঠলাম। ঐ কামড়ায় বড় জোর ১৫-২০ জন যাত্রী হবে। সবই শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের গরীব লোক।

বিনয়দা ষ্টেশনের উল্টো দিকে মুখ করে সব সাধারণ লোকের সঙ্গে উল্টো দিকেই বসলেন আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে। আমরা তিনজন ষ্টেশনের দিকে পেছন দিয়ে বিনয়দাকে লক্ষ্য রেখে বসে পড়লাম। আমাদের টিকিট দিয়ে গেল "ক্ষিতীন মিত্র"। ছাত্র বলতে আমরা তিন জনই ঐ কামরায়। "মহাবীরকে" লক্ষ্য রেখে তিন জনে দিলালী গল্প শুরু করে দিলাম। আর একখানা গাড়ী ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে গেছে এবং অতি ধীরে ঢাকা ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ী ও বাঁশী বাজিয়ে হুস্ হুস্ করে চলতে সুরু করলো। আধ ঘণ্টার পথ। গাড়ীর কামরায় সাধারণ লোকেরা কেউ গল্প করছে কেউবা বসে চুপ করে। আর অর্জুন পুত্র 'অভিমন্যু' আলো-আঁধারে মনোমুগ্ধকর আলোর খেলার মাঝে সম্মুখের দিগন্ত বিস্তৃত আমন ধানের সবুজ চারাগাছগুলোর নাচন দেখ্ছিলেন।

আমাদের মধ্যে "বকুল দাশগুপ্ত হাসির কথা

বলতে পারে। নিজেও তার সর্বশরীর দুলিয়ে হাসতে পারে। হঠাৎ সে বললো দেখ "বঙ্গেশ্বর" একটি গল্প শোন ; আর আমাকে বললো আপনিও শোনেন। 'বকুল' বলতে শুরু করলো,—লামা-পাড়ার (ঢাকার) হু হু মিঞা কোন রকমে দিন গুজরায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে। নিজের কষ্ট ও দারিদ্র্য ভুলবার জন্য মদ খায়, জিন্দাবাহার গিয়ে রাত কাটায়, নাচে গানে আর মদে বুঁদ হয়ে থাকে। একদিন ওর খেয়ালহ'লো যে মরে যাওয়ার পর হু হু র নছিবে কি আছে জানবে। গাড়ী চলছে তীব্র গতিতে। কামরাটা প্রায় চুপচাপ। "বকুলবাবু" বলে চললো হু হু এক গণৎকারের নিকট জিজ্ঞাসা করলো 'ঠাকুরমশাই, দেহেন তো হালায় মইরা যাওয়ার পর আমার তগ্‌দীরে কি লেহা আছে ?' ঠাকুর মশাই ওকে জানতো। তখুনি বললো—'তোর তো নরককুণ্ডে যাইতে হইবো।' "নরককুণ্ড কী বুঝছস্‌নি। মস্ত বড় "গুয়ের গাড়া" তার মধ্যে দুইনার বদ্‌মাইসগো যমদুতরা ছুঁইড়া দিয়া ডাঙ্গস নিয়া পারে দাঁড়াইয়া থাকে। মাথা উঠাইলেই "ডাঙ্গসের" বাড়ি।—আমি তো "রাজাবাবুর গাড়ী" দেখছি, হেই রকম নাকি ? —"আরে এই গাড়ী দুইনা জোড়া বুঝলি।" বললো ঠাকুর মশাই।—"অ্যাঁ বুঝলাম্‌। এই আছে—আমার নছিবে ? আচ্ছা তবলচি রামজান মিঞা,—প্রশ্ন করলো হু হু।—"ওর ও নরোক বাস," বললো ঠাকুর মশাই। হু হু তৃতীয় প্রশ্ন করে-"আর আমার "সরলি"। "তর সরালরও নরকবাস।" ঠাকুর মশাই বললো। হু হু খুব আনন্দে ও উত্তেজিত হয়ে বললো—"বাজী বা ঠাকুর মশাই, আমি হালায় নরকে, রামজান মিঞা বি নরকে আমার সরলি বি নরকে—তবে তো নরক গুলজার।" হাসিতে আমার পেটে খিল ধরে গেল। তিনজনই খুব হাসছি।

এর মধ্যে ফতুল্লা ষ্টেশন এসে গেল। এক মিনিট গাড়ী থেমে গাড়ী চলতে শুরু করলো। আমরা হাসতে হাসতেই এক নজর ষ্টেশনটা দেখে নিলাম। এর মধ্যে 'বকুল' হাসছে তার সমস্ত শরীর দিয়ে আর বঙ্গেশ্বর খুবই আস্তে ধীরে। তখুনি মস্ত লম্বা একটানা একটি হুইসেল বাজতে লাগলো। আমাদের হাসির রেশও একেবারে থেমে গেল। আমরা গন্তব্য স্থান চাষহারা ষ্টেশনে এসে গেছি প্রায়। তিনজনই তিনজনের দিকে তাকালাম। আর লক্ষ্য করলাম "গিরিশ মহাপাত্রকে"। আমরা সজাগ হলাম। "চাষহারা" ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। ইঞ্জিনটা রেল গেটের রাস্তার (Level) ক্রসিং থেকে একটু দূরে থেমে সাদা সাদা ধুঁয়া ছাড়তে লাগলো। আর শোঁ শোঁ আওয়াজ। ইতি মধ্যে "গিরিশ মহাপাত্র" মশাই নেমে পড়লেন। গাড়ী থেসে সোজা সকলে ছুটছে টিকিট চেকারের দিকে। চেকার মশাই গেটটা অল্প ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক জন চলে গেল তার পরই "গিরিশ মহাপাত্র" টিকিট দিয়ে ষ্টেশনের বেড়া পার হয়ে গেলেন। তার পেছনেই আমরা। আমরা লক্ষ্য করলাম যে "গিরিশ মহাপাত্র"কে সরকারী অভ্যর্থনা জানাবার কোন আয়োজনই নেই। অদূরে বৈদ্যুতিক

আলোর নীচে একটি আই. বি ওয়াচার কি যেন টুকছে। এটা রোজকার ডিউটি।

গেট পার হয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মস্ত বড় চওড়া "ডিলায়েল" রোড। দু পাশে বড় বড় গাছ। আমরা চলেছি "গিরিশ মহাপাত্রকে" লক্ষ্য করে। একটু দূরে গিয়েই দেখি "বিনয়দার" বাম দিক দিয়ে একটু আগে চলেছেন সেই ছোট খাটো মানুষটি "সুপতিদা" (শ্রীসুপতি রায়)।

আমরা তিনজনের কেউ জানিনা "বিনয়দাকে" কোথায় পৌঁছে দেব। তাই 'সুপতিদাকে' দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। মিনিট পনর হাঁটার পর 'শীতালক্ষ্যা' নদীর ধারের বাড়ীগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছি। ঐ বাড়ীগুলো থেকে ১০০ থেকে ১৫০ গজ দূরে আমাদের রেখে 'বিনয়দা' এগিয়ে গেলেন কথাটি না বলে। আমি দৌড়ে গিয়ে তার বলিষ্ঠ হাত খানা আমার দু হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চেপে ধরলাম। "বিনয়দা" আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে মৃদু হাসির রেখা ছড়িয়ে গেল তার ঠোঁটের কোন দিয়ে। তিনি সামনের দিকে চলে গেলেন। তাঁর সাথে আমার এই শেষ দেখা।

আমি পেছনে ঘুরতেই দেখি "সুপতিদা" সম্মুখের একটি পুল থেকে নেমে বামে মোড় নিয়ে আমার দিকে আসছেন। 'বঙ্গেশ্বর' ও 'বকুলের' দিকে চলতে চলতে আমায় বললেন—"বিনয় তুমি চলো"। আমি সুপতিদাকে বললাম ওদের আমি বলে নিচ্ছি। 'বকুলকে' একথা বলতেই সে এগিয়ে এসে সুপতিদাকে বললো 'সুপতিদা', 'নেপালদা' আমাকে বলে দিয়েছেন 'বিনয়কে' (ছোট) নিয়ে আসিস্ কিন্তু। এ কথা শুনে 'সুপতিদা' চলে গেলেন। আমরাও উল্টো দিকে ঘুরে ষ্টেশনের দিকে ছুটতে সুরু করলাম ঢাকা ফিরে যাওয়ার জন্য। পথে ভাবলাম, আশ্চর্য আমার এই দাদা দুটি।

ঢাকায় ফিরে এলাম। খেয়ে দেয়ে এক ঘুমেই ভোর হয়ে গেল। সকালের খাওয়া খেয়ে দৌড়ালাম আস্তানায়। আমরা তিনজনে 'নেপালদাকে' সব বললাম। আলোচনা শেষে বাড়ী ফিরে এলাম দুপুর ১২টায়। আবার ঘুম দুপুরে।

আজ রবিবার ৩১শে আগষ্ট ১৯৩০ সন। বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় পাড়ার একটি ছেলে আমাকে জাগিয়ে বললো,—শোভাযাত্রা আসছে পাটিয়াটুলির দিক থেকে। আমি উঠে 'নরমাল' স্কুল-এর নিকট গিয়ে দেখি 'ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের' সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে প্টন মাঠের দিকে সেই রাস্তা ধরে বড় বড় সাদা নিশানের সম্মুখের ভাগ 'কলেজিয়েট স্কুল ও ভিকটোরিয়া পার্ক এর প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছে। বুঝতে বাকীরইল না যে এটা মিঃ লোম্যান-এর শেষ যাত্রা 'চার্চ'-এর দিকে। সব নীরব নিঃশব্দ ও থমথমে।

আর অন্য দিকে। সকালে অমৃত বাজার পত্রিকাতে (Amrita Bazar Patrika) দেখেছি বড় বড় কালো হরফে লেখা

The Assailent of M/s Lowman & Hodson is a Medical Student.—No name was announced & picture of Benoy Bose was printed on that day.

সেই ছাত্রের নাম ধাম কিংবা ছবি তখনও প্রকাশ করে নি। ৩১শে আগষ্ট ১৯৩০ সনে অভিমন্যু অগ্রসর হচ্ছে কখনো বাঁকা পথে, কখনো সোজা পথে, ঝড় ঝঞ্ঝাকে, পথের বহু বাধা বিঘ্নকে পার হয়ে শত্রু ব্যূহের দিকে আঘাত হানতে সোনার ভারত লুটেরাদের।

চলেছে বীর উন্নত শির
শির নেহারি নত শির ঐ
শিখর হিমাদ্রির।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৬

১।	শ্রীসুপতি রায়	প্রবন্ধে এই নম্বর দেওয়া নামগুলির অধিকারী সকলেই সে সময় 'বি-ভিদলের প্রমুখ সদস্য ছিলেন
৩।	শহীদ বিনয় বসু	
৮।	শ্রীসুপতি ঘোষ	
১১।	শ্রীগোপাল সেন	
১২।	শ্রীমণি সেন	
২।	শ্রীঅক্ষয় বসু	শ্রীসঙ্ঘের সদস্য
৪।	" জগৎ বসু	
৫।	" শিশির দত্ত	
৬।	" বঙ্গেশ্বর রায়	
৭।	" নেপাল নাগ	শ্রীসঙ্ঘের প্রমুখ সদস্য, শ্রীসঙ্ঘের গেণ্ডারিয়ার তৎকালীন আস্তানার নেতা
৯।	শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়	শ্রীসঙ্ঘের নেতা
১০।	শশাঙ্ক দত্ত—	সঙ্গতটোলা দত্ত বাড়ীর যুবক, শ্রীসঙ্ঘের সদস্য

১৩। শ্রীমতী লীলা নাগ— শ্রীসঙ্ঘের নেত্রী

১৪। শ্রীক্ষিতীন মিত্র— শ্রীসঙ্ঘের সদস্য

১৫। " জ্যোৎস্না সরকার
১৬। " শচীশ সরকার
১৭। " বকুল দাশগুপ্ত
} শ্রীসঙ্ঘের সদস্য

১৮। লেখক শ্রীবিনয় কুমার বোস (ছোট) শ্রীসঙ্ঘের সদস্য।
শ্রীবিনয় বোস ও শ্রীদীনেশ রায় বৈপ্লবিক স্পর্ধা দেখিয়ে দুপুরে ঢাকা বড় পোষ্টাফিসের ডাকলুঠ করে গন্তব্যস্থলের দিকে যাবার সময় পুলিশের গুলিতে আহত ও ধৃত হয়ে আন্দামানে কারাদণ্ড ভোগ করেন। [জঃ সঃ]

বিজ্ঞপ্তি : ভালো কমিশনের বিনিময়ে জয়শ্রী-র জন্য গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক প্রয়োজন। অফিস টাইমে ঘণ্টা তিন/চার সময় দিতে পারেন এমন পরিশ্রমী সপ্রতিভ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জয়শ্রী অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

ম্যানেজার জয়শ্রী

পুস্তক পরিচয়

বিদেশীর দৃষ্টিতে নেতাজী

জার্মানীর চোখে নেতাজী ॥ নন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন অঞ্জলি সেনগুপ্ত ॥ গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা ॥ দাম দশ টাকা ॥

কয়েক বছর আগে মূল ইংরেজি গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি সমাদৃত হয়েছে দেশে ও বিদেশে, কয়েকটি সংস্করণ হওয়াই তার প্রমাণ। ভারত-জার্মান মৈত্রীসূত্র রচনায়ও বইটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে ; পশ্চিম জার্মাণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও গবেষক মহল, সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছেন বইটিকে।

এম, জি, গানপুলে 'Netaji in Germany' নামে একটি বই লিখেছিলেন, তাতে সংক্ষেপে সমরকালে জার্মানীতে নেতাজীর কার্যকলাপের কথা ছিল। এ বইটি অন্য প্রকৃতির। জার্মানীর সরকারী ও বিদগ্ধ মহল, নেতাজী সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করত' এই বইয়ে পাওয়া যাবে তার পরিচয়। এবং আলোচনার বিষয়টিকে যথোচিত প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে লেখক নেতাজীর সংগ্রামী-জীবনের নীতিগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে এই পটভূমির কথাই আছে। সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন বিশ্বের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ও কলাকৌশল সম্পর্কে তখনই তিনি অধ্যয়ন সুরু করেন। এই সময়ের কথা দিয়েই লেখক তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। ইংলণ্ড থেকে ফেরা, গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান—ইত্যাদি থেকে সুরু করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কৌশল। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের সমরনীতির কথা আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে—কিভাবে ঐ সমরনীতি তিনি স্থির করেছিলেন আর কেনই বা,—তা বিশদভাবেই লেখক বলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে পাই জার্মানদের চোখে নেতাজীর নীতি ও ব্যক্তিরূপ কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল সেই কথা। এইটিই দীর্ঘতম ও শেষ অধ্যায়। এরপর সংযোজিত হয়েছে পরিশিষ্ট, যাতে কয়েকটি মূল্যবান দলিলের পূর্ণ বয়ান দেওয়া আছে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ-কাল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ; তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা

ও কর্মের পূর্ণতার কাল প্রথম মহাসমরের সমাপ্তির পর থেকে সুরু হয়েছিল। সারা বিশ্বে অতি শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কদের এই সময় আবির্ভাব ঘটেছিল ; লেনিন ও স্তালিন, মুসোলিনী ও হিটলার, চিয়াংকাইশেক ও মাও সে-তুঙ, রুজভেল্ট ও চার্চিল এবং দেশবন্ধু, গান্ধী জওহরলাল প্রমুখ নেতারা এই কালে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই যখন একজন সর্বভারতীয় জনপ্রিয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ও বহির্বিশ্বে পর্যাপ্ত পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তখনও মাও সে-তুঙ অপরিজ্ঞাত, হিটলারের নাম জার্মানীতেও শ্রদ্ধাভরে গৃহীত হয়নি, স্তালিন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিষ্কণ্টক হননি। ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনে পাদ-পীঠের আলোয় এই সব নেতারা যখন উদ্ভাসিত হয়েছিলেন তখন সুভাষচন্দ্রও করমর্দন করেছেন তাঁদের সঙ্গে ; ভারতের ও বিশ্বের দৃষ্টি সম-আগ্রহে তাঁকেও অনুসরণ করেছে। সেই অনুসরণের কিছু ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে নন্দবাবুর আলোচনায়।

নন্দবাবু নিপুণ ও পরিশ্রমী গবেষক। অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করার পর তীব্র বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সে তথ্যগুলির মূল্যায়ণ করেছেন তিনি। যুক্তির আলোয় তিনি পথ চলেন ; যুক্তির স্খলন বা সত্যের অমর্যাদা তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তাই শুধু বিবরণ দেওয়াই তাঁর কাজ হয়নি ; বিশিষ্ট বিদ্বৎজনদের বক্তব্যের সারবত্তা তিনি নিরুত্তাপ যুক্তির আলোয় যাচাই করে করে এগিয়েছেন। তাঁর ধীমত্তা প্রশংসা আদায় করে নেয়।

মূল ইংরেজি বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল বলে মনে হয়েছে যে অনুবাদ সর্বত্র স্বচ্ছন্দ হয়নি। তবু এই বাংলা সংস্করণটি প্রচারিত হওয়া দরকার। নেতাজীর কর্মনীতি ও যুদ্ধকালে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে একটা সুসংগঠিত অপপ্রচার নতুন করে সুরু হয়েছে। খোসলার পর বোধ করি এ বিষয়ে তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন এস. গোপাল। নন্দবাবুর বই নেতাজীর চিন্তা ও কর্মধারার অনুধাবন ও মূল্যায়নে বিশেষ সহায়ক হবে। তাই এই বইটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেকেরই উচিত।

পবিত্রকুমার ঘোষ

Keshub Chandra Sen—F. Max Mueller, Edited by Nanda Mookerjee. Published by S. Gupta & Brothers, 58, Bidhan Sarani, Calcutta-700006 : Price : Rs. 10/-.

Shakespeare was first edited in 1709 A. D. by Nicholas Rowe, That was the beginning of Shakespearean Scholarship. Since then scholars have been editing valuable works of writers of importance with increasing zeal. As a result editing a book has spelt both an art and a mark of erudition. There Nanda Mookerjee steadily scores twice

to make three in a row with the present volune—"Keshub Chandra Sen" by F. Max Mueller. The previous two were "I point to India" and "Ramakrishna: His Life & Sayings"—both by F. Max Mueller: all edited between 1974 to 1976.

One must bear in mind that the present scientific world welcomes objective thinking. A classical outlook is thus the stamp of an honest editor. True to this spirit, Nanda Mookerjee does never burden his reader with his own thoughts. Instead he accompanies the reading on the latter's probe into the writer's mind unassumingly: How well and laboriously he chooses the pieces of the present volume.. None can overlook that aspect of his editing.

The second and third decades of the 19th century Bengal saw Raja Rammohan Roy at his best—between 1815 and 1830 to be precise. That was the dawn of India's greatest revolution of thought. Keshub Chunder Sen came in its wake and stretched that thought-current further to culminate at the feet of Sri Ramakrishna. That was also the cradle and grave of his role as a religious reformer. The editor, in his fairly long introductory remarks, shows how the Brahmo Samaj movement initiated by Rammohan rapidly developed under Keshub. He makes a historical survey of that movement to evaluate Keshub from an objective perspective. That is a fair preparation for the reader before probing Max Mueller's views on the man—specially the obituary remarks "India has lost her greatest son……"

The present volume leans mainly on Max Mueller's admiring, yet critical, tribute to Keshub Chunder Sen as both a man and thinker after the latter's unripe death in 1884. Then on the editor presents a few correspondences mainly between Keshub Chunder Sen and Max Mueller and and also some of their smaller articles covering topics of a wide range and interest. Indeed an enjoyable

smooth sail through a vast ocean of thought,—truly inspiring.

A word on the get-up. Satyajit Ray has sketched Keshub alive. That is no less eloquent than what Max Mueller says through words. The publisher thus steals our congratulatory thanks.

Dwijadas Banerjee

রূপনগরী হংকং—শঙ্করপ্রসাদ রায়
ইলোরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স।
আট টাকা।

বাংলায় উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনী সুলভ নয়। সাধারণত দু' জাতের ভ্রমণকাহিনী বাজারে প্রচলিত; এক, ভ্রমণের নামে উপন্যাস—পথে যেতে দেখা রমণীর সঙ্গে মন দেয়া-নেয়ার বিবরণ; দুই, গাইড-বই আর টাইম-টেবিলের সমন্বয়কারী বিবরণী। সুখের কথা, শঙ্করপ্রসাদ রায়ের 'রূপনগরী হংকং', এর ব্যতিক্রম। এটি স্বাদে, প্রকৃতিতে, বিশুদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনী। বর্ণনাগুণে 'হংকং নগরী' আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হংকং মূল চীনের দ্বারদেশে অবস্থিত, ইংরেজ শাসিত। ইংরেজ হংকংএ কী করেছে? লেখক সেখানে লোকমুখে শুনেছেন, "অংরেজ হিঁয়াকা আদমি রোঁকো নৌকর বাবারা, উঁর আওরতোঁকো বানায়া—'। এক-কথায় ইংরেজের কীর্তির পরিচয় দান। এই অল্পকথায় অনেকটা বলার কৌশল আয়ত্ত করেছেন লেখক, সেই সঙ্গে যুক্ত খোলা মন, খোলা দৃষ্টি। সরস ভাষণ আর অল্প ভাষণ, দুয়েতেই লেখক দক্ষ। গ্রন্থ-সূচনাটি নাটকীয়, পাঠককে চমৎকৃত করে।

"হ্যাঁ, মাত্র আট ডলার নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হল। দমদমের এয়ার পোর্টে ঢুকে পড়েছি। পাশপোর্ট, টিকিট, হেলথ সার্টিফিকেট সবই—"

শুরু হয়ে গেল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এই কথনভঙ্গিটি এতো প্রত্যক্ষ ঘরোয়া আর সরস যে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। আমি ত এক বৈঠকে শেষ করেছি। মহিলা কাস্টমস অফিসার, লেখককে প্ররোচিত করছিলেন, ডিউটি ফ্রীশপ থেকে কিছু না হোক একটা সেন্টের শিশি কিনুন। ঘাঘু সহ-যাত্রীর কাছে লেখক জানতে পেলেন, উনি আমাকে ফাঁদে, ফেলছিলেন। ডিউটি-ফ্রী শপ থেকে কিছু কেনা মানেই ফয়েন একসচেঞ্জের মালিকানা আর তখনি—শুনে কেবল লেখক নন, আমরাও ভয় খেয়ে যাই। বিদেশ ভ্রমণের হাঙ্গার ঠেলা মালুম হয়।

দুধারে পাহাড়, মাঝে একফালি জলের উপরকার আকাশপথে ছুটে গিয়ে আকাশ ছোঁয়া বাড়ির চূড়া বাঁচিয়ে হংকং এর কাইতক বিমানবন্দরে নামে প্লেন। লেখকের সহযাত্রী হয়ে আমরাও হংকংএ পৌঁছই। লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি তীক্ষ্ণ, দুটি চোখ উৎসুক, মন সদাগ্রহী, হাতে আছে হাল্কা ও শুরু বিষয়ের বর্ণনোপযোগী কলম—তার ফলে পেয়েছি এই সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী। কাইতক বিমানবন্দর,

হোটেল হায়াৎ, সংকীর্ণ ছোট শহরে উপচীয়মান অধিবাসী, দিনের বাণিজ্যনগরী আর রাতের ফূর্তি-নগরী: হংকং-এর নানারূপ লেখক দেখেছেন, দেখিয়েছেন। হংকং-এর ভারতীয় বণিকদের কয়েকজনকে—নালিন কেবল রামানি, করিম ভাই, ফতেচন্দ জালান, কেজরিওয়াল, সাব্বারাওয়ালাকে লেখক আমাদের কাছে হাজির করেছেন। সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন ভারত সরকারের শিল্পবাণিজ্যনীতি আর ভিয়েতনামের গল্প। আসলে, লেখকের হাত মিঠে-কড়া। গুরু লঘু দু-ক্ষেত্রেই তা সমান চলে। তাই হংকং এর পত্তন-কাহিনী, ভিয়েতনামের অসাধারণ প্রতিরোধ-কাহিনী, বৌদ্ধ-দর্শন, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ, আর ভারত-সরকারের বাণিজ্যনীতি সব কিছুকেই তিনি স্বাদু করে পরিবেশন করেছেন। গল্পচ্ছলে কেবল হংকং নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশের কথাও শুনিয়েছেন। তাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম, জাপান, বর্মা, সিঙ্গাপুর, চীন, তিব্বত—নানাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতির মোট কথাগুলি সরস করে লেখক বলেছেন।

টুকরো টুকরো ছবি আর ঘটনা সাজিয়ে মূল অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা লেখকের আছে। হংকং-এর ছোকরা চীনা গাইডকে লেখক প্রশ্ন করেছিলেন— 'ব্রিটিশ রাজত্বে কেমন আছ? ব্রিটিশ চলে গেলে লাল শাসন যদি কায়েম হয় তা হলে—?'

গাইডের ছোট ছোট চোখে ফুটে ওঠে ভয়ের ছাপ, বলে,—'উই দোন্ত ওয়ান্ত রেদ রুল।'

হংকং এর ছোকরা ভারতীয় ব্যবসায়ী কেজরিওয়াল চায় জীবনের রাঙন অভিজ্ঞতা। সে সব কথাতেই বলে—'এ বাৎ মাননা পড়তা'। তাকে লেখক প্রশ্ন করেন, রাতের হংকং-এর কী দেখলে? সে জানায়—'রায়বার ব্লু ফিল্ম আর স্ট্রিপ টিজ—দুটোই দেখলুম। 'কেমন দেখলে?' এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়—'যখন ব্লু ফিল্ম দেখছিলুম মনে হচ্ছিল মানুষ দেখছি না জানোয়ার দেখছি।' একথা শুনে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে হয়—'এ বাৎ মাননা পড়তা'।

হংকং এ ভারতীয় আছে বিশ-পঁচিশ হাজার। বেশির ভাগই ব্যবসায়ী। সেখানে পানের মশলা অর্থাৎ সুপারী, মৌরী, এলাচের বাজার আছে। এবং দু পয়সা সত্যি কামানো যায়। লেখকের প্রশ্ন —কোনো বাঙালির ছেলে যাবে কি? আমাদেরও সেই প্রশ্ন—যাবে কি?

'রূপনগরী হংকং' গ্রন্থে আছে কয়েকটি সুন্দর আলোকচিত্র। এটা হলো উপরি-পাওনা। আসল প্রাপ্তি হলো—এক সদাজাগ্রত রন্ধ্রদর্শী ভ্রমণকারীর আনন্দ-অভিজ্ঞতা। তার স্বাদ পেয়ে ভালো লেগেছে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র ২য় খণ্ড ১১.০০ পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বক্সী

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্যতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান: জয়শ্রী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬.
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

শ্রদ্ধার্ঘ্য-অনুষ্ঠান

বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ের পঞ্চবিংশতিতম স্মরণ-সভা

বৃহস্পতিবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৬, সন্ধ্যা ৬॥০ টায় বালীগঞ্জ গোলপার্কে, মুরলীধর গার্লস কলেজে বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ের পঞ্চবিংশতিতম স্মরণ-সভা এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অনিল রায়ের সহকর্মী কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন।

সভার প্রারম্ভিক বক্তা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমূল্য সেন বলেন: আমাদের নেতা অনিল রায়ের সৃষ্টি বাংলাদেশের অনন্য বৈপ্লবিক সংগঠন "শ্রীসঙ্ঘ"-এর একটি প্রামাণ্য ইতিহাস প্রয়োজন। লীলাদি ও অনিলদার মানসপুত্র "জয়শ্রী" এই কাজে হাত দিয়েছে। এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদের সকলের যোগ দেওয়া কর্তব্য। এ দেশে অনেক বিপ্লবী জন্মেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অনিল রায় জন্মান নি।

প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত বলেন: আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি। লীলা রায় ও অনিল রায়ের কোনোদিন ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছিল না। ভারতকে যাঁরা মহান করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামকে যাঁরা ধরে রেখেছেন; তাঁরা তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে স্থান করে নিয়েছেন।

অনিল রায় ও লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ তাঁর সুলিখিত ভাষণে বলেন: অনিল রায় এমন একজন কালোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ বিরাট পুরুষ ছিলেন, যিনি সমসাময়িকদের মনে এতো গভীরভাবে ছাপ রেখে গেছেন যে তাঁর লোকান্তরের পঁচিশ বছর পরও আমাদের বর্তমান জীবনে তাঁর উপস্থিতির অপরিহার্যতা অনুভব করছি। তাঁর মত বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের, অসাধারণ সংগঠন প্রতিভার, দুর্জয় আদর্শবোধের, বৈপ্লবিক কর্মপ্রণালীর, সর্বোপরি স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের, এবং অপরিমেয় শক্তি ও সাহসের অভাব, আজকের দিনে তাঁকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের মত কনিষ্ঠদের ১৯৪০ সাল থেকেই পাঠচক্র নিয়েছেন, বৈপ্লবিক মানসিক প্রস্তুতির জন্য।

শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বলেন: তাঁর অনির্বাণ শিখা আজও ম্লান হয়নি! মার্ক্সবাদের মোহ যখন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তাকে সমালোচনা করেছিলেন অনিল রায়।

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শিলং থেকে অনিল রায়ের পঞ্চ বংশতিতম স্মরণ-সভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন ১৯২২ সালে তিনি যে সময় স্কুলের ছাত্র, অনিল রায় সে-বছর ডিসেম্বরে তাঁর অন্তরে অগ্নিমন্ত্রের বীজ বপন করেন। অনিল রায়ের খাঁটি বাঙালীয়ানা, কর্মযোগ ও শক্তিমান বৈপ্লবিক মননা, পত্রলেখককে প্রেরণা যুগিয়েছে। আজও তিনি শ্রদ্ধায় সে-কথা স্মরণ করেন। তার পত্র পাঠ করেন বিপ্লবী হেলেনা দত্ত।

অনিল রায়ের অন্যতম সহকর্মী ভবেশ নন্দী বলেন: তাঁকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। আজকের দিনে অনিল রায়ের মত বলিষ্ঠ পুরুষের প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের বিষাক্ত পরিবেশকে বিশুদ্ধ করে তুলবার জন্য।

অনিল রায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অনিলচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায়ের আদর্শ নৈতিক চরিত্রের পটভূমিকায় উল্লেখ করে বক্সা ক্যাম্পে ত্রিশদশকে বিপ্লবীদের মধ্যে নির্বিচারে মার্ক্সবাদ গ্রহণের প্রবাহকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার জন্য 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ পাঠ করে অনিল রায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পুস্তক থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করেন।

সভাপতি বিচারপতি সেন বলেন বিশ দশকের গোড়ায় এক শীতের অন্ধকার রাত্রে অনিল রায়ের কণ্ঠস্বরের বিদ্যুৎচমকের মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রভাবধারার প্রতি আমাদের আকর্ষণের উৎসও অনিলদার কবিগুরুর কবিতার উদাত্ত আবৃত্তি। এ-ছাড়া অনিল রায় অভীঃ মন্ত্রেও দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিজের জীবনে বার বার তার পরিচয়ও দিয়েছেন। কাজে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতা, তরুণদের চরিত্রগঠনে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সভাপতি বলেন আজকের দিনে এ-ধরণের অসাধারণ পুরুষের প্রয়োজন।

উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেষণ করেন অনিল রায়ের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁরই রচিত সঙ্গীত "নমো নমো ভারতবর্ষ" দিয়ে। এর পর শ্রীসুশীল ব্যানার্জির সুমধুর কণ্ঠে সংস্কৃত ও বাংলা সঙ্গীত সভাস্থল মুগ্ধ করে রাখে।

লীলা রায়: জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

গত ২রা অক্টোবর '৭৬ মহানবমী পূজার দিন বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী 'জয়শ্রী কার্যালয়ে', ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লীলা রায়ের সহকর্মী কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র। প্রথমে শ্রীমতী সুধা মাইতি একটি উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন। লীলা রায়ের অনুগামী বিপ্লবী হেলেনা দত্ত, লীলা রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি লীলা রায়ের সংগে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে এবং জেল-

জীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে লীলা রায়ের আদর্শ অনুসরণ করে সকলের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ বলেন, আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যে সময়ে লীলা রায়ের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় সংকল্প, অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভা, দেশপ্রেম, তেজোদীপ্ত চরিত্র-মাধুর্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মানবপ্রেম এবং বিংশ শতাব্দীর বিপ্লববাদ তাঁকে আত্মনিবেদনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লীলারায়ের বিভিন্ন সময়ের লেখা থেকে মূল্যবান অংশ পাঠ করে লীলারায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভাপতি কিরণচন্দ্র মিত্র লীলারায়ের বহুমুখী চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন লীলা রায় কারুর পথ অনুসরণ করে নেত্রী হন নি। তিনি নিজেই নূতন পথের স্রষ্টা। সেই পথের সঙ্গে যার মিল রয়েছে তার পথের সংগে মিলিত হয়ে তিনি তার কর্মপ্রণালী নিরূপণ করেছেন। তিনি তার অনুগামীদের যোগ্যতায় ও কৃতিত্বে সবচাইতে বেশী আনন্দ পেতেন এবং সেই পথে তাদের এগিয়ে দিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

লীলা রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমতী ভবানী নাগ সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন।

পূজার সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের দপ্তর ছুটি থাকায় জন্মানুষ্ঠানের সংবাদটি প্রচারিত না হওয়া সত্ত্বেও, লীলারায়ের বহু অনুগামী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

একটী স্মরণীয় অনুষ্ঠান

১৭ই আগষ্ট '৭৬ জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্ন—অসুর-শক্তির প্রতীক কংসকে বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—যুগে যুগে এই অবতারের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে দেশ—এমন একটি পুণ্যলগ্নের সুপ্রভাতে কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিলচন্দ্র রায় ও বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের স্মৃতি-ফলক উন্মোচিত হলো। পরিবেশটি ছিল ভাবগম্ভীর। এই দুই মহান বিপ্লবীর অমর-স্মৃতির স্মারকরূপে দুটি স্মৃতি-ফলক অনুপম বিন্যাসে পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত হয়ে অপরূপ সৌন্দর্য বিকীরণ করছিল। শ্রীমতী মীনাক্ষী দাশগুপ্তের 'বন্দেমাতরম' সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা। জয়শ্রী পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছে, তাই প্রথমেই ভূমিকা রচনা করলেন জয়শ্রী পত্রিকার প্রকাশক শ্রীকরণচন্দ্র মিত্র। কোনো বক্তার ভিড় ছিল না। শুধু সভাপতির ভাষণ ছিল আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তব্য—অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর উদাত্ত ভাষণ। সমগ্র আকাশ-বাতাস মথিত করে দিয়ে গেল বাংলার দুই বরেণ্য সন্তানের কর্মকাণ্ডের অপূর্ব বিশ্লেষণ; শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। সভাপতি উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অতিসুন্দরভাবে বর্ণনা করলেন। লীলা রায়ের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অপূর্ব সংগঠনী

প্রতিভা, অনুপম চারিত্র-মাধুর্য, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, প্রখর ব্যক্তিত্ব, মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর ভাষণে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠল। আবার শ্রীসংঘের প্রতিষ্ঠাতা অনিল রায়ের বিপ্লববাদ, আধ্যাত্মিকতা, দেশপ্রেম, তাঁর ভাষণে মূর্ত হয়ে উঠল। একসময়ে তাঁদের মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও বিপ্লববাদের আদর্শ বাংলাদেশের সমগ্র তরুণ-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তাঁদের বিপ্লববাদ দেশবাসীকে সংগঠনের কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। নেতাজীর আদর্শ, ভারতের অন্তরাত্মার বাণী এই বরেণ্য, দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। দেশবাসীকে বিপ্লবকার্যে ও সংগঠনের কর্মে এঁরা উদ্বোধিত করেন। নূতন পথের দিশারী এঁরা—এই পথের আদর্শের দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়ে সেই হাজার হাজার তরুণ-তরুণী কর্মযজ্ঞেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সমবেত অনুরাগীবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত শাস্ত্রীমশাইর ভাষণ শুনছিলেন।

তারপর অনিল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শর্মী দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী দীপিতা রায় অনিল রায়ের রচিত "নমো নমো ভারতবর্ষ" গানটি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। মীনাক্ষী দাশগুপ্তের "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা", "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক" গানগুলিও মর্মস্পর্শী ছিল—সব মিলিয়ে গোটা শ্মশানভূমি যেন পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হলো। সবশেষে ১৯২৩ সালের রচিত গান "দীপালী" "দীপালী", "জ্বালাও আলো," যেন দূর অতীতের সমস্ত বাণী বহন করে নিয়ে এল—অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের যেন কিসের ইঙ্গিত। বহু বিপ্লবী, বহু মহিলা ও পুরুষের সমাবেশে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক কালে এরকম একটি অনুষ্ঠান দেখা যায় নি।

জয়শ্রী প্রকাশন-এর

কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০

ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬·০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

5/-

রামমোহন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস ১·২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায় ২·০০

২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs. 300·00
Half Page :	Rs. 150·00
Quarter Page :	Rs. 80·00

Special Position : 25% extra

Cover Page

Second Cover :	Rs. 350·00
Third Cover :	Rs 400·00
Fourth Cover :	Rs. 600·00

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.

Enlisted with DAVP for
Central Govt. advertisements

Contact : Manager, Jayasree.
Office : 20A Prince Golam Md. Road
Calcutta—26
Phone : 46-4116

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

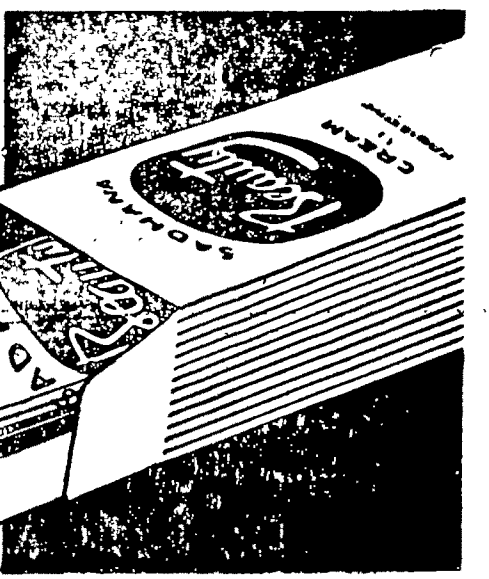

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC 5/71

ECONOMIC PLANNING OF NETAJI SUBHAS

[Continued from page 511]

supply etc could never be even thought by our private sector who are very shy to invest in such highly capital intensive industries with low return, high risk and long gestation period. In fact, all basic raw materials and infra-structures are being provided by the public sector in order to assist the common man to start small-scale and medium scale industries and thus work shoulder to shoulder for the economic development of the country.

No doubt public sector industries have been set up according to the policy chalked out by Netaji Subhas, Pandit Jawharlal Nehru, Meghnad Saha and other founders of National Planning but the question is "Have we been able to build the nation up to their expectations ?"

Could we eradicate the problem of poverty, illiteracy, unemployment and disease ?

What is the connection between the role of public sector and removal of these evils ? We know all these evils are deep-rooted and are the curse of centuries and can not be removed so soon. But the public sector was set with the objective of rapid economic development to ameliorate and uplift the standard of living of the masses of India. We shall now discuss how far the public sector has fulfilled this objective.

Seventy percent of running public sector industries are utilising above 50% of their installed capacity, while 50% are working up to 75% of their installed capacity or slightly more.

When we look to the profit/surplus generated by the Rs. 80,000 millions we find that the performance is poor. It is only ·5% or less. But normally it should be 10%.

One of the main idea of the setting up of public sector was to plough back the profits for reinvestment so that there is a continuous and automatic growth of industries and employment. Economic processess are such that one feeds upon the other. If these Rs. 80,000 millions can generate surplus of Rs. 8000 millions per year and can be reinvested for the expansion of the industrial base of India, it will increase manifold during a short period and the problem of unemployment of your youth, the flowers of our country, will be solved to a great extent, and there will be on over all improvement in the standard of living of our masses.

From the above we find that the performance of the public sector has improved a good deal but still they are lacking behind both in capacity utilisation and generation of profits for reinvestment—the main objectives for which public sector was set up.

In order to achieve the above objectives following steps may be considered :

Patriotic leadership of industrial administrators :

Our industrial administrators should be real leaders, patriots and must have a spirit of self sacrifice. History teaches us that achievement of objective depends on the strength of leadership. If the idea is noble, the object is mass upliftment, the cause is national respect and if people are enthused with these ideals by right type of leadership they can do wonders. The worker shall be made to understand that they are working with him not because he has power to dictate them but they are working in a team, every member of which has a distinct role to play i.e. to contribute their might to build a strong, happy and prosperous India. Our youth and workers can be enthused with the spirit of hard work and discipline if all of us inculcate the patriotism, self-sacrifice and hard work of Netaji Subhas and other great national leaders.

Reduction of over-capitalisation of Plants :

Block capital of plants is high and is rising day by day. Black capital may be brought down by skilful purchase of plants and reducing or waving the customs duty/excise duty on plant and machineries which are capital goods. In this case money is being transferred from one pocket to another pocket of the govt. Money paid by the public sector undertaking as customs/excise duty is received from the govt. as capital and paid back to the govt. as duty which becomes revenue income to the same govt. ultimately the plant will have to provide for interest, depreciation and other losses for this amount and thus the block capital will go up. Some deferred payment or waving of these duties will bring down the block capital of public sector undertakings.

Capacity utilisation of Plants :

This is the most important factor. If full capacity is utilised, the country will get the required material, plant will also increase income. Here men, machine and material all are involved. Men must work hard and shall be efficient, machine must be sound and material must be of good quality. But ultimately every thing depends on honesty, integrity, hard work of men. All concerned shall be enlightened if the plants are producing to the fullest capacity, we all shall get enough materials for consumption and export. With the increase in income, plants will be able not only to increase our emoluments but will also have enough fund for expansion to provide employments for our children.

খেলাধুলোর
মরশুমে
বাটা
ট্রেনিস ৮৩
সাইজ ৩-১০
টা ২২.৯৯
জেস-টু-টা ৯১
সাইজ ৩-১০
টা ১৫.২৫
পি পি বুলেট ৩৯
সাইজ ৫-১০
টা ৩২.২৫
Bata

Reduction in Inventory Holdings :

Inventory turnover in USA is 8, in UK and USSR 4 and in India 1. Inventory turnover means value of a year's consumption of Raw Material of any individual organisation divided by the value of stock held by the organisation. Thus USA manages with a stock of values of $1\frac{1}{2}$ months consumption. UK with the three months consumption and Indian Industries unnecessarily stores stock of six months to one year's consumption. Such heavy stocks not only cause unnecessary lockage of capital but is also the root cause of losses of many industries. Inventory carrying cost per year is about 25% of the inventory value held by an organisation. In fact, the third largest element in manufacturing cost is material flow cost which is only behind material and labour cost. If the scientific inventory control is followed and the inventory is brought down, money blocked in dead weight of unnecessary inventory will be released for production purpose and the profit of all undertakings will go up,

High power commissiou :

Giant industries have been set up in public sector. The public sector is now controlling national life to a great extent. We could not yet develop methods of effective control on the activities of the industries. But such effective control on the activities of these public sector industries is essential. In order to study their activities and to evalute the result a high power commission should consist of eminent jurists, economist, engineer and accountants of the highest calibre available in the country. The commission should study the activities of the various industries under public sector and suggest constructive remedies for defects, and failures and thus help to evolve a code for the regulation of the public sector industries.

We feel that the best way to enthuse our youth and workers with the spirit of self-sacrifice, patriotism, discipline and hard work is to inculcate the life and activities of Netaji Subhas and other great national leaders.

২০৯ বি বিধান সরণিস্থ কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

সুকান্ত মূল্যায়ন

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৫০-তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য। বাংলার বহু খ্যাতনামা কবি ও প্রবন্ধকারের আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

মূল্য : পাঁচ টাকা

গঙ্গাসাগর মেলা

সচিত্র এই বইখানিতে রয়েছে মেলার ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সাম্প্রতিক কালের বিশদ বিবরণ। তাছাড়া আছে পথ-নির্দেশ, ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্য।

মূল্য : দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি আবশ্যক গ্রন্থ। বাংলার লোকসাহিত্য, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য লোক-উৎসব, লোকসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু প্রমুখ অধ্যাপক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও অন্যান্য যাঁদের বিশিষ্ট দান আছে, তাঁদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত।

মূল্য : পাঁচ টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭
প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১, কিরণশংকর রায় রোড কলিকাতা-১,

পঃ বঃ (তথ্য জনসংযোগ) ৩২৪।৭৭

With best Compliments of

Das Goopta & Co.

PROCESS ENGRAVERS, DESIGNERS & ART PRINTERS

15, MAHENDRA SARCAR STREET, CALCUTTA-700012

PHONE : 24-4515

22 JAN 1977

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১৫·০০
পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
বিদ্যার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	৫·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	৩·০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড প্রতিখণ্ড	৩·৫০
বেদুইনের দেশে	৩·০০
নিবেদিতা	১০·০০

মণি বাগচী

বিদ্যাসাগর	১০·০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২·০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪·০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·৫০
বাংলার ঋষি	৫·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবনগড়া	১·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্ধিত সংস্করণ)	

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬·০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ নিবারণ	৫·০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩·০০
শরীর ও শক্তি	৩·০০
সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট প্রতিটি	১·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা - ১২

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

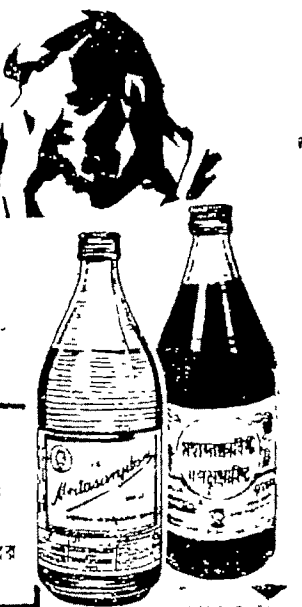

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

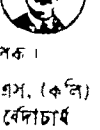

অধ্যক্ষ ডাঃ নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের বনাম্বন্ধ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/69

Central Registration No 2870 57 Per Copy Rs 3·00 with Regtd Postage Rs 5·00 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

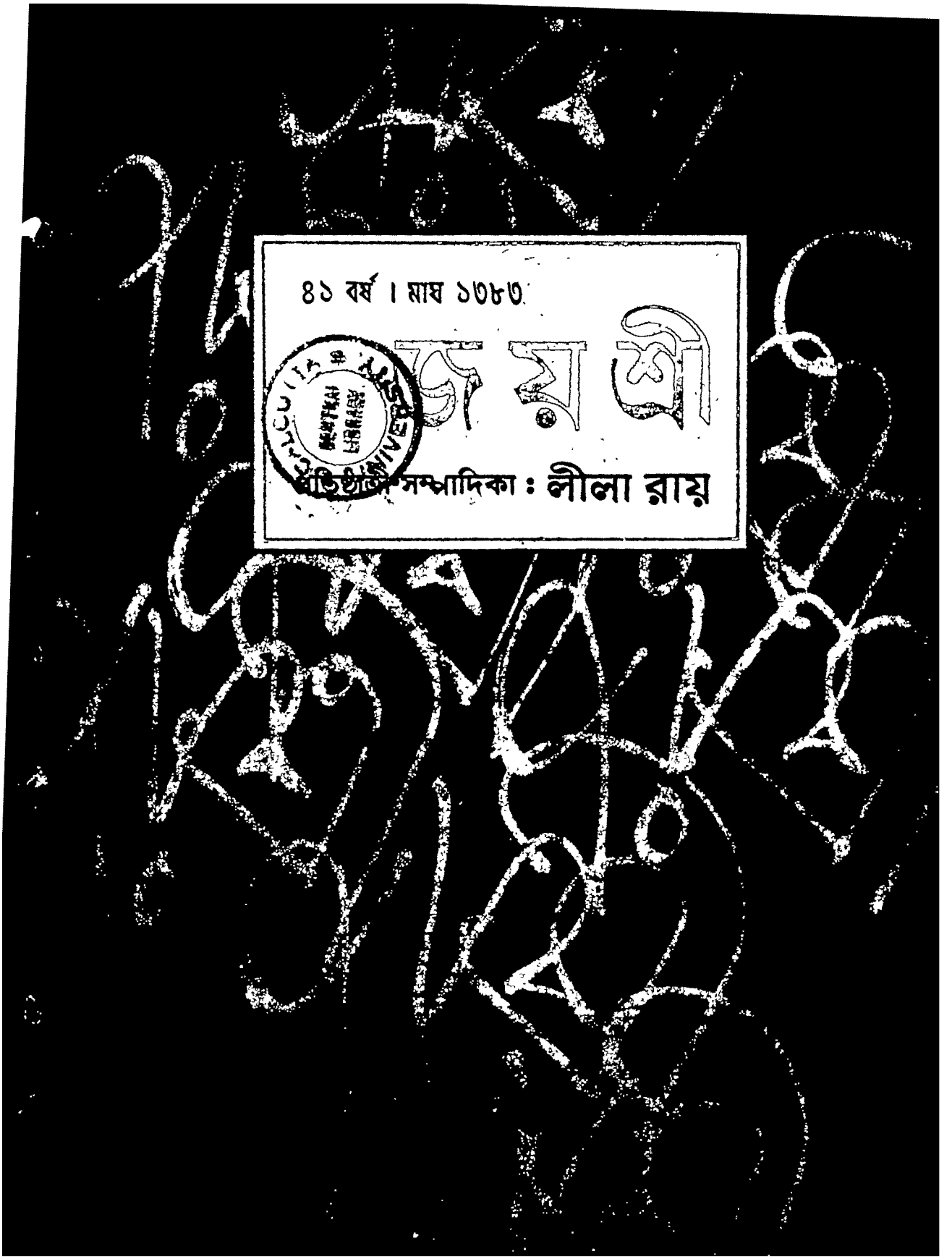
৪১ বর্ষ । মাঘ ১৩৮৩
সম্পাদিকা : লীলা রায়

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাঁধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্যে দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন

(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪১ বর্ষ ১৩৮৩ মাঘ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
নির্বাচনের ডাক ৫৭৫

কবিতা
ক'লকাতা ॥ অমিয় চক্রবর্তী ৫৮৩
সুভাষচন্দ্র : বাংলা কবিতায় : ৫৮৬
(আলোচনা)
অলকরঞ্জন বসু রায়চৌধুরী

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ৫৯৯
অভয়শঙ্কর শর্মা

আফ্রিকা : কালোমানুষের মুক্তি-সংগ্রাম
(আলোচনা) ৬১১
মৃণাল বিশ্বাস

কবিতা
শিলাজতুর সুবাস সুমনা দাস ৬২৩
'ইন টিউন উইথ প্রেস' (কাহিনী) ৬২৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশন-এর

কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬·০০

NETAJI SPEAKS
Volume One
A collection of speeches & writings 5/-

রামমোহন
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব
সুনীল দাস ১·২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান
অনিল রায় ২·০০

২০-এ প্রফুল্লচন্দ্র সরকার রোড, কলিকাতা-২৬

জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র ২য় খণ্ড ১ .০০ পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বক্সী

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্যতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

জয়ন্তী

৪১ বর্ষ। দশম সংখ্যা। মাঘ ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের ডাক

লোকসভায় নির্বাচনের ডাক পড়েছে। গত ১৮ই জানুয়ারী রাত্রিবেলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকের পর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানালেন মার্চ মাসে লোকসভার নির্বাচন হবে এবং বর্তমান লোকসভাকে অবিলম্বে ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণায় আকস্মিকতা থাকলেও বিস্ময়ের কিছু থাকে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের ওপর এ-ধরণের আকস্মিকতার ঝলক বর্ষণ করে থাকেন। ভারতবর্ষের বিগত লোকসভার আয়ুষ্কাল ফুরাবার একবছর আগেই প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১-এর নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন। এবার লোকসভার আয়ুষ্কাল ফুরাবার পরও দুই বছর পর পর তা বর্ধিত হয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে লোকসভার —এবং সেই সঙ্গে বিধানসভাগুলিরও বটে— আইনানুগ আয়ুষ্কাল এক বছর বর্ধিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বর্তমান লোকসভা আরও পনের মাস চালিয়ে যেতে পারতেন। দলের সংখ্যাপরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান অনুযায়ী পরিষদীয় আয়ুষ্কাল বাড়াবার ক্ষমতা পেয়ে থাকলেও দেশের মানুষ এই সাংবিধানিক অনৈতিকতাকে সমর্থন করে নাই। সেন্সর আইনে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ ছিলো এবং এমার্জেন্সীর জুজু দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিলো। তাই এই অনৈতিকতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ কোথাও প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত হয় নাই। শুধু সেই অনৈতিকতার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যই যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন, একথা ভাবলে ভুল হবে। লোকসভার নির্বাচনের সময় হিসাবে ১৯৭৭-এর মার্চ মাসটাই প্রধানমন্ত্রী নানা দিক থেকে প্রকৃষ্ট সময়রূপে বেছে নিয়ে থাকবেন। হয়তো

তার হিসাবে মার্চের পর নির্বাচনের সময় ধার্য করলে তা কংগ্রেসের অনুকূল হবে না, হয়তো বা পরিস্থিতির জটিলতার দরুণ আগামী পনের মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আর সুযোগ হয়েও বা উঠতে না পারে। এই ধরণের নানা হিসাব-নিকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দাবাহিনীর নির্বাচনের সময় সম্পর্কে অভিমত, কিম্বা ভারতবর্ষের নিকট-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা বা কর্মসূচী ১৯৭৭-এর মার্চে নির্বাচনের সময় ধার্য করতে তাঁকে বাধ্য করে থাকবে।

জরুরী অবস্থা চলাকালীন সরকারী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ সম্পূর্ণরূপে মূক করে দেওয়া হয়েছে, দেশের এবং জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনে সংবাদপত্রগুলিকে সরকারী নীতির নিরঙ্কুশ তাবেদারীর বাহনে পরিণত করা হয়েছে,—দুই-একটি পরাক্রান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া,—জাতির জাগ্রত চেতনাকে নির্বীর্য করে ফেলা হয়েছে এবং গোটা জাতিকে এক অভূতপূর্ব কর্তাভজার সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রায় সকল সংবাদপত্রগুলিতেই একটি, কি দুইটি কণ্ঠস্বরের কলতান ছাড়া জাতির আর সকল কণ্ঠস্বরই মাটিচাপা পড়ে জীবিতের দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছে। ১৯৭৫-এর ২৬শে জুন আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বে সরকারী স্বৈরশাসন, দুর্নীতি ও মূল্যবোধের হত্যার বিরুদ্ধে বিরোধীদের সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর বহ্বারম্ভে, কিম্বা—ভাষান্তরে,—আস্ফালনেই রয়ে গেলো, বিরোধীরাও আজ সে কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। ইংরেজ আমলের চূড়ান্ত অত্যাচারের দিনগুলিতে যা সম্ভব হয় নাই, এবার ভারত সরকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সন্ত্রাসের শাসন তাকে হার মানিয়েছে, বলতেই হবে। আর বিরোধীদের মধ্যে যারা অহরহ বিপ্লবের নামে শপথ নিয়েছেন, তাদেরই দেখা গেলো, জরুরী অবস্থার সন্ত্রাসের কাছে নির্বীর্য বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষা করে চলেছেন এবং বামপন্থীর শিরোপা টাঙিয়ে এবং মাঝে মাঝে বৈঠক বসিয়ে সংগ্রামের অনুচ্চ হুমকীর প্রহসন করেছেন।

১৯১০ সালে ভারতীয় প্রেস আইন (Indian Press Act) পাশ করে ইংরেজরা যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রদোষকালে একটা জাতির স্বাধীন চিন্তার উপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কণ্ঠরোধ করেছিলো,—যা ১৯০৮ সালে প্রবর্তিত সংবাদপত্র (অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনাদান) আইনেও [Newspapers Incitement to Offences Act] সম্ভব হয় নাই। এবারকার সেন্সরশিপ ব্যবস্থাপনার করাল ছায়া তেমনি সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তারই মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং সরকার সংবাদপত্রগুলিকে যে ভাষায়, যে ভঙ্গীতে কথা বলাতে চেয়েছেন, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই—প্রশংসনীয় নির্ভীকতার ব্যতিক্রম ছাড়া—সেই কাজ হাসিল করে ছেড়েছেন।

নির্বাচন ঘোষিত হ'বার পর সর্বোচ্চ সরকারী স্তরে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচনের অবাধ সুযোগ দেবার জন্য এমারজেন্সীর বিধান শিথিল করা হবে। সেগুলি প্রত্যাহার করা হবে—এ-ধরণের দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি সরকারী-পক্ষ থেকে এ-পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই এবং এমারজেন্সীর বিধানগুলি শিথিল করা (relaxation) এবং প্রত্যাহার করার (revocation) মধ্যে যে যোজন-ব্যাপী ব্যবধান রয়েছে, সেই ব্যবধান ঘোচাতে কোনো উদ্যোগও সরকারী তরফে নেই। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে নির্বাচনে আকস্মিকতার প্রকৃতির সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক ঘোষিত নির্বাচনের আকস্মিকতার প্রভেদ আশমান-জমিন পর্যায়ের। এতো বিধিনিষেধের বেড়াজালে, এতো সন্ত্রাসের আঁধার-আলোয়, শাসকের উদ্যত খড়্গের এতো অনুচ্চ শাসানির পরিবেশে, এতো সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পথে এতো প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে আর কখনও ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শিথিল করা ও প্রত্যাহার করার মধ্যে ফাঁক কতটা, দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই বোঝানো যাবে। গত ১৯ মাসের সেন্সারসিপের উৎস ভারতের প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিধানের ৪৮নং রুলের (Rule 48 of the Defence and Internal Security of India Rules) অমোঘ প্রয়োগ, নির্বাচন উপলক্ষ্যে আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে। এই ৪৮ নং বিধানের প্রয়োগের ফলেই সরকারের হাতে সংবাদপত্র সেন্সরশিপের অধিকার বর্তায়। এই ৪৮ নং বিধানের প্রয়োগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে পারেন। এই বিধানটি আইনের পাতায় রয়ে গেলো, এবং নির্বাচন চলাকালে কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করলে, এই আইনের বলে পুনরায় সেন্সরশিপের প্রয়োগ বহাল করে স্বাধীন মত প্রকাশের সকল প্রকার পথে প্রতিরোধের মহড়া নিতে পারবেন। এই ঝুলন্ত খড়্গ সর্বদাই অবাধ-নির্বাচনী অভিযানের পথের কাঁটা হয়ে থাকবে।

যে চৌহদ্দির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তার ছক স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১৮ই জানুয়ারী তারিখে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার ভাষণে বলেছেন: জরুরী অবস্থার কিছু আঁটুনি, আরও শিথিল করে দেওয়া হয়েছে, 'আইনসম্মত রাজনৈতিক কার্যকলাপ'-এর সুযোগ দেবার জন্য—to permit "legitimate political activity"। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের সুযোগ দেবার ঘোষণা এই "আইন সম্মত রাজনৈতিক কার্যকলাপ"-এর সর্তে চাপা পড়ে গেলো। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সংগ্রামের যুগে ইংরেজ-শাসকরা যেমন এক এক পর্যায়ের নির্মম অত্যাচারের পর কিছু কিছু শাসনসংস্কার দিয়ে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার ছিঁটে-ফোটা ছুঁড়ে ফেলে দিতো, ১৯ মাসের জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের সকল প্রকার স্বাধীনতা

হরণের, লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবরণের, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে নির্মূল করবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধৃত বন্দীদের নির্মমভাবে অত্যাচারের পর, জরুরী অবস্থা কিছুটা শিথিল করে "আইনসম্মত রাজনৈতিক কার্যকলাপ"-এর অনুমতি দিয়ে, কংগ্রেসের দাক্ষিণ্য বিতরণের মধ্যে ইংরেজ-শাসকদের প্রভুত্বের মনোভাব ষোলআনা নিহিত রয়েছে। বাড়ীর কর্তাব্যক্তিরা পরিবারের নাবালকদের এই ধরণের সুযোগ দিয়ে আত্মপ্রসাদের গরিমা লাভ ক'রে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় সে-ধরণের আত্মপ্রসাদের ছাপ যে নাই, তা কি কেউ উচ্চকণ্ঠে বলতে পারবেন,—গত উনিশ মাস যারা তাঁর স্তাবকতা ক'রে ক্ষমতার মঞ্চে স্থান দখল করে রয়েছেন কিম্বা ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে আরও ঊর্ধ্বারোহণ করেছেন, তারা ছাড়া ?

রাষ্ট্রপতি, নাগরিকদের 'সাতটি স্বাধীনতা'—'Seven Freedoms'—আইন বলে জরুরী অবস্থার সময় বাতিল করে দিয়েছেন। 'মিসা' বা নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তারের জাল গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে নির্বিচার গ্রেপ্তারের অধিকার অধস্তন কর্মচারীদেরও দেওয়া হয়েছে ; শুধু তাই নয়, এই ধরণের নির্বিচার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনার সকল প্রকার আইনের পথ নাগরিকদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে—বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইংরেজ আমলের সব চাইতে বিভীষিকাময় দিনগুলিতেও যা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা হয় নাই—এর উপরে জারী রয়েছে ১৯৭৫-এর ৮ই ডিসেম্বর থেকে ইংরেজ আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের নৃশংস আইনকেও লজ্জা দিয়ে "আপত্তিকর বিষয় প্রকাশন দমন আইন"—"Prevention of Publication of Objectionable Matter Act—" যে আইনের বলে, যে কোনো নির্বাচনী ইস্তাহার, যে কোনো প্রবন্ধ-পুস্তিকাকে "আপত্তিকর" সাব্যস্ত করে তাদের লেখক ও প্রকাশকদের দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। "আপত্তিকর বিষয়", 'Objectionable Matter'—যে কী তা 'দেবাঃ ন জানন্তি'। কারণ, "আপত্তিকর বিষয়ের" কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জানাতে পারে, কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে, এমন কোনো বাক্য, নিশানা বা দৃশ্যপট —যার পরিণতিতে সাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে কিম্বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়—"Cause or tend to Cause Public disorder", তাকেই "আপত্তিকর বিষয়ে"র মধ্যে টেনে আনা যেতে পারে। এই অনির্ণেয় সর্ত, সরকারী দৃষ্টিতে পূরণ হয়ে গেলেই "আপত্তিকর বিষয় প্রকাশন" আইনের কোপে পড়ে লেখক ও প্রকাশক দণ্ডনীয় হবেন। শুধু কি তাই ; কোনো বাক্য, নিশানা কিম্বা দৃশ্যমান বস্তু যদি কর্তৃপক্ষের বিচারে রাষ্ট্রপতির, উপরাষ্ট্রপতির, প্রধানমন্ত্রীর, লোকসভার স্পীকারের কিম্বা রাজ্যপালদের অবমাননাকর সাব্যস্ত হয়, সেক্ষেত্রেও দণ্ড অনিবার্য। যারা কার্টুন আঁকবেন প্রার্থীদের সম্পর্কে, যারা

সম্পাদকীয় লিখবেন নির্বাচন সম্পর্কে, আর প্রার্থীরা, যারা শাসকদের শাসনের সমালোচনাসূত্রে প্রধানমন্ত্রীর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবেন—তাদেরও 'শিরে সংক্রান্তি' অপেক্ষা করবে। এদের সবাইকেই নির্বাচনের শিথিল-পরিস্থিতির অবসানের পর তাদের বিরুদ্ধে মামলার এবং দণ্ডের জন্য তৈরী থাকতে হবে। সব চাইতে বড়ো কথা "Prevention of Publication of Objectionable Matter Act"কে সংবিধানের নবম তপশীলের (Ninth Schedule) আশ্রয়ে বচারালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে রেখে এই আইনটিকে নিরাপদ করা হয়েছে। এই একটি আইন নবম তপশীলের নিরাপদ দুর্গে সচল রেখে, প্রার্থীদের এবং তাদের স্বপক্ষে প্রচারকদের, তাদের পত্র-পুস্তিকা প্রকাশকদের, সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের ওপর শিথিল-এমারজেন্সীর পরিস্থিতিতেও নির্বাচনোত্তরকালে দণ্ডের সন্ত্রাস ঝুলে থাকবে। বাক্-স্বাধীনতার এই কুণ্ঠিত অবস্থায়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উচ্চবণ্ঠ প্রচার করে শাসকদল শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনাই করছেন তা নয়, যারা শাসক দলের উনিশ মাসের সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন, তাদেরও প্রতারিত করে আর একবার তাদের ওপর দণ্ডের নির্বাসন চাপিয়ে দেবার প্রচ্ছন্ন উদ্যোগ করছেন—এই অভিযোগ অস্বীকার করবার তাদের পথ কোথায়?

এখনও বহুলোক জেলে আটক রয়েছেন, বিভিন্ন-দলের সদস্যরা, নেতারা মুক্তি পান নাই। গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেলদের বৈঠকে রাজ্যওয়াড়ীভাবে হিসাব-নিকাশ নেবার পরও সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে "খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই আটক আছেন" এবং তাদের নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী এস, এল, খুরানা রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ-সূচক কয়েকটি কথা বলেছেন, যার তাৎপর্য সাদা কথায় বুঝতে হ'লে বলতে হবে: 'এমারজেন্সীর শিক্ষাটা সাধারণ মানুষের মনের গভীরে কতটা গেঁথ রয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলিই বা কতটা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলবেন তা দেখতে হবে' "How far the Emergency has been able to discipline the people and how far political parties would like to act in a disciplined manner remains to be seen." খুরানা মহাশয় আসলে কী একথাই বলতে চান যে এমারজেন্সীর খোঁয়ারে উনিশ মাস কাটাবার পর, তার বাইরে এসে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুক্ত বোধ করে স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করেন কিনা, না খোঁয়ারে রেখে তাদের স্থায়ীভাবে মূক-বধির মেষশাবক তৈরী করা গেছে কিনা সেটাই দ্রষ্টব্য? খুরানাসাহেব অবশ্যি রাজনৈতিক দলগুলিকে অবাধ মত প্রকাশের সুযোগের কথা বলেছেন, তাদের

সভা-সমিতি বিঘ্নিত না হয় সে দিকেও রাজ্য প্রশাসনকে নজর রাখতে বলেছেন, এবং ভোটদাতারা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। কিন্তু এমারজেন্সীর ডিসিপ্লিনটার যেন হের-ফের না হয়, সাবধান! এমারজেন্সীর এই ডিসিপ্লিনের অপর নামই হবে 'আইনসম্মত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা' : "Legitimate political activity"—নির্বাচনের যে চার-দেয়ালের সীমানা প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১৮ই জানুয়ারীর রাত্রিবেলার বেতার-ভাষণে লোকসভার নির্বাচনের ঘোষণার সময় টেনে দিয়েছেন।

তারপর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের সভা করছেন। সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করছেন। সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তেই বিরোধীরা এমারজেন্সীর "আপত্তিকর বিষয় প্রকাশন বন্ধ আইনের", মিসা বন্দীদের মুক্তির (অর্থনৈতিক অনাচারের জন্য মিসায় বন্দী ছাড়া), মিসা আইন প্রত্যাহারের এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের দাবী জানিয়ে এসেছেন। ২০শে জানুয়ারী তারিখে চারটি অকম্যুনিষ্ট বিরোধী দল,—যারা গত এক বছর যাবৎ সংহত হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন—নির্বাচনের জন্য একটি দলের নামের তলায় সমবেত হয়েছেন, সে নামকরণ হয়েছে : 'জনতা পার্টি'। তার একটি পতাকা থাকবে, নির্বাচনী প্রতীকও থাকবে একটি। নির্বাচনের পর এই চার পার্টির—সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং লোকদলের—বিলুপ্ত হয়ে একটি দলে এরা সংহত হবেন। স্থায়ী নাম, পতাকা, প্রতীক ইত্যাদি সে-সময় স্থির করা হবে। এ-দলের সভাপতি হয়েছেন মোরারজী দেশাই, সহ-সভাপতি চৌধুরী চরণ সিং সাধারণ সম্পাদক—সুরেন্দ্র মোহন, এল, কে, আদভানী, সেকেন্দার বখ্‌ত, রামধন। ২৭ জনের একটি জাতীয় কর্মপরিষদও এই দল গঠন করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য পরিষদীয় কমিটি। গোড়ায় যেমন এই নূতন দল এবং তার অংশগুলি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, আপত্তিকর বিষয় প্রকাশন বন্ধ আইন প্রত্যাহার, সকল বন্দীমুক্তি, বাজেয়াপ্ত প্রেস-পত্রিকা পুনঃ পরিচালনার সুযোগ দান, মৌলিক স্বাধীনতার প্রত্যাবর্তন, ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী প্রত্যাহারের জন্য উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এবং তাদের এই দাবীর ঝোঁক ছিল এ-সব সর্তপূর্ণ সাপেক্ষে তাদের নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ, নির্বাচনের দিন, ১৬ থেকে ২০শে মার্চ, এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঝোঁক নির্বাচনের দিকে চূড়ান্তভাবে সরে এসেছে। শুধু জনতা পার্টি নয়, অন্যান্য বিরোধীদলও এমারজেন্সী প্রত্যাহার, বন্দীমুক্তি, 'আপত্তিকর বিষয় প্রকাশন বন্ধ আইন' প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবী থেকে সরে গিয়ে নির্বাচনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পীড়নমূলক আইনসমূহ, যা দেশের ওপর দিয়ে সন্ত্রাস ও নিপীড়নের ঢেউ বইয়ে একতান্ত্রিক শাসন এবং ব্যক্তি-শাসনের দিকে দেশকে একদিকে প্রবলভাবে ঠেলে নিয়ে এসেছে, এবং অপরদিকে

নৈতিকতা-বিরোধী বে-আইনী আইনের মহড়া দিয়ে দেশকে নির্বীর্য করেছে, বিরোধীদের নির্বাচনের নিঃসর্ত অংশগ্রহণে সেই বে-আইনী আইনের উনিশ মাসের দুঃস্বপ্নকে নিঃসন্দেহে আইনানুগ মর্যাদা দেওয়া হবে। এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তাই জনতা পার্টি হোক কিম্বা অন্য যে কোনো বিরোধী দল হোক, তাদের দায়িত্ব ছিল বে-আইনী আইনসমূহ প্রত্যাহারের দাবীকে দুর্জয় সংগ্রামে পরিণত করে, নির্বাচনের পূর্বে এই সকল বে-আইনী আইনের প্রত্যাহার অনিবার্য করে তুলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করা। সংগ্রামোত্তর নির্বাচন না হলে বিরোধীদের সাফল্যেও—যদি সাফল্যই তাঁরা লাভ করেন—পূর্বেকার নির্বাচনোত্তর গতানুগতিকতায় তারা আত্মসমর্পণ করবেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নির্বাচনে বিরোধীরা সীমিত সাফল্য লাভ করে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দলের কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্থিতস্বার্থের সাম্রাজ্য রচনায় মশগুল থেকেছেন, লোকসভার প্রিভিলেজের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে বসে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের এবং নিজেদের মাঝখানে প্রিভিলেজের প্রাচীর তুলে দিয়েছেন, এবারও তার চাইতে পৃথক কিছু হবে বলে ভরসা হয় না—সংগ্রামোত্তর নির্বাচনকে যেখানে তারা এড়িয়ে গেলেন।

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে মোরারজী দেশাই জনতা পার্টির নির্বাচনী অভিযান গত ৩০শে জানুয়ারী সুরু করে প্রশ্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে—২৫শে জুনের রাত্রির অন্ধকারে গ্রেপ্তারের আয়োজন তো পক্ষকাল পূর্বেই করা হয়েছে? তাহোলে ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ আনা হয়েছে বিরোধ নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য, সে ষড়যন্ত্রটা করলো কে?: 'আপনি না আমরা?' "I wish to ask whether it is we who hatched the conspiracy or whether it is you who hatched the conspiracy." আর দেশাই-এর ভাষায় 'এমারজেন্সী তো জারী হ'লো এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায়ের ফলে।'

পাটনায় জনতা পার্টির নির্বাচন অভিযান সুরু করে জয়প্রকাশ নারায়ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন: 'এই নির্বাচন স্থির করবে দেশে গণতন্ত্র থাকবে, না একনায়কতন্ত্র তার স্থলবর্তী হবে।' জয়প্রকাশ নারায়ণ আরও বলেন যে দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে হবে, কারা প্রস্তুত।' জয়প্রকাশ নারায়ণ মনে করেন এই নির্বাচন আগামী পঁচিশ বছরের জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে দেবে। দেশ কোন পথে যাবে—গণতন্ত্রের না একনায়কতন্ত্রের? জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে নির্বাচনটা নিছক ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে হার-জিৎ নয়, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লুপ্ত মূল্যবোধের প্রত্যাবর্তন তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। নিছক হার-জিতের খেলার পর বিরোধী দলের কিম্বা সদস্যদের সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, এযাবৎ বিরোধী দল এবং তাদের সদস্যরা কমবেশী সকলেই যা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, এবং শাসকদের পরিখার অপর পারে দাঁড়িয়ে, কিঞ্চিৎ

সমাজ-সচেতনতার তুবড়ী ছুঁড়ে, আসলে পরার্থ-পরতার পরিবর্তে আত্মপরতায়ই মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তা সত্ত্বেও জয়প্রকাশ নারায়ণ চেয়েছেন অ-কম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলি একটি দলে সংহত হয়ে এক পতাকা ও এক প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখোমুখি হউক। জনতা পার্টির উদ্যোগও তাই। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে অন্যান্য বিরোধীদলের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট যাতে ভাগ না হয় সে-ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, এই অন্যান্য বিরোধীদলের অন্যতম।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাদের সহচররা কারা? এমারজেন্সীর খড়্গ যে-সময় ভারতীয়ত্বের মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তনে প্রতিশ্রুত সংগ্রামীদের আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত করছিলো, যে-সময় মূল্যবৃদ্ধি এবং আনুসঙ্গিক আধিক সঙ্কটে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন রক্তমোক্ষণে ধুঁকছিলেন, এবং প্রত্যাশা করছিলেন, যারা বামপন্থী পরিচয়ে অহরহ বিপ্লবের হুমকি দেন, পশ্চিমবঙ্গে সেই দলগুলি সেই নিদারুণ সঙ্কটে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শাসক দলের নীতি পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে নেবে পড়বেন। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা দূরে থাকুক, মাঝে মাঝে এই দলগুলি বামপন্থার তক্‌মার নীচে বৈঠক করে শাসকদলের ছায়ার সঙ্গে—কায়ার সঙ্গে নয়—লড়াইয়ের ছলনা করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান দুর্গতির জনক কে? ইতিহাসের নিরিখে তা নির্ণয় করতে গেলে, ইতিহাস এই বামপন্থার তক্‌মাধারীদের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করবে। সুতরাং এই দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়ায় অ-কম্যুনিষ্ট জনতা পার্টি এক-নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার যে সংগ্রাম করছেন, সে সংগ্রামের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা অনিবার্য-ভাবে শিথিল হয়ে যাবে। কারণ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাদের সহচরেরা নিঃসংশয়ে একতন্ত্রবাদী। পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্ট শাসনের আমলে কাজে ও কথায় তারা সে-পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং এই নির্বাচনকে মূল্যবোধের সংগ্রামে পরিণত করতে যারা এগিয়ে আসবেন, তাদের সেই উদ্দেশ্য অলক্ষ্যে ব্যাহত হয়ে গেলো।

এরই মধ্যে গত ২রা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রের সর্ব চেয়ে প্রবীণতম মন্ত্রী এবং প্রবীণতম কংগ্রেস সদস্য এবং কংগ্রেসের উচ্চস্তরের সকল সংগঠনের অন্যতম নেতা জগজীবন রাম, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট ও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী পরিকল্পনাকে প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত করেছেন। জগজীবন রামের সঙ্গে পদত্যাগ করেছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ, এম, বহুগুণা ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কে, আর, গণেশ, প্রাক্তন লোকসভার প্রবীণ সদস্য ডি, এন, ভেণ্ডয়াড়ী এবং প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী রাজমঙ্গল পাণ্ডে। জগজীবন রাম পদত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এমারজেন্সী প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রবীণ সহকর্মীর

[শেষাংশ ৬৩১ পৃষ্ঠায়]

কলকাতা

অমিয় চক্রবর্তী

স্বর্ণচাকনির
ওধার থেকে
এই দৃশ্য দেখব—যদি দেখি—
যারা চলছে কলকাতায়
পথে দোকানে বাড়িতে
এস্‌প্লানেডের স্টলে সেই মাসিক দৈনিক কিনছে
চতুর্দিকে ট্রামের চীৎকৃত সর্পিল গতি
—বুঝিবা স্টল মাটি থেকে হুধাপ উঠেছে,
ট্রামের সরঞ্জাম নতুন প্রশস্ততর—
গোলদিঘিতে তরুণ তরুণী বিদ্যার্থীর উৎসুক ভিড়,
পাশে ঝকঝকে দেশী আন্তর্জাতিক রেস্তরাঁ ;
বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটুকু আছে তা গৌরব-সৌধ,
প্রায় সবটা সরে গেছে দশ বিশ মাইল সুন্দরবনের দিকে
—বাঘ নেই, নৃসিংহের গর্জন আশুতোষের দৃঢ়, উদার আহ্বান,
থামে নি,—
সর্বভারতীয় মহাশিক্ষায় উচ্চ চূড়া, বড়ো গাছ, ঝিলের ঔজ্জ্বল্য ;
চওড়া পথ, বিনামাশুলের কলেজী বাস ; জগৎ জ্ঞানের স্নাতক সমাগম ;
শহরের অদূরে দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ধারে ; জৈন মন্দির, মহাবোধি ভবন
পুরোনো গির্জে মসজিদ—
সব ছাড়িয়ে চিরন্তন মানুষের নীলান্তিক জীবনধর্ম,
তার জাগ্রত প্রকাশ নতুন কলকাতায়,
উৎসবে, শিল্পে, কীর্তনে ;
রাস্তাঘাটের নাম বদলিয়েছে, ক্ষতি নেই, হু'চারটে পুরোনো নামও স্মরণিক
ইংরেজ আমলের গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন ;
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ল আপনিই অদৃশ্য হবে ;
নতুন বা পুরোনো মনুমেণ্টে বহুদিন জড়িয়ে থাকবে

হিজ্‌লি-অত্যাচারের উপর রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত বক্তৃতা।
বড়ো বড়ো দেশী জাহাজের আনাগোনা বন্দরে,
দূরাগত নানা-নিশানী অন্য রাষ্ট্রের অর্ণবপোত, নৌকা, সাম্পান্,
আধুনিক জেটিতে রাজ্যের ব্যবসা, ব্যবসায়ী, আতিথ্য ;
দমদম এয়াপোর্টে তলা উঠেছে, সবুজ ঢাকা বাতায়ন।
ভিতরে সুন্দর পণ্যবীথি, বইয়ের, শিল্পের ; আতিথ্য দোকানে ভীমনাগের সন্দেশ ;
ভদ্র পোস্টাপিস, খবর-চিত্রের বিবিধ দৃশ্য-দেখানো সিনেমা ;
নতুন এরোড্রোম উঠবে হাওড়ার ধারে ? বা নরেন্দ্রপুরে—এখনো ঠিক হয়নি ;
মধ্যশহরে শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর বালিগঞ্জ, আরো দূর পর্যন্ত নৃত্য-নাট্যনিকেতন
ম্যুজিয়ম, গ্রন্থাগার, আরোগ্যসদন, চলচ্চিত্রালয়—
প্রশস্ত রাস্তায় পুষ্পিত বীথি,
কোথায় যেন সানাইয়ের আওয়াজ ;
বস্তিগুলোর অস্তিত্ব নেই, লোকেদের সুশ্রী গঞ্জ নানা পাড়ায় ;
চিৎপুর সত্যই উবে গেছে, ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি গলি, গুণ্ডা, সব অশুভ সুদ্ধ—
ভালো অধিবাসীরা অন্যত্র, জোড়াসাঁকোর ধারে মস্ত পার্ক।

চেয়ে দেখছি—যদি দেখি—
স্বর্ণচাকনির ওধার থেকে
অভিনব, প্রাচীন, আমার কলকাতা॥

দুই

হায়রে, এসবই বহির্দৃশ্য, মনে রেখো আগামী বাঙালি,
যাঁরা গেছেন কলকাতার পথে
তাঁদেরি তৈরি চিন্ময় নগরীর ঐতিহ্য,
রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ,
এপথ দিয়ে গেছেন গান্ধীজি,
গেছেন জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র,
বিজ্ঞানবীর জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্র, মেঘনাদ—
অগণ্য সেবাব্রতী নরনারী জীবন দিয়েছেন ভারত-মুক্তির তীর্থে

তাঁদের দান সর্বাশ্রিত, অগ্নিময়, কল্যাণী ;
বর্হিদেশ থেকে এলেন উলিয়ম জোন্‌স্, আনি বেসাণ্ট্,
ভগিনী নিবেদিতা, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ;
পূর্বএশিয়ার গুণী এসেছেন জ্ঞানের মৈত্রী নিয়ে।
বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবনক্ষত্র বঙ্কিম, মাইকেল, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর
—রবীন্দ্র-নাম বহুশাখায়িত মহাতরু—
চিত্রে অবনীন্দ্র, নন্দলাল যামিনী রায়।
যাঁরা আছেন ধ্যানকর্মে ঃ মাদার টেরেসা, লোকেশ্বরানন্দ ;
নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সঙ্গীতে রবিশঙ্কর, আলিআকবর,
চলচ্চিত্র প্রতিভায় সত্যজিৎ—
নামাবলীর শেষ নেই, মণি-সদৃশ, প্রত্যহ নব-যুক্ত,
ছড়িয়ে আছে আধুনিক কবিতায় গল্পে লোকনাট্যে, গীতে,
কলকাতার সমাজে, আসরে, প্রীতির বৈভবে ঘরে ঘরে ॥

বলি নিজের কথা ঃ জেনেছিলেম মায়াময় আপন সংসার এল্‌গিন রোডে,
কাছের গলিতে গুল্‌-মোরের রক্তিম-সোনার অজস্রত্ব,
যেতাম পদ্মপুকুর পাড়ায় বকুলতলায় ; সুরভিত্বপুর,
মনোমেঘ ;
যদিও স্বনির্বাসিত, তবু সমুদ্র পেরিয়ে আসি বারবার
শুনতে বাংলা কথা,
চিরদিনের, প্রিয় কণ্ঠের
বাংলা গান ॥

হিরন্ময় পাত্র সরিয়ে, ওধার থেকে মহাশূন্যে
যদি দেখি কলকাতা,
অতি দূরে জাগবে ঘর
হয়তো একটি শ্যাম সুবর্ণ রেখা, গঙ্গাজল,
প্রণমিত
অকল্পিত,
মুহূর্ত ॥

সুভাষচন্দ্র ঃ বাংলা কবিতায়

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

ইতিহাসের নায়ককে সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়বস্তু করার দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে কম নয়, একমাত্র গান্ধীজীকে নিয়েই বাংলায় অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে। সে তুলনায় নেতাজীর মতো একটি দীপ্ত ও বর্ণাঢ্য জীবন হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবন নিয়ে এযাবৎকাল খুব বেশী সাহিত্য রচিত না হওয়াটা কিছুটা বিস্ময়োদ্রেক করে। এর সম্ভবতঃ দু'টি কারণ, প্রথম—নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন আগাগোড়া তীব্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এসেছে ও নানা অপপ্রচারের শিকার হয়েছে, এবং দ্বিতীয়—নেতাজীর জীবন সুচিন্তিত গণসাহিত্যের বিষয়বস্তু হবার মতো কালগত দূরত্ব এখনো অর্জন করেনি। অর্থাৎ যত দিন যাবে, ক্রমশঃ তাঁর জীবন কথা-সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করবে সেই লক্ষণও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

নেতাজীর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রভৃতি বাংলার প্রধান সাহিত্যিকরা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কেউ কোনো "সুভাষ-সাহিত্য" আমাদের কেন উপহার দিলেন না—এই ক্ষুদ্র প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে অপূর্ব প্রশস্তিবাণীটি ('দেশনায়ক') রচনা করেছিলেন তা আমাদের সকলেরই পরিচিত। সুভাষচন্দ্রকেই উৎসর্গীকৃত 'তাসের দেশ' নাটিকার মুখবন্ধ "খরবায়ু বয় বেগে" গানটি সুভাষ-জীবনকে লক্ষ্য করে লেখা—এরকম অনেকের[১] ধারণা হলেও ঐ গানে সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট নামোল্লেখ নেই। বস্তুতঃ, এঁদের অনেকেই তাঁদের রচনাকালের মধ্যে সুভাষ-জীবনের চরম উত্তরণ নেতাজীপর্ব দেখে যেতে পারেন নি, তা' পারলে তাঁরা নিশ্চয়ই সুভাষজীবন নিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতেন—একথা মনে করা যায়।

পরবর্তীকালের কবিরা অবশ্য নেতাজীকে উপেক্ষা করেননি। মোহিতলাল ("জয়তু নেতাজী"), সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ("জ্বলন্ত তরবারি") ও দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতের কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের কীর্তি-কাহিনী নিয়ে বাংলায় কিছু কিছু কাহিনী রচনাও হয়েছে বিশেষতঃ শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গল্প-কারকদের হাতে। রাধারাণী দেবীর "অভীককুমার"[২] একটি সুন্দর রূপকথা—যার মধ্যদিয়ে নেতাজীর জীবন তুলে ধরা হয়েছে ছোটদের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এক আজাদ-হিন্দ সেনানীকে[৩] নায়ক করে

১। দ্রষ্টব্য—'মহাজাতি সদন'/শংকরীপ্রসাদ বসু [নেতাজী প্রদর্শনী পত্রিকা] ও "নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ" (২য় খণ্ড)/নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।

২। 'গল্পের আল্পনা' (দেব সাহিত্য কুটীর)।

৩। 'অজয় নন্দী'—'শুকতারা'য় প্রকাশিত গল্পাবলী।

কয়েকটি সকল অ্যাডভেঞ্চার-গল্পও রচনা করেছিলেন। সম্প্রতি নারায়ণ সান্যালের "আমি নেতাজীকে দেখেছি' গ্রন্থ নেতাজী জীবন-ভিত্তিক সার্থক উপন্যাস রচনার সম্ভাবনাকে প্রকটিত করেছে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই অবশ্য কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছেন। দিলীপকুমার রায়ের লেখায় আছে, বিলেতে তাঁর এক ভক্ত সহপাঠী তার হিরো সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু স্বভাবসংযত সুভাষচন্দ্র নাকি বেচারীর সেই উৎসাহে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। আরও পরবর্তী-কালে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রস্থিত সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ব্যঙ্গপটু বাঙ্গালী অনেক কবিতা লিখেছে, তার কিছুসংখ্যক বেশ কদর্যও; ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলকে আঘাত করবার বাঙ্গালী ঐতিহ্যবাহী এক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কবিতাগুলো অবশ্য বর্ত্তমান আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়নি। 'অন্ধ গুরুবাদের' সমালোচক সুভাষচন্দ্রের অন্ধতা ঘুচিয়ে দেবার জন্য অরবিন্দ আশ্রমের নিশিকান্তও নাকি একটি কবিতা লিখেছিলেন। আরও পরবর্তীকালে নেতাজীকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন জাপানের জাতীয় কবি নোগুচি, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অনামা গীতিকার তাঁকে নিয়ে গান রচনা করেছিলেন, আর তারও পরে সুভাষচন্দ্র বিষয়ে কবিতা লিখেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই বিতর্কিত অধ্যাপক ওটেন সাহেব। কিন্তু এসব কবিতার অনেকগুলোই বাংলায় নয়, কাজেই সেগুলোকেও আলোচনার বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে রচিত আধুনিক বাংলা কবিতা যেগুলো সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বা সংকলনে[৪] চোখে পড়ে সেগুলোকে মোটামুটি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কোনো কবিতা স্মৃতিচারণমূলক, কোনোটি গুণকীর্তন বা জীবন-কথার বিবৃতিমূলক, আবার কোনোটিতে নেতাজী একটি আদর্শবাদের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত হয়েছেন, কোনোটিতে বা তাঁর উদ্দেশ্যে উদ্গীত হয়েছে সেই চিরন্তন কবিপ্রার্থনা—"Thou should be living at this hour—England hath need of thee!" এইসব শ্রেণীর কবিতাই এই আলোচনা স্থান পেয়েছে। —কিছু উদ্ধৃতি-সহযোগে।

নেতাজীর কলেজ-জীবনের সহপাঠী কাজী আবদুল ওদুদ স্মরণ করেছেন সুভাষচন্দ্রের ছেলেবেলাকার প্রেরণার কথা তাঁর কবিতায়—"অশ্রান্ত ছিল তার বন্ধুদের দেশের পথে আহ্বান/একদিন কাঁধে হাত রেখে বলেছিল সে অনুচ্চ কণ্ঠে—/ত্যাগ করতে হবে ভোগবিলাসের পথ, হতে হবে ফকির,/ফকির হয়ে করতে হবে দেশের সেবা, দশের সেবা—/তাতেই জীবনের সার্থকতা"। ['জানতাম এক সুভাষচন্দ্র বসুকে'] সাবিত্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তিনি শুধু কবি নন, সুভাষচন্দ্রের সহচরও, কবিতা লিখেছেন[৫] তাঁর মধুর স্মৃতির বেদনাভারে— "মনে হয় বুঝি এখনই আসিয়া দাঁড়াবে আমার কাছে / চিরপরিচিত স্মিত সুহাস্যে করিবে আলিঙ্গন / তোমার কণ্ঠে সেই আহ্বান আজিও হৃদয়ে বাজে / নয়নের জলে তোমার পথে কি দিয়েছি আলিম্পন!" কবি অমিয় চক্রবর্তীর নেতাজী-প্রশস্তি ও স্মৃতিচারণার সুরে ঃ···তাঁর কথা

৪। যে সব উদ্ধৃতির পরে গ্রন্থ বা পত্রিকার নাম উল্লিখিত হয়নি, সেগুলি 'নেতাজী রিসার্চ বুরো' প্রকাশিত কাব্য সংকলন' বীরবন্দনা থেকে গৃহীত বুঝতে হবে।

৫। 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র'/সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

মনে পড়ে, কতবার জীবনের পথে/দেখেছি বিজয়ী মূর্তি, অক্লান্ত দেশাত্ম চর্যাব্রতে/···লাহোরে দিল্লিতে দেখা, কলকাতায় দীর্ঘ প্রতিবেশী/সান্নিধ্য এলগিন রোডে—মধ্যে দূরদেশী/গেছি স্নিগ্ধ কার্লস্‌বাডে, ছিলাম তাঁরি যে অতিথি···"তারপর কালক্রমে নেতাজীর আবির্ভাব : "ভয়হীন জয়বাণী 'জয়হিন্দ' মাতৃভূমি ফিরে/পেলনা সন্তান তাকে, তবু তীরে তীরে/'জয়হিন্দ' 'জয়হিন্দ' যুগে যুগে তাঁরই কণ্ঠে জাগে—/ কোটি ভ্রাতাভগ্নী জানে সেই মন্ত্র রাগে'নতুন দিনের পথ···" ['বীরবন্দনা']

সুভাষচন্দ্রের রূপকথাতুল্য ভাস্বর জীবনশৌর্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অনেক কবিতার বিষয়বস্তু। কিশোরদের জন্যই এ জাতীয় অধিকাংশ কবিতা রচিত। সুনির্মল বসুর অনবদ্য ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন—"যাঁর রণভেরী জীবন জাগালো মরণ মহোৎসবে/হিন্দুকুশ ও কুমারিকা কাঁপে জয়হিন্দ এর রবে/সেই হিন্দ্‌বীর জয় নেতাজীর কে তাঁরে মারিতে পারে? / মরণ তাঁহার চরণে প্রণাম করে যায় বারে বারে।"[৬] ['নেতাজী জিন্দাবাদ'] সুভাষচন্দ্রের গায়কবন্ধু দিলীপ কুমার তাঁকে নিয়ে ইংরিজি ও বাংলায় একাধিক পদ রচনা করেছেন। তাঁর একটি গানের কিয়দংশ—"দেখেছি আমরা কান্তি যাহার বিকচ ইন্দীবর/শুনেছি যাহার যৌবনবাণী—বৈরাগ সুন্দর/অমিতাভ তেজে বরি যে পাবক / লভিল উপাধি দেশের নায়ক মন্থি মরণসিন্ধু হানিল অমরণ শতদল, / যে তোমারে করি প্রণাম হে অপরাজেয়, অমিতবল।[৭]" 'স্বপনবুড়ো' লিখেছেন—"নেতাজী তোমার পুণ্য ও নামে আমরা আরতি করি/ঘুমের দেশেতে সবারে জাগালে অভয়-মশাল ধরি'/জপমালা হলো তোমার ও নাম—/ মোরা দলে দলে করি যে প্রণাম—/অশ্রু-আখরে তর্পণ করে নেতাজী তোমারে স্মরি।" ['নেতাজী', যুগান্তর] নির্মলেন্দু গৌতমের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে নেতাজীকে নিয়ে অপরিমিত গর্ববোধ—"হিমালয়ের তুহিন শিখর পেরিয়ে গেল যারা/সত্যি জেনো সুভাষ বসুর দেশের ছেলে তারা/···শত্রুকে ভয় পায়না যারা মরণকে দেয় ঠেলে/তারাই জেনো সুভাষ বসুর সোনা মায়ের ছেলে।"...['২৩শে জানুয়ারি'—আনন্দবাজার] কিংবা "খ্যাপাটে মেঘ লাফিয়ে উঠুক সাজুক ঘনঘটায় / সুভাষ বসুর দেশের ছেলে দাও ভরে দিক ছটায়।" ['শঙ্খে এবার ফুঁ দাও—যুগান্তর] জ্যোতিকুমার লিখেছেন···"সেই এক মহারথী/অক্ষৌহিনী মাঝে / জীবনের কাজে/ভাঙাগড়া যত কারুকাজ/সে তাহার শিল্পী জানি/যৌবন উদ্দাম/সেই এক মন যার/আজো স্বপ্ন দেখি/অশ্রুজলে লিখি / আজো তার নাম···" ['তেইশে জানুয়ারি', যুগান্তর] এই অশ্রুজলের বেদনা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে বাঙালি কবিদের কবিতায়, প্রাণের দুলালকে অকালে হারাবার বেদনা—প্রতীক্ষায় থেকে ফিরে না পাবার বেদনা। অনিলশংকর রায়ের কবিতায় প্রথমে নেতাজীর কীর্তি-গাথা বর্ণিত হয়েছে—"ডাকাত ছেলে, ডাকাত ছেলে/ দেশের মাকে দেশেই ফেলে / তেরো নদীর পার। দেশের প্রভু চমকে ওঠে পরাণ কাঁপে তার।···"তারপর অনিবার্যভাবেই এসেছে সেই বেদনা···জন্মদিন এসেছে বারেবার/ডাকাত ছেলে হারিয়ে গেছে ঠিকানা নেই তার/সে নামে কাঁদে দেশের মাটি / কাঁদে দেশের প্রাণ/সে নামে আজও বুকটা কেন করে যে

৬। 'শুকতারা'য় প্রকাশিত কবিতার অংশ বিশেষ। ৭। 'স্মৃতিচরণ'/দিলীপকুমার রায়।

আনচান/ডাকাত ছেলে প্রণাম নিও আজি/তোমার নামে গগন ভরে/শঙ্খ ওঠে বাজি।" ['নেতাজীর জন্মদিনে—'আনন্দবাজার] কিন্তু সে ছেলে হারিয়ে গেলেও নিত্য মনে পড়ে তার কথা, তাকে ভোলা সম্ভব নয়—"বাংলাদেশের স্নিগ্ধ মাটি দোদুল তরুলতা/তোমার কথা রাখবে মনে কইবে তোমার কথা / দখিন বাতাস বলবে গেয়ে তোমার জয়গান/উঠবে দুলে দীঘির জলে শ্বেতকমলের প্রাণ—" [অতীন মজুমদার—'তোমার নামে', যুগান্তর]।

নেতাজীকে রক্তমাংসের অস্তিত্বে ফিরে না পেলেও তাঁর ভাবমূর্তি অমর হয়ে আছে মানুষের মনে। সে মূর্তি কোনো ব্যক্তি মানুষের নয়—সুভাষ সেখানে একটি জীবনাদর্শের প্রতীক। বনফুলের ভাষায়—"যে প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুদুর্গম পথ/বীর্যবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্র পর্ব্বত/তুমি সে প্রেরণা/যে বাণীর তূর্যনাদে ধিক্কৃত হইবে পাপী / সমনস্ক হবে অন্যমনা/তুমিই সে বাণী / তারই মাঝে হে অমর, আছো তুমি / আছো তুমি জানি।" প্রভাকর মাঝি লিখেছেন ঃ" নেতাজী একটা দৃপ্তকণ্ঠের সংকল্পের নাম/চলতে চলতে দুর্গম পথে জানে না যে বিশ্রাম !..." ['নেতাজী'—আনন্দবাজার]।—আমাদের লক্ষ্যের দিকে চলার পথে আজও প্রেরণা দিচ্ছে সেই বাণী, যদিও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি "তোমার কণ্ঠে—আহ্বান এলো দিল্লী চলার সুর / আজো ফুরালোনা দিল্লীর পথ, দিল্লী যে বহুদূর/...নিদ্রার মাঝে পেতে রই কান—/ দূর হতে শুনি তব আহ্বান/চলো চলো চলো দিল্লীতে চলো / বাধা ভেঙে করো চুর।" [ধীরেন বল—'আহ্বান এলো', আনন্দবাজার]।

নেতাজীর ব্যক্তি-পরিচয়ের উর্ধ্বে তাঁর আদর্শায়িত রূপ যেখানে বাঙালি কবিদের প্রেরণার বিষয়বস্তু সেখানে কবিরা কেউ বা নিজেদের প্রিয় ও পূজিত আদর্শগুলোকে মূর্ত দেখেছেন সুভাষের মধ্যে, কেউ বা তাঁকেই একটি সমুন্নত আদর্শ প্রতীকরূপে অবলোকন করেছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় নেতাজীর মধ্যে দেখেছেন গীতার আদর্শকে রূপ ধরতে— "...হারাইয়া তব বাহুবল/তোমার আদর্শ ছাড়া বাঙালির কি আছে সম্বল ? / নহ তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীম, নহ যুধিষ্ঠির/গীতামন্ত্র শুনিবার একমাত্র যোগ্য তুমি বীর/এ যুগে গাণ্ডীবি তুমি, তুমি মহারথ তোমা বক্ষে ধরি ধন্য এ মহাভারত।" ['সুভাষতর্পণ'] নরেন্দ্র দেবের দৃষ্টিতেও সুভাষচন্দ্র গীতাপুরুষ ঃ— "...মহাভারতের মহাদুর্দিনে শুনায়েছ তুমি যে মহাবাণী./সে নবগীতায় সঞ্জয় দেয় দৃঢ় প্রত্যয় চিত্তে আনি/ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কারি তোলে অমৃতানন্দ সবার প্রাণে/মুক্তি যজ্ঞে মন্ত্র যে তার নব জীবনের বার্তা দানে।", ['নেতাজী'] আবার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের চোখে নেতাজী আনন্দমঠের সন্তানধর্মের প্রতিনিধি ঃ "পড়েছি আনন্দমঠ, দেখিনি সন্তান/দেশমাতৃকার পদে উৎসর্গিত প্রাণ/তোমাতে হেরিনু মূর্ত স্বপন ঋষির ! / শত সংগ্রামের তুমি দুঃসাহসী বীর..." ['নেতাজীর জন্মদিনে'] রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল 'সাতকোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।' কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী এই ক্ষোভের উপশম পেয়েছেন সুভাষচরিত্রে, বলেছেন ঃ—"উদার এ কবিবাক্য হয়ে / সম্মুখে জাগিছে আজি প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ে ! / গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া/শক্তি নির্যাতিত/যে মহাসন্তান তব বিশ্বের বিদিত/... অটল পৌরুষে তাই সে আজি মানুষ,/বিশ্ব-স্বাধীনতা যজ্ঞে প্রকাণ্ড পুরুষ !...." ['সুভাষচন্দ্র'] চারণকবি বিজয়লালের চোখে সুভাষচন্দ্র যদি বা ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, শিবাজীর 'সগোত্তর', অচিন্ত্যকুমার সেন-

গুপ্তের চোখে তবে সুভাষচন্দ্র প্রতিভাত হয়েছেন 'আরেক বুদ্ধ' রূপে। এই অগ্রণী কবির অনবদ্য সুভাষ-বন্দনার কয়েকটি ছত্র—"কাহাকে প্রমাণ বলে ? কী প্রমাণ ? কোন ন্যায়ে ? কে করিবে বিচার-নির্ণয় ? ক'জন মুখস্থ সাক্ষী, শ্রুতকথা, ধূলিম্লান দলিলের ক'টি দস্তখত—তাইতেই তুমি নাই ? তুমি মূর্ত উপস্থিতি, উজ্জ্বলন্ত উদধি-উদয়, / মৃত্যুকে নস্যাৎকরা অদৃষ্য অপরাজিত। অনাময় অখণ্ড ভারত/প্রাণস্ফূর্ত তোমাতেই একমাত্র। অদৃশ্য কে ? তুমি স্থির প্রত্যক্ষ-দর্শন/প্রকাশ্যে-রহস্যে করো চূর্ণ যত বলদৃপ্ত ব্যূহ-বদ্ধ শত্রু-কারাগার,/তোমার জীবন এক চিরন্তন অভিযান, অনির্বাণ মহানিষ্ক্রমণ/বোধিই তোমার প্রাপ্য, সে কেবল উদার পরামাধার ভারত-উদ্ধার !..." ['আরেক বুদ্ধ'] প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে সুভাষচন্দ্রের আদর্শায়িত-রূপ চিরকালীন সম্পদ বলে গণ্য :—"তুমি শুধু স্মৃতি নও, শোক নও/নও শুধু পূজনীয় প্রাচীন পবিত্রতা, / তুমি সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল উপস্থিতি/আমাদের বর্তমান ও ভাবীকাল/যার বিদ্যুৎস্পর্শে চিরস্পন্দমান।" [তুমি] আবার অন্যত্র দেখি, বাহ্যিক আড়ম্বরের বদলে নেতাজী স্থান পেয়েছেন তাঁর হৃদয়ের নিভৃত উষ্ণতায়... "প্রণাম করবার মানুষ যাঁরা আছেন/তাঁরা প্রণাম নিন। / কুর্ণিশ করবার মানুষকেও জানাই/ দরবারী সেলাম/তোমার জন্যে এসব কিছু নয়। / প্রণামের দূরত্বে তুমি নেই। /....অপরাজেয় অভয় যৌবনের/প্রতীকরূপে নাও,/মুগ্ধ কৃতজ্ঞ দেশের/উষ্ণ হৃদয়ের অনুরাগ।" ['মহানায়ক,' দক্ষিণী বার্তা] নেতাজী যে শুধু নাম নয়, এই ধূলিম্লান ভারতবর্ষে নেতাজী যে একটি আদর্শ, সে কথা আধুনিক কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু স্পষ্টই উল্লেখ করেন—"...ব্যক্তিক স্বার্থের কৌশলে, / শুধু কথা আর বক্তৃতার ঘাতুতে / আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠি, / —সেদিনের মন্ত্র আর মুক্তিস্নান/শুধু ঐ একটি নামের মন্দাকিনীতে। /তাই মনে হয় নেতাজী শুধু নাম নয়—/নেতাজী আদর্শ।" ['নেতাজী']

নেতাজীর শুভ জন্মলগ্ন স্মরণ করে বাঙালিরা শঙ্খধ্বনি করে। নেতাজীর নাম বা জীবনের মতো ঐ শঙ্খনিনাদও অনেক বাঙালি কবির চেতনায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আদর্শ প্রতীক। গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কাছে ঐ জন্মঘোষণা শৃঙ্খলমোচনের তূর্যধ্বনির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে—"...ঐ শোন বাজে শাঁখ / দুপুরের আকাশের নীচে/নেতাজীর জন্মলগ্নে/মুক্তপ্রাণ কারাবাসী/ সেই শব্দে / দু'হাতের শৃঙ্খল ভাঙিছে"। ["তেইশে জানুয়ারির একটি দুপুর"] আবার কবিতা সিংহ লিখেছেন :—"মধ্যাহ্নে শঙ্খের ধ্বনি সমুদ্র নির্ঘোষ/ বুকের ভিতর যায়, ঢেউ যায়, হে আমার—/অমলিন বালিকা বেলার স্মৃতি এক আনন্দ অশ্রুর/ছবি কাঁপে থরোথরো, মিছিলে মশালে জ্বলে/মানুষের প্রেমলিপ্ত মুখ ! / ..." ['মধ্যাহ্নে শঙ্খের ধ্বনি'] এখানে দেখা যায় বাঙালি জীবনের ঐ অপরিহার্য শঙ্খধ্বনি কৈশোরের সুখস্বপ্নেরসঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। যে মানুষ আদর্শায়িত হয়ে গেছে, তার জন্য প্রতীক্ষা চলবে অনন্তকাল, সে প্রতীক্ষার শেষ নেই। শান্তশীল দাশের কবিতা থেকে—"সে আসন শূন্য আজো, সমুজ্জ্বল আজো সেই মতো,/চারিদিক ঘিরে তার এতটুকু কমেনি বিস্ময়,/অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য ঝরে নিত্য অজস্র ধারায়/প্রতীক্ষা আজিও চলে—সে মূর্তি ভাস্বর চিরদিন।" ['নেতাজী : ৭৭ তম জন্মদিনে,' দৈনিক বসুমতী]। সুভাষচন্দ্রের আদর্শায়িত রূপকে চমৎকার ফুটিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি ছোট্ট কবিতায়। সম্পূর্ণ কবিতাটি—সাক্ষী চন্দ্র, সাক্ষী

সূর্য/আর সাক্ষী তুমি; / নদীর জল হয় না মলিন/এবং জন্মভূমি।" ['সুভাষচন্দ্র', দৈনিক বসুমতী '] নেতার এই আদর্শায়িত রূপ ভালোবাসার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে আধুনিক বাঙালি কবির অস্তিত্বে আজও উত্তাপ সঞ্চার করে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় নেতাজী জীবন-অনুরাগেরই আরেক নাম— "তেমন মানুষ দেখলে মন খুশীতে ভরে ওঠে,/বুকের শূন্য জায়গায় জমতে থাকে উত্তাপ···/ তেমন মানুষ কাছে পেলে যেন সজীব হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক, / আহ্লাদ হয় জিহ্বার জড়তা কেটে যায়, ভাষা/ফোটে মুখে···/তেমন মানুষের মুখ দেখতে পেলে জীবনকে আবার/নতুন করে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।" ['তেমন মানুষের মুখ,' জয়শ্রী]

মহানায়ক নেতাজীর রণদুর্মদ রূপের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর বাঙালির ঘরের ছেলের চেহারা। সেই সৌম্য শান্ত ছবি ফুটেছে কয়েকজনের কবিতায়— "এদেশ ছেড়েও সে এর মাটিই ছুঁয়েছিল/সবশেষে ফিরতে চেয়েছিল সে / যেন মায়ের আদুরে ছেলের মতো / কোঁচার খুট গায়ে জড়িয়ে/পাড়ায় বেরুবে তারপর/সন্ধ্যায় বসবে পার্কের নিরিবিলি কোনে/দূর থেকে চেয়ে দেখবে শিশুদের নিরুদ্বেগ জটলা···" সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতার শেষে আবার এসেছে সেই বিষাদ—"সেই নক্ষত্র আর দেখা যায় না/ কিন্তু স্বপ্নে সকলের চোখে তা' ফুটে ওঠে / মাঝে মাঝে দমবন্ধ দুপুর রাতে/তার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়/ আহা, তাঁর চোখ থেকে আকাশ ঠিকরোত,/আহা, তাঁর কণ্ঠে ছিল সহস্র বিষাণ / আহা, তাঁর স্পর্শে ছিল পঞ্চাশ পবন/এলসিদের মতো তিনি আর ফিরে আসেননি।" ['তাঁর জন্য শোক গাথা,' যুগান্তর] সুভাষচন্দ্রের এই আন্তরমহিমার সমাহিত রূপের কথা পীযূষ রাউতের কবিতায়ও পাই— "একথা হয়তো অনেকেই জানেন না / তার সেই বিরাট পাথুরে চশমার আড়ালে তার দু'টি কাককালো/চোখ ছিল। আত্মার ভিতর / ভালোবাসাময় বিশ্বাস ছিল। কেঁপে উঠতো হলুদরৌদ্রে/তার অরণ্য প্রকৃতি। সে জানতো/ ভালোবাসা ও বিবেকের যথার্থ মানে।" ['সেই সৈনিক'—দেশ]

আর এক শ্রেণীর সুভাষ-বিষয়ক কবিতায় সুভাষ-চন্দ্রের জীবনের ছন্দ এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে যে মনে হয় স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই ওর ভেতর দিয়ে কথা বলছেন। কবিতাগুলো যেন সুভাষচন্দ্রের মানসিক-তারই দলিল। এরকমই একটি ঃ— "···মার খেতে খেতে অবশেষে / অমরত্বে অভিষিক্ত হয়ে, / আত্মার দ্যুতিতে জ্যোতির্ময়/কৌপীন সর্বস্ব রিক্ততায় / দেশকে উন্নীত কর, সমুন্নত হও মহিমায়! / ও পথ আমার নয়। / আমি চলে যেতে চাই/ক্ষুরধার পরীক্ষার সূচীমুখ একাকিত্বে,/প্রত্যয়ে প্রোজ্জ্বল অহঙ্কারে,/আনতে নতুন দিন/না যদি তা আসে,/কিছু যদি নাই হয়/তবু, / জ্বলন্ত উল্কার এক দুঃসাহসদীপ্ত কবিতা ত/দিয়ে যাব তোমাদের!...." [নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'সুভাষচন্দ্র'] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এমনই একটি সুন্দর কবিতার অংশ ঃ—" তোমাকে ভালবাসি বলেই / তোমাকে ছেড়ে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই। / অন্যের ভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, / কিন্তু অন্য আর কিছুই দেখিনা, / তখনও / শুধু তোমাকেই আমি দেখতে থাকি, / ভারতবর্ষ।" ['ভারতবর্ষ', দক্ষিণী বার্তা]

সুভাষচন্দ্র ফিরে আসুন, আজকের বাঙালির এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে স্বপ্নের পেছনে বলি দিয়েছিলেন জীবন-যৌবন, তার সঙ্গে আমাদের আজকের চোখেদেখা

ভারতের প্রকট বৈষম্যই এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র করেছে। অনিবার্যভাবে মনে পড়েছে এ ভারত নেতাজী চাননি। ফলতঃ তাঁর অভাববোধ এসেছে অপ্রতিরোধ্য ভবেই ঃ "রাত্রির পাবক কোথা গেল? বজ্র আর বিদ্যুতের/ প্রবল বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ বর্ষার প্লাবিত পৃথিবীতে/দুই শক্ত মুঠি দিয়ে যে ধরেছে মশাল আঁধারে, / দিনের আলোকে দীপ্ত আকাশেতে সে কোথা হারালো?..." [সন্তোষকুমার অধিকারী, 'কালের পাবক'] গোপাল ভৌমিকেরও প্রশ্ন জেগেছে 'ইতিহাসরচনাপ্রয়াসী' নূতন ভারত সম্পর্কে ঃ—"...সে কি ভুলে গেছে তার/ আকাশে যে পাখী/আঁধারে শুনিয়েছিল ভোরের কূজন?/ সে পাখী ঝড়ের রাতে/হারালেও পথ/রেখে গেছে অনাবিল আলোর স্বপন..." ['নেতাজী স্মরণে'] অজকের ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে নেতাজীর পথকেই অনিবার্যভাবে প্রতিষেধক মনে হয়েছে কবিরুল ইসলামের "...চতুর্দিকে বামনের বেচাল খেউড়ে/এখন হরির লুঠ দিনদুপুরে রোজ;/ এসব মারির তুমি পরম ঔষধ।/ তুমি আছো এই পুণ্যে আজও দেশ আছে। / তোমাকে দরকার বন্ধু দেশের দুর্দিনে/যেহেতু আমরা জানি তুমিই উদ্ধার।" ['কেউ কেউ নেতা'] নেতাজীর পথে আমরা যাইনি বলে অনুতাপ জেগেছে সুনীলকুমার ঘোষের কবিতায়—..."ঘরে ঘরে/আলোতে/ অন্ধকারে/...আততায়ীর বুলেটে / কালোবাজারিয়াদের নখের আঘাতে/স্বাধীনতার পরে/অনেক রক্ত আমরা দিয়েছি/দিচ্ছি/কিন্তু এ রক্ত তোমার চাওয়া রক্ত নয়/এ রক্ত দিয়ে কপালে কেউ ফোঁটা কাটে না/এ রক্তের রঙ কালো/এ রক্ত বেইমানের। / তোমার চাওয়া রক্ত / সেদিন আমরা যদি দিতাম!"['রক্ত দাও']। ভারতভূমির এই চেহারা দেখলে, অতএব সুভাষচন্দ্রের কথা মনে না এসেই পারে না। কারণ তিনি থাকলে দেশ এ দুর্গতি থেকে রক্ষা পাবে, এদেশের বিশ্বাস। এই আকাঙ্ক্ষা আর বিশ্বাসই প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন সুভাষ-কবিতায়, সেখানে সেই এক আকুতি—"তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো"। অপরাজিতা গোপ্পী লিখেছেন,..."তাই আজিকার ভারত/তোমার প্রতীক্ষায় অধীর, / অধীর নিষ্পেষিত মানবাত্মার/মুক্তিযন্ত্রণা,..." ['দিনগুণি একটি পদধ্বনির', সাপ্তাহিক বসুমতী]। এই আহ্বান আর প্রতীক্ষার সুর বেজে উঠেছে নচিকেতা ভরদ্বাজের কলমেও "...কতদিন—কতদিন হয়ে গেল—কত মাস—/কত বর্ষ আমরা তাঁকে আর দেখি না।/ অথচ আমাদের বুকের মধ্যে তাঁর সেই পাঁচ আঙুলের ছাপ,/তাঁর সেই মহান দীপ্তির আলোকাভিসার/ ...আমাদের সবার বুকে বুকে আজো আমরা/মমতায় লালন করছি।" ['দুই একটি মানুষ আসে'] / নির্মল বসাকের কবিতায়ও পরিস্ফুট দেখি এই অম্লান অনন্ত প্রতীক্ষাকে ঃ—"...তারো পরে সূর্য নাকি ওঠে—/ ছুটে যায় ঘোড়সওয়ার স্বপ্নের ভিতরে/খুরধ্বনি করে ফিরে দিগন্তের মাথার ওপর—/বিশুদ্ধ বিশ্বাসে আজো চেয়ে আছি এই 'ঘোর অবেলায়/দগ্ধঅশ্রুচোখে।" ['ঘোড়সওয়ার'] শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আকুল আহ্বান—"অন্ন নেই বস্ত্র নেই, জীবনের পুষ্প অপচয়/ পথে পথে, আর কোনো স্বদেশে এমন যুদ্ধ হয়?/ মিছিলে জনতা আজও কেঁপে ওঠে আন্তরিক ক্রোধে,/ এখনো অনেক পথ, রৌদ্রদাহ জ্বলন্ত দুপুরে/ছায়াহীন যাত্রা, আর দিল্লি আজও অনেক সুদূরে—/মুক্ত হাওয়া নিয়ে এসো যন্ত্রণার এই অবরোধে/বলো শেষ পরিণামে লেখা হবে মানুষের জয়।" ['দিল্লি আজও অনেক সুদূরে'—সাপ্তাহিক বসুমতী] দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, "তুমি আছ, তুমি আছ এই সুরে রাত্রির তিমিরে/বিদ্যুৎ বীণায় বাজে গান/বিহঙ্গেরা

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

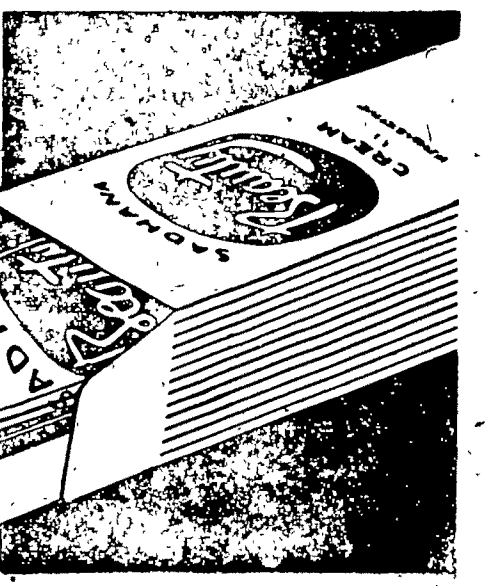

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC 6/71

ফিরে ফিরে/কেঁদে কেঁদে করে শুধু অন্ধকারে এপার ওপার/খাপ খোলো হে সৈনিক/দেখা দিক সূর্য তরবার।" ['সুভাষচন্দ্র,' দৈনিক বসুমতী] 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় একটি স্মৃতিচারণের শেষে উদ্ধৃত সন্তোষকুমার বসুর কবিতার কিয়দংশ—"সুদীর্ঘ তপস্যা অন্তে এসো আজ ফিরে/তৃষি এ কর্মক্ষেত্র হে তাপস-বর/জননী দাঁড়ায়ে আছে পরাইতে শিরে/বিজয়-মালিকাখানি শীতল সুন্দর।" নেতাজীর শৌর্য ও নির্ভীকতার আদর্শ আমাদের ক্লৈব্যের গ্লানি দূর করুক, আধুনিক কবির এই কামনা—"কাঙ্খিত সময় আছে আজও—যদি পার হও পদাতিক—ক্লীবত্বের বর্ম ভেঙে দাও—জনপদ ভরেছে বাচালে,/...গোষ্পদে হারায় জাতি ; সাঙ্গ করো সব জনান্তিক—/অহল্যার ঘুম দূরে ফেলে জাগরিত হও তো স্বকালে।" [আনীশ কল্যাণ—শ্যামবাজারে পাঁচমাথায়,' সত্যযুগ]। তাঁর আদর্শ আমাদের ধ্রুবজ্যোতির মতো পথ দেখাক এই প্রার্থনা উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়ও, তারই কয়েক ছত্র..."জীবনের ট্রাফিক জ্যামেও তবু সপ্রতিভ উল্কা-পতনে নেমে এসে/রৌদ্রদগ্ধ স্মৃতির কবিতা জুড়ে ধূপের গন্ধ ভরে দাও। / লেভেল ক্রসিংএ গাড়ি সমানে দাঁড়িয়ে—/তোমারই রুমাল নাড়ায় সিগন্যালের রুগ্ন লাল চোখ/কাঁচের অন্ধকারে হয়ে যাবে নীল।" ['তেইশে জানুয়ারির কবিতা,' দৈনিক বসুমতী] বিপুল চৌধুরীর কবিতাতেও ধ্বনিত হয়েছে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার আর্ত আবেদন—"...যে পথ দেখালে তুমি নিজে নিত্য করি অতিক্রম/সে পথে চলতে চাই যত কিছু সাহস বিক্রম—/সে শুধু তোমার আছে, এসো তুমি আমাদের আগে/হে নেতাজী, দেখো ভব সুপ্তদেশ জাগে কি না জাগে।" ['এসো তুমি", আনন্দবাজার] মুখে নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি দিলেও আমাদের চরিত্রে বাসা বেঁধে আছে ভণ্ডামি, কারণ—"আমরা তোমার নামে জয়ন্তী উৎসব করি/সভা ডাকি/মূর্তি গড়ি/বই লিখি/...তারপর চালে কাঁকর অকপটে মিথ্যে কথা বলি/ফাঁকি দিই/জোট বাঁধি..." তাই প্রভাকর মাঝির আর্তি—"নেতাজী আমাদের উদ্বোধিত করো/আমাদের পঙ্কিল থেকে সমুদ্রে নিয়ে চলো।" ['নেতাজীকে', আনন্দ বাজার পত্রিকা]। নেতাজীকে নিয়ে এই ভণ্ডামির প্রতি ব্যঙ্গ আমাদের অলোচ্য কবিতাগুলোর একটি শ্রেণীর উপজীব্য। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় কবিতায় এই ব্যঙ্গকে তীব্রভাবে ধিকৃত হতে দেখি :—"কোথাও তোমার নামে মূর্তি গড়া হয়/কোথাও বা শোভে রাজপথ..." কিংবা "...প্রহসন আরও আছে, এঁকে রাখে শৌখিন পটুয়া/তোমার কার্টুন ক্যালেণ্ডারে,/যেমন ধর্মের নামে অলিতে গলিতে চলে জুয়া/সেই মতো তোমার সংস্কারে।...['তুমি আছো']। অনেক কবিতায় এই ব্যঙ্গ দেখা দিয়েছে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে। কুমারেশ ঘোষ স্বভাবসিদ্ধ ঢংএ লিখেছেন, "নেতায় নেতায় ভরে গেছে দেশ, হাট বসে গেছে—নেতার হাট।..." তারপর "এখন বরং ঘরের দেওয়ালে/ছবি হয়ে আছো ভালো। / কিংবা যেমন সহরে রয়েচো/ পাথুরে মূর্তি কালো। / তাতেই যাহোক রেখেচো বজায় তোমার ঐ যে নেতাজী ঠাঁট/আমরাও খুশি, ছুটি পেয়ে থাকি, ছবি নিয়ে ঘুরি রাস্তাঘাট।" ['নেতাজীকে'] পলাশ মিত্রের রমণীয় শৈলীতে আত্মধিক্কার :—"তুমি বলেছিলে রক্ত দিলেই স্বাধীনতা দেবে/আমরা বলেছি/রক্ত দিলেই কুড়ি টাকা নেবে। / তুমি বলেছিলে/দিল্লিতে চলো দেশকে বাঁচাতে/ আমরা এখন/দিল্লিতে যাই দেশকে নাচাতে। / আমাদের কাছে দিল্লি মানেই/লোকসভার এই ঠাণ্ডা ঘর/তোমার ছবিতে ধুলো জমে আছে/বড় তেতো

লাগে তোমার স্বর।" ['তোমার ছবিতে ধুলো জমে আছে']। এরকমই আর একটি—"...ইলেকশনের জন্য মূল্য দিই তোমাকে ভীষণ। / বৎসরান্তে করে তুলি স্মৃতিকে কী সুন্দরতর যে/তোমার মিশন ছিল, আমাদের খোসলা-কমিশন/...তুমি তো সর্বস্ব দিলে পরিবর্তে আমরা কী দিলাম? / রাস্তায় রেস্তোরাঁয় টাঙিয়েছি, ভাঙিয়েছি নাম।" [হেনা হালদার—'নেতাজীকে মনে করে'।]

আমরা যেসব কবির খণ্ডিত রচনাংশ উদ্ধৃত করেছি, তা' ছাড়াও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, উমা দেবী, বাণী রায় প্রভৃতি অনেক কবি। আমরা আশা করতে পারি, অনাগত ভবিষ্যতে নেতাজীকে নিয়ে আরও অনেক উৎকৃষ্ট কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচিত হবে—যেদিন রাজনৈতিক দলের অন্ধপ্রচার কোনো কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। *

* বাংলা কবিতায় 'সুভাষ ভাবনা' প্রসঙ্গটির একটি দীর্ঘ তালিকা লেখক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দুটি কবিতা অনেকেরই নজরে পড়বে না অথচ কবিতা দুটির মূল্য অপরিসীম। সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ক্ষেময় কলকাতায় এলেন সেই সপ্তাহের আত্মশক্তি পত্রিকায় রসরাজ অমৃতলালবসু পুত্রসম তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে একটি কবিতা লেখেন। আর ঐ একই সংখ্যায় সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অধিকারী হুমায়ুন কবীরও একট কবিতা লেখেন। কবিতা দুটিই এখানে উদ্ধার করা হল।

বন্দীদ্বারে ঃ শ্রীঅমৃতলাল বসু

বাহুতে অসীম বল, বিস্তারিত বক্ষস্থল,
গাণ্ডীবীর জ্যেষ্ঠ ভীম দ্বিতীয় পাণ্ডব,
শ্রেষ্ঠ সহিষ্ণুতায়; কভু কোন কৃপা ভিক্ষা
নিজের কারণে করেনি মানব মানবী
কিম্বা দেবতার দ্বারে। সেও হায়! একদিন
পুত্রের প্রাণের তরে, ধ'রে জয়দ্রথ করে,
অনুনয়ে দিয়েছিল গর্ব্ব বলি দান।
পিতৃপ্রাণে হায় কবে থাকে অভিমান,
কৃতান্ত কবলে হেরি' সন্তানে পড়িতে?
সেই মত আমি আজ, হে ইংরাজ!
হৃদয় বেদন নিবেদন করি তব পাশে।

ভাগ্য দেবতার বরে রাজদণ্ড করে
করেছে ধারণ, ক্ষত্র-শক্তি ধর, বীর ব'লে
পরিচয় দাও বিশ্ব মাঝে; বৈশ্যজন প্রায়
আশঙ্কার দাস্য শোভা নাহি পায়
পাষণ্ড দলন "ষণ্ডজনের"*জীবনে।
জলে স্থলে ব্যোমে তব শক্তির বিস্তার;
বিরাট কামান মুখে মৃত্যুর ফুৎকার;
অনল-বিজয়ী বাষ্প পুষ্পক বিমান,
—বশ্যতা স্বীকার করে দাস্যভাবে তব,
হৃত-অস্ত্র ছাত্রদলে দলকে কি ফল তবে?

শান্তি রক্ষা তরে শ্বেত-শ্যাম-কান্তি
পুলিশ প্রহরী সংক্রান্তির শেষে বেতন আদায় করে;
জেলায় জেলায় বিচার আলয়;
রাজবিধি রাজবাঁধে রাখিয়াছে বেঁধে
আষ্টে-পৃষ্ঠে দুষ্ট ধৃষ্ট মুষ্টিমেয় সমাজের কীট;

তবে কেন নিজকৃত বিধির বিরোধী-বিধি সৃষ্টি কর প্রভু ?
সত্য বল, সত্য বল জিজ্ঞাসি তোমায়,
হে ভারত-প্রবাসী বৃটেন সন্তান !
সহজে সন্তুষ্ট এত শান্ত প্রজার বসতি
আছে কি তোমার আপনার দেশে ?
খোল ইতিহাস, করতো প্রকাশ,
সপ্তদশোত্তর শতবর্ষ শান্তির যে সু-আদর্শ
দেখায়েছে বঙ্গদেশ বৃটিশ শাসন যুগে,
কোন্ দেশে কোন্ কালে, রাজতন্ত্র জনতন্ত্র
যে কোন শাসনে প্রভুত্ব আসন
পাইয়াছে হেন আরামের উপাদান ?
পেশী-শক্তি অসি-শক্তি মসী-শক্তি,
শক্তিমান তুমি একত্ব গঠন কৌশলে
কে করে নষ্ট তব অধিকার
ধর্ম ভ্রষ্ট নাহি হও যতক্ষণ ?
সে ক্ষেত্রে মানব হস্তের বেত্র,
ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ; ঈশ্বর ! ঈশ্বর !—
বিশ্বের বিধাতা চিরজন্মদাতা
পুণ্য-পথত্যাগী অভাগার ।

বৃটিশ বঙ্গের কোলে মানব-মাতঙ্গ
কত লভেছে জনম শিক্ষার গৌরব তব
করিতে প্রকাশ ; নয় কি সুভাষ আজ
গর্বের কেতন ইংরাজ-তেজো দীপ্তি
ছড়াতে জগতে সম সে রামমোহন
দেবেন্দ্র, কেশব, সুরেন্দ্র, রবীন্দ্র জগৎ-আনন্দ
বিবেকানন্দাদি পুরুষ প্রধান ?
হায় রাজরাজেশ্বর করহে ভাস্বর,
সুবর্ণ অক্ষরে লিখি ইতিহাস-পত্রে,
তব ছত্রতলে সুশিক্ষার জলে
ছাত্রদল মধ্য হ'তে দেবারাধ্য কি পদ্ম
উঠেছে ফুটে এ সুবাস সুভাষ-রূপে ।
বিন্দুমাত্র সন্দেহ রেখ না মনে,
রাজায় পিতায় প্রভেদ না করে হিন্দুর সন্তান ;
রাজভক্তি পিতৃভক্তি তার,
নয় ভয়ে ভয়ে "জয় জয়" উক্তি রসনার
বলতো ইংরাজ পিতা, চাহ কি পুত্র পরিচয়ে
পঙ্গু কোন অঙ্গ ভঙ্গ জীব ?
বলতো ইংরাজ-রাজ, আজ এই
যীশুর বিংশতি শত অব্দে
গৌরবের শব্দে জানাতে চাহ কি জগতে
মনুষ্যত্ব-হারা নিতান্ত বেচারা
প্রজার জঞ্জাল তুমি করেছ সৃজন ?
রবি করে শক্তিমাল ক্ষুদ্র দূর্বাদলে
ধূমকেতু হয় মাত্র হেতু বিনাশের ।
পিতার আকুল প্রাণে অশ্রু মাখা আঁখি,
ভীম যথা ভ্রাতুষ্পুত্র তার জয়দ্রথ দ্বারে,
আমি আজ পুনঃ বলি, আমি আজ
হে ইংরাজ ! অন্তিম চিতার-তীরে,
দাঁড়ায়ে শিথিল পায়, গদ্ গদ্ কণ্ঠে করি
মিনতি তোমায়, খোল কারা দ্বারা,
দাও বঙ্গের স্নেহের ধন নয়ন আনন্দ
শ্রীসুভাষচন্দ্রে ।

নাহি উচ্চপদ ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
প্রাচীন গৃহস্থ মাত্র আছে পরিচয় ;
আর পরিচয় পিতা আমি, পিতামহ,
—পিতাও তাহার ; তাই বন্দীবাসে ব'সে
হৃদয়ের রসে লেখা পত্রখানি পড়ে
সেই মায়ের বাছার, অর্দ্ধ-অন্ধ

নয়নের জল,-লোল গণ্ডস্থল গড়ায়েপড়েছে
এই রুক্ষ-বক্ষোপরে।
নহে নিজতার
রাজার দুয়ারে কি ধনীর আগরে
কৃপা ভিক্ষা আশে যে কভু করে নাই
এ হস্ত বিস্তার, আজি গেয়ে ভিখারীর গান,
মাগিবারে দান আসিত না শাসনের
আসনের পাশেতে তোমার।
অটুট বিশ্বাসে আমি করি এ আশ্বাস,
ফেলি স্বস্তির নিঃশ্বাস, সারা বঙ্গবাসী আসি
বলিবে তোমায়, হে রাজন জনে জনে
রহিনু জামিন্, স্বামীন। বারেক জাগায়ে
অন্তরে নিহিত তব বিটিশ-বিভবে
গৌরবে করহপূর্ণ এই বঙ্গধাম,
রাখ স্বাধীন জাতির নাম,
প্রাণারাম পুত্রধনে তুলে দিয়া পুনঃ
তার মা-বাপের কোলে।
তরী হয়ে অরীরে করেছে পার
যীশুখৃষ্ট—ইষ্টদেব তব।

* ষণ্ডজন—Jhon Bull

রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলী আমেদ-এর আকস্মিক লোকান্তর

১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভোর ৬টায় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আমেদ হৃদ-রোগের আক্রমণে স্নান-ঘরে অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে ৭২ বছর বয়সে সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে পরলোকগমন করেন।

রাষ্ট্রপতি ১৯৭৪-এর ২৪শে আগষ্ট কার্যভার গ্রহণের পর ইতিমধ্যে বহু দেশ পরিভ্রমণ ক'রে তাঁর অমায়িক আচরণের ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে আসামে সাদুল্লা সরকারের পতন ঘটিয়ে কংগ্রেস সরকারের প্রতিষ্ঠা ক'রে তরুণ ব্যারিষ্টার ফকরুদ্দীন আলি আমেদকে আসামে গোপীনাথ বরদলই সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তারপর ধীরে ধীরে ফকরুদ্দীন আলি আমেদ সম্মানের সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বারোহণ ক'রে শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে সর্বোচ সম্মানের অধিকারী হন।

জাতীয় এই গভীর বেদনাবোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরাও পরলোকগত রাষ্ট্রপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

১২.২.৭৭

যাত্রী

হুমায়ুন কবীর

হে বন্ধু নবীন পথে যাত্রী তুমি চলিয়াছ একা
ঊষার আলোক সম্মুখে জানি নাক কোথা পথ রেখা
কোথাও কি আছে পথ ? অথবা কণ্টক বন মাঝে
গহন কানন ভেদি, একলক্ষ্য আপনার কাজে
তোমারে চলিতে হবে দিবস রজনী ? যারা সবে
আপন সুখের স্বপ্নে কাটাইছে বিলাস বিভবে
জীবনের দিনগুলি, তারা সবে আসি' দলে দলে
কর্দ্দম ছড়াবে গায়ে, বাক্যবাণে তিক্ত অশ্রুজলে
ভাসাইতে বক্ষতল চাহিবে তোমার। শিরে তব
কণ্টক মুকুট দিয়া উপহাস অপমান নব
তুলিবে পুঞ্জিত করি'। তারি মাঝে হৃদয় তোমার
থাকিতে পারিবে জাগি ? লক্ষ্য স্থির রাখি আপনার
চলিতে পারিবে নিত্য সম্মুখের আলোকের পানে
জীবন মুখরি তুলি' আন্তরের জয়ধ্বনি গানে।

আত্মশক্তি ৬ই মে ১৯২৭, ২৩শে বৈশাখ ১৩৩৪, শুক্রবার।

With Best Compliments Of

Phone : 23-9545

M s P. S. AUTOMOBILES

P-25 PRINCEP STREET
CALCUTTA-700003

ধারাবাহিক প্রবন্ধ
অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর
কিস্তি ১১

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভয়শঙ্কর শর্মা

চীনে প্রতিরক্ষার পটভূমি

স্ট্যালিনের আমল থেকেই যে চীনের সঙ্গে রুশের সুখ-সম্পর্ক ছিলোনা, তা আজ আর কারো অজানা নেই। চীনা কম্যুনিস্টদের অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের ১৯-তম সাধারণ অধিবেশনে, (19th Plenary Session of the Eighth Party Congress) ১৯৫২-এর সেপ্টেম্বরে, মাও নিজেই বলেন যে ১৯৪৯-এর চীন-বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন ১৯৪৫-এ জাপানের পরাজয়ের পর চ্যাং কাই-শেক-এর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর চাপ দিয়েছিলেন। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি, স্ট্যালিন-এর বাধা উপেক্ষা ক'রে চ্যাং কাই-শেককে যুদ্ধে পরাজিত করে; চীনে বিপ্লবও সার্থক হ'ল। ১৯-তম সাধারণ অধিবেশনের সেই ভাষণেই মাও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে উপস্থিত হয়ে মাও স্বয়ং চীন-রুশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে, স্ট্যালিন গোড়ায় সে চুক্তি স্বাক্ষর করতে অসম্মত হন। তাই ঐ চুক্তির আলাপ-আলোচনায় দু' মাস কেটে যায়। স্ট্যালিন যে সেদিন মাওকে একজন ঔপনিবেশিক তাঁবেদাররূপ দেখেছিলেন, সে বিবরণ ১৯৫৬-এ অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের গোপন ভাষণে ক্রুশ্চেভ উদ্ঘাটিত করেছিলেন। আগামী দিনের রুশ-চীন বিরোধের করাল ছায়া ১৯৫৬-র ১৫ই নভেম্বর, পার্টি সহকর্মীদের কাছে মাও-প্রদত্ত একটি ভাষণে পরিস্ফুট হয়েছিলো। মাও সেদিন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে প্রত্যয় সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট মতবাদ, বলশেভিক বিপ্লবের মূলনীতি এবং

লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা থেকে কি বিচ্যুত হয় নাই?

১৯৬৯র মার্চে চীন-রুশ সশস্ত্র সীমান্ত সংঘাত, ১৯৫৬র ১৫ই নভেম্বরে সোভিয়েত নেতৃত্ব সম্পর্কে মাও-এর মূল্যায়নের পরিণত ফল। ১৯৪৯-এ চীন বিপ্লবের পথে স্ট্যালিনের বাধা সৃষ্টির চেষ্টা এবং ১৯৪৯-৫০ এ রুশ-চীন মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে তাঁর অসম্মতি, পরবর্তীকালে মাও-এর এই মূল্যায়নকে সংশয়াতীতভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। সুপ্ত চীন-রুশ সীমান্ত-বিরোধ ১৯৬০-এ মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১টি কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে প্রকাশ্য মঞ্চে দেখা দেয় এবং ১৯৬৯ পর্যন্ত ছোটো-খাটো ৭০০০টি সীমন্ত-সংঘাতের ঘটনার পর, এই দুই বৃহৎ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তাপ, ১৯৬৯-এর মার্চ এ চীন-রুশ সীমান্তে সশস্ত্র সংঘাতে ফেটে পড়লো। চীন-রুশ সীমান্তে এই সশস্ত্র সংঘাত, সে-বছর মার্চ থেকে ক্রমাগত আগষ্ট মাস পর্যন্ত চলতে থাকলে এবং ১৯৬৯-র সেপ্টেম্বরে রুশের সেনানায়করা আণবিক যুদ্ধের স্বরিৎ-আঘাতে চীন-কে পর্যুদস্ত করতে চাইলে, রুশ-চীন সীমান্ত সঙ্কট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলো। সে সময় হানয়ে ভিয়েৎনাম বিপ্লবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হো চি-মিনের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষ্যে উপস্থিত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সমবেত নেতৃবৃন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধেও বটে, আর চীনের বিরুদ্ধে হঠকারী আক্রমণের স্বত-প্রতিঘাতে সোভিয়েত রুশে ভয়ঙ্কর আভ্যন্তরীণ সংকটের আশঙ্কায়ও বটে, ব্রেজনেভ এবং কোসিগিন সোভিয়েত রুশের সমরনায়কদের চীনের উপর স্বরিৎ-আণবিক আক্রমণের উদ্যোগ থেকে নিরস্ত করেন। সোভিয়েত শাসকদের বিরুদ্ধবাদী (Dissident) প্রখ্যাত রুশ লেখক আঁদ্রাই আমলারিক (Andrei Amalrick), ১৯৮৪ সালের পূর্বে—সম্ভবত ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০র মধ্যে—রুশ-বিধ্বংসী ভয়াবহ চীন-সোভিয়েত যুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন। আমালরিকের ধারণা ক্রমবর্ধমান জটিল আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই চীনের সঙ্গে এই ধরণের বিধ্বংসী সশস্ত্র সংগ্রামে সোভিয়েত নেতারা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, আমালরিক তাঁর এই বেপরোয়া মত প্রকাশের জন্য বর্তমান রুশ-শাসকদের হাতে নিপীড়িত, বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রুশ থেকে কার্যত বহিষ্কৃত হয়েছেন।

চীনে পারমাণবিক বোমার আক্রমণের আশঙ্কা ঃ ভূগর্ভে আশ্রয়স্থল

১৯৬৯র সেপ্টেম্বরে চীন-সোভিয়েত সশস্ত্র সীমান্ত সংঘাত এতোটা আসন্ন হয়ে উঠেছিলো যে, সে সময় মস্কোর রুশ মুখপাত্ররা মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীন দখলের জন্য চীন সীমান্তবর্তী রুশবাহিনীর এই ইচ্ছাই শুধু খোলাখুলি অনুচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করে রুশীরা ক্ষান্ত থাকেন নাই, ক্রেমলিন থেকে (সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তর) পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে সারকুলার

মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন, চীনের উপর পারমাণবিক আক্রমণ তাদের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। সোভিয়েত রুশ থেকে পারমাণবিক আক্রমণের ত্রাসে চীনের সর্বত্র ;—গ্রাম ও দক্ষিণাঞ্চল বাদে—মূলত শহরাঞ্চলে পারমাণবিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সাজসাজ রব পড়ে যায়। চীনের সর্বস্তরের নাগরিকরা সরকারী নির্দেশে ভূগর্ভের গভীরে, দ্রুতগতিতে শহরাঞ্চলের সর্বত্র প্রতিরক্ষা-আশ্রয় তৈরীতে এগিয়ে চললো, কারণ সামরিক কিম্বা বেসামরিক, কোনো লক্ষ্যস্থলই পারমাণবিক বোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে না। চীনের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বললেন: "With one million Russian troops on our frontier, we have no alternative." (To Peking—and Beyond : A Report on the New Asia : Harrison. E. Salisbury : Arrow Book Ltd - 3 Fitzroy Square; London W. I : 1973 : Pp 234)—'ভূগর্ভ-আশ্রয় তৈরী করা ছাড়া আমাদের উপায় কি?' শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায়, চারপাশে, ভূগর্ভ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগকে লক্ষ্য করে মাও বলেছিলেন: কাজটা খুবই শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু ছাত্রদের সদাপ্রস্তুতিতে এই সুযোগ কাজে লাগবে,—'It is quite an arduous task, but at the same time it is a good opportunity to teach the students to be prepared" (Ibid, Pp 234)। বহুক্ষেত্রে চীনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৃহৎ প্রাচীরের 'Great wall'—ইঁট খুলে খুলে ভূগর্ভ-আশ্রয় তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ভূগর্ভ-আশ্রয় কেন্দ্রগুলির প্রবেশ-পথ সহসা পথ-চলতি মানুষের চোখে পড়বে না। পিকিং-এর প্রতিটি বাড়ীর হাতায়, প্রতিটি দালান-সংলগ্ন জমিতে, কারখানায়, দপ্তরে, পাঁচ-ছয় ফুট অগভীর সুরঙ্গ পথ খোঁড়া হয়। যাতে সেই সুরঙ্গপথ বেয়ে সর্বসাধারণের জন্য খোঁড়া বৃহত্তর ও গভীরতর আশ্রয়-কেন্দ্রে পারমাণবিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নাগরিকরা সহজে পৌঁছাতে পারে। এদের মধ্যে কোনো কোনো সুরঙ্গ-পথ পিকিং-এর ভূতলে ত্রিশ ফুট গভীর আশ্রয়-কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার জন্য খোঁড়া হয়। সোভিয়েত আণবিক আক্রমণের অব্যবহিত লক্ষ্যস্থলরূপে উত্তর চীন, মাঞ্চুরিয়া, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য চীনের বড়ো বড়ো শহরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আশ্রয়স্থল তৈরীর কর্মসূচ দ্রুত কাজে পরিণত করা হয়। অতঃপর পিকিং-এর ভূতলে একটি গোটা শহর তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৭২-এর মে মাসেও এই ভূতল-শহর তৈরীর কাজ চলছিল। পিকিং-এ পারমাণবিক বোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাগরিকরা যাতে দ্রুত ভূতল-শহরে পৌঁছাতে পারে সেজন্য সকল সুরঙ্গ পথের শেষপ্রান্ত এই ভূতল শহরে যাতে এসে মেশে সে-পরিকল্পনার কাজেও একই সঙ্গে হাত দেওয়া হয়। এ ছাড়া পিকিং শহরকে ঘিরে বৃত্তাকার ৬০ ফুট গভীর সুরঙ্গ কেটে এই গভীরতর বৃত্তাকার সুরঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য সুরঙ্গের যোগাযোগের

পথ তৈরী করে বহু সংখ্যক আশ্রয়-প্রার্থীর স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সুরঙ্গ বুহে বিদ্যুৎ, জল, প্রচুর ওষুধপত্র এবং বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। গভীর সুরঙ্গগুলির প্রাচীর মজবুতের কাজে পিকিং-এর 'গ্রেট ওয়ালে'র ইঁটও কাজে লাগানো হয়। সাংহাই এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে শহরের বৃহত্তম সুরঙ্গ-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০ দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক আক্রমণের আশংকায় স্টালিনের নির্দেশে মস্কো শহরে যে পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ সুরঙ্গ-আশ্রয় গড়ে তোলা হয়েছিলো, পিকিং এর সুরঙ্গ-আশ্রয়ব্যবস্থা তারই অনুরূপ: "Peking shelter system resembled the Moscow shelter system built at Stalin's orders in late 1940's, when he feared an American nuclear attack ....Mayakovsky Station of Moscow's Metro was used by Stalin and the Government as the main shelter." (Ibid, pp 237)। চীনের গ্রামগুলিতে এই ধরণের সুরঙ্গ-আশ্রয়ের পরিবর্তে কৃষকেরা খাদ্যশস্য ও চাউল মজুদ ক'রে পারমাণবিক আক্রমণের পরিপূরক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্বরূপ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে চীনের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যাঞ্চল, অথবা মাঞ্চুরিয়ার শহরাঞ্চল পারমাণবিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হলে গ্রামাঞ্চলে প্রতিরক্ষা যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'তে লাগলো। দুর্ধর্ষ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ জাপানী সেনাবাহিনী যেমন চীনের পিপলস্ লিবারেশন আর্মির (People's Liberation Army) কাছে গেরিলাযুদ্ধে ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়েছিলো, বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমার আক্রমণের অনুসরণকারী পরাক্রান্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তেমনি দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের কৌশলে বিধ্বস্ত করবার জন্য চীনের সেনাবাহিনী কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধের কৌশল শেখাবার এবং শহরে ভূ-গর্ভ-আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব নাগরিকদের রক্ষা করবার কৌশলনীতি চীন গ্রহণ করলো।

চীনের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রস্তুতি

সোভিয়েত রুশের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার তুলনায় চীনের অস্ত্রসজ্জা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর হলেও, পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং আক্রমণকের সামরিক লক্ষে অব্যর্থ আঘাতের উদ্দেশ্যে পরিবহনযোগ্য মাঝারী ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র (Missile), রকেট প্রযুক্তিতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে চীন যে সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৫৭ সালের ১৫ই অক্টোবরে সম্পাদিত গোপন রুশ-চীন প্রতিরক্ষা চুক্তির (Secret Sino-Soviet Defence Treaty of 15th October, 1957) কয়েকটি গোপন ধারার মধ্যে চীনকে আণবিক অস্ত্রপ্রস্তুতে সাহায্য করবার, পারমাণবিক বোমার একটি 'প্রতিরূপ' ('Prototype') দেবার এবং সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পায়নে বৈজ্ঞানিক ও

কারিগরী সাহায্য দেবার একটি ধারা ছিল। ১৯৫৯ সালের ১৫ই থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিভৃত বিশ্রামস্থান 'ক্যাম্প ডেভিড'-এ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে, দীর্ঘকালের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিলিত হ'তে যাবার পূর্ব ২০শে জুন, ক্রুশ্চেভ সে-চুক্তিটি ছিঁড়ে ফেলেন। ১৯৬০ সালের ১৪ই থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সোভিয়েত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশনে, চীনকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতিযুক্ত ১৯৫৭ সালের চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নিয়ে পরদিন ১৭ই জুলাই পিকিং-এ সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত রুশ এই চুক্তিটি বাতিল করে দেয়। ১৯৫৯ সালের ২০-এ জুনের ঘটনাটি, ১৯৬০-র ১৫ই আগষ্ট পিকিং-এ পিপল্‌স্ ডেইলীতে (People's Daily) প্রকাশ করে বলা হয়: "..... On June 20 1959, before there was a question of any Treaty, banning or partially banning nucler Tests Russia unilaterally broke the Treaty relating to new techniques for national defence which she had signed with China on 15 October 1957, and unilaterally refused to give China a prototype of the A-bomb or any technical details about its production." মস্কো, এই বিবৃতি সমর্থনও করে নাই, প্রতিবাদও করে নাই। কিন্তু "রাষ্ট্রীয় গোপনতা উদ্ঘাটনের জন্য" চীনকে তীব্র তিরস্কার করে। তাই সে-সময় কারুর বুঝতে বাকী রইলো না, 'পিপল্‌স্ ডেইলীর পরিবেশিত তথ্য ষোলআনা সত্য।

সোভিয়েত রুশের এই আকস্মিক পার্শ্বপরিবর্তনের পর, আণবিক অস্ত্র তৈরীর জন্য চীন "একলা চলো" নীতি গ্রহণ এবং দ্রুত সাফল্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। চীনের পারমাণবিক বোমা করায়ত্ত করবার এই অনমনীয়তায় সোভিয়েত রুশ, ১৯৬০-র ২রা সেপ্টম্বর গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'রে বিবৃতি দেয়। কিন্তু চীনের আণবিক বিস্ফোরণ শীর্ষতম পণ্ডিত অধ্যাপক চিয়েন সান-চ্যাং-এর (Chien San Chang) নিরলস চেষ্টায় মাও সে-তুং-এর নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৯৬৫-র ১লা জানুয়ারীর পূর্বেই ১৯৬৪-র ১৬ই অক্টোবর সিন্‌কিয়াং-এর (Sin-Kiang) লপ-নড় (Lop Nor) মরুপ্রান্তরে একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে ২০-টি টোট-এর প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে চীনা আণবিক বৈজ্ঞানিকেরা অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দিল। উন্নততর দেশগুলিতে যে পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমা তৈরী হয়, চীন প্রথমবারের চেষ্টাতেই সেই পর্যায়ের সাফল্য দেখাতে সক্ষম হ'ল। চীনের এর পরের পারমাণবিক বোমাটির বিস্ফোরণ হয় ১৯৬৭-র ১৪ই মে তারিখে। কিন্তু লপ নড়ের উঁচু স্তম্ভে নয়, একটি বিমান থেকে বোমাটি নিক্ষেপ করা হ'ল। দ্বিতীয় বোমাটি প্রথমটির চাইতে

অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল; ১৯৬৭-র ১৭ই জুন চীন ৫-মেগাটন শক্তিসম্পন্ন প্রথম হাইড্রোজেন বোমা (Hydrogen Bomb) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা প্রস্তুতির দিকে গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি করে দিলো এবং তার পূর্বে আন্তঃমহাদেশক রকেটের পরীক্ষায় ১৯৬৬র ১৭ই মে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'ল। সোভিয়েত রুশের যেখানে ১৯৪৯র ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৩ বছর ১১ মাস পর, ১৯৫৩র ১২ই আগষ্ট প্রথম হাইড্রোজেন বোমায় পৌঁছাতে লেগেছিলো, আমেরিকা যেখানে ১৯৪৫-এর ১৬ই জুন প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৭ বছর ৪ মাস পর, ১৯৫২র ১লা নভেম্বর প্রথম হাইড্রোজেন বোমায় পৌঁছালো, গ্রেটব্রিটেন যেখানে ১৯৫২র ৩রা অক্টোবর প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৪ বছর ৮ মাস পর, ১৯৫৭র ১৭ই মে হাইড্রোজেন বোমায় পৌঁছালো, ফ্রান্স যেখানে ১৯৬০র ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৮ বছর ৬ মাস পর, প্রথম হাইড্রোজেন বোমায় পৌঁছালো, সেখানে চীনের পারমাণবিক বোমা ও প্রথম হাইড্রোজেন বোমার ব্যবধান মাত্র ২ বছর ৮ মাস!

শুধু তাই নয়, চীন ক্রমবর্ধমান শক্তিধর পারমাণবিক বোমা তৈরীতেও সফল হ'ল। ১৯৬৬র ২৮শে ডিসেম্বরে বহির্বিশ্বের উচ্চস্তরে ১০০ কিলোটন শক্তিধর বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে, ১৯৬৭র ২৩শে ডিসেম্বর বহির্বিশ্বে ৩০০ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন একটি আরও শক্তিধর বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে, চীন বোমা তৈরীর উন্নততর গড়নে পৌঁছাবার ইশারা দিয়ে গেলো। চীনারা এই বিস্ফোরণটির স্বীকৃতিসূচক কোনো ঘোষণা না দিলেও, আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পরিমাপক যন্ত্রে এই বিস্ফোরণটি ধরা পড়ে। এই বোমাটি পারমাণবিক পরিভাষার একটি "নোংরা বোমা" ("dirty Bomb"), যার বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে তেজোস্ক্রিয় পদার্থ ভূপৃষ্ঠে ঝরে সেখানকার পরিমণ্ডল বিষাক্ত করে তোলে। "China Comes of Age" পুস্তকে ফরাসী গ্রন্থকার জাঁ পিয়েরে ব্রুলে (Jean-Pierre Brule) চীনের পরমাণু শক্তির ক্রমবিকাশ দেখে মন্তব্য করেছেন; "Clearly Peking intended to have the most powerful possible weapons geared to the strategy of war directed against Civil populations, thus implying destructions on a massive scale" (পৃঃ ১৬১, Pelican Books)। মাও সে-তুং-এর ৬৫তম জন্মদিনের উপহার স্বরূপই ১৯৬৮র ২৭শে ডিসেম্বর চীন লপ নড়-এর আকাশে ৩ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো। এটি চীনের অষ্টম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং এর শক্তি ১৯৬৭র ১৭ই জুনের ৫-মেগাটন শক্তির হাইড্রোজেন বোমার সমপর্যায়ের।

চীনে বিশেষজ্ঞদের প্রতি অনুসৃত নীতি

আশ্চর্যের বিষয়, চীনে পারমাণবিক বিস্ফোরণের অগ্রগতি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমসাময়িক। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিদ্ সম্পর্কে চীনের গোড়াকার নীতি ছিল: 'বিজ্ঞানের বিকাশ বিজ্ঞানবিদ্দের হাতে ছেড়ে দাও'—"Leave Science to the Scientists."। ১৯৫৬র সেপ্টম্বরে অনুষ্ঠিত চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে এই নীতি গৃহীত হবার পর মাও সে-তুং চীনের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে অধিকতর স্বাধীনতা দেবার এবং বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী ও অ-কম্যুনিষ্টদের স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশের অধিকতর সুযোগ দেবার জন্য: "শত শত ফুল ফুটুক, শত শত মত বিকশিত হোক": "Let Hundred Flowers Blossom And Let a Hundred Schools of Thought Contend" শীর্ষক নীতি গ্রহণ করলেন। মাও-এর "শত শত ফুল" বা "Hundred Flowers" সম্পর্কিত ভাষণের প্রস্তুতি সুরু হয়েছিলো ১৯৫৬র ২রা মে এবং ৮ই জুন পর্যন্ত এই প্রস্তুতি চলে। এই নীতির সুযোগে, রাষ্ট্রবিরোধী অজস্র মতপ্রকাশে মাও আতঙ্কিত হয়ে সকল প্রকার বিরুদ্ধমতবাদকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে চীনের জাতীয় জীবনের সর্বত্র দলের একাধিপত্য স্থাপনে অগ্রসর হলেন। ফলে, "বিজ্ঞান, বিজ্ঞানবিদদের হাতে ছেড়ে দাও" নীতিরও পরিবর্তন হয়ে বিজ্ঞানের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের উপর দলের আধিপত্য আরোপিত হ'ল। ১৯৫৮র ২৩শে নভেম্বরে গঠিত চীনের সর্বশক্তিমান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, 'সায়েন্টিফিক এণ্ড টেকনিক্যাল কমিশনে'র-এর সভাপতি, (Scientific and Technical Commission) চীনের অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মার্শাল নিয়েহ্ ইয়ু'-চন (Marshal Nieh Yung-Chen) মত দিলেন: ".....Political Leadership is Supreme. There can be no scientific progress outside the guidance of the Party" ('Red Flag', 1st October 1958), এবং একই কারণে চীনা কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটিও চাইলেন বিজ্ঞান-বিদ্দের "Red and Expert" হ'তে হবে; অর্থাৎ, কম্যুনিষ্ট মতবাদে আনুগত্য আগে চাই, তবেই বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ আসবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মার্ক্সীয়-লেনিনিয় মতবাদের পাশ কাটিয়ে গবেষণায় এগোতে চাইলে, চীনা কম্যুনিষ্ট-দল তাদের "Red and Expert" হবার নীতি, ১৯৬১ সাল থেকে ক্রমাগত শিথিল ক'রে ১৯৫৮, ১০৫৯ সালে এ সম্পর্কে লিপ্তাপিত দলীয় নীতির বিরোধী নীতিকেও সমর্থন করতে বাধ্য হন। ১৯৬১র ১০ই আগষ্ট, এই পরিবর্তিত নীতির ব্যাখ্যা সূত্রে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ (Marshal Chen-yi) একটি ভাষণে বললেন: "There are some people who need time for their studies, and others who have little interst in politics and will give little time to political activity.

Provided they produce results in their own field, and contribute to the construction of Socialism, there should be no objection to their taking a lesser part in political activity……।" অর্থাৎ, 'কিছু লোকের পড়াশোনার জন্য সময় চাই এবং আর কিছু লোকের রাজনীতিতে ঝোঁক নাই, তাই রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য তাদের সময় নাই। সমাজবাদ গড়ে তুলবার পথে তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কিছু কাজের কাজ করলে, রাজনৈতিক কাজকর্মে অপেক্ষাকৃত কম সময় দিলে আপত্তি করবার কিছু থাকে না।' একটি ব্যক্তিত্ব "Red" এবং "Expert"-এর সমাবেশ, সেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সুপ্ত দ্বৈতরূপের জন্ম দেয়। তাই, এমন একটা সময় আসে যখন "Expert"-এর বৈশিষ্ট্যের উপর ক্রমাগত বর্ধিত দাবী, সেই ব্যক্তিত্বের Expert'-এর বৈশিষ্ট্যকে তত্ত্বতঃ করে অর্থাৎ, "Red"—চিহ্নিত মার্ক্সীয়-লেনিনিয় বৈশিষ্ট্যের উপর সেই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ শিথিল হয়, দলীয় আদর্শবাদে ভাটা পড়ে। চীনে এই স্বাভাবিক দ্বৈত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন "Expert-রা" 'রিভিসনিষ্ট' বা 'সংশোধনবাদী' রূপে পরবর্তীকালে চিহ্নিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন।

চীনে পারমাণবিক বিজ্ঞানবিদ্ গোষ্ঠির শীর্ষতম ব্যক্তি অধ্যাপক চিয়েন সান্-চিয়াং (Chien San-Chiang) প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চীনে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের শীর্ষতম ব্যক্তি অধ্যাপক চিয়েন হুয়ে-চিয়েন-এর (Chien Hsueh-Chien) সহায়তায় "পাঁচ ষষ্ঠাংশ" ("Five-Sixths") নামাঙ্কিত এক পদ্ধতির ব্যবস্থা বিজ্ঞান-গবেষক ও বিজ্ঞানের সুদক্ষ ছাত্রদের জন্য সরকারের হাত থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকরা তাদের কাজের সময়ের 'পাঁচ-ষষ্ঠাংশ' ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে অপর 'এক-ষষ্ঠাংশ' (One-Sixth') ভাগ রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকবেন। ফলে, বিজ্ঞানের সুদক্ষ ছাত্ররা এবং অধ্যাপকরা গ্রামাঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ থেকে অব্যাহতি পেলেন, যা থেকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের এবং কেরাণীদেরও রেহাই নেই। এমন কি ১৯৬৬ সালের ৮ই আগষ্টে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংক্রান্ত প্রস্তাবে এ-সম্বন্ধে যা বলা হয়, তার মোদ্দা কথা ছিল রাজনৈতিক কোনো 'বিশেষ ঘটনায়' ('Incidents') চীনের পারমাণবিক প্রতিযোগিতার গতিবেগ ব্যাহত করা চলবে না। চীনের সকল স্তরের মানুষের জন্য মার্ক্সবাদী-মাওবাদী নীতির বৈষম্যহীন কাঠামোর মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্ ও বিজ্ঞানের সুদক্ষ ছাত্রদের জন্য এই বৈষম্যমূলক ব্যতিক্রম অপ্রত্যাশিত বলা চলে!

অতীতে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে মাও বলতেন: 'পারমাণবিক বোমা দিয়ে কি যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? না, তা যায় না!……জনসাধারণের একক সংগ্রাম ছাড়া পারমাণবিক বোমার কী মূল্য?" —"Can atom bombs determine the

course of wars ? No, they cannot..... without individual struggles by the people, atomic bombs count for nothing". (Selected Works, vol IV Pp 21-2)। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পারমাণবিক বোমার কার্যকারিতা সম্বন্ধে মাও-এর মতকেও অতিক্রম ক'রে যায়। বলাই বাহুল্য, এ-বিষয়ে মাও-এর সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে মত পরিবর্তন আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৬৬র ২৭শে অক্টোবর পারমাণবিক বিস্ফোরণের পূর্ব লক্ষ্যস্থলে সেই বোমা পরিবহন ব্যবস্থার (delivery system) অসামান্য সাফল্য, বিশ্বে চীনের বৈজ্ঞানিকদের অভূতপূর্ব কৃতিত্বের যে পরিচয় বহন করে নিয়ে এলো, তা সোভিয়েত রুশের উচ্চতম মহলকেও চমকে দিলো। একটি ক্ষেপণাস্ত্রের নাকের ডগায় ২০ কিলোটন শক্তি-সম্পন্ন পারমাণবিক বোমা স্থাপন ক'রে ৭০০ কিলোমিটার দূরত্বে পরিবাহিত হয়ে অব্যর্থভাবে লক্ষ্য-বস্তুকে আঘাত করানোর সাফল্যে, চীন সেদিন বিশ্বকে বুঝিয়ে দিলো ভবিষ্যতে চীনের আরও দূর-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অব্যর্থ-লক্ষ্য সন্ধানে কৃতি হবে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ১৯৫৭-র গোপনচুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রুশ, চীনকে পারমাণবিক বোমার পদ্ধতিগত বিদ্যা না শেখালেও কিম্বা পারমাণবিক বোমার 'প্রোটোটাইপ' বা প্রতিরূপ না দিলেও, ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রুশ চীনা বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য রকেট দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সংশয়াতীতভাবে বলা যায়, অল্পসময়ের মধ্যে পারমাণবিক বোমার লক্ষ্য-বস্তুতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ-ব্যবস্থা চীনা বিজ্ঞানিদের অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবন। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ এবং একই সঙ্গে দূরপাল্লায় ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে সেই বোমার লক্ষ্য সন্ধানে অব্যর্থ উত্তরণের সার্থক পরীক্ষা, যুদ্ধে পারমাণবিক বোমার অব্যবহিত ব্যবহারে চীনের প্রস্তুতি,—সেদিন এই পরীক্ষা ঘোষণা করে দিলো। অবশ্য আরও দূর-পাল্লায়—৮০০০—১০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বের—বহু মেগাটন-শক্তিসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপের ক্ষেপণাস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পরীক্ষায় চীনের উত্তীর্ণ হতে হবে। সে-ধরণের পরীক্ষা চীনের পক্ষ থেকে করাও হচ্ছে। তা সত্ত্বেও পিকিং-এর 'পিপলস্ ডেইলী' স্পর্ধার সঙ্গে ১৯৬৬র ১৫ই নভেম্বর বলেছে, 'রকেট ও পারমাণবিক অস্ত্র চীনের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং, অতঃপর চীনের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে'—"Since she has a rocket and a nuclear weapon, China's influence will henceforth be irresistible."

আণবিক অস্ত্রের মজুদ : লক্ষ্যস্থলে পরিবহন

ইতিমধ্যে চীনের ২১টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ সফল হয়েছে : এর মধ্যে ১৯৭৬-এর ৮ই সেপ্টেম্বর চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর তিনটি বিস্ফোরণ হয়েছে। শেষতম বিস্ফোরণ একটি

হাইড্রোজেন বোমার—চার মেগাটন-শক্তিসম্পন্ন। এটি ঘটেছে ১৯৭৬-এর ১৬ই নভেম্বর তারিখে। এই একুশটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে তিনটি বিস্ফোরণ চীনারা সরকারীভাবে ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু আমেরিকার আণবিক শক্তি কমিশন এই তিনটি বিস্ফোরণ সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এদিকে আবার লণ্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্রসম্ভারের খতিয়ান-কারক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'ইণ্টারন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস' তাদের ১৯৭৫-এর বার্ষিক খতিয়ানে চীনের ১৮টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের উল্লেখ করে বলেছেন, বেশীর ভাগ বিস্ফোরণই উচ্চ স্তরে ঘটানো হয়েছেন, কিছু আকাশে চলন্ত বিমান থেকে নিক্ষেপের পর বিস্ফোরণ ঘটেছে মাধ্যাকর্ষণের টানে, অন্তত একটি ক্ষেপণাস্ত্র-বিস্ফোরণ এবং একটি ভূগর্ভ বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে। এঁরা বলছেন যে চীন ২০-কিলোটন থেকে তিন-মেগাটন শক্তিসম্পন্ন অন্তত ৩০০ পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ তৈরী করেছে।

ইনস্টিটিউটের মতে চীনের পারমাণবিক অস্ত্র-ক্ষেপণে ১৫০০ মাইলব্যাপী আক্রমণাত্মক ব্যাসার্ধ (Combat radius) পরিমিত ৬০টি টিউ-১৬ (60 Tu-16) মাঝারী বোমারু, ১০০০ মাইল-ব্যাপী ব্যাসার্ধ পরিমিত ৪০০টি ইলিউসিন-২৮, ১৭৫০ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিবহন-যোগ্য ৬০টি অন্তর্বর্তী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র (Intermediate-range ballistic missiles) এবং ৫০টি মধ্যবর্তী পাল্লার (medium-range ballistic missiles) ৭০০ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিবহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। এ-ছাড়া চীনে ৩৫০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য সেগুলি বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে তাক্ করে ছড়িয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর ওপর আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতিও চীনের রয়েছে, যা ৭৫০০ মাইল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ, চীন থেকে মস্কো এবং এশিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলে পৌঁছাতে পারে। এ-ছাড়া পশ্চিম মহাদেশের অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু ঘায়েল করবার উপযোগী আরও দূর-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চীনে চলছে। ইনস্টিটিউটের মতে ৮০০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার গতি মন্থর হয়ে গেলেও, তার কারণ সম্বন্ধে ইনস্টিটিউটের হাতে কোনো নির্ভর-যোগ্য তথ্য নাই। এই মন্থরগতি কোনো কারিগরী-সমস্যার জন্য, না সোভিয়েত রুশের পারমাণবিক আঘাত থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির জন্য—ইনস্টিটিউট সে-সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় নয়।

সিনকিয়াং—পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষার মরুস্থান

চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে, চীনের পশ্চিম সীমার প্রত্যন্ত প্রদেশ সিনকিয়াং-এর গুরুত্বর ভূমিকা রয়েছে। সিনকিয়াং-এর উপর সোভিয়েত রুশের বিশেষ নজর ছিল। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের সে-সময় বেজায় বন্ধুত্ব। ১৯৫০-এর ২৮শে

মার্চ মস্কোতে রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের ভিসিন্স্কির ও সেখানকার চীনা রাষ্ট্রদূতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বলে ১৯৫০-৫১ সালে যে চারটি চীন-রুশ যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিলো, তার দুইটি ছিল সিন্‌কিয়াং-এ। সিন্‌কিয়াং-এর খনিজ সম্পদের মধ্যে ইউরেনিয়াম্, মোনাজাইট, টাংস্টেন ও তেল খুবই দুর্লভ। সিন্‌কিয়াং-এ এই যৌথ কোম্পানীর প্রথমটি তেল খোঁড়ে। ১৯৫৪ সালে পিকিং-এ ক্রুশ্চেভ ও চৌ এন-লাই-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ৭টি চুক্তির বলে, সোভিয়েত রুশ ১৯৫৫-র ১লা জানুয়ারী এই যৌথ-কোম্পানীগুলি চীনের হাতে তুলে দিলে পারমাণবিক বোমা তৈরীর আবশ্যিক উপাদান ইউরেনিয়াম—মোনাজাইট খনিজকে ইউরেনিয়ামে রূপান্তরিত করলে পারমাণবিক বোমার আবশ্যিক উপাদান পাওয়া যাবে—উৎপাদনের একক অধিকার চীনের হাতে চলে আসে। সিন্‌কিয়াং-এর তৈলসম্পদ উৎপাদন ও পরিশ্রুতির এবং ইউরেনিয়াম উৎপাদন করে পারমাণবিক বোমা তৈরীর পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক কারিগরির কল-কারখানা, বিদেশীদের চোখের আড়ালে রাখবার জন্য ১৯৬০ থেকে বিদেশীদের সিনকিয়াং-এ প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

সিনকিয়াং মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তর চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মরুস্থানে পরিণত হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির টাক্‌লা মাকান্ (Takla Makan) অঞ্চলের লপ্ নড়কে (Lop Nor), পারমাণবিক বোমা ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পীঠস্থান বলা চলে। এই কারণে গত পনের বছরে সিনকিয়াং-এর সামরিক গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিনকিয়াং-এর রাজধানী উরুমচীতে পিকিং-এর 'অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স'-এর অনুসরণে পারমাণবিক শক্তির একটি ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে এবং ল্যাংচাওতে পারমাণবিক বোমা তৈরীর একটি অনিবার্য অনুসঙ্গের প্ল্যান্ট খোলা হয়েছে। ল্যাংচাও-এর নামই হয়ে গেছে চীনের পারমাণবিক রাজধানী (atomic capital)। সিনকিয়াং-এর মূল ইউরেনিয়াম খনিজ-ঘাঁটি সোভিয়েত-রুশ সীমান্ত-সংলগ্ন, এখানে ইউরেনিয়াম ঘাঁটির বিস্তৃতি, পরিমাণ সোভিয়েত রুশের বেশী জানা আছে, কারণ তারাই এই খনিজ-ঘাঁটি প্রথম উদ্‌ঘাটন করেছিলো। তাই সোভিয়েত-রুশের পক্ষে এই ঘাঁটির ইউরেনিয়াম-ব্যবহার অনায়াসলব্ধ ছিল। এখান থেকে ইউরেনিয়াম উদ্ধারের কাজে চীন কয়েক লক্ষ শ্রমিক, নিয়োগ করেছে এবং সিনকিয়াং-এর আলা শান (Ala shan) প্লেটার গুহায় আড়াল ক'রে রাখা, গোপন সামরিক মাল-মশলা উৎপাদনের সংস্থাগুলি প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যের পাহারায় রয়েছে।

চিয়ু-চিয়াং-এ (Chiu-Chiang) মধ্যপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘাঁটি রয়েছে, যেখান থেকে চীন তার ৮০০ থেকে ১,০০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে। লাসার উত্তরে তিব্বত-এর নাগচু জং (Nagchu Dzong)

এলাকা থেকে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়ার অনেকটা অংশ ভাক্ করবার মত একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। একদিকে যেমন সিনকিয়াং-এ পারমাণবিক শক্তির বিচিত্র সংস্থা সম্ভারে আকীর্ণ হয়ে আছে, তেমনি অপরদিকে সিনকিয়াং, আফগানিস্থান, কাশ্মীর, পাকিস্তান এবং চীনের পশ্চিম-সীমান্তে সোভিয়েত রুশে প্রবেশদ্বার। সিনকিয়াং-এর সামরিক গুরুত্ব, এই সীমান্তে সোভিয়েত রুশ ও চীনের শস্ত্রসংঘাত এক এক সময় নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। তাই চীনও যেমন তার প্রত্যন্ত পশ্চিম প্রদেশে, চীন-রুশ সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরা দেয়, সোভিয়েত রুশও এই সীমান্তে প্রচুর সমরসজ্জায় চীনকে কাবু করতে সর্বদাই উদ্যত। এক সময় সমর-বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা ছিল, অগ্রিম পারমাণবিক (Pre-emptive Strike) আঘাত হেনে সিনকিয়াং-এর পারমাণবিক উদ্যোগ সোভিয়েত রুশ অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেবে। তবে এখন পর্যন্ত সোভিয়েত রুশ এ-বিষয়ে নিরস্ত রয়েছে, যদিও ১৯৬৯র সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শীর্ষতম নেতৃত্ব এ-সম্পর্কে প্রায় মন স্থির করে ফেলেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

৭. ১২. ৭৬

চাই ভালো লেখা—চাই নতুন লেখক

শক্তিশালী নতুন লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা প্রকাশের সুযোগ 'জয়শ্রী'তে সর্বাগ্রে।

প্রবন্ধ হবে তথ্যবহুল মননশীল আনুমানিক তিন হাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ শেষে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব লেখাই স্পষ্ট হস্তাক্ষর বা টাইপে এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবেন। রচনার মাথায় শব্দ সংখ্যা লিখে দেবেন॥ রচনার সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biodata) পাঠাতে ভুলবেন না।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক, জয়শ্রী

আফ্রিকা ঃ কালোমানুষের মুক্তি-সংগ্রাম

মৃণাল বিশ্বাস

আফ্রিকাতে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কিন্তু ভারতবাসীরা আফ্রিকার রাজনীতি নিয়ে খুব সচেতন বলে মনে হয় না।

ইতিহাস এবং সাহিত্যের কথা থাক, সেখানে গান্ধীজীর আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের কথা এসে পড়বে। বর্তমানের আফ্রিকা, প্রাচীন বৈচিত্র্য এবং সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

সাহারা মরুভূমি এই বিশাল মহাদেশকে-দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। উত্তরে আরব অধ্যুষিত দেশগুলি, আর সাহারার দক্ষিণে গভীর আফ্রিকার আদিম এবং কালো মানুষদের বিশাল ভূভাগ। উত্তরে মরুভূমি, দক্ষিণে ঘন-জঙ্গল।

প্রায় বারো শতক যাবৎ কৃষ্ণবর্ণদের সঙ্গে আরব জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ঘটেছে আফ্রিকা মহাদেশে। সব সময় ঘনিষ্ঠতা পারস্পরিকতায় পৌঁছাতে পারেনি! তার কারণও অনেক।

বলা বাহুল্য, আরববাসীরা বরাবরই নিজেদের উঁচু পর্যায়ে রেখেছে। ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুগত উত্তরাঞ্চলের আরব অধিবাসীরা, গভীর দক্ষিণে যাতায়াত করেছে বরাবরই। কৃষ্ণাঙ্গদের ধর্মবিষয়ে কোন নির্দিষ্ট বা বলিষ্ঠ মত ছিল না। আদিম মানুষের লক্ষণগুলি নিয়ে ওরা জীবন-জিজ্ঞাসার তৃষ্ণা মেটাতো। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতির সমস্ত বস্তু এবং ঘটনার প্রাণ আছে, এবং তারা উপাস্য। এই বিশ্বাসের ওপর প্রথম এবং প্রবল ঘা দিল ইসলাম। আরববাসীরা ইসলাম ধর্ম দিয়ে আদিম বিশ্বাসকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। তবু এই বিশাল ভূভাগের প্রত্যন্ত প্রদেশের সর্বত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি। ফলে আদিম বিশ্বাস নিয়ে অনেক কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকাবাসী তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপেও শ্বেতকায় উপনিবেশকারীরা খৃষ্টধর্ম নিয়ে এলো আফ্রিকা মহাদেশে। ফলে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম কৃষ্ণকায়দের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই ঘটনার সূত্রপাত।

আরবরা কৃষ্ণবর্ণদের ভাগ্য অন্যভাবেও নিয়ন্ত্রিত করে যাচ্ছিল। প্রথমদিকে এবং বেশ কয়েক শতক যাবৎ আরবদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণবর্ণদের নিয়ে দাস-ব্যবসা করা। এমন কি যখন শ্বেত-উপনিবেশবাদ আফ্রিকার দিকে দিকে বিস্তার লাভ করছে, তখনও আরবরা কালোদের নিয়ে

দাস-ব্যবসায় উপনিবেশ-কারীদের সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

কিন্তু সেই আরবরাই আবার বিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণমহাদেশের মুক্তি আন্দোলনে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নেয়।

ভাষায় কথা ধরা যাক। কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকান পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত সহেলী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান ভাষা হোসা। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আরবী ভাষার প্রভাব অত্যধিক। সহেলী ভাষার জনপ্রিয়তা এবং কার্যকারিতা এতই বেশি যে, সারা আফ্রিকার যোগাযোগের ভাষা হ'তে (Lingua Franca) এর বিশেষ কোনো বাধা নেই।

কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকাবাসীদের ওপর আরবদের অবিসম্বাদিত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীর আগে কখনও আরব-কৃষ্ণবর্ণদের সম্পর্কে স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকেনি। আরবরা উন্নত, জগৎ সম্পর্কে বাস্তব-বোধসম্পন্ন, ধর্মবিষয়ে স্থির এবং উগ্র, ব্যবসার দিক থেকে শোষক। অন্যদিকে অনুন্নত কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা শুধু পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে এবং শোষণের শিকার হয়েছে। এর ফলে আরবদের সম্পর্কে কৃষ্ণবর্ণদের মনোভাব কখনই সদয় হতে পারেনি, আরবরাও তাদের সমপর্যায়ের ভাবতে দ্বিধা করেছে।

শ্বেত-উপনিবেশবাদ আফ্রিকার কূল ধরে যখন মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন থেকেই আরবদের প্রভাব সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। কারণ কৃষ্ণবর্ণরা আরবদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে শ্বেতবর্ণদের দেখতো।

ধীরে ধীরে সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপীয় দেশগুলির কবলে চলে গেল। আরবদের প্রভাব শুধু সঙ্কুচিত হল তা নয়, আরব দেশগুলিতেও ইউরোপীয় শক্তির প্রাধান্য রোধ করা গেল না। খৃষ্টধর্ম, ইউরোপীয় ভাষা এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অধীনে আফ্রিকাকে বন্দী হ'তে হ'ল, পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

ব্রিটিশ-শক্তি ছিল আফ্রিকায় প্রধানতম ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী। ব্রিটিশরা কিন্তু জানত' মধ্যপ্রাচ্যের (বা পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকার) আরবরা আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তারা যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে সাম্রাজ্যরক্ষায় নজর দিয়েছিল।

আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বৃটিশদের প্রধান দৃষ্টি পড়েছিল মিশরের ওপর। প্রাচীন পিরামিড এবং ফারাওদের দেশ মিশর ছিল এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারেরও একটি প্রধান অবলম্বন। সুতরাং নীল নদের অববাহিকাই শুধু নয়, এর আশেপাশের দেশগুলিও বৃটিশরা দখল করে নিল।

আফ্রিকাতে ইউরোপীয় শক্তির ক্ষমতা খর্ব হতে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। চারটি বড় বড় ঘটনা আফ্রিকার শ্বেতপ্রভুত্বের অন্তিম পর্যায় রচনা করল।

প্রথম ঘটনা : ১৯৫২ সালে মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান এবং (রাজা) ফারুকের দেশত্যাগ। দ্বিতীয় ঘটনা : ১৯৫৮ সালে বেলজিয়ামের কঙ্গো থেকে বিদায় এবং সেখানে তার পরবর্তী মারাত্মক গৃহযুদ্ধ। তার সর্বনাশা পরিণাম সম্পর্কে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তৎ সত্ত্বেও ফ্রান্স আলজেরিয়াতে তার উপনিবেশ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়। সেখানকার সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন ফরাসী জাতিকেই ক্ষত-বিক্ষত করে, সে-সময় ফ্রান্সে ১৯৫৮ সালে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক দ্য গল আলজেরিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেন।

সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটছে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে প্রায় চল্লিশ বছর সালাজারী একনায়কত্ব সহ্য করার পরে পর্তুগালে হঠাৎ এক অভ্যুত্থান ঘটে যায়, প্রধানত সামরিক-বাহিনীর নেতৃত্বে। এর পরেই শুরু হয় আফ্রিকায় পর্তুগীজ উপনিবেশের একে একে স্বাধীনতা অর্জন।

লক্ষ্য করার বিষয় আফ্রিকার ফরাসী এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে উভয় দেশেই তীব্র রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবার পরে। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিহত করতে গিয়ে দুই দেশের মানুষ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটে রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে এবং ফলে বেপরোয়াভাবে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সমূহের ওপর চরম আঘাত হানে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতে থাকে। মিশরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর নাসেরের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, ব্রিটিশরা বুঝতে পারল' আফ্রিকাতে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ফলে পূর্ব-আফ্রিকায় পর পর কয়েকটি দেশ ৬০-এর দশকে বৃটিশদের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়েই তাদের স্বাধীনতা আদায় করে নিলো। শুধু রোডেশিয়া নিয়ে একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। যার জের এখনও থামেনি।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে আলজেরিয়াসহ আফ্রিকার অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বেলজিয়াম-কঙ্গো, যার নাম পরিবর্তন করে হল জেঈয়ার (Zaire)—আফ্রিকার রাজনীতিতে একটা বড়রকমের নাড়াচাড়া দিয়ে গেলো। বেলজিয়াম সরকার আফ্রিকার এই দেশ থেকে তাদের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তীব্র গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। রক্তক্ষয়ী ঐ যুদ্ধে বিশ্বশক্তিগুলি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই সুযোগে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার মূল ভূভাগে সোবিয়েৎ রাশিয়ার হস্তক্ষেপের প্রথম সুযোগ আসে। সোবিয়েৎ কম্যুনিষ্টরা এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে চাইলেও, সামান্য কিছু প্রচার এবং বিবাদমান গোষ্ঠীর কয়েকটিকে দূর থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা ছাড়া সোবিয়েৎ রাশিয়

বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। কিন্তু বেলজিয়াম-কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ থেকেই ওরা আফ্রিকার রাজনীতি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সেটা ভবিষ্যতে তারা কাজে লাগায়।

কঙ্গোর দুইজন বিশিষ্ট নেতা বেলজিয়াম-কঙ্গোর গৃহযুদ্ধের শিকার হন। একজন সেদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা এবং অপরজন রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক ডাগ হামারশীল্ড। লুমুম্বাকে নিয়ে সারা বিশ্বের বামপন্থী আন্দোলন জোর প্রচারকার্য চালায় এবং তাঁকে যুদ্ধবাজ উপনিবেশিক শক্তির হাতে নৃশংসভাবে নিহত এক মহান শহীদরূপে চিহ্নিত করা হয়। মস্কোতে প্যাট্রিস লুমুম্বার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

ডাগ হামারশীল্ডের মৃত্যুও এক মর্মন্তুদ ঘটনা। রাষ্ট্র সংঘ বেলজিয়াম-কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ স্তিমিত করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করছিল। হামারশীল্ড সেই উদ্দেশ্যেই বেলজিয়াম-কঙ্গো গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার বিচ্ছিন্নতাকামী কাটাঙ্গা প্রদেশের আকাশে তাঁর বিমান গুলিবিদ্ধ হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বেলজিয়াম-কঙ্গোর গৃহযুদ্ধের সময়েই আরেকটি ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান যুদ্ধের ভাড়াটে সৈন্যের এক বিশাল সমাবেশ ঘটে সেখানে। দুর্ধর্ষ এই ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে যে কোনো প্রতিপক্ষই নাজেহাল হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর কাছেই এরা কিছুটা কাবু হয়েছিল। বিশ্ব জনমতের তীব্র ধিক্কার, বিরুদ্ধ কূটনৈতিক অভিযান এবং অর্থনৈতিক চাপের কাছে এদের প্রভুরা বিপর্যস্ত হলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাড়াটে সৈন্যদের দাপট হ্রাস পেতে থাকে।

শেষপর্যন্ত বেলজিয়াম সেনাবাহিনীর প্রধান মবতু যখন (১৯৬১) দেশের ক্ষমতা দখল করল তখন বিবদমান পক্ষগুলো যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও শক্তিহীন।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ সমগ্র আফ্রিকার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে যায়। আফ্রিকার রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারলেন যে-সব দেশ তখনও পরাধীন, সে-সব উপনিবেশের স্বাধীনতা সব সময় মসৃণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আসবে না। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

ইতিমধ্যে, নাসেরের নেতৃত্বে আফ্রিকার আরব শক্তি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে এগিয়ে এলে নাসের বুঝতে পেরেছিলেন আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রাম ক্রমশঃই শক্তি-সঞ্চয় করবে এবং আরবরা এই সুযোগে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৃহৎ আফ্রিকাকে বিশ্বের তৃতীয় শক্তির স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে, কারো কারো কাছে ইপ্সিত লক্ষ্য আর দূরে নয়, তবে বেশির ভাগই সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার দুরূহ কাজে ব্যস্ত, চারদিকেই একটা সাজ-সাজ রব।

এই উদ্দীপনার মধ্যে আফ্রিকার নেতারা ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকার শহরে মিলিত হয়ে 'আর্গানিজেশন অফ্ আফ্রিকান্ ইউনিটি' বা সংক্ষেপে 'ও-এ-ইউ' গঠন করেন। পরবর্তীকালে ও-এ-ইউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

'ও-এ-ইউ' যখন গঠিত হয় তখন আফ্রিকার ব্রিটিশ এবং ফরাসী উপনিবেশগুলি প্রায় সবই স্বাধীন, কিন্তু স্প্যানিশ সাহারা এবং পর্তুগালের দখলে গিনি-বিশু, অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে স্বাধীনতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। স্পেনে চলছিল ফ্রাঙ্কোর রাজত্ব আর পর্তুগাল সালাজারের অধীন।

উভয় দেশেই কঠোর একনায়কত্ব চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকেই। এরা কেউই আফ্রিকার উপনিবেশ ছেড়ে দেবার কথা কল্পনাও করতে পারত না। ফলে স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ কলোনীগুলিতে স্বাধীনতাকামী মানুষরা সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ও-এ-ইউ গঠনের গোড়ার দিকে ডাকারে আফ্রিকার নেতাদের যে শীর্ষ সম্মেলন হয় তাতে সমগ্র আফ্রিকার স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে কি কি পন্থা অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়।

সেই সময়ে নূতন স্বাধীন আলজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেন বেলা। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার নেতাদের জন্য মূল্যবান স্ট্র্যাটেজি স্থির করে দেন। বেন বেলার মূল কৌশল হল ও-এ-ইউর স্বাধীন সদস্য রাষ্ট্রগুলি সমষ্টিগতভাবে আঘাত হানবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর শ্বেত শাসিত কলোনীগুলিতে, অর্থাৎ ও-এ-ইউর প্রথম লক্ষ্য হবে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে গিনি-বিশু (উত্তর আফ্রিকার একমাত্র পর্তুগীজ কলোনী), অ্যাঙ্গোলো এবং মোজাম্বিকে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা অর্জন করা। দক্ষিণ আফ্রিকার পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিক স্বাধীন হয়ে গেলে আরও দক্ষিণে রোডেশিয়া তিনদিক থেকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে যাবে। তখন ও-এ-ইউ চরম আঘাত হানবে রোডেশিয়ার ওপর এবং সেখানে অবিসংবাদিত সংখ্যাধিক কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে ভীষণভাবে একা পড়ে যাবে আর একটি শ্বেতশাসিত রাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা। সর্বশেষে ও-এ-ইউতে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার কাজে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে বেন বেলার মূল কৌশল আফ্রিকার শ্বেতকায় প্রভুদের বিষম বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে।

এখানে ও-এ-ইউ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভালো। শ্বেত-প্রভুদের হটিয়ে "অসমাপ্ত আফ্রিকান বিপ্লব" সম্পূর্ণ করবার জন্য ও-এ-ইউ বরাবর জোর দিয়েছে সমষ্টিগত কাজের উপর। আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামকে পরিচালনা করবার

জন্য ও-এ-ইউয়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে তার নাম দেওয়া হয় আফ্রিকান লিবারেশন কমিটি বা সংক্ষেপে এ-এল-সি। ও-এ-ইউর বরাবর লক্ষ্য ছিল মুক্তি সংগ্রামের জন্য সব রকম সাহায্য, তা সেটা আফ্রিকার ভেতর থেকেই আসুক বা বাইরে থেকেই আসুক, আফ্রিকার লিবারেশন কমিটির শক্তি বৃদ্ধি করবে। এর ফলে মুক্তি-সংগ্রামের কাজ একটা জায়গা থেকে পরিচালনা হতে সুবিধা হবে আর আফ্রিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্ভাব্য রেষারেষির ওপর একটা রাশ টেনে রাখা যাবে। ও-এ-ইউর নেতারা ভেবেছিলেন যদি এ-দুটো কাজ ঠিকমত করা যায়, তবে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তি-সংগ্রামের সংগঠনকে অনেকখানি এগিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনা দেখায় ও-এ-ইউ অন্ততঃ অ্যাঙ্গোলার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ও-এ-ইউ কিন্তু প্রথমদিকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে এ-এল-সির ভূমিকা ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ইউরোপে শক্তিশালী সোস্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশানালের সদস্য সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং হল্যাণ্ড সরকার এবং ব্রিটেনের শ্রমিকদল, আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামে যখন যা সাহায্য করবার এ-এল-সির মাধ্যমেই করেছে। এমন কি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশ্ব-সংগঠন, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস, তাদের সাহায্য এ-এল-সির কাছেই পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এবং চীনের গণপ্রজাতন্ত্র এই নিয়ম খুব একটা মানত না। মুক্তি সংগ্রামে যেসব দলগুলি সোবিয়েৎ প্রভাবধীন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সেসব দলগুলিকে সরাসরি সাহায্য করত। তেমনি, অন্ততঃ ১৯৭০ সালের আগে পর্যন্ত চীনা-পন্থী দলেরা চীনের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য পেত। ক্রমে ক্রমে ও-এ-ইউর মধ্যেই সোবিয়েৎ পন্থা বা অনুরূপ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে চারটি ঘটনা বর্তমান যুগের আফ্রিকার চাকাকে অন্য খাতে বইয়ে দেয়। সেগুলি যথাক্রমে: মিশরে নাসেরের অভ্যুত্থান, বেলজিয়াম-কঙ্গো বা জেইয়ারে গৃহযুদ্ধ, ফ্রান্সে দ্য গলের পুনরাবির্ভাব এবং পর্তুগালে সালাজারী শাসনের অবসান।

পর্তুগালে সালাজারশাহীর কেন পতন হল, আফ্রিকার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, পর্তুগাল পাঁচশ বছর আগে অ্যাঙ্গোলাসহ আফ্রিকার অন্যান্য যায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে। আফ্রিকার পণ্য তারা নির্বিচারে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। কিন্তু একথাও বলতে হবে পর্তুগীজ-শাসিত আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণ কখনও বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়নি। এমন কি শ্বেতকায় পর্তুগীজ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উদ্ভূত মিশ্র মুলাত্তো এবং মেস্তিকো সম্প্রদায় কিন্তু আমাদের দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত, এঁরা দেশের

জীবন-প্রবাহ থেকে কখনো দূরে থাকেনি। বরঞ্চ অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা সংগ্রামে মুলাতো সম্প্রদায় বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পর্তুগালে সালাজার যখন দাপটে রাজত্ব করছেন তখন স্বাধীনতার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আফ্রিকার কূলে উপকূলে। অন্য সব ঔপনিবেশিক শক্তি নূতন পরিস্থিতি বুঝে আফ্রিকার রাজ্যপাট গুটিয়ে নেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আফ্রিকার সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য পর্তুগালের জনসাধারণের উপর বিরাট করভার চাপিয়ে দিল এবং শক্ত-সমর্থ যুবকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে লড়তে বাধ্য করল। একদশকের উপর রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রামে দেশের যুব-সাধারণ যেমন এর নিরর্থকতা বুঝতে পারল, তেমনি পর্তুগালের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। অন্য দিকে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম, গিনি-বিসাউ, অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে ক্রমেই জোরদার হতে থাকল'।

পর্তুগীজ আফ্রিকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী সালাজারী শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকল, আর অপর দিকে মুক্তি সংগ্রামীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটতে থাকল। সালাজারের এক পার্টির শাসন ক্রমেই জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে থাকল। ওখানকার সোস্যালিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দল দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে গোপনে দেশের ভেতরে সংগঠন গড়ে তুলেছিল, সুযোগ বুঝে তারাও রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়ে তুললো। এই অবস্থায় খোদ পর্তুগীজ সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সালাজারী শাসকদের দিন ফুরিয়ে গেলো। পর্তুগালে নাটকীয় ঘটনার মধ্যে শাসন ব্যবস্থা চলে এল বিপ্লবী সামরিক গোষ্ঠির হাতে। সেটা ঘটে ১৯৭৪-এর এপ্রিল মাসে। তারা নিষিদ্ধ দলগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমতার অংশীদার করে নেয়। এই পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরেই পর্তুগীজরা গিনি-বিসাউ এবং মোজাম্বিক থেকে তাদের শাসন বা উপনিবেশ গুটিয়ে নেয়। অ্যাঙ্গোলায় মুক্তি-সংগ্রামীদের তিনটি দলের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকায় পর্তুগীজরা কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে সেই নিয়ে মুস্কিলে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ দলের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে অ্যাঙ্গোলার শেষ গভর্ণর পর্তুগীজ পতাকা গুটিয়ে তার সৈন্যদল এবং কর্মচারীদের জাহাজে উঠিয়ে রওয়ানা দেন পর্তুগালের দিকে। এর পরেই শুরু হয়ে যায় অ্যাঙ্গোলায় গৃহযুদ্ধ।

অ্যাঙ্গোলার মুক্তি-সংগ্রামীরা প্রধানতঃ তিনটি দলে ছড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে সোবিয়েৎ-পন্থী পিপল্‌স্ মুভমেণ্ট ফর লিবারেসন অফ অ্যাঙ্গোলা বা এম-পি-এল-এ সব চাইতে শক্তিশালী সংগঠন। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই দলকে নিঃসঙ্কোচে সাহায্য করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি অ্যাঙ্গোলার প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ও-এ-ইউর মধ্যে তীব্র বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ঘটে। সোবিয়েৎ-পন্থী এম-পি-এল-এ এক তরফা একটি

সরকার গঠন করে অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়াণ্ডাতে ঘাঁটি গেড়ে বসে। আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র এম-পি-এল-এ সরকারকে স্বীকারও করে নেয়। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল—এফ-এল-এন-এ, এবং উনিটা মিলিতভাবে আরেকটি পাল্টা সরকার গঠন করে। পাল্টা সরকারও আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করে।

ও-এ-ইউর মধ্যে এ-নিয়ে ঝড় বয়ে যায়। দুটি প্রস্তাব ও-এ-ইউর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ এর সৃষ্টি করে। একটি প্রস্তাব হল এম-পি-এল-এ সরকারকে ও-এ-ইউ স্বীকৃতি দিক। অপর প্রস্তাব হল অ্যাঙ্গোলার তিনটি দল মিলিত সরকার গঠন করুক। ও-এ-ইউর সদস্য রাষ্ট্রেরা পরস্পর প্রস্তাব দুইটির পক্ষে ঠিক আধাআধি ভাবে ভাগ হয়ে যায়। ও-এ-ইউ অ্যাঙ্গোলার প্রশ্নে কোন মীমাংসা দিতে ব্যর্থ হলে, এম-পি-এল-এ সরকার সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে কিউবার সৈন্যবাহিনীকে তাদের পক্ষে গৃহযুদ্ধে নামিয়ে দেয়। ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এফ-এন-এল-এ-এবং উনিটা কোণঠাসা হয়ে অ্যাঙ্গোলার মূল ভূখণ্ড থেকে হটে যায়। ধীরে ধীরে ও-এ-ইউর সকল সদস্যরাষ্ট্র এম-পি-এল-এ সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। অ্যাঙ্গোলার রাজনীতি নির্ধারিত হয়ে যায় সোবিয়েৎ কম্যুনিষ্ট শক্তির অনুকূলে।

অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিক, এই দুই দেশে ভূতপূর্ব পর্তুগীজ কলোনী, কম্যুনিষ্ট রাজনীতির পক্ষে সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়ায় আফ্রিকার দক্ষিণে তিনটি শ্বেত-শাসিত দেশের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। অ্যাঙ্গোলার রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম এবং রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আফ্রিকার নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে সংঘর্ষের পথ দীর্ঘ হলে সোভিয়েৎ প্রভাব শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং, রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অবশিষ্ট পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছেন। বেন বেলার রণকৌশল অনুযায়ী এখন আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের পরবর্তী লক্ষ্য হল রোডেশিয়া বা জিম্বাবে।

আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের কাছে পরিচিত জিম্বাবেতে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশরা যখন একে একে উপনিবেশ গুটিয়ে নিচ্ছিল তখন জিম্বাবের শ্বেতকায় অধিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রোডেশিয়াকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীনদেশ বলে দাবি জানায়।

বারো বছর আগের সেই দিন থেকে রোডেশিয়া স্বাধীনদেশ কিন্তু সংখ্যাধিক্য কৃষ্ণাঙ্গদের নিজের দেশের শাসনব্যবস্থায় কোন অধিকার নেই। এখন রোডেশিয়াতে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৪ হাজার আর কৃষ্ণাঙ্গদের শক্তি হল ৬১ লক্ষ। বারো বছর ধরে কৃষ্ণাঙ্গ রোডেশিয়ানরা সংখ্যাধিক্যের শাসন অর্জন করতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ ইয়ান স্মিথ সরকারের হাতে শুধু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অ্যাঙ্গোলার মত রোডেশিয়াতেও একাধিক মুক্তি-সংগ্রামী দল আছে। আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্র-নেতারা তাদের মধ্যে ঐক্য আনার চেষ্টা করে সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার চারটি দলে তারা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দলের চাইতে চার নেতার নাম এখন বেশী পরিচিত। জসুয়া এন্‌কোমো এদের মধ্যে প্রবীণতম এবং জিম্বাবের স্বাধীনতা ও সংখ্যাধিক্য শাসন-আন্দোলনের শুরু থেকে প্রথম সারির নেতা। এন্‌কোমো এখন ৫৯ বছর বয়সী এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিলের একটি ভাগের সভাপতি। নরমপন্থী এন্‌কোমোর প্রতি সমর্থন রয়েছে গ্রামের মানুষের মধ্যে।

রেভারেণ্ড এন্‌ডাবান্‌ইনলি সিঠোল প্রায় এন্‌কোমোর সমপর্যায়ের নেতা ছিলেন কিন্তু সম্প্রতি তার দুর্ভাগ্য চলছে। ছাপান্ন বছর বয়সী সিঠোল এক সময় সব চাইতে সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামী দল জিম্বাবে আফ্রিকান ন্যাশানাল ইউনিয়ন বা জানু (Zanu) গঠন করেছিলেন।

তার এক সময়ের সহযোগী রবার্ট মুগাবে জানুর গেরিলা সেনাদের নিয়ে জিম্বাবে পিপল্‌স আর্মি বা জিম্বাবে গণবাহিনী গঠন করে সিঠোল-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। রোডেশিয়ার ভেতরেই ৩০০০ গেরিলা সৈন্য নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আরেকটি হিসাবে ৫০০০ থেকে ৮০০০ গেরিলা সৈন্য পূর্বসীমান্তের দেশে মোজাম্বিকের ঘাঁটিগুলিতে রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম জাম্বিয়ার ঘাঁটিগুলিতে রয়েছে ২,৫০০-এর মতো জিম্বাবে মুক্তিসেনা। সোবিয়েৎ গোষ্ঠির অস্ত্রবলে গেরিলারা সুসজ্জিত এবং শিক্ষিত। এদের মধ্যে মোজাম্বিক ঘাঁটিগুলিতে অবস্থিত গেরিলারা সব চাইতে মারাত্মক এবং বেপরোয়া। এদের একটি ১৮ জন সদস্যের হাই-কমাণ্ড আছে। হাই-কমাণ্ডের মধ্যে শুধু মুগাবের (৫১) নাম জানা যায়।

বিশপ আবেল মুজোরেবা ও ৫১ বছর বয়সী তার দল আফ্রিকান ন্যাশানাল কাউন্সিল শহর-গুলিতে খুবই শক্তিশালী এবং বরাবর সংখ্যাধিক্য শাসনের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে।

ইয়ান স্মিথের শ্বেতসরকার এতদিন রোডেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামী নেতাদের হয় কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, নয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেছেন। কিন্তু শ্বেতকায় শাসকদের অবস্থা যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে সেটা আর কেউ বুঝুক না বুঝুক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জার বুঝতে পেরেছিলেন। যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংখ্যাধিক্য কৃষ্ণবর্ণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়, তবে অ্যাঙ্গোলার চাইতেও মারাত্মক গৃহযুদ্ধ রোডেশিয়া সহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং কিসিঞ্জার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ফরস্টারের সাহায্যে রোডেশিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তর আলোচনার পথে নিয়ে এলেন। রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথকে। এর জন্য অবশ্য স্মিথের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অপর দিকে

কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের আলোচনাতে রাজি করানো হ'ল আফ্রিকার কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধানের হস্তক্ষেপেরর মাধ্যমে। রোডেশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আলোচনা চলছে বা চলবে তার মূল সুর হল সংখ্যাধিক্য কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু কি উপায়ে সেটা করা হবে এবং সংখ্যালঘু শ্বেতকায় অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ কি, বা তাদের নিরাপত্তাই বা কি, সেটা নিয়ে দরকষাকষি চলবে। কোন্ সময়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে সেই বিষয় নিয়ে বিরোধ স্বাভাবিক। শ্বেত-শাসকরা স্বভাবতই চাইবে দেরীতে এবং জটিল পথে ক্ষমতা হস্তান্তর হোক। সেক্ষেত্রে ওদের পক্ষে অনেকখানি ক্ষমতা করায়ত্ত রাখ সম্ভব। কিন্তু দেরী হলে সশস্ত্র সংগ্রামীরা শক্তিশালী হবে এবং তাদের যারা সমর্থন করবে তারা আরও প্রভাব বিস্তার করতে সুযোগ পাবে। এভাবেই সোভিয়েৎ প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থেকে যায়। মার্কিন রাজনীতি, আর যাই হোক, আফ্রিকাতে সোবিয়েৎ প্রভাব বৃদ্ধি চাইবে না।

শ্বেতকায় শক্তির প্রধান এবং সবচাইতে শক্তিশালী ঘাঁটি হল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু সেখানেও বিপুল সংখ্যাধিক্য রয়েছে আফ্রিকার আদিম কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায় অধিবাসীর সংখ্যা ৪৩ লক্ষ, আর কৃষ্ণাঙ্গদের জন সংখ্যা ১ কোটী ৮০ লক্ষ। তাছাড়া ২৪ লক্ষ মিশ্রবর্ণের এবং ৮ লক্ষ এশীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করে। তবে ৩০০ বছরের বেশীকাল ধরে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করে যাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তি-সংগ্রাম সব চাইতে প্রাচীন। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ এমনই যে, শ্বেত বনাম কৃষ্ণ সংগ্রামের শেষ অধ্যায় এখানেই স্থিরীকৃত হবে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এ-এন্-সি, প্যান্ আফ্রিকানিষ্ট কংগ্রেস বা পি-এ-সি এবং আফ্রিকান পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন অফ্ সাউথ আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তি সংগ্রামীদের তিনটি পরিচিত দল। এদের মধ্যে এ-এন্-সি সবচাইতে শক্তিশালী এবং ১৯১২ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত এদের নেতারা গান্ধী-অনুসৃত অহিংসপন্থায় স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকেই এদের মধ্যে একটি অংশ সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। এ-এন্-সি এখন নিষিদ্ধ দল এবং এদের মধ্যে যারা ধরা পড়েনি তারা বিদেশ থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

পি-এ-সি, দলটিও দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিষিদ্ধ দল এদের মধ্যে নানারকম ভাঙ্গন ও ধরেছে। কিন্তু ও-এ-ইউর অফ্রিকান লিবারেশন কমিটি পি-এ-সিকে বরাবর জোর সমর্থন দিয়ে এসেছে। ও-এ-ইউ এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে সরাসরি সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে অপারগ। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের বিদ্রোহ ঘটলে সেটা নিয়ে বিশ্বজনমতের দরবারে প্রচার অভিযান চালানো ও-এ-ইউর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রোডেশিয়া প্রশ্নের যতদিন না ফয়সালা হয়, ততদিন ও-এ-ইউ দক্ষিণ আফ্রিকার

শ্বেতকায় সরকারকে খুব একটা ঘাটাবে না বলেই মনে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা চাইছে ইতিমধ্যে উদ্ভূত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে তাদের নূতন কৌশল স্থির করে নিতে। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার বেশ কিছুদিনের সংঘর্ষবিহীন সময়। রোডেশিয়া নিয়ে যদি সংঘর্ষ ঘটে যায় তবে অ্যাঙ্গোলার ঘটনার মত বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, আফ্রিকার দক্ষিণে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উদয় হবে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা দেশটিও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে বাধ্য। এবং শ্বেতাঙ্গদের কোণঠাসা হবার সম্ভাবনা।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সংঘর্ষবিহীন সময়ের মধ্যে কয়েকটি মূল কাজ সেরে নিতে চায়। মূল কাজটির লক্ষ্য হল শ্বেতশাসনকে চিরস্থায়ী এবং নিরাপদ করে তোলা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের জন্য বর্ণ-বিদ্বেষী সরকার নয়টি হোমল্যাণ্ড সৃষ্টি করেছে। সব কালো মানুষকে কোন না কোন হোমল্যাণ্ডের নাগরিক হতে হবে। শ্বেতপ্রধান অঞ্চলে জীবিকা অর্জনের জন্য যেসব কালোমানুষ বসবাস করবে বা যাতায়াত করবে তাদের যোগ করতে হবে নিজ নিজ হোমল্যাণ্ডের পারমিট বা পাসপোর্ট। সুতরাং দরকার হলে বর্ণবিদ্বেষী সরকার খুশীমত যে কোন কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীকে বহিষ্কার করে দিতে পারবে এবং তাকে তার হোমল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ শ্বেতকায় অধিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মূল ভূখণ্ড দখল করে রাখবে। কৃষ্ণবর্ণদের জন্য থাকবে দেশের প্রান্তসীমায় কতকগুলো হোমল্যাণ্ড। অক্টোবর মাসে ট্রান্সকাই নামক হোমল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের প্রধান মন্ত্রী ফরষ্টার অবশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার আশ্রয় নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে কম প্রয়াসী নন। তার ধারণা যদি আফ্রিকা মহাদেশে আর বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ না বাধে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য হোমল্যাণ্ড গঠন সময়মতো সম্পূর্ণ হবে এবং এদের স্বাধীনতাও দিয়ে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকায় শাসন দখলের জন্য কৃষ্ণাঙ্গদের একতা বিপর্যস্ত হবে এবং টুকরো টুকরো অঞ্চলে এদের আনুগত্য বিভক্ত হয়ে যাবে।

আফ্রিকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যদি স্থায়ী রূপ ধারণ করে, তবে বিরাট কৃষ্ণাঙ্গ মহাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত সরকার একটা দাঁতাঁত বা সমঝোতায় আসতে পারবে বলে ফরষ্টার মনে করেন। তার ধারণা শান্তির পরিবেশকে বজায় রাখার ব্যাপারে কৃষ্ণ আফ্রিকার আগ্রহ কম থাকবে না। একথা মনে রেখে ফরষ্টার রোডেশিয়ার শ্বেত-সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। যাতে সেখানে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

আর সেই কথা মনে রেখেই তার শাসনাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা বা নামিবিয়াতে ১৯৭৮ সালের

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী হয়েছেন। নামিবিয়া ১৯২০ সাল থেকে জাতিপুঞ্জের ফরমান অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনাধীন। জাতিপুঞ্জের পরবর্তী সংস্থা রাষ্ট্রসংঘ কিন্তু আগেই বলেছে নামিবিয়াতে রাষ্ট্রসংঘের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যে খবরদারী করছে তার সমাপ্তি ঘটুক; ১৯৭৭ সালের ৩১শে আগষ্টের মধ্যে নামিবিয়কে স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

নামিবিয়াতে আটটি কৃষ্ণাঙ্গ জাত আছে আর আছে তিনটি মিশ্র জাত এবং শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী। কৃষ্ণবর্ণ ওভাম্বো জাতের কালো মানুষের সংখ্যাই জন বসতির ৪৬ শতাংশ। এই ওভাম্বো জনসমষ্টির নেতারা নামিবিয়াতে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে সাউথ-ওয়েষ্ট আফ্রিকা পিপল্‌স অর্গানিজসন বা সোয়ানোর (Swano) নেতৃত্বে। সোয়ানো আপোষহীন স্বাধীনতার জন্য প্রতিবেশী আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। উত্তরে অ্যাঙ্গোলা পর্তুগীজ শাসন-মুক্ত হওয়ায় সোয়ানোর আঘাত হানবার ক্ষমতা বেড়েই গেছে। সোয়ানোর নেতা সাম নুজোমা যদিও কোনো কম্যুনিষ্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত নন, তবু কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতা নিতে তার দ্বিধা থাকার কারণ নেই। উত্তরে অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেণ্ট নেতোর কম্যুনিষ্ট প্রীতি অজানা নয়। সুতরাং নুজোমা যে নেতোর সাহায্যে নামিবিয়াতে ভবিষ্যতে কিউবার সৈন্য নামাবেন না সে কথা বলা যায় না। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেবার আলোচনায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সোয়ানোকে শতহস্তে দূরে রেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেত প্রভুত্ব পাকা করতে ফরষ্টার সরকার আরেকটি হিসাব করেছেন। সেটা সাদা কালো আদমিদের সংখ্যানুপাতিক হার। সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকার ভূভাগে ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। এর মধ্যে ৬ কোটি ১০ লক্ষ লোক অবস্থান করে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলিতে। এদের মধ্যে আবার শ্বেতকায়-বাসীদের মোট জনসংখ্যা হল মাত্র ৫০ লক্ষ। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ৪৩ লক্ষ শ্বেতকায় অধিবাসীর বাস। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাতেই শ্বেত কলোনী-বাসীদের চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা পাকা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় ভূতপূর্ব পর্তুগীজ কলোনীগুলি এবং রোডেশিয়ার সমস্ত শ্বেতকায়রা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসিদের যদি নয়টি হোমল্যাণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে শ্বেতবর্ণ অধিবাসীদের রাজত্ব আরও পাকাপোক্ত হতে পারে। একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের ভবিষ্যৎ নিরাপদ বলে যদি মনে হয় হবে অন্যান্য মহাদেশ থেকে আরও শ্বেতবর্ণের লোক এদেশে এসে বসবাস করতে উৎসাহী হতে পারে। সেক্ষেত্রে কালোদের সঙ্গে সংখ্যায় পাল্লা দেওয়ার মত একটা অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতবর্ণবাসীরা যেটাকে সবচাইতে ভয় পায় তা হল সংঘর্ষের রাজনীতি এবং

রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। কারণ তাদের আশঙ্কা ৪৩ লক্ষ শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে একসঙ্গে ১ কোটি ৮০ লক্ষ কালো অধিবাসী, ২৪ লক্ষ মিশ্র বাসী এবং ৮ লক্ষ এশীয় হঠাৎ এক বর্ণবিরোধী উত্থানে সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় দাবানল জ্বালিয়ে দিতে পারে। শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘকালের আশঙ্কার দাবানলকেই এক কথায় বলা হয় 'আর্মাগেডন্'। সাউয়েটো সহরে সাম্প্রতিক শ্বেতবিরোধী সংঘর্ষ প্রমাণ করেছে আর্মাগেডন্ শ্বেতকায়দের কল্পনা-প্রসূত ভীতি মাত্র নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে আরেকটি কঠিন পরীক্ষা হবে। ইউরোপের শ্বেত বর্ণের মানুষেরা অন্যান্য মহাদেশে গিয়ে সেখানকার আদিবাসীদের হয় কোণঠাসা নয় নির্মূল করে দিয়ে নিজেরা বসতি স্থাপন করেছে (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল), একমাত্র এশিয়া তার ব্যতিক্রম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গরা ইতিহাসের চাকা ঘোরাতে বদ্ধপরিকর।

সারা বিশ্বে শ্বেতবর্ণের মানুষদের অনেকেই আজ রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেত প্রভুদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে শ্বেত প্রভুরা অনেক আগেই এক বর্ণের রাজত্ব নিষ্করুণভাবে কায়েম করলেও, ইউরোপের কোথাও অশ্বেতকায়রা আদিবাসীদের হটিয়ে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে উদ্যোগী হয়নি।

কিন্তু আজ অশ্বেতকায়দের জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বসবাস করবার জন্য তাদের অনেক নূতন জমি দরকার হবে। সুতরাং শুধু আফ্রিকা নয় অন্যান্য মহাদেশেও শ্বেত-অশ্বেত প্রশ্ন ভাবীযুগে বিশ্ব-রাজনীতিকে জটিল করে তুলবে বলেই মনে হয়।

শিলাজতুর সুবাস : সুমনা দাস

দশদিকে ক্রুর দৃষ্টি,
যদিও তা অস্বচ্ছ.
ছাইরঙা মেঘ, ধোঁয়াটে—
তবুও সন্ধ্যাবেলা জ্বলে ওঠে
আগুনের ফুলঝুরি।

বিবিক্ত নৈরাশ্যে শুধু
শিলাজতুর সুবাস,
এ শুধু কথা, শুধু
অর্থহীন প্রলাপ,
এর মায়াজালে তুমি
ধরা পড়ো না।

সমক্ষে মহাপ্রস্থানের পথ
তার আদি নেই, অন্ত নেই,
বুকের মাঝে দুরন্ত ঈগল,
অথচ ক্ষীণপ্রজ্ঞ আমি
সে পথে যাব কি কৌশলে?

সৌজন্য হাতিক গার্লস কলেজে কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত। (অ. সং)

কাহিনী

'ইন্ টিউন উইথ দ্য গ্রেস্'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু :

ভরসা করি ঈশ্বরের কৃপায় তুমি কুশলে আছ। আজ দুদিন হলো চণ্ডীগড়ে ফিরে এসেছি। গত কয়েকদিন থেকে আমার যে কি হয়েছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না—সব সময়েই দু'হাত জোড় করে কপালে রেখে কেবল বলে চলছি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

দিনে রাতে কতবার যে বলছি তার যেন গোণা-গুণতি নেই। এমনকি রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও সেই একই চিত্র। এতে আমার কোন ক্লান্তি নেই। বরঞ্চ কে যেন ধীরে ধীরে শান্তির বারি দেহ-মনে সিঞ্চিত করে আমার আত্মাকে আলোকিত করে বার বার তুলে ধরছে। সে আলোর রাজপথে কত যোগী, কত ঋষি, কত মহামানবের যে ভিড়, দেখে চোখ আপনি বুজে আসে। কেবল একটা উৎকণ্ঠা ডাইনে-বাঁয়ে মনের সামনে বেজে উঠে—পাছে এতে ছেদ পড়ে যায়। যদি আনন্দ উবে যায়। মনে মনে পরম দামী কম্বল দিয়ে আমি যেন মুখ ঢেকে রাখবার চেষ্টা করি, যাতে এ-আবৃত্তির আনন্দ পালিয়ে না যায়। এর শুরু—সেই সিমলা থেকে।

তুমি'ত সিমলায় একলাগাড়ে অনেকদিন ছিলে। তোমার চাকুরী-জীবনের শুরুত' সিমলায় এবং সিমলার অফুরাণ গল্প তোমার মুখে শুনেছি। সিমলা প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর রাডিয়ার্ড কিপলিঙের অজস্র উল্লেখ তোমার কাছেই আমি প্রথম শুনি—যদিও মেজাজ ও মননে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিপলিঙের তফাৎ আকাশ-পাতাল। তবুও সিমলার পরিপ্রেক্ষিতে অদ্ভুতভাবে তুমি ওদের মিলিয়ে দিতে। একটি দেবতাত্মা সনাতন হিমালয়, অন্যটি হিমালয়ের কোলে সাহেবলোগ রচিত হিলস্টেশনের প্রাকৃত লোকযাত্রা। একটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদ, অন্যটি খাঁটি ভাটিয়াল। দার্জিলিঙ্ নয়, সিমলাই তোমার প্রিয় এবং হিমালয়ের পটভূমিকায় ভারতীয় হিলস্টেশনের মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় রাণী সিমলা।

আমি দিন কয়েক হ'ল সেই সিমলা ঘুরে এসেছি। উঠেছিলাম সিমলা কালীবাড়িতে। সেখানে তিলধারণের জায়গা নেই। বাঙালী চিরকালই হুজুকে, সারা ভারতবর্ষ বেড়াতে তার জুড়ি মেলা ভার। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'-এর মত নিছক ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ, ভূ-ভারতে বাঙালী ছাড়া কেউ করে না।

আগাধিরাজ হিমালয়কে খুব কাছের থেকে

দেখবার আমার অনেক সুযোগ হয়েছে। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী আমি বার কয়েক ঘুরে এসেছি। গেছি অমরনাথ পশুপতিনাথেও। নৈনীতাল, রাণীখেত, আলমোড়াতে যে কতবার গেছি ডায়েরী না খুলে সে হিসেব দেওয়া কঠিন।

কুমায়ুন হিলসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন আমার গায়ে একটা ভ'ঘুরের কোট পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে কোট আজও খুলে রাখতে পারিনি। ঘুরে ফিরে আসছি ত আসছিই। আলমোড়ার বৈজনাথ মন্দিরে, রাণী খেতের কালিকা মন্দিরে কতবার যে গেছি তার ইয়ত্তা নেই। নৌসানীর ডাকবাংলায় দাঁড়িয়ে কতবার গভীর শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথের সেই উপনিষদের দিবা-অনুভূতির বাংলা তর্জমা আবৃত্তি করেছি, তার ঠিক নেই। আজও কে যেন নিত্য জাগ্রত বিস্ফারিত চৈতন্যের ভূমিতে মাঝে মাঝে শুনিয়ে যান :

একদা এ ভারতের কোন বনতলে/কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে। উচ্চারি উঠিলে উচ্চে "শোনো বিশ্বজন,/শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ/ দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে/মহান্তপুরুষ যিনি আধারের পারে/জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি,/মৃত্যুরে লাঙ্ঘিতে পারে, অন্য পথ নাহি।'

ভারতীয় কাব্য ও পুরাণে হিমালয়ের তুষার মুকুটিত উত্তুঙ্গ উপস্থিতি অনস্বীকার্য। ভাবলে বড় দুঃখ বোধ করি, যখন দেখি সমতলের অনেক মানুষ হিমালয় আর সমুদ্র না দেখেই জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। ভারতীয় হিলস্টেশনপুঞ্জ হিমালয়ের পটভূমিকায় গোঁজা রইলেও আমার কেমন বিদেশী, চাই কি ইওরোপীয়, বলে মনে হয়। যে কখনও কোন হিলস্টেশন দেখেনি তাকে বোঝানো মুশকিল, হিলস্টেশন কি? কিন্তু একটি হিলস্টেশন দেখলে অন্য অদেখা হিলস্টেশন আঁচ করতে পারা যায়। তবে রাঁচি বা শিলঙ-এর অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্য অদেখা হিলস্টেশনের সমীক্ষা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য শিলঙ সুন্দর, তবুও পূর্ণাবয়ব হিলস্টেশন নয়। সেখানে শুধু জল পড়ে, পাইনের পাতা নড়ে। ফগ নেই, বরফ নেই, নেই হিমালয়ের পবিত্র উপস্থিতি। তবে তোমার দেখা শেষ বৃটিশ আমলের সিমলা ও আজকের সিমলার তফাৎ—জন্মান্তরের তফাৎ। হপ্তাখানেক সিমলায় থেকে সিমলার নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না, অন্ততপক্ষে সিমলায় মাস দু'য়েক থাকতে হয়। অত সময় ও টাকা কোথায়? তবুও ঘুরে ঘুরে খুটিয়ে খুঁটিয়ে সিমলাকে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি। ছোট সিমলা থেকে বইলুগঞ্জ, জাকো পাহাড়, বেমলো তন্ন তন্ন করে দেখেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে সিমলায় গিয়ে আমার অহরহ মনে পড়ত। তবে সিমলা থেকে তাঁর দেখতার আমিও নারকেণ্ডায় বার কয়েক বেড়িয়ে এসেছি। কেবল মনে হ'ত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হঠাৎ তার হাতে আসা ঈশোপনিষদের সেই ছেঁড়া পাতার কথা, আর আমিও নারকেণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতবার যে তন্ময় চিত্তে আবৃত্তি করেছি :

"ঈশোবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

সমস্ত আমি যেন দেবতাত্মা হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতাম, সেই স্বর্গীয় সুষমা আজও যেন মনকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে, মনে কোন অশুভ চিন্তার ছায়া পড়তেই সেই স্বর্গীয় মন্ত্রোচ্চারণ বেজে উঠে আমাকে উজ্জীবিত করে, দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। দুঃখ এই যে ভুল করে মহর্ষির আত্মজীবনী সঙ্গে আনিনি। আনলে, মিলিয়ে দেখতুম। আরো হয়তো কত নতুন আলোর উৎস নতুন নতুন পোষাকে নতুন পথের নিশানা দিত। সত্যিই রম্যানি বীক্ষ্য, অর্থাৎ রমণীয়কে না দেখলে, সুন্দরের সান্নিধ্য না পেলে হিমালয়ের ধ্যান না করলে, মনে প্রাণে শুভ্র, শুচিতা, চাইকি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগেনা। দার্জিলিঙের টাইগার হিলে কোনও চমৎকার সকালে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই কাঞ্চনজঙ্ঘার নিরুপাধি রূপের ঝলকেই সমগ্র হিমালয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সিমলাও হিমালয়, হিমালয়ের মধ্যেই সিমলা তবুও হিমালয়কে দেখতে হলে আপারম্যালে দাঁড়িয়ে একদিকে বাজারের আকাশপারের চিরায়ত বরফের মুকুটপরা তিব্বতী গিরিমালার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সিমলার আবহাওয়া শুকনো খটখটে, দার্জিলিঙের মতন ড্যাম্পা নয়। অদেখা ইয়ারোর রূপ এক, দেখা ইয়ারোর রূপ আর এবং আবার-দেখা ইয়ারোর রূপ একেবারেই আলাদা। আইডিয়েলের সঙ্গে রিয়েলের ঘটকালি করে বিয়ে দেওয়া কঠিন; তবুও আইডিয়েল আর রিয়েলের রাজযোটকের মিলন না ঘটলে, সত্যকে সম্যকরূপে আপন করা যায় না। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে সিমলা থেকে কন্যাকুমারিকা, মণিপুর থেকে গুজরাট, ভারতের সর্বত্রই আমি ঘুরেছি। তীর্থ রজ গায়ে মেখেছি, তীর্থ সলিলে অবগাহন করেছি, স্মৃতির ঘট ভরেছি, মনে মনে প্রাচীন আর আধুনিক ভারতকে মেলাতে চেষ্টা করেছি এবং আজ মধ্য ঘাটে পৌঁছে আমি মনে করি দেশমাতৃকা শুধু মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ীও বটে। যে চোখে দেশমাতৃকা, হিমালয় ও গঙ্গাকে তিরিশ বছর আগে দেখেছি, আজ সেই চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে। হাজার দুঃখ ও দৈন্যের কাঁটালতার মধ্যেও আজ মনে হয় জন্মসূত্রে আমি ধন্য, কেননা আমার জন্ম ভারতে, এবং আমি ভারতীয়। একমাত্র আমাদেরই দেশে আবহমান কাল ধরে ঈশ্বরকে একটি সুবৃহৎ শিল্প পরিণত করা হয়েছে। আমাদের সব কিছুর শুরু ও সারা ঈশ্বরে। আমাদের মানবতাবাদও ঈশ্বরকে নিয়ে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নয়।

সিমলায় আমার এই প্রথম আসাও নয়, বছর দশেক পরে "বাহুড়ায়" আসা। কিন্তু এবারে বহুকাল পরে সিমলায়, চণ্ড গড়ের আহ্বান গরমের অতিষ্ঠ হয়ে শুধু স্নিগ্ধ নয়, সমস্ত মন প্রাণ নিঃসীম শান্তিতে ছেয়ে গেছে। দৈনন্দিন কৃপার ইংরেজী তর্জমা অসম্ভব, কৃপার রূপান্তর "গ্রেস" নয়, কেননা কৃপার সম্যক অর্থ গ্রেসে নেই। তবুও ইংরেজী ভাষান্তরে কৃপার তর্জমা "গ্রেসই"। 'কৃপার' ধ্বনি কিন্তু মোটেই শ্রুতিমধুকর নয়, তবে 'গ্রেসের' যুগপৎ বেদনা ও মাধুরী আমার কানে মধু ঢালে। আমার এবারের

সংক্ষিপ্ত সিমলা সফর জীবনদেবতা কোন অলক্ষ্য সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন—"ইন্ টিউন উইথ দ্য প্রেস" সেই নির্গলিতার্থ বোঝাবার জন্যই তোমাকে এই দীর্ঘ চিঠি।

আগেই জানিয়েছি সিমলা কালীবাড়িতে আমি উঠেছি, সে ত সোনার তরী, সেখানে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। দিল্লী—দিল্লী সমগ্র ভারতের বাঙালী যেন একই দিনে টিকিট কেটে এক গাড়ীতে চেপে নিদাঘ-সিমলার কালীবাড়িতে এসে ঢুকে পড়েছে। স্থানাভাবের জন্য লেডী প্রতিমা মিত্র হল খুলে দেওয়া হয়েছে। তবু স্থান সঙ্কুলান আর হয়না। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে লোক এসেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কালীবাড়ির ঘরে ঢুকতেই আশ্চর্যভাবে আমার দুই পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তারা আমাকে সাদরে কলরব করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। একটি ছোট দলের সঙ্গে আলাপ করিয়েও দিলেন। তাদের মধ্যে একটি যুবক বেশ ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারেন। রাতে খাবার পর অনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনি আমাদের শোনালেন। ঠিক হলো পরের দিন সন্ধ্যায় আবার গানের আসর বসবে। খুব তৃপ্ত আমেজে ঘুমোতে গেলুম। ঘুমের মধ্যেও যেন কে রাত ভর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কিন্তু অবিশ্বাস তো করতে পারিনে।

পরের দিন গানের আসর বসতেই বন্ধুপ্রবর বিজয় সিং অকস্মাৎ আমাকে কোন লেখা বা একটা নতুন গল্প শোনাবার অনুরোধ করে বসলেন, প্রথমটায় আমি কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। সামলে নিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগলো। গত কয়েক মাস নাগাদ আমার মাথায় একটা নতুন লেখার নক্সা ঘুর-ঘুর করছিল। কিছুটা কাগজে, কিছুটা মনে মনে একে বিনে সুতোয় গেঁথে রেখেছিলুম, টাইট্যাল-'দি আন্‌সন গুরু,' শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে। কি মনে হলো তাই কোন রকম করে গুছিয়ে এই ছোট্ট বাসরে পড়লুম। পড়তেই সবাই খুশী, আমি সবচেয়ে বেশী খুশী। আমি যেন খুশির এক নতুন দেশে পৌঁছে গেছি। সে দেশে আর আগে কখনও আসিনি। গোটা দেশ যেন ফুলের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তুলতুলে নরম অথচ মজবুতের রাশী। বিচিত্র রঙের দীপ্তি, শ্বেত আলোয় বিচ্ছুরিত। কত কথা, নতুনের কত ইঙ্গিত, গঙ্গার মতো বয়ে চলছে, আমরা সবাই যেন নিত্য স্নানে রত, আনন্দের ঝরণা তলায় ধ্যানমগ্ন, অনেক রাত অবধি সেদিন আমাদের গানের আসর জমজমাট ছিল।

নৈশ ভোজের পর ঘণ্টা তিনেক কালীবাড়ির খুল বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নির্মল আকাশ তারায় তারায় ভরা, কী ভালই যে লাগল তোমাকে বোঝাবার মতো আমার ভাষা নেই। সমতলের নিস্তব্ধ রাত্রি এক, কিন্তু হিমালয়ের নিভৃত রাত্রি, আর আকাশের নীচে দেবতারা যেন পিথাগোরাসের "মিউজিক অফ স্ফীয়ার," অন্তরীক্ষের গান শুনতে আসেন। আমাদের প্রাকৃত কানে সে গান এসে পৌঁছায়না। এই বৃহত্তর সত্তার আবেশেই

মানুষ হয় অন্তর্মুখ ও স্থিতধী জীবনের নতুন অর্থ তার সামনে ভেসে ওঠে। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় তা হলো শক্তিপাত। সময় হয়েছে, কে যেন এসে তোমায় ছুঁয়ে গেল। সে ছোঁয়ার পরশে আত্ম-চৈতন্য বিস্ফারিত হয়। হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" ক্রমে আমাদের নিয়ে পৌঁছায় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মন্ত্রে।

আমি ধ্যানস্তিমিত চোখে সেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, মনে হলো কারা যেন আমাকে বগল-দাবা করে স্প্রচুটল গ্র্যাভিটেশনের বাইরে তুলে নিয়ে চলছেন। নিয়ে যেন এল আমাকে রামধনুর দেশে। আকাশ জুড়ে যেন আশীর্বাদের ফুল ফুটে আছে। কারা যেন এসে ললাটে পরিয়ে দিল সে ফুলের ছোঁয়া। সে ছোঁয়ায় আমার অন্তর-বাহির সব ছাপিয়ে উঠলো এক নতুন আলো, রূপান্তরের আলো। আলোর স্পর্শে আত্মস্থ।

সে এক নতুন দেশ, অরূপ 'ইথরে' ছাওয়া। পুরানো সব মুছে গেল। কিছুই যেন মনে আসতে চায় না। ট্রান্সের অনেকক্ষণ পরে যেন দেখতে পেলুম আমাদের সেই গ্রামের স্কুলের মাঠের সীমানা ঘেঁসে পুব দিকের মাঝখানের সেই ছেলেবেলার আম গাছটাকে। সে গাছকে নিয়ে কত যে খেলেছি সে কেবল আমার মনের পাতায় লেখা রয়েছে, কে আর মনে রেখেছে সে সব কথা। কত রঙিন স্মৃতি আঁকা আছে মনের চত্বরে। সে গাছে দু-এক বছরই ফল ধরেছিল, তাও খুব কম। বোর্ডিংয়ের ছোট্ট ছেলেরা সুযোগ পেলেই ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে আম পাড়তে গিয়ে গাছটাকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। সে দুঃখে ঐ গাছটি আর বড় হ'লনা। পরে আমি ঢিল ছোঁড়া খেলায় আর আনন্দ পেতাম না। গাছের দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পেতাম। বন্ধুরা দল বেঁধে চলে গেলে, একা দাঁড়িয়ে আমি গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতুম, "ষাট ষাট"; গাছটি খুশি হতো। টুক করে গাছের গুঁড়ির দরজা খুলে ইশারা করে আমাকে ওদের দেশে নিয়ে যেত। আমগাছের বুড়ীমা চন্দনের টিপ পরিয়ে দিত। ফুলের আংটি পরাতো আঙুলে আর রূপোর থালা ভরে মিষ্টি আম খেতে দিতো। আর একবার সেখানে পৌঁছে দেখি আমগাছের বড় ছেলের সঙ্গে কাঁঠাল গাছের মেয়ের বিয়ে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী, কাঁচা হলুদ রং যেন ফেটে পড়ছে। কত যে গাছ সে নেমন্তন্নে এসেছে তার লেখাজোকা নেই। আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, কলা, পেপে, কমলা সবাই ঝুড়ি ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। সারা আকাশ জুড়ে রঙিন ছাতা উড়িয়ে তারা যেন শত শত বছরের আত্মীয়তার, সমঝোতার আলোয় ও আনন্দে ঝলমল।

ঘুর ফিরে কখন যে আবার স্কুল বোর্ডিং-এ ফিরে আসতুম আমার কিছুই যেন খেয়াল থাকতো না। সম্বিত ফিরতো যখন দেখতুম আমার মাষ্টার মশাই, রাধারমন পাল মহাশয় অবাক চোখে, আমার দিকে চেয়ে যেন কি খুঁজছেন। আজও যেন সে আনন্দের ছোঁপ গায়ে লেগে রয়েছে।

হঠাৎ গায়ে জলের ফোঁটা পড়তে চমকে গিয়ে

আবার যেন হিমালয়ের বুকে ফিরে এলাম। সিমলায় তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সমগ্র হিমালয় যেন আমাকে শান্তিবারি সিঞ্চন করে আশীর্বাদ করলেন। কার স্পর্শে যেন আমি উজ্জীবিত। নিঃসীম স্থিরতায় যেন আমি স্থির। হিমালয় আর আমার অদেখা গুরুর অভয় আর আশীষ যেন পেয়ে গেলুম।

পরের দিন সকালে সব বন্ধুরা দল বেঁধে কালকার ট্রেনে চাপল। স্টেশনে ওদের তুলে দিতে গিয়েছিলুম। ওরা চলে যেতে মনে হল গানের স্পেশ্যাল সিমলা স্টেশন ছেড়ে গেল। বর্ষণমুখর সিমলাতে আমি একাই যেন ঘুরি, নতুন সূচনার ভরসায়।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে দেখি, কালীবাড়ির আপিস ঘরে গুটি-তিন চারেক পরিবার ঠায় দাঁড়িয়ে, থাকবার জায়গা দূরের কথা, বসবার জায়গাও তাঁদের নেই। এঁদের মধ্যে একটি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের বিবাহিতা তরুণীর দিকে চোখ পড়ল, সঙ্গে দুটি ছেলে —একটি বছর তিন, অন্যটি বছর দুয়। গাজিয়াবাদ থেকে সিমলায় বেড়াতে এসেছেন। বৃষ্টিতে শপশপে ভেজা। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় তাকে প্রশংসা পত্র দেওয়া চলেনা। খুঁটিয়ে দেখলে অনেকেই-বিশেষ করে মহিলা-বিচারকের দল—তাঁকে রূপসী বলে স্বীকার নাও করতে পারেন। কিন্তু সমস্ত মুখে এমন একটা শ্রী ও পবিত্রতা, যে বিস্ময়ে-আনন্দে মেয়েটিকে দেখতে লাগলাম, ঈশ্বরের করুণাধারায় যেন সে স্নাত। দীর্ঘচ্ছন্দা মেয়েটির সুঠাম দেহ-যষ্টিমা, স্বাস্থ্য ও ঔজ্জ্বল্যে সিমলার সতেজ সবুজ পাইন-দ্রুম প্রতিম। কাছের ও দূরের থেকে জীবনে বহু মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এই অনন্যার ব্যক্তিস্বরূপ আর রূপের ভূমিকার একক প্রকাশ করতে হলে বলতে হয়: বৃক্ষ ইব স্তব্ধ। হাজার লোকের ভিড়-হাজার চোখের আলোয় সে তার দৈবত উপস্থিতির জন্য আকর্ষণ করবেই করবে। কোথায় যেন পড়েছি, মানুষের রূপ উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনা, যদি না তাতে দীপ্তি ও যৌন আবেদন থাকে। কিন্তু তরুণীর বাহরঙ্গের শ্রী ও সুষমার মধ্যে যা ছিল—তা নিছক দৈবত আকর্ষণ।

সকাল থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে অতিথিশালার যাকেই দেখেছে, তাকেই অনুরোধ করেছিল চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম: 'আপনি ক্যান্টিনে যান, চা-খাবার পাবেন।' তার কাছে শুনলাম, সে কিছুক্ষণ আগে ওখানে কিছুই পায়নি। আমি তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা ও খাবার জুটিয়ে দিলুম। সে খুশি হয়ে বিনীত ব্যঞ্জনায় বারে বারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে। মুখ তুলে চোখের দিকে তাকাতেই দেখি তার চোখে জল। আমার চোখ আপনিই বুজে এল। মনে হলো আমি দেবী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে পত্রাঞ্জলি নিবেদন করছি:

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'॥

মেয়েটি শপশপে ভিজে, কেন যেন বলে ফেললুম—যদি কিছু মনে না করেন আমার ঘরের বন্ধুরা প্রায় সবাই বাইরে বেরিয়ে গেছেন, আপনি

ইচ্ছে করলে ঘরে গিয়ে শাড়ী পালটিয়ে নিতে পারেন; পুরো যে ভিজে গেছেন! বলেই ঘরের চাবিটি তার হাতে গছিয়ে দিলুম। তিনি আয়ত-চোখের কোণ দিয়ে আমাকে একবার দেখেই, শাড়ী হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। পরে যখন বেরিয়ে এলেন সে এক অপরূপ রাজরাজেন্দ্রাণীর বেশ, মহামায়া। মনে হলো যেন এক পূর্ণ কুম্ভ। কাউকে বোঝাতে পারব কি না, কারো মনে দাগ কাটবে কিনা জানিনে কিন্তু আমি সেদিন শাড়ীতে জীবন দেখেছিলাম। একখানি শাড়ীতেও এমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে, কখনও ভাবিনি।

সম্বিৎ ফিরতে সেই তরুণীকে প্রশ্ন করলুম: উঠবেন কোথায়? সে হাত জোড় করে বললে "ঈশ্বর জানেন, কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছি।" বার বার সে আবৃত্তি করলে "কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছি"। বুঝতে কিন্তু দেরী হলোনা যে যার মুখ দেখেই সে বেরিয়ে থাকুক, তার ওপর তার কোন খেদ ও ক্ষোভ নেই। সে যেন খোলা চোখে নিশ্চল হয়ে ঈশ্বরকে অনুধ্যান ও স্মরণ করছে এবং তাঁর শরণ নিচ্ছে। এ জন্যেই তাকে আমার এত ভাললাগা। এই তরুণীর ঝাঁকি দর্শনের জন্যই যেন ঈশ্বর আমাকে সিমলায় নিয়ে এসেছেন।

ঠিক এই সময়ে তরুণীর স্বামী এসে খবর দিলেন, অনেক চেষ্টায় একটা হোটেল পাওয়া গেছে যার দৈনিক চার্জ সাকুল্যে একশ চল্লিশ টাকা। তরুণী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দু'টি ছেলের হাত ধরে মন্দিরের চত্বরে উঠে গেল। সঙ্কোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে তার পরিচয় নিতে বাধল। সে পিছন ফিরে চেয়ে আমায় দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল।

কালীঘাটে, কানপুরে বা মাদুরায় তার সঙ্গে ইহজীবনে আবার দেখা হবে মনে হয়না। যদি নাও হয় ক্ষতি নেই। সে আমার হৃদয়ে দিব্য স্পর্শমণি ছুঁইয়ে গেছে।

[৫৮২ পৃষ্ঠার পর]

অনুরোধ সরাসরি উপেক্ষা না করে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এ-বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য খতিয়ে দেখবার কথা বলে কার্যত তার অনুরোধ উপেক্ষা করেন। জগজীবন রাম ও তার সঙ্গী কংগ্রেসত্যাগী প্রাক্তন মন্ত্রীরা কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের পরিবর্তে সেখানে দ্রুত গোষ্ঠিশাসন ও ব্যক্তিশাসনের প্রসারে শঙ্কিত হয়ে কংগ্রেসে একনায়কতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি রোধ করবার জন্য অনন্যোপায় হয়ে কী ভাবে এই পথ বেছে নিয়েছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সঞ্জয় নামে পরিচিত প্রধানমন্ত্রীর পুত্র—শৈশব থেকে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পারিবারিক মহলে এবং ঘরের বাইরেও যার নাম ছিল সঞ্জীব—কংগ্রেসের কিম্বা সরকারের কোনো কর্মকর্তা না হয়েও যে ভাবে সংগঠনে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে ধ্বস নামিয়ে দিয়েছে, জগজীবন রাম ও তার কংগ্রেসত্যাগী সহকর্মীরা তাদের দীর্ঘ বিবৃতিতে তারই সর্বনাশা পরিণতির উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসসেবীরা কি দ্রুত তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছেন? ব্যক্তিবিশেষের মুরুব্বিয়ানার ('bossism') দরুণ সে-কথার উল্লেখ করেও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ-ছাড়া পরিষদীয় দলে মুখ্যমন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাদের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ, একতান্ত্রিকতার আর একটি মারাত্মক উপসর্গরূপে তারা উল্লেখ করেছেন। তাই তারা দাবী জানিয়েছেন: (১) মিসার প্রত্যাহার চাই, (২) জবরদস্তিমূলক আইনে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই, (৩) আপত্তিকর বিষয় প্রকাশক নিরোধ আইনের প্রত্যাহার চাই. (৪) পরিষদে আলোচিত বিবরণী সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সংক্রান্ত ফিরোজ গান্ধী-আইন বহাল চাই। (৫) ভোটারদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে এমনি ভাবে পুলিশ ও আধা-মিলিটারীদের নির্বাচনের সময় কাজে লাগানো চলবে না, (৬) কোনো ব্যক্তির স্বার্থে কিম্বা কোনো ব্যক্তির প্রচারের জন্য সরকারী প্রচার যন্ত্র (mass media) ব্যবহার করা চলবে না। জগজীবন রাম ও তার সহকর্মীরা তারপর উচ্চকণ্ঠে বলেছেন যে পরিষদীয় গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী, অবাধ ও স্বাধীনভাবে নির্বাচনে মত প্রকাশের জন্য এই নিম্নতম সর্তগুলি পালিত না হলে, তাদের পক্ষে নিজেদের কাজের পেছনে নৈতিকতা ও আইনানুগ সমর্থনের জন্য ভোটে অগ্রসর হওয়া চলে না। "Any party believing in parliamentary system of Government cannot possibly consider going to the electorate to seek legitimacy for itself without fulfilling these minimum conditions for a free expression of the popular verdict"

এই সর্তপূরণ না হ'লে ১৯ মাসের নীতিহীন শাসনকে আইনানুগ স্বীকৃতি বা 'legitimacy' দেওয়া হবে, জগজীবন রাম ও মুখদের বক্তব্য থেকে

এই সার কথাটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্যি জগজীবন রাম প্রমুখরা গত উনিশ মাস এই 'Illegitimacy' বা আইনবর্জিত নীতিহীনতার, শরিক ছিলেন। বিলম্বে হলেও তাদের ভুল ভেঙেছে। হয়তো জরুরী অবস্থার যন্ত্র-যাঁতাকল শিথিল না হ'লে তাদের কাজের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, তাদের পদত্যাগ ও তার কারণ কী সে-সম্বন্ধে হয়তো কেউ কোথাও জানবেনা, তারা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে পারতেন,—এই সব কারণেই তারা ১৯ মাসের 'Illegitimacy'র শরিকানা থেকে বেরিয়ে আসতে বিলম্ব করে থাকবেন।

প্রধান মন্ত্রীর চতুরতার সুনাম আছে, কিন্তু জগজীবন রামের মনোভাব ঘুণাক্ষরে তার কাণে এসে পৌঁছালো না,— তার পদত্যাগের পূর্ব মুহূর্তেও— এটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিপদের লালসঙ্কেত। তাঁর যে কয়েকটি গোয়েন্দাবাহিনী রয়েছে, সব ক'টিকেই জগজীবন রাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পেরেছেন, নিজের শিবিরের নিরন্ধ্র গোপনীয়তা দিয়ে। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী বোধহয় এই ধরণের আকস্মিকতার ধাক্কার সম্মুখীন হন নি।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নির্বাচনের সময় বাড়াইয়ে কি কি হিসাব-নিকাশ হ'তে পারে? অনেকেই বলে থাকেন দলের আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপ তাকে এই সময় নির্বাচনে বাধ্য করেছে। কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ক্রমেই একটার আকার ধারণ করছিলো। প্রধানমন্ত্রীও কিছুদিন যাবৎ বলছিলেন, তার শত্রু দলের ভেতর, বাইরে নয়। দলের ভেতরকার শত্রুদের যদি চিহ্নিত করতে পারতেন, তবে এতোদিনে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করে নিষ্কণ্টক হ'তেন। দলের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সেটা তেমন কোনো সুস্পষ্টরূপে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয় নাই। দলের মধ্যে শত্রুদের উপস্থিতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তার অনুচ্চকণ্ঠ বিরোধীদের মনে আশঙ্কা ও ভীতি জাগিয়ে রেখে কাজ হাসিল করে থাকতে চাইবেন। দলের শত্রুদের চাইতেও দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে বড়ো কথা আবার মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা। দেশের আর্থিক কাঠামোতে টাকার জোগান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্রলের দর বাড়লে আর এক দফা দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বাড়বে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিম্বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, যতই ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির তারিফ করে আসুন না কেন, ভারতীয় অর্থনীতি এক মারাত্মক স্ববিরোধিতার সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে। দেশের আর্থিক পরিস্থিতির ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এতো সামান্য, যে শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে ভারতবর্ষে মন্দা চলছে। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় বাড়ছে। শিল্পে ও কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিণামে দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক দারিদ্র্যের নিষ্পেষণায় দিন যাপন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী এই পরিস্থিতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধন করতে

পারে নাই। তার প্রমাণ বেকারত্বের অভিশাপ বাড়ছে বই কমছে না। বর্তমানে বেকারের সংখ্যা এককোটির ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বিশ দফা কর্মসূচী কোনো নূতন 'ম্যাজিক' নয়। একে বিভিন্ন সময়ে সরকারী প্রতিশ্রুতির একটি সার সঙ্কলন বলা যেতে পারে, যে কর্মসূচীগুলি রূপায়ণে সরকারী অবহেলা দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেন, একাজ করতে বহু পূর্বেই রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করতে পারতেন।

প্রধানমন্ত্রী শাসনের মেয়াদ ফুরাবার এক বছর পূর্বেই নির্বাচন চেয়েছেন কেন, সে প্রশ্ন বার বার উঠছে, আরও উঠবে। তাঁর উনিশ মাসের জবরদস্তির শাসনের পেছনে আইনের ও নৈতিকতার সমর্থন (legitimacy) তাঁর কাছে অমোঘ হয়ে উঠেছিলো; বিশেষভাবে এই উনিশ মাসের জবরদস্তির শাসনের বিরুদ্ধে মার্কিণী ও ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলির, ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের উচ্চ প্রশংসিত সমালোচনায় এবং পশ্চিমী সরকারগুলির বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ও প্রয়োজনবোধে এদের সমর্থন লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসে এদের চোখে 'legitimacy' অর্জন করা ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠছিল। অবশ্য জগজীবন রামের আকস্মিক পদত্যাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ১৯ মাসের সন্ত্রাসের শাসনের স্বরূপ জগজীবন রাম কর্তৃক উদ্ঘাটনের পর, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 'legitimacy' অর্জনের প্রশ্নটা অবান্তর হয়ে গেছে। ১৯৬৯ তে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডনের সময় জগজীবন রামের মত প্রবীণ কংগ্রেসী, প্রধানমন্ত্রীর পাশে না দাঁড়ালে, প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতায় আসীন থাকা দুঃসাধ্য হোতো। জগজীবন রাম সে সময় নব কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতম প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে দলীয় সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রীকে জয়ী করে, তার ক্ষমতার আসন পোক্ত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং জগজীবন রাম আকস্মিকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে তার সকল হিসাব-নিকাশই চুরমার করে দিয়েছেন।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় নির্বাচন কি শেষ পর্যন্ত হবে? কারণ জগজীবন রামের পদত্যাগের ফলে নির্বাচনের পূর্বেই কংগ্রেস বিপর্যয়কর অস্থৈর্যের মধ্যে আবর্তিত হবে। প্রধান মন্ত্রীর নিরাপদ আসন, জনতা পার্টি ও জগজীবন রামের "কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসীর" ঝাপটায় অনিবার্য-ভাবে ঝড়ের মুখে নোঙরহীন জাহাজের মত তোলপাড় হবে—প্রধান মন্ত্রী বিপদের সেই সঙ্কেত দেখে ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন "অস্থৈর্য ডেকে আনা হচ্ছে"। তার চাইতেও ভবিষ্যতের বিপজ্জনক সঙ্কেতপূর্ণ ভাষ্য প্রধান মন্ত্রীর মুখ থেকে বেরিয়েছে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তার বাড়ীতে সমবেত শ' পঁচেক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে: 'এই সময় যে কোনো অস্থৈর্য বাইরের বিপদকে ডেকে আনতে পারে'—"Any instability at this time could lead to external dangers"।

এ-কোন বিপদের লালসঙ্কেত? তবে কি নিকট-ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধের আশঙ্কাকে সামনে রেখে, পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে তাঁর শাসনের 'legitimacy' সপ্রমাণের দায়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন? সে-পরিস্থিতিতে যদি বা পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে, বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নূতন কার্টার-শাসনের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'তে হয়? অন্তত সেই শাসনের অনুকূল স্রোত ভারত-সরকারের দিকে প্রবহমান হয়, সে-ভাবনাও ত' প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনের জন্য সময় বাছাইয়ের পেছনে কাজ করে থাকতে পারে? আর গত ১৫ই জানুয়ারী ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল রায়না সেনাবাহিনীর প্যারেডে ঘোষণা করলেন: 'নায়েক থেকে লেফটেনান্ট-জেনারেল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সকল স্তরে নিয়োজিতদের দু'বছর চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো হ'ল।' নির্বাচন ঘোষণার তিনদিন পূর্বেকার এই ঘোষণার সঙ্গে নির্বাচনের কি কোন নিকট অথবা দূর সম্পর্ক রয়েছে? চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে ১৯৭৬-এর ১লা ডিসেম্বর থেকে। ১৫ই জানুয়ারীতে ঘোষণা কেন? নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে জনতা পার্টির গঠন, কংগ্রেস দলের পক্ষে শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিলো। জগজীবন রামের পদত্যাগ, দল গঠন ও ৫ই ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর নীতির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ বহু কংগ্রেসীকে নির্বাচনের পূর্বে দল-ছাড়া করবে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কী তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ-জগজীবনের একতান্ত্রিকতার অপ্রতিরোধ্য অভিযোগ এবং গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের মধ্যে শেষবারের মত নির্বাচকমণ্ডলীকে বাছাই করে নেবার আবেদনের দুর্বার আঘাতে টিঁকে থাকতে পারবেন? সেই সম্ভাব্য সঙ্কটমোচনের জন্য নিজ ক্ষমতার বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আঘাত সামলাবার জন্য নির্বাচন বন্ধ ক'রে দিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে সাময়িকভাবে শাসনভার তুলে নেবার আশঙ্কা কী একেবারে অমূলক হতে পারে?

১৯৭৯ সালে ব্রেজনেফ, ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের কোনো বিরোধী দলের ভারতে অনাবশ্যকতা ঘোষণার পর ধীরে ধীরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল কংগ্রেসের ছায়ায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেসের যুবসংগঠনের কর্মসূচী ও পরিচালনার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রচার করার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসুলভ তুচ্ছীভাব ঝেড়ে ফেলে সরাসরি তাদের আক্রমণ করেন, বোধহয় কংগ্রেসের যুবনেতা, তাঁর পুত্রের সমর্থনে। কিন্তু জগজীবন রামের কংগ্রেসত্যাগ, যেমন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে যুব-কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লোকসভার নির্বাচনে সংখ্যাধিক প্রার্থী হবার শখ মিটিয়ে কংগ্রেসে প্রধান-মন্ত্রীর পুত্রের বিরোধীদের শক্তিশালী করেছে এবং তাদের মনোনয়ন পেতে সাহায্য করেছে, তেমনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির দিকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনী সমঝৌতার হাত বাড়াতে বাধ্য করেছে।

ফলে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের দর বাড়িয়ে কংগ্রেসের হাত থেকে আশাতীত সংখ্যায় বেশী আসন আদায় করে নিয়েছে এবং এদের বর্ধিত আসন দেবার ফলে বঞ্চিত মনোনয়ন প্রার্থী কংগ্রেসীরা দলত্যাগ করে 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসীর' দিকে ঝুঁকছেন। সোভিয়েত রুশের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শাসনের অন্ধ ঘনিষ্ঠতা যতদিন বজায় থাকবে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ততোদিন ভারতীয় শাসকদলের দ্বিতীয়ের আসন দখল করে থাকবেন। আর কোনো আসন্ন-ভবিষ্যৎ, আন্তর্জাতিক সঙ্কটের টালমাটালে ভারতবর্ষ সোভিয়েত রুশের আরও সমীপবর্তী হলে, অস্ত্র ও যুদ্ধকালীন শিল্পসম্ভারের জন্য সোভিয়েৎ রুশের মুখাপেক্ষিতা ভারতীয় শাসকদের বৃদ্ধি পেলে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তার মাশুল আদায় করে নেবেন এবং হয়তো তাদের ভারত সরকারের ক্ষমতার আসনে আরোহণের দিবাস্বপ্ন বাস্তব রূপও বা নিতে পারে। আর যদি ভারতীয় শাসকদের, সোভিয়েত রুশের চাইতে কট্টর-শাসনের মার্কিণী রাষ্ট্রের সমীপবর্তী হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান অনুচরের সম্পর্ক বৈরীর সম্পর্কে পরিণত হবে। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সেদিনের জন্যও প্রস্তুতি রয়েছে। তবে এই নির্বাচনে জগজীবন রামের পদত্যাগ তাদের উপর কংগ্রেস দলের একান্ত নির্ভরশীলতা নিশ্ছিদ্র করে দিয়েছে। এখন যাতে দর কষাকষি করে কংগ্রেসের হাত থেকে কম বেশী আসন ছিনিয়ে আনা যায়, সেই প্রচেষ্টাতেই কম্যুনিষ্ট পার্টি নিয়োজিত। প্রধানমন্ত্রীর উনশ মাসের বেইআইনী শাসনের শরিক হবার মুল্যটাতো তাদের কংগ্রেস থেকে আদায় করে নিতে হবে! জগজীবন রাম সেই সুযোগ এনে দেওয়াও কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জগজীবন রামের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো রাজ্যে শ্রীরামের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নির্বাচনে অংশগ্রহণও তাদের বাধবে না। কংগ্রেস সম্পর্কে তাদের 'unity-struggle'-এর নীতি, অর্থাৎ 'ঐক্যও বটে, সংগ্রামও বটে'—এই দ্বৈতনীতির প্রতিক্রিয়া যাতে কংগ্রেসের স্বপক্ষে যায়, প্রধানমন্ত্রী সে-জন্য যে কোন পন্থা গ্রহণে বিমুখ হবেন না। সোভিয়েত রুশের সঙ্গে ভারত-সরকারের হৃদ্যসম্পর্ক ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা দলীয় স্বার্থ সাধনে কাজে লাগাবে, যদি না মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়!

প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই ক্ষমতাচ্যুত হবার জন্য নির্বাচনের ডাক দেন নাই। জগজীবন রামের পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলেও যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ করে নেবার পরিকল্পনা তার নেই, ক্ষমতায় থাকবার যে কোনো পন্থা অবলম্বন অতীতে প্রধানমন্ত্রী যে চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন, জীবনের এক মারাত্মক সন্ধিক্ষণে তার চাইতে বহুগুণ চতুরতার আশ্রয় নেবেন না, একথা কোনো মূর্খও বলবে না। এই রকম সঙ্কটে ক্ষমতায় আসীন থাকবার জন্য নির্লজ্জ একতান্ত্রিকতা বা ডিক্টেটরশিপের আশ্রয়ও তার কাছে অগ্রাহ্য হবে—হলফ করে সে-কথা কে বলবে?

তবে জনতা পার্টি ও 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী', একদিকে বলছেন এবার নির্বাচনে শেষবারের মত গণতন্ত্রের ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বাছাই করতে হবে, আবার আর একদিকে তারা, সারা ভারতবর্ষে যারা একতান্ত্রিক শক্তি, যাদের একতান্ত্রিক সন্ত্রাসের শাসনের দুর্বিসহ বোঝা জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের পথ করে দিয়েছিলো, তাদেরই সঙ্গে সমঝৌতা করছেন। পশ্চিম বঙ্গে সেই দৃশ্যই বর্তমানে সব চাইতে ক্রুদ্ধ দৃশ্য। ১৯৬৯-এর যুক্তফ্রন্টের শাসনে যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির হত্যা ও সন্ত্রাসে পশ্চিম বাংলাকে জর্জরিত করে বামপন্থী রাজনীতির মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছিলো, সেই মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের জোটের সঙ্গে জনতা পার্টি সাড়ম্বরে আসন ভাগাভাগির জোট পাকাচ্ছেন। অতঃপর, আর তাদের মুখে গণতন্ত্র ও একতন্ত্রের বিরুদ্ধে শেষ বাছাইয়ের সংগ্রামে আদর্শবাদের ছোঁয়াচ রইলো না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট ভাগাভাগি বন্ধ করার নামে এই ধরণের রাজনৈতিক অনৈতিকতা, জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসির আদর্শবাদে কালিমায় ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একতান্ত্রিকতাকেই শক্তিশালী করবে—'জনতা পার্টি' ও 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী', সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে চাইলে, এই ধরণের আদর্শ-বিচ্যুতি, তাদের মহৎ অভিপ্রায়ের পথে একান্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

সুনীল দাস

৭.২.৭৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs. 300·00
Half Page :	Rs. 150·00
Quarter Page :	Rs. 80·00

Special Position : 25% extra

Cover Page

Second Cover :	Rs. 350·00
Third Cover :	Rs 400·00
Fourth Cover :	Rs. 600·00

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.

Enlisted with DAVP for Central Govt. advertisements

Contact : Manager, Jayasree

Office : 20A Prince Golam Md. Road

Calcutta—26

Phone : 46-4116

২০৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	১৫ ০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১৭ ০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭ ০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫ ০০
Srimad-Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	15 00
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ন, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩ ০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যাঘাগে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭ ৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩ ৫০
বাংলার মনস্বী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩ ০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩ ০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪ ০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অষত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

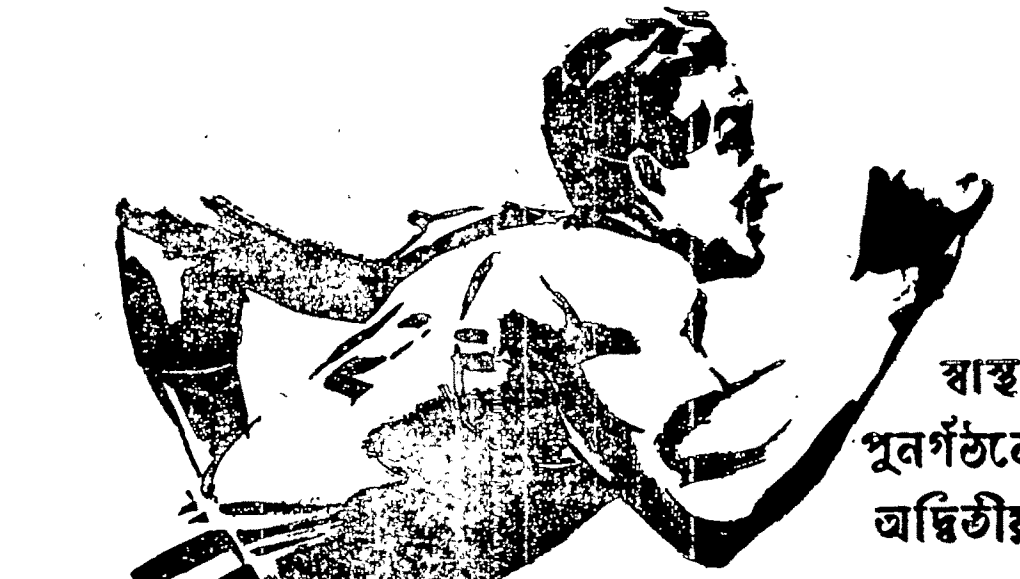

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (ক্যালি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রাতঃরাশ ও রাত্রির আহারের পর সেব্য।

SMM-2/66

৪১ বর্ষ । ফাল্গুন ১৩৮৩

জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা : লীলা রায়

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাঁধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে, মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ। মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন

(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

সামাজিক প্রগতি

গত আঠারো মাসে দেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে।

* ১৯৭৬-এর নভেম্বর শেষ হওয়ার আগে প্রায় একাত্তর লক্ষ পরিবারকে বাস্তু জমি দেওয়া হয় (এই ধরনের জমি পাওয়ার কথা মোট ১১৩,৬ লক্ষ পরিবারের)

* ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সব কটি রাজ্য আইন প্রণয়ন করেছে

* এগারোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পল্লী-ঋণ মকুব করার জন্য (ঋণ আদায়ের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমেত) আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে

* ৮৯,১৯৮ জন বেগারখাটা বা মুচলেকা মজুরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে

DAVP 76/885 (Bengali)

আপনি কি চমৎকার
নতুন বিশ্বস্ত ময়ী পলিসির
জন্য আপনার এল.আই.সি. এজেন্টের সঙ্গে
যোগাযোগ করেছেন?

'মানি ব্যাক' পলিসি

পলিসির মেয়াদ শেষ হবার আগেই নির্ধারিত সময় অন্তর, অন্যান্য চালু প্রকল্পের তুলনায় আরো তাড়াতাড়ি ও আরো বেশী নগদ টাকা পাবেন এবং মেয়াদ শেষের আগে মৃত্যু হলে সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

'ক্যাশ এণ্ড বোনাস' পলিসি

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কিস্তিতে থেকে টাকা পাবেন, এ বিষয়ে গ্যারান্টী থাকে—এবং সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকার ওপর লভ্যাংশ—এর সঙ্গে সারা জীবনের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

'প্রগ্রেসিভ প্রোটেক্সন' পলিসি

নির্ধারিত সময়ে আপনা হতেই পলিসির টাকার পরিমাণ বেড়ে চলে, নতুন প্রস্তাবপত্র দাখিলের বা ডাক্তারী পরীক্ষার দরকার হয় না।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে...
প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন ঘটে

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪১ বর্ষ ফাল্গুন ১৩৮৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৬৩৭
'আমি লহরে লহরে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলছি ।। চারণিক ৬৪৫

কবিতা

কয়েকটি কবিতা ।। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪৯

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি বাংলা কবিতা
কবিতার ইংরেজী রূপান্তর ।। ডঃ মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ৬৬৩
রকমারি গ্রেপ্তার ঃ অন্যকালে, অন্যদেশে ।।

প্রবন্ধ

আন্ পারসন ৬৬৮
সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ।।
পুলকেশ দে সরকার ৬৭৫

পুস্তক পরিচয়

My Uncle Netaji ৬৮৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক ঃ সুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশনের নতুন বই

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ ১৮৫৩-১৯৬৫

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

দাম ঃ ছয় টাকা

চাই ভাল লেখা—চাই নতুন লেখক

শক্তিশালী নতুন লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা প্রকাশের সুযোগ 'জয়শ্রী'তে সর্বাগ্রে।

প্রবন্ধ হবে তথ্যবহুল মননশীল আনুমানিক তিনহাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ শেষে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব লেখাই স্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা টাইপে এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবেন। রচনার মাথায় শব্দ সংখ্যা লিখে দেবেন ।। রচনার সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biodata) পাঠাতে ভুলবে না।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

সম্পাদক, জয়শ্রী

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

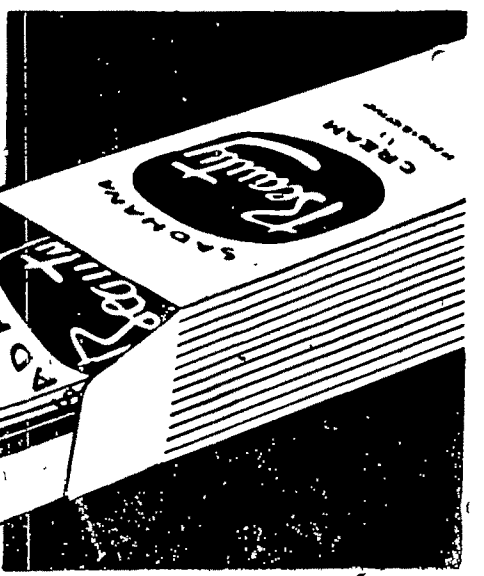

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

ভারতী

৪১ বর্ষ। একাদশ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

দিন আগত ঐ!

নির্বাচন এলো বলে। আর পাঁচদিন পরই ভারতবর্ষের লোকসভার ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে। ভোটের তারিখ স্থির হয়েছে আগামী, ১৬ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে মার্চ। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে আসনের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৪ ও ৮৫। এই দুই রাজ্যের ভোটগ্রহণ করা হবে ১৬, ১৮, ২০শে মার্চ। ১৬ই মার্চে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হবে: অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ওড়িষা, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, পশ্চিম বঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি, দিল্লী, গোয়া, দমন ও দিউ, লাক্ষাদ্বীপ এবং পণ্ডিচেরীতে। নাগাল্যাণ্ডে ভোট হবে ১৬ই ও ১৮ই মার্চ। ১৬ই ও ১৯শে মার্চ ভোট হবে আসাম, গুজরাত, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, মিজোরামে। এর মধ্যে সিকিমের ও অরুণাচল প্রদেশের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস-প্রার্থীর নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। ১৯শে মার্চ হবে কেরালায় ভোট গ্রহণ। কেরালায় লোকসভার ও বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০শে মার্চ সকালবেলা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়ে ২২শে মার্চের মধ্যে সে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। ১৯৭১-এর ২৭৪,০৯৪,৪১৩ সংখ্যক ভোটারের তুলনায় এবারকার ভোটার সংখ্যা ৩২০, ১৪১, ৫৭৩ জন। অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটার বেশী, শতকরা হিসাবে সেবারের চাইতে ১৬ ভাগ বেশী। তাও ভোটার তালিকায় হাজার হাজার পুরাণো ভোটারের নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখে মনে হবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যারা, তারা প্রতিপক্ষ ভোটারের নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পোলিং বুথ হয়েছিলো ৩৪২,৯৪৪টি আর এবার সে-সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৫০,০০০টি। ব্যয়ের মাত্রাও বাড়বে। ১৯৭১-এর লোকসভার

নির্বাচনে কেন্দ্রের ব্যয় হয়েছিলো ১১ কোটি টাকা। এবারকার অনুমান ১৫ কোটি টাকা।

এবার প্রার্থী সংখ্যা কত? ১৮৮০ জনেরও বেশী প্রার্থী নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী নাম প্রত্যাহার করে নেবার পর লোকসভায় ৫৪০টি আসনে প্রার্থী রয়েছেন ২৪৩০ জন (দুই জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন)। এদের সংখ্যা ১৯৭১-এর চাইতে ৩৩৪ জন কম, সে-বছর অবশ্যি লোকসভায় মোট আসন সংখ্যাও ছিল বর্তমানের ৫৪২টির চাইতে ২২টি কম। এবার সর্বভারতীয় দলের সংখ্যাও ১৯৭১-এর চাইতে কম। সেবার ছিল কংগ্রেস, সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র, এস, এস, পি,; পি, এস, পি; সি, পি, আই; সি. পি, আই (এম)। আর এবার কংগ্রেস, জনতা পার্টি, কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী; সি, পি, আই; সি, পি, আই (এম)। এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে আসন ভাগাভাগির ফলে কার্যত দুটি মোর্চা হয়েছে। কংগ্রেস ও তার সহযাত্রীরা একদিকে আর অপর দিকে জনতা পার্টি ও তার সহযাত্রীরা। অবশ্যি পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং তামিল নাড়ু ছাড়া অন্যত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সি, পি, আই-এর আসন নিয়ে রফা না হওয়ায় কার্যত দু'টি মোর্চা এবং একটি দলের মধ্যে নির্বাচন হবে। ১৯৭১-এ ডি, এম, কে এবং আকালী দল নিজেদের নামে নির্বাচনে নেমেছিলো, এবার এরা জনতা পার্টির ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে। মোট প্রার্থীর মধ্যে ১,১৫০ জন দলীয় প্রার্থী, অবশিষ্ট ১২৮০ জন নির্দল। কংগ্রেস মোট ৪৯২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, আর তার সহযাত্রীদের প্রার্থীর সংখ্যা ৫০। জনতা পার্টি ও তার সহযাত্রীরা প্রার্থী দিয়েছে ৫৩৮টি আসনে। লোকসভার ৫৪০টির আসনের মধ্যে ১০০টির বেশী আসনে জনতা পার্টির মোর্চার সঙ্গে কংগ্রেস ও তার সহ-যাত্রীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ১৯৭১-এ এই ধরণের প্রতিযোগিতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬টি। সে-সময় অবশ্যি লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল ৫২৩। ত্রিমুখী লড়াই এবার হবে ১১৪টি আসনে, ১৯৭১-এ ছিল ৯০ টিতে। ১০৫টি আসনে এবার চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, ১৯৭১-এর চাইতে একটি বেশী আসনে। অবশিষ্ট ২১৯টি আসনে ১,৪৭৫ জন প্রার্থী, প্রতিকেন্দ্রে পাঁচ অথবা তার বেশী সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা করবেন। এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা সব চাইতে বেশী হবে মহারাষ্ট্রে, ১৫টি আসনে, তারপরই মধ্য প্রদেশে ১১টিতে, কেরল, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে হবে প্রতিটিতে ৮টি আসনে, কর্ণাটক ও ওড়িষায় প্রতিটিতে ৮টি আসনে, বিহারে মাত্র একটি আসনে।

নির্বাচকদের মন যোগাবার জন্য এবার নানা ক্ষেত্রে নানা প্রলোভনের জাল বোনা হয়েছে। কৃষকদের, সাধারণ মানুষের বোঝা লাঘবের এই ঘোষণাগুলি আগেও করা যেতো। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে মোক্ষম মুহূর্তে এই ঘোষণাগুলি ভোটারদের

চিত্তজয়ের উদ্দেশ্যেই সরকার গ্রহণ করেছেন বলতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কাছে এগুলি সরকারী উপঢৌকনরূপেই নিঃসন্দেহে চিহ্নিত হবে। ঘটনাও তাই। এই উপঢৌকনগুলি: (১) নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের মিল-ছাড় মূল্য শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিল্পের পক্ষ থেকে কয়েক বছর যাবৎই এই দাবী রয়েছে। সরকার ৩১ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে ক্রেতাদের কাছে বস্ত্রের মূল্য অপরিবর্তিত রাখবেন।

(২) আমদানী করা তুলোর দাম হ্রাস করা হয়েছে। লক্ষ্য, তুলার দামে স্থিতি এলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস। ক্ষতির খেসারৎ সরকার বহন করবেন। বেঙ্গল দেশী তুলার রপ্তানি বন্ধই থাকবে।

(৩) সিমেন্টের চক্রমূল্য (rotation price) ১৭ টাকা টন হারে বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে এক্সাইস শুল্ক হ্রাস। ফলে কারখানাগুলির অতিরিক্ত আয়ের জন্য সরকার বছরে ৩০ কোটি টাকা খেসারত দেবে।

(৪) বোনাস আইন শিথিল করে, যে সব কোম্পানী লাভ করছে অথচ উদ্বৃত্ত দেখাতে পারছে না, তাদের প্রতিটি শ্রমিককে ১০০ টাকা বোনাস দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৫) সারের দাম টন প্রতি হ্রাস করা হয়েছে।

(৬) ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৭৫ কিলোমিটার নূতন পথ শহরে ও গ্রামে নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে।

(৭) অত্যাবশ্যক পণ্যের আন্তঃরাজ্যিক চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

(৮) দিল্লী প্রশাসন অননুমোদিত কলোনীগুলি বুলডোজার দিয়ে উৎখাত করার কাজ বন্ধ রেখে নির্বাচন ঘোষিত হবার পর সেগুলিকে পুনর্বিন্যাস ও স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ-ছাড়া এই সব এলাকায় ইলেকট্রিক সরবরাহের দায়িত্বও বিদ্যুৎ পরিবহন সংস্থা গ্রহণ করেছেন, এ-যাবৎ যা সম্ভব ছিলো না। নূতন দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল কমিটি দৈনিক বেতন ভোগীদের বেতন বাড়িয়েছে।

(৯) রাজস্থানে পরিবার পরিকল্পনার শিবিরগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্রোপচারে অসম্মত হবার অপরাধে যেসব সরকারী কর্মচারীদের দুই মাস যাবৎ বেতন বন্ধ রাখা হয়েছিলো, তাদের হঠাৎ সব বকেয়া বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বীজকরণের হিসাব দেওয়াও রাজস্থানের জনসংযোগ বিভাগ ত্রস্ততার সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছে।

১০) দিল্লী-জয়পুর দ্রুতগামী গোলাপী সিটি এক্সপ্রেস (Pink City Express) ৩১শে জানুয়ারী থেকে চালু হয়েছে। এই ঘটনাকেও নির্বাচনের উপঢৌকনরূপে জনসাধারণ দেখছেন।

১১) বিহারে ছোটনাগপুর উপজাতি এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১০ জন শ্রমিকের অধিক নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্ডিন্যান্সের বলে হরিজন ও আদিবাসীদের জন্য চাকুরী সংরক্ষিত হবে। আর

একটি সরকারী ঘোষণায় জানানো হয় যে, সরকারী চাকুরীর জন্য উর্দু-মাদ্রাসার সার্টিফিকেট যোগ্য প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। তারপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে স্কলারশিপ দেবার জন্য বিহার সরকার ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। এ-ছাড়া উপজাতি এলাকায় ছাত্রদের জন্য ৪টি হোস্টেল চালু হবার কথা ঘোষণা করা হয়।

১২) এরপর আরও আছে। কৃষকদের ধানের লেভির পরিমাণ কেরল সরকার ৯ই ফেব্রুয়ারী হ্রাস করেন। রেশন কার্ডে ইলেকশনের পূর্বে অতিরিক্ত চাল, চিনি, কেরোসিন, গম দেবার ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন।

১৩) মধ্যপ্রদেশ সরকার, সরকারী কর্মচারী, চালের ব্যবসায়ী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মন ভেজাবার জন্য নানা সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন।

১৪) বিহার সরকার কৃষকদের বিদ্যুৎ সারচার্জ থেকে রেহাই দিয়েছেন, এবং বিদ্যুৎ-রহিত সময়ের জন্য রিবেট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। ১৯৭৪-এ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘটকালীন বেতন মঞ্জুর করেছেন, কৃষকদের ঋণ পরিশোধের মেয়াদ তিন মাস বৃদ্ধি করেছেন এবং এই বর্ধিত সময়ের জন্য ঋণের ওপর সুদ মকুব করে দিয়েছেন।

১৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাসকদলের পক্ষে বিরূপ নির্বাচন কেন্দ্রে, চারটি যৌথ-সম্ভাব্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান মঞ্জুর করেছেন। কোল ইণ্ডিয়া কয়লা-খাদের শ্রমিকদের জন্য একটি বোনাস পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, যার কাঠামো এখনও অনিশ্চিত। দার্জিলিং, মেদিনীপুর ও অন্যান্য কয়েকটি পৌরসভার জন্য নানা পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৬) হিমাচল প্রদেশে সরকারী কর্মচারীদের জন্য ঋণ, জমি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য অগ্রিমের বিধি-নিষেধ শিথিল করা হয়েছে এবং নির্বীজকরণ না করার জন্য বঞ্চনার হুকুমনামা অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হয়েছে।

১৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদের জন্য বাড়ীভাড়ার ভাতা ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে মূল বেতনের শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগে বৃদ্ধি করেছেন, এই ভাতার ঊর্ধ্বতম সীমা ১৫ টাকা। চিকিৎসা ভাতাও মাসে ৮.৩৫ টাকা থেকে ১৬.৭০ টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী মহার্ঘ ভাতা বাড়াবার প্রশ্নটি আগামী আর্থিক বছরে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৮) উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯টি বড়ো শহরে স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য বাড়ীভাড়া মঞ্জুর করেন। এ-ছাড়া চামড়ার কারখানায় নিযুক্ত দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের ন্যূনতম বেতনের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯) হিমাচল প্রদেশ সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারী জানান যে তপশিলী জাতি ও উপজাতির মধ্যে যারা উচ্চবর্ণের হাতে দৈহিক নিগ্রহ ভোগ করেছেন, তাদের ত্রাণের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় ২০০০ টাকা দেওয়া হবে।

২০) অনগ্রসর জাতির জন্য নিযুক্ত হাভানুর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী চাকুরীর শতকরা ৩২ ভাগ সংরক্ষণের পরিবর্তে, কর্ণাটক সরকার শতকরা ৪০ ভাগ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। মুসলমানদের পরবর্তী দুই পুরুষের, ক্রিশ্চান ধর্মগ্রহণকারীদেরও অনগ্রসরদের মধ্যে গণ্য করা হবে। কর্ণাটকে এবং হায়দারাবাদে ছোটখাটো আরও সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে—সবই ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে।

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, নির্বাচনী উত্তেজনা ততো বেশী বাড়ছে। জনতা পার্টির প্রথম সারির নেতাদের এবং জগজীবন রামের সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কল্পনাতীত জনসমাগম হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সভা-সমিতিতেও ভিড় হচ্ছে, তবে কোনো কোনো এলাকার সভায় ভিড়ও ভাল জমেনি। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের সভায় ভিড় না বলে বলতে হয় লক্ষ লক্ষ শ্রোতা-সমাগম হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় নরম-গরম সুর রয়েছে, কোথাও কোথাও মনে হয়, তার বক্তৃতার তাল কেটে গেলো। যেমন ১৯শে ফেব্রুয়ারী কাঁথির জনসভায় বললেন: 'Alliance only to encircle and stab me'—'আমাকে ঘিরে ফেলে ছুরি মারবার জন্যই জোট'। তার পূর্বে দিল্লীতে ৯ই ফেব্রুয়ারী পুত্রের সমর্থনে বললেন আমরা 'জনতার সেবক' এবং 'আমাদের পরিবারের ত্যাগ' অতুলনীয়। এই মন্তব্য ক'রে হাস্যাস্পদও হয়েছেন। আবার বলেছেন 'জনতার রায় মাথা পেতে নেবো', 'বিরোধীরা সরকার গঠন করলে সহায়ক হস্ত প্রসারিত করবো'। এসব বলার পরও প্রধানমন্ত্রী বলছেন নির্বাচনে মীমাংসা হবে স্থিতি চাই, না বিশৃঙ্খলা চাই: 'stability or Chaos'। অর্থাৎ কংগ্রেস স্থিতিশীলতা এনেছে, আর বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর শাসন উৎসাদিত করে বিশৃঙ্খলা আনতে চাইছে। আরও উদ্ভট যুক্তিহীন কথাও প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেছে। তার মতে জরুরী অবস্থা শিথিল করবার পরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ জরুরী অবস্থা শিথিল হয়েছে ১৯৭৭ ১৮ই জানুয়ারীর পর থেকে ক্রমপর্যায়ে, আর দ্রব্য-মূল্যের পাইকারী সূচক ক্রমবর্ধমান ১৯৭৬-এর মার্চ থেকে। আসলে গোটা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে হিন্দিভাষী এলাকাতে প্রধানমন্ত্রীর শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে প্রধান-মন্ত্রী খেই হারিয়ে যুক্তির পারম্পর্যও বজায় রাখতে পারছেন না।

অপরপক্ষে বিরোধীদের নেতারা ধীরভাবে এবং বলিষ্ঠকণ্ঠে জাতীয় জীবনে ১৯ মাসের দুঃস্বপ্ন একের পর এক বিবৃত করে যাচ্ছেন। তাঁরা এই নির্বাচনকে নিয়েছেন কঠোর পরীক্ষারূপে—দেশে গণতন্ত্র থাকবে, না স্বৈরতন্ত্রের নিগ্রহে গণতন্ত্র বিদায় নেবে। তাই তাদের চোখে এ-সংগ্রাম ১৯ মাসের হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। জনতা দল বলছেন—রুটি নিশ্চয়ই চাই, সেই সঙ্গে স্বাধীনতাও ষোলআনা চাই। শাসক দল রুটির প্রলোভন দিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন। অথচ রুটিরও দেখা নেই। এই

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তর ভারতে স্বতস্ফূর্ত জন-অভ্যুত্থানের ঢেউ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা সারা ভারতে ঘুরছেন তাদের দৃঢ়মত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহারের ১৬২টি (১৩+১০+৮৫+৫৩ =১৬২) আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪০টা আসনও পাবে কি না সন্দেহ। এ-ছাড়া ইন্দিরা-বিরোধী ঝড় মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস শিবিরে কাঁপুনি ধরিয়েছে, হিমাচল প্রদেশ, অন্ধ্র ও আসামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং কর্ণাটকেও বিপর্যয় ঘটবে। সব মিলিয়ে বিরোধীদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনিবার্যতা দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন কংগ্রেসী-বিদ্রোহী দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে; তাদের অনেকেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া বিরোধীদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের ভীতিপ্রদর্শণ, আক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযোগের মাত্রাও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসীরাও অবশ্যি বিরোধীদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তবে কংগ্রেসীদের অপকীর্তি দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থীকে গুরুতররূপে আহত করবার পর আর ঢেকে রাখা চলবে না। গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন বা ব্যক্তি জীবনে জোরজবরদস্তি প্রয়োগে ক্ষমতাবানরা বাধা পেয়ে ক্ষমতাচ্যুতির আশঙ্কা দেখলেই তারা আরও জোরজুলুম সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরা সে-পথই সমবেতভাবে বেছে নিলেন কি না তা আর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। আর পশ্চিমবঙ্গে যদি কংগ্রেসীদের সেই পরিণতি হয়, উত্তর ভারতের জনতার ঝড়ের মুখে সেখানকার কংগ্রেসী শক্তি কোন্ পথ নেয়, সেটাও ভাববার কথা। সি, পি, আই (এম)-রাও এই সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ তুলছেন। দুঃখের বিষয় এই যে ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় আরূঢ় থেকে সেদিন তারা জুলুম-সন্ত্রাসের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের জীবনে। তারা সেদিন ভাবেন নি নেমেসিস্—nemesis—এই ভাবেই একদিন নেমে এসে তাদের যেমন আচ্ছন্ন করবে, সমগ্র রাজ্যের জনজীবনকেও রাহু-কবলিত করবে।

এবার লোকসভার ৫৪২টি আসনের মধ্যে দুই জন কংগ্রেস প্রার্থী বিনা বাধায় নির্বাচিত হয়েছেন, এ-ছাড়া আরও ৪৯০ জন বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গে, কেরলে এবং তামিলনাড়ুতে সি, পি, আইকে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যথাক্রমে ৮, ৯ ও ৩ টি আসন ছেড়ে দিয়েছেন এবং আন্না-ডি, এম কের দলকে তামিল নাড়ুতে ২০টি আসন ছেড়ে দিয়েছেন। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জনতা পার্টি ৩৯১ আসনে, কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী ৪৫টি আসনে, সি, পি, আই (এম) পশ্চিম বঙ্গে ২১টি আসনে এবং তামিল নাড়ুতে ডি, এম, কে ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ-ছাড়া আকালী দল, রিপাবলিকান পার্টি ও অফ ইণ্ডিয়া, পশ্চিম বঙ্গে সি, পি, আই (এম) মোর্চ্চার

অন্যান্য দল সব মিলিয়ে প্রায় ৫৩৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

জনতা পার্টি অন্ধ্রের ৪২টি আসনের ৩৬ টিতে, আসামের ১৪টি আসনের ১১টিতে, বিহারের ৫৪টি আসানের ৪৫ টিতে, গুজরাতের ২৬টির ২৫টিতে, হরিয়ানার ১০টির ১০টিতে, হিমাচল প্রদেশের ৪টির ৪টিতে, জম্মু ও কাশ্মীরের ৬টির ২টিতে, কর্ণাটকের ২৮টির ২৭টিতে, কেরলের ২০টির ৩টিতে, মধ্যপ্রদেশের ৪০টির ৩৯টিতে, মহারাষ্ট্রে ৪৮টির ৩১টিতে, মণিপুরের ২টির ২ টিতেই, ওড়িষার ২১টির ১৮টিতে, পাঞ্জাবের ১৩টির ৩টিতে, রাজস্থানের ২৫টির ২৫টিতে, তামিল নাড়ুর ৩৯টির ১৭টিতে, উত্তর প্রদেশের ৮৫টির ৭১টিতে, চণ্ডীগড়ের ১টির ১টিতে, দাদরা ও নগর হাভেলীর ১টির ১টিতে, দিল্লীর ৭টির ৭টিতে, গোয়া, দমন, দিউর ২টির ২টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, দিল্লীর আসনগুলিতে জনতা পার্টি এবং তার সহযোগী কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই রাজ্যগুলির মোট আসন সংখ্যা (৮৫+৫৪+১০+১৩+৪০+২৫+২৮+৭) ২৬২। অন্ধ্র, আসাম, মহারাষ্ট্র, ওড়িষার (৪২+১৪+৪৮+২১) ১২৫টি আসনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে বলে মনে হয়। যদিও এই রাজ্যগুলিতেও জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী ভাল ভোট পাবে, তামিলনাড়ুতে ডি, এম, কে এবং আন্না ডি, এম, কের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এবং ডি, এম, কের সমর্থনে তামিল নাড়ুতে যেমন জনতা পার্টি মোট ৩৯টি আসনের মধ্যে ১৭টিতে প্রার্থী দিয়ে কিছু আসন পাবে তেমনি কংগ্রেসও আন্না ডি, এম, কের সহায়তায় ১৫টি আসনে প্রতিযোগিতা করে কিছু আসন পাবে। মনে হয় কেন্দ্রীয় অর্থনীতি সুব্রহ্মনিয়ম একটি নিরাপদ আসনে দাঁড়িয়ে জয় লাভ করবেন। তেমনি বোম্বাই শহরের ছয়টি আসনেই কংগ্রেস বিপন্ন। বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী গোখলে, বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল ভাণ্ডারে, এদের জয়ের সম্ভাবনা ক্রমশই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। মহারাষ্ট্রের সমাজবাদী নেত্রী মৃণাল গোরের জয় সুনিশ্চিত বলা যেতে পারে। তেমনি দিল্লীর ৭টি আসনের মধ্যে ৭টিতে জনতা পার্টির প্রবাহ ঝড় তুলে দিয়েছে। মনে হয় এই কয়টি আসনই জনতা পার্টির দখলে চলে আসবে। কেরলে হিন্দুস্থান টাইম-এর প্রাক্তন সম্পাদক বি, ভার্গিস সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য কেরলের মাভেলিকারায় নির্দল প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে প্রচুর জন-সমর্থন পাচ্ছেন। ভার্গিস একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকরূপে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং এক সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রেস এডভাই-সারের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভার্গিসের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করে তহবিল পূর্ণ হবার পর সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এই ঘটনাটি সাংবাদিক মহলে এবং হিন্দুস্থানটাইমস থেকে তাকে অপসারণের সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। ভার্গিসের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন কংগ্রেস প্রার্থী।

পশ্চিমবঙ্গেও জনতা দলের প্রতি সমর্থন ক্রমবর্ধমান দেখা যায়। কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসীর প্রার্থীদের প্রতিও অনুকূল হাওয়া বইছে। সি, পি, আই সব ক'টি আসনেই বিপাকে পড়েছে। সি, পি, আই (এম)-এর সাংগঠনিক শক্তি তাদের বড়ো ভরসা। এ-যাবৎ তারা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়ে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। জনতা পার্টির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির অনুকূল হাওয়ায় সি, পি, আই (এম) দ্রুত এগিয়ে এসেছে। জনতা পার্টির, সি, পি, আই (এম)-এর উপর একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য জনতা পার্টিকে ভবিষ্যতে বিপাকে পড়তে হবে কি না, সেটাও তাদের ভাবতে হবে। কংগ্রেস, পশ্চিম বাংলাও জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসির ঝড়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সেই বিপদ মুক্তির জন্য তারা ১৯৬৯ সালে জনতা পার্টির বোঝাপড়ার শরিক সি, পি, আই (এম)-এর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের শাসনের বিভীষিকার দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঝড় সামলাবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই ঝড় সামলে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, যদি নির্বাচনের দিন অবাধে ভোটদানে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয়, যেমন হয়েছিলো ১৯৭২ সালে। জনতার পার্টির শেষ মুহূর্তের প্রচারের অন্তিম লক্ষ্য লোকসভায় শুধু সাদা-মাটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা; আর প্রধান মন্ত্রী ঝড়ের বেগে শেষ কয়দিন ছুটোছুটি ক'রে সেই দুঃস্বপ্ন থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করছেন। কংগ্রেসের প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে নির্বাচনের পর মারাত্মক সংখ্যা-লঘিষ্ঠতায় পরিণত হতে পারে, প্রধানমন্ত্রী কী আর সেই বিপদ সম্পর্কে সচেতন নন?

গণ-অভ্যুত্থানের এতো গভীরতা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও ভোটের দিন, ভোটের বাক্সে দ্বিধাহীনভাবে, সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভোটপত্র ফেলতে হবে—জনতার ঝড়ের এটাই দ্ব্যর্থহীন সঙ্কেত। অন্যথায় ঝড় শুধু স্বৈরতন্ত্রের গোড়ায় ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে মাত্র। ভারতবর্ষে যুগপরিবর্তনের সূচনা দিগন্তে নিঃসংশয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে, সে-দিক থেকে ভোটের দিনগুলিই একেবারে শেষ কথা নয়। তারপরও অনেক সংগ্রাম, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক ত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণ অপেক্ষা করবে। আর ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লবের তূর্যধ্বনি নির্বাচনে বিরোধীদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে ওঙ্কারিত হলেও জনসাধারণের কাছে আরও দুর্গমের দুর্বার পথ বেয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান আসবে। নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষে জনতার জয় সে পথের প্রদীপ্ত নিশানা দেবে, এই প্রত্যয় নিয়েই ভারতবর্ষে শৃঙ্খল-মোচনের মিছিল নির্বাচনের পরও আহ্বান জানাবে। ১৭ই মার্চ, ১৯৭৭

নির্মলচন্দ্র ঘোষের লোকান্তর

'জয়শ্রীর' সুহৃদ, নেতাজীর অনুগামী এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন নেতা নির্মলচন্দ্র ঘোষ আটষট্টি বৎসর বয়সে কিছুকাল রোগভোগের পর গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর বালীগঞ্জ গার্ডেনস-এর বাড়ীতে লোকান্তরিত হন। নির্মলবাবু ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে এবং তার পরও কারাবরণ করেন। শেষের কয়েক বছর তিনি তাঁর চার্টার্ড একাউন্টেটের পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার এবং জয়শ্রীর হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর অমায়িক প্রকৃতির জন্য দক্ষিণ ক'লকাতার সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক শ্রাদ্ধ বাসরে স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাঁর স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, তিনকন্যা, পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

২০৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'আমি লহরে লহরে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলছি'

চারণিক

প্রজাতন্ত্র দিবস, দেশের রাজধানীতে উৎসবের ধুম পড়েছে। সে সময় পার্বত্য এক নির্জন পল্লীতে চারণের ভিন্‌দেশী মহাকাল-অনুগত ভক্তদের সঙ্গে দিন কাটছিল। পূর্বদিন রাত্রে মহাকাল তেরঙ্গা পতাকা পাঠালেন, নির্দেশ এলো পতাকা উত্তোলন করতে হবে, উত্তোলনের মুহূর্ত্ত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং অবনমিত করতে হবে সূর্যাস্তের সময়। প্রত্যুষে চারণ গাইল 'বন্দেমাতরম্' গান। মহাকাল তাঁর কণ্ঠ মেলালেন, এক বিচিত্র তরঙ্গে নতুন দিনের আবহ সৃষ্টি হল।

চারণের মনে পড়ে গেল একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবরণ—বাঙ্গলারই এক উদাসী মাতৃসাধক এক রৌদ্র উজ্জ্বল দুপুরে নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিবিষ্ট মনে শুয়েছিলেন, ভেসে যাওয়া মেঘের মত একের পর এক দৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল, উদাসী মাতৃসাধকের যে দৃশ্যের সঙ্গে ভাবনার কোনও খেই ছিল না; তাই বিস্ময়কর ঠেকেছিল। অথচ এমন একটি দৃশ্য যা মনকে আন্দোলিত ক'রে, সমগ্র চেতনায় শিহরণ জাগায় আর সমসাময়িকতার সঙ্গে যার সুদূরপ্রসারী সম্বন্ধ রয়েছে। মাতৃসাধক দেখলেন—'নীল আকাশে অনেকগুলি পাতাকাহীন দণ্ডের আনাগোনা, ক্রমে দণ্ডগুলি তেরঙ্গা পতাকায় সারা আকাশ ছেয়ে ফেললো, আর সেই পতাকার ঢেউ থেকে ভেসে এল এক বিরাট ছায়া; ছায়া নিকটবর্ত্তী হলে এক অতি পরিচিত, একান্ত আপন ও বহু আকাঙ্খিত মহানিষ্ক্রান্ত সন্ন্যাসী যোদ্ধার কায়ায় রূপান্তরিত হ'ল। মুহূর্ত্তে কয়েকটি বিশাল তেরঙ্গা পতাকা সন্ন্যাসীর পশ্চাৎভূমি রচনা করলো। অকস্মাৎ পতাকাগুলি থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হোল, তারপর সব অন্ধকার। অন্ধকার থেকে একটি মূর্ত্তি বেরিয়ে এল, পরণে কালো কাপড়, মূর্ত্তিটি মাতৃসাধকের দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী হলে দেখা গেল সেটি নারী-নেত্রীর; ধীরে তা অপসৃত হল।'

উদাসী মাতৃসাধক পরমপুণ্যবান। এই দৃশ্য দেখা কোনও স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, এটি প্রকৃতই একটি Vision। দেশময় অগণিত নারী-পুরুষ এই দৃশ্য দর্শনের আকাঙ্খায় দিন রাত্রি ইষ্টদেবতার কাছে আকুতি জানাচ্ছেন, আর সেই আকুতির সংহতরূপের প্রতিফলনই উদাসী মাতৃসাধক আকাশে দেখেছেন।

অন্যত্র, গ্রহনক্ষত্রের হিসাবে পারদর্শী পণ্ডিতকুল বার বার ছক মেলাচ্ছেন আর বার বার সেই একই উত্তর—ভবিষ্যতের সূচনা ঘন অন্ধকার, চরম দুর্যোগের মধ্যে। তারপর আলোর ঝলকানি নতুনের আবির্ভাব। ক্ষমতাসীন ক্ষমতাহীনে পর্যবসিত। শাসক শাসিতে পরিণত।

আর, কোনো খ্যাতনামা মন্দির গাত্রের প্রাচীন ফলকে বর্তমান ও আগামীদিনের শাসনের উল্লেখ; বর্তমান বুঝিবা নারী-শাসনের আর—ভবিষ্যত সন্ন্যাসী-শাসনের কাহিনীযুক্ত।

ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাপক বিকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত

ভারতে অর্থনীতির দ্রুত বিস্তার ঘটছে, মুদ্রাস্ফীতি শাসনে এসেছে (শূন্যাংকের পর্যায়ে নেমেছে) এবং মূল্যমান স্থিতিশীল হয়েছে ঃ

★ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁচেছে ; বর্তমানে দেশে ভাণ্ডারে-মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ হল ১৮ মিলিয়ন টন

★ আর্থিক বছরের প্রথম ছ' মাসে শিল্প-বিকাশের মাত্রা ছিল প্রায় ১২ শতাংশের মতো; গত বছরের ঐ সময়ে তা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ—১৯৭৬-৭৭-এ শিল্পোৎপাদন তার আগের বছরের তুলনায় দশ শতাংশের মতো বেশি হবে বলে অনুমান

★ ১৯৭৫-এর এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১৯৭৬-এর ঐ সময়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মাত্রা ১৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

★ ১৯৭৬-এর এপ্রিল-অক্টোবরে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ৩৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে…ঐ সময়ে আমদানী কমে এসেছে ৯ শতাংশের মাত্রায়

★ অন্যান্য দেশের প্রাপ্য পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ভাণ্ডারে ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চিত হয়েছে

★ সরকারী ক্ষেত্রে বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশের মতো

★ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ১৭ থেকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

আমাদের এই বিশাল প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সর্ব সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করার জন্য সরকার ও জনগণের দৃঢ় সংকল্পের বাস্তব অভিব্যক্তি হল এই সাফল্যগুলি।

DAVP 76/886 (BENGALI)

স্বাধীনতার রূপান্তর একটি বৃহৎ কারাগারে, মহাকালের ভাষ্যে যেখানে ৬৫ লাখ মানুষের নির্যাতন। তবু দেশ জাগে না, মানুষের জন্ম হয় না। মনে পড়ে মহাকালের বার বার উচ্চারিত একটি প্রতিজ্ঞার অনুরণন 'দেবতারা না জাগলে দানবদের জাগরিত করবো।'

বর্তমানের প্রসঙ্গে সামান্য কটি কথা কিন্তু গভীর অর্থবহ,—'নিজের Ego ছাড়বে না কেউ, তারই ফলে এই পরিস্থিতি। দেশের যাঁরা সমঝদার যারা দেশের কথা ভাবেন তাঁরা এ-সব দেখে দুঃখিত হন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই সব জোনাকি পোকার মত দল দেখে হাসেন। রাত্রে জোনাকি পোকায় আলোর কাজ হয়না দরকার হয় প্রদীপের লণ্ঠনের।... এদেশের অসংখ্যদলই তার একমাত্র অভিশাপ। একজন বহুকাল যাবৎ সবার একত্রিত হওয়ার কথা বলছেন। নিজেদের Identity না রেখে এক হওয়া দরকার অথচ সেটাই কেউ চায় না।'

" 'লালকুর্তা' দলের strategy প্রথমে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হয়ে মস্তবড় share দাবী করা, যদি দেখে ওদের চীৎকারে প্রতিপক্ষ দাবী মেনে নিয়েছে তাহলে তো ভালকথা ; যদি তা না মেনে নেয় তখন দু একটির দাবী place করে কিছু হাতিয়ে নেওয়া। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গুপ্তভাবে ভাল্লুকের দেশ চাপ দিতে থাকবে।'

—এই কথা কটি এত শীঘ্র সত্য প্রমাণিত হবে ভাবা যায়নি। সচেতন সজাগ মানুষ রাজনৈতিক দাবা-খেলার এই বিচিত্র লীলা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন।

সেই সঙ্গে মহাকালের কড়া ইঙ্গিত—'গাঢ়' 'ফিকে' আধা লাল কোনোটির সঙ্গেই মিলিত হবে না।' একথা মহাকাল বারবার বলেছেন আবারও বর্তমান পরিস্থিতিতে সাবধান করে দিলেন।

নির্বাচনে কে জিতলো কে হারলো এ বিষয়ে মহাকাল উদাসীন। এইসব সাময়িক ঘটনায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্মিলনের পর এই দীর্ঘ ১৫।১৬ বছরে কত ঘটনা ঘটে গেল যা চারণ প্রত্যক্ষভাবে জানে, মহাকালের নির্দেশিত ছকেই ঘটে চলেছে। [যে দেশে ১২ বছরের মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় ছাপা হয়, পরলোকগত মায়ের নামও ভোটার তালিকায় পাওয়া যায়, অথচ গৃহকর্ত্তার নাম ভোটার তালিকায় নেই, যে দেশে এই ভোটার তালিকা ভিত্তি করেই নির্বাচন হয়, সে দেশে নির্বাচন আর যাই হোক সোজাপথে হয় না।]

মহাকাল নিরুদ্বেগ, উদাসীন, তবু সারাদেশময় উথালপাথাল জনসমুদ্র মন্থনে নানাভাষাভাষী অতিথিদের চাঞ্চল্য দেখে মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এক আধটু যা বলেন তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে মহাকাল একযুগ পূর্বে ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বলেছিলেন যে তার তাৎপর্য-চারণ ও সমমনস্করা আজ দ্বিধাহীন চিত্তে অনুভব করছে। চারণ মাঘ ১৩৭৫ (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) সালে যে রচনা দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল; ভারতীয় রাজনীতির মূল সমস্যায় মহাকালের সেদিনকার বক্তব্য এই ভুলে-যাওয়া দেশবাসীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চায়ঃ

'Indian Politics ! Ugh ! It stinks ! সত্যকথা জেনে রাখো ঃ এজগতে—States-

men are a rarety, সর্বত্রই। কিন্তু, ভারতে তো Statesman নেই-ই।.....যেখানে Politicians Number by Legion (s) সে দেশে Stability মরীচিকা। The vagaries of wayward Politicians have debased the very life and look of India।'

চারণ এই বিরাট দেশব্যাপী সাগরমন্থনে উথাল-পাথাল জনতার ঢেউয়ের স্পর্শ পেতে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বারবার আশার আলোর সন্ধানে উন্মুখ জনতার আবেগ তাকে আবিষ্ট করে তুলছে, চারণ প্রতিনিয়ত অনুভব করছে, 'militant nationalism' অবারিত হোক। কেবল মাত্র এই একটি অমোঘ অস্ত্রই দেশে অনাচার অবিচার দুর্বলতা কলুষ থেকে মুক্তি দিতে পারে। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মানুষ সংঘবদ্ধ সংহত রূপ নিতে যাচ্ছে। তারই মহড়া চলেছে দেশব্যাপী জনসাগর মন্থনে। আর দিগন্তে অমৃতভাণ্ডার নিয়ে মহাকাল ধীরে আবির্ভূত হচ্ছেন লোক চক্ষে। চারণের এই ভাবনা সংশয়হীন। শুধু চাই আত্মনিবেদন। মহাকাল এই আত্মনিবেদন ও আত্মউদ্বোধনের একটি মহান রেখাচিত্র এঁকেছিলেন একটি গানের প্রেক্ষিতে। সেই মনোরম উপাচার চারণ আগামী দিনে পত্রস্থ করবে। আজ শুধুমাত্র সেই রেখাচিত্রের মর্মকথা এখানে উল্লেখ করছে চারণ।

জাতীয়তাবাদী দেশবাসীর প্রাণপুরুষ মহাকাল। তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা পুনরাগমনায় চ। অথচ এই পুনরাগমনের পথে বাধা কোথায় অথবা তার সামান্য কর্তব্য পালনই বা কোথায়?

'প্রাণের দেবতা চান আত্মনিবেদন। তিনি চান সর্বস্ব সমর্পণ। আর কি সুন্দর সে নেয়া। জ্ঞান, অজ্ঞান, কর্ম, অকর্ম, ইহকাল পরকাল, সর্বস্ব দিয়ে যখন তার পায়ে পড়তে হয় তখন তার হৃদয়ের দেবতা প্রসন্ন হয়ে তার শিষ্যকে বুকে তুলে নেন। ভক্ত, প্রেমী, সাধক নিজেকে সর্বস্বান্ত করে তার অরাধ্যকে পেলেন। আরাধ্য সেই দীন সর্বস্বান্তকে বুকে তুলে নিলেন। আর দর্শকরা দেখলেন সেই দীনতম সেবক আরাধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, কে দিল কে নিল? যে চেয়েছে সে হয়ে গেল দাতা, আর যে দাতা সে হয়ে গেল গ্রহীতা। আরাধ্য হৃদয়ের সর্বস্ব-দেবতা হয়ে গেলেন সেই ভক্ত আর ভক্ত হয়ে গেলেন সেই আরাধ্য। কী এই পরিণতি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির মধ্যে মিলে গেলেন।'

[কথা বলতে বলতে কি হল হঠাৎ মহাকাল বলতে শুরু করলেন তোমরা কথা বলো, শিগগিরই কথা বলো, 'আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের ভাবনা থেকে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।' চারণ ও ভিন্ দেশী শ্রোতারা কথা সুরু করলেন। চারণ এই ঘটনা বার বার ঘটতে দেখছে, একি ভাব সমাধি। কে জানে। এযে পরম শান্তি, পরম প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ কোন সন্দেহ নেই।']

আগামী দিনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেই মহাকাল অপেক্ষা করছেন, তাই তিনি এই মুহূর্তে এত নিরুদ্বেগ এত শান্ত। সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী শক্তি তাকে বরণ করে নিক, সূর্যের মত তার উপস্থিতি সরব ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না, আত্মসমর্পণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে সেই বরণ সম্ভব।

চারণ সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় নিবিষ্ট আরাধনায় রয়েছে। চারণ আর গাইবেনা পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে। কারণ সেই চিরঅজ্ঞাত শেষের উত্তর মহাকাল চারণকে জানিয়ে রেখেছেন। এই মুহূর্তে দেশময় উত্তেজনা তাই চারণকে স্পর্শ করে না, করে উদাস, দেয় অনাস্বাদিত প্রাপ্তির পরমতৃপ্তি।

৬ই মার্চ ১৯৭৭

কয়েকটি কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথধারা

একটানা চলসরিতের পথধারা —
চুপ আবর্তের আড়ি, নিরালা মানুষমুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আলোআঁধারীর ছাপা পাড় —

শ্লথ দৃষ্টি — ডুবে যায় না-দেখার মনে, প্রান্তকোণায় হঠাৎ
একদণ্ড দিন পিঠ পেতে নিল ধোঁয়ার ফোয়ারা।

ধূমল আড়াল থেকে চেয়ে আছে — শাপবদ্ধ কিন্নরীর মতো।
একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটু দাঁড়াও…

মানুষগুচ্ছের পুরু কানাতের নিচে একা মুখ, চেয়ে আছে —
একটু দাঁড়িয়ে যাও এইখানে, বহ্নিহারা ক্ষান্তিহারা ধোঁয়া—

নিঃশব্দ তীক্ষ্ণতা…

খেলা করে খেলা করে সপাট জামার নিচে গিয়ে
সারা গায়ে, খেলা করে ওঠে চষিপোকাদের সাথে—

এত স্বাদ বেঁচে আছে নাকি ? ওগো বুঁদ হয়ে বসে আছো ওঠাপড়া বুকের মাঝখানে,
নেয়ালিকুসুম জ্বলে জ্বলে যায় রুপালি নোলকে,

একটু সেঁকবো এই ঠাণ্ডা দুটো হাত ?… শূন্য আস্তিন, শূন্য
আলো আর আঁধা-ছাপা দু-ধারের প্রবাহিণী পাড় —

দিনান্ত শিথিল হয়ে ঝরে আছে শরৎশেষের আগাছাতে…

দ্রোণফুল

উঁচু জাঙালের পথে হন্‌হন্ ফিরছে — কাঁধে হাল,
সাতকেলে চাষী। সন্ধ্যা ঘোর ঘোর… বাঁশঝাড়টার আড় দিয়ে

হঠাৎ বেরিয়ে এলো পাঁচ পাঁচ শহুরে দেবতা।
হ্যাঁ গো দেবতা এতদিন পরে! কী এনেছ?
ঘরপোরা ছেলেপিলে? দুধভাত? সম্বচ্ছরের দানাপানি?

কাগ না ডাকতে আশপাশ ঘিরে ডাগর জোয়ান।
রীতিমতো দিনমজুরির দামে নামাল পথের কাদা সাফ,
ঢোলা ঢোলা কচুরিপানার নিচবিচ থেকে বেরোলো রুপোর পারা জল,
আড়াআড়ি উড়ে গেল বিজলিতারের ভোজবাজি,
কিম্ভুত মুখোশ আঁটা যন্ত্রপাতি— হুশহুশ গাড়ি…
আরো চাই?
ঝোলা কাঁধে ছবিয়াল থেকে থেকে হাতড়ে আনছে
হাসন্ত মেয়েমানুষ, মরদের ছরকুটে পেশী… এইবার

দেখ চিনতে পারো মুখ? এই সার সার পাকা ঘর—
চেনো? ঐ চিমনিভলক ধোঁয়া, ইচ্ছেপানি, গোবরপুড়োনো আশরফি—
তিল তিল জমে ওঠে কিমিয়াবিদ্যায় বনা সোনা।
জমে ওঠে চৌকাঠ ছাপিয়ে।
পর্দা-জোড়া এপার ওপার ছায়াছবি— ও কি মানুষ, না পরী? অতদূর

উড়ে যেতে পারো? তোমরাও?
এতখানি সুঁই-ভরা রিষবিষ নামানো দাবাই
চোদ্দপুরুষের জড় আধিখাওয়া নির্বুদ্ধি শিরায়
জ্বলতে জ্বলতে ছোটে… এক দুই তিন— ব্যস, আর না এবার
থামো।
বিজলিরাতের ওমে হাঁড়িকুড়ি ঠেলে বসে ১৭ নম্বর
শোনে ট্রানজিস্টর-বাক্স উপচে পড়ে পরীদের গান— ঝিলিমিলি
বিছানাভর্তি ঘুম,
যেন ঘাসজঙ্গলের সুখে অগাধ অবাক দ্রোণফুল··

কাল

এই সুড়ঙ্গের পথে কালকে পৌঁছবো।
গ্রামান্ত আলোর দেশ। ব্যস্তসমস্ত লোকজন।
মাথায় সূর্যের তাজ, জরি বেয়ে জহর ঠিকরে পড়ে পথে।

আরব শেখের সাজে সবসুদ্ধু শহর ইজারা
নিয়ে আছি, সপাট দাপটে নিয়ে যাবো
আকরলোহার পিণ্ড, পরমাণবিক কূটকলা—
সব নিয়ে ফিরে যাবো
আমাদের নিরন্ন পুরীতে।

তুরিত পাতাল রেলে ভিড়, ক্ষিপ্ত ভিড়,
মরকত শূন্যে খচা দৃশ্যাতীত গ্রহতারকার তীব্র নিচে
কণামানুষের মুখ—

মেয়েলি অধর ঘিরে ভনভন মাছির রঙিন গান…

থাক সব পুণ্যফল জমা থাক পুণ্যের শরীরে।
স্বায়ত্ত প্রতিভা, যাও অবাক বিশ্বের
চোখের সুমুখ দিয়ে পুঁতে দাও জ্বলৎনিশানা…

আপাতত ফাঁকহীন সংযম চলুক— আটদিন,
পরিবহনের রিহার্স্যাল।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কয়েটি বই

ঝুমুলি মুকুট ঃ ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের মনোরম কবিতার বই। দাম ঃ ছ টাকা

শিকড়ের ডানা ঃ হুয়ান রামোন হিমেনেথ-এর কবিতার অনুবাদ। দাম ঃ তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। কলিকাতা ৯, ভারবি। কলিকাতা-১২

উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড

১৯৭৫-এর পয়লা জুলাইএ ঘোষিত কার্যসূচী রূপায়ণে দেশের দৃঢ় সংকল্পের পুরস্কার ঃ

* খাদ্যোৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়েছে এবং ভাণ্ডারে মজুত রয়েছে ১৮ মিলিয়ন টন

* ১৯৭৬—৭৭-এর প্রথম ৪ ছ'মাসে শিল্পোৎপাদনের মাত্রা যেখানে বারো শতাংশ সেখানে তার আগের বছরের ঐ ক'মাসের মাত্রা ছিল মাত্র তিন শতাংশ

* ১৯৭৬-এর প্রথম সাত মাসে রপ্তানির পরিমাণ ৩৩.৯ শতাংশের রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে

DAVP 76/887 (Bengali)

ধারাবাহিক প্রবন্ধ
মাঘ সংখ্যার পর
কিস্তি ১২

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভয়শঙ্কর শর্মা

সাবমেরিন

ইনষ্টিটিউট অফ ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিজ-এর (Institute of Strategic Studies) হাতে, চীনে প্রাথমিক পর্যায়ের আণবিকশক্তি পরিচালিত সাবমেরিন এবং জমাট জ্বালানী-পরিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কিত টুকরো টুকরো তথ্য ("fragmentary evidence") এসেছে। এই প্রাথমিক পর্যায় থেকে '৮০ সাল নাগাদ চীন শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবার উপযোগী কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সামুদ্রিক যুদ্ধযান তৈরী করতে পারবে। শত্রুসেনা-বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করবার এবং আক্রমণের পূর্বাভাস দিয়ে নিজদেশের সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থাও তারা উন্নততর করছেন। সোভিয়েত-আক্রমণের বলয়সীমা থেকে কোনো ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ সতর্কতার সঙ্গে প্রতিরোধ-প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রান্তিক রেডার (Radar) কাজ করছে। ১৯৭০-এর এপ্রিল-এর পর চীনে পৃথিবীর পাঁচটি উপগ্রহ কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি ১৯৭৫-এ। এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের অন্তিম উদ্দেশ্য পৃথিবীতে অবস্থিত শত্রুপক্ষের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর আলোকচিত্রের প্রতিফলন থেকে তাদের গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা।

চীন মূলতঃ স্থলশক্তি হ'লেও, তার ১২,০০০ কিলোমিটারব্যাপী উপকূল রক্ষার জন্য এবং জলপথ নির্বিঘ্ন করার জন্য নৌশক্তির দিকেও নজর দিয়েছে এবং বর্তমানে বৃহৎ শক্তিবর্গের নৌশক্তির তুলনায় চীনের নৌশক্তি অত্যন্ত পরিমিত আয়তনের হলেও এশিয়ায় তা সর্ববৃহৎ নৌশক্তির আকার নিয়েছে। কিন্তু চীনের ২০০,০০০ (১৯৬৯) নৌসেনা, চীনের স্থল ও বিমানবাহিনীর তুলনায় একেবারেই ক্ষুদ্রাকার। অবশ্যি, সাংহাই এবং ক্যাণ্টনে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ জাহাজ তৈরী হচ্ছে।

সোভিয়েত রুশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পূর্বে চীনের সাবমেরিনে নিযুক্ত বাহিনী পুরোপুরি রুশীয় অফিসার ও নাবিকদের দখলে ছিলো। কিন্তু ১৯৬০-এর পর থেকে সাবমেরিন-এর জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত চীনা নাবিক তৈরী হয়েছে। এবং এই সময়ের মধ্যে নৌবাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী চীনা নৌবহর সাবমেরিনের শক্তিতেই শক্তিশালী। আর এই সাবমেরিন থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের নাকের ডগায়বাহিত আণবিক অস্ত্রের লক্ষ্য অব্যর্থ। তাই সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপের উপযোগী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীতে চীনের সমরকুশলীরা নজর দিয়েছে। ১৯৭৬ সালে পোর্ট-আর্থারের পশ্চিমে সাবমেরিন থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেট-বাহিত আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাও হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে চীনের নৌশক্তি প্রতিরক্ষামুখীন, আক্রমণাত্মক নয়। রুশ নৌবাহিনী, সাইবেরিয়ার উপকূলে অবস্থিত সোভিয়েত নৌঘাঁটি, ভ্লাডিভস্টক থেকে ভারত মহাসাগরে দ্রুত পৌঁছাবার জন্য মালাক্কা প্রণালীর আন্তর্জাতীয়করণ দাবী করে আসছে। চীন এই রুশীয় প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। সোভিয়েত রুশের নৌবহরে আণবিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সাবমেরিনের সংখ্যা বিশ্বের অপর বৃহৎ নৌ-শক্তি আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। তাছাড়া ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত রুশের নৌবহরের বিশটি জাহাজ (১৯৭৬-এর ডিসেম্বরের হিসাব) সর্বদাই টহল দেয় বলে অনুমান করা যায়। প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরে সোভিয়েত রুশের শক্তিশালী নৌশক্তির অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে চীন তার নিজের নৌবহরের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করছে।

চীন মামুলীযুদ্ধের (conventional war) আক্রমণ প্রতিহত করতে নিজের প্রতিরক্ষাশক্তির আধুনিকীকরণের দিকে মন দিয়েছে। সেই কারণে পশ্চিমী দেশ থেকে প্রতিরক্ষামূলক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্রমাগত উদ্যোগ করছে। সামরিক বিমান-বাহিনীর জন্য সোভিয়েত রুশের মিগ-২৩-এর চাইতেও শক্তিশালী বিমান তৈরীর ইঞ্জিন লণ্ডন থেকে ক্রয়ের চুক্তি করেছে এবং শেষপর্যন্ত নিজের দেশে চীন এই ইঞ্জিন তৈরী করবে। গোড়ায় চীনের অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের জন্য চীন বিদেশ থেকে এ-ধরণের শস্ত্র-সামগ্রী আমদানী করলেও, চীনের লক্ষ্য রয়েছে তার নিজের দেশের উন্নতশিল্পের ও কারিগরীবিদ্যার প্রয়োগে চীনেই সেই সব অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করবার। সোভিয়েত রুশের আণবিক আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষাই চীনের আশু নির্নিমেষ লক্ষ্য। চীন আগামীতে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে সতর্ক করে এসেছে। ইনস্টিটিউট অফ্ স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ্ তাদের ১৯৭৫-এর সমীক্ষায় বলছেন যে স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিতে, এই ধরণের যুদ্ধের সম্ভাবনার উপর চীন আর জোর না দিয়ে, বৃহত্তর পটভূমিকায় যুদ্ধের সম্মুখীন হ'বার জন্য চীনের প্রস্তুতি চলছে। ইনস্টিটিউট বলছেন: "...Chinese Strategy, despite continual

warnings that a world war is inevitable, appears to have de-emphasised the threat of the conflict in the short-run. In the long-run, Peking seems to be placing "a new premium on being able to react to a wide spectrum of military contingencies."

কিন্তু ১৯৭৫-এর ৩০শে ডিসেম্বরই নিউইয়র্ক থেকে 'রয়টার' (Ruetar) জানিয়েছে যে, 'চীন চারদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার' এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে পৃথিবীর উপর আধিপত্যের জন্য সোভিয়েত রুশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব যত বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের সরকারী সংবাদ প্রচারের সংবাদ-সংস্থা 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী,' এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মন্তব্য করেছে যে, একমাত্র সোভিয়েত রুশ এবং যুক্তরাষ্ট্রই নূতন বিশ্ব-যুদ্ধ সুরু করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সেই মন্তব্যেই বলা হয়েছে যে সোভিয়েত রুশ বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার মূল উৎস, আর আমেরিকা সেই মারাত্মক সংঘাত থেকে আত্মরক্ষার পথ নিয়েছে মাত্র। কারণ, সোভিয়েত রুশের তুলনায়, 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর' মতে আমেরিকার সামরিক শক্তি দুর্বলতর: "...the Soviet Union and the U. S. A were the only countries in a position to start a new world war. But it added that Moscow was the main source of danger of war as Washington was on the defensive because of its weaker position."

চীনের স্থলবাহিনী

চীনের স্থলবাহিনী বিপ্লবকালীন গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। চীনের এই লাল ফৌজের গড়ন, ১৯২৭-এর ১লা আগষ্ট তারিখের জন্মলগ্নে অনেকটা সাবেকী থাকলেও তার উদ্দীপনা ছিল আকাশ-ছোঁয়া। চীনের এই বাহিনীর সাহায্যেই ১৯৪৯র ১লা অক্টোবরে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি গোটা চীনে শাসনক্ষমতা দখল করে। বলতে গেলে মাও সে-তুং তার সহকর্মীদের নিয়ে বৈপ্লবিক সংঘাতের সময় একাদিক্রমে কুড়ি বছর সামরিক শক্তির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হয়েছেন, এই বাহিনীকেই তাঁর আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির সম্প্রসারণের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

এই পিপলস্ লিবারেশন আর্মির বা গণমুক্তি ফৌজের,—সংক্ষেপে যার নাম 'পি, এল, এ,—শান্তিকালীন শক্তির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ সেনাবাহিনী, নাবিক ও বৈমানিক। এদের সহায়ক শক্তিরূপে রয়েছে বিশ কোটি আধা-সামরিক মিলিশিয়া। সুতরাং, চীনের স্থলবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি নিঃসন্দেহে বিপুল। এই পি, এল, এ বাহিনীর বৈপ্লবিক চরিত্র ১৯৪৯-এর বিপ্লবোত্তর-কালে ১৯৫০-এর কোরিয়ার-যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত

ছিল। এই কোরিয়া-যুদ্ধের সময়ই পিপলস্ লিবারেশন আর্মির দুর্বলতা কোথায়, তা সর্বপ্রথম প্রকাশ পেলো। ফলে চীনে সেনা-বাহিনীর নেতৃত্বের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। একদল চাইলেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকরণে আধুনিক শস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত পেশাদার সেনাবাহিনীর গড়ন, যার ফলে চীনাবাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর সমীপবর্তী হবে এবং চীন-সোভিয়েত সম্পর্কে যথা-সম্ভব মৈত্রী স্থাপন করতে হবে। অপর পক্ষের মতবাদীদের ভাবনায় পিপলস আর্মির সীমিত আধুনিকীকরণ, মাও সে-তুং-এর আদর্শ ও কর্মপন্থায় তাদের আস্থা অটুট রাখবে। সোভিয়েতপন্থী আধুনিকীকরণবাদীরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। ১৯৫৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর চীনা প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ঘোষিত হ'ল। এই সংবিধানের ৪২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী, মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তাও তিনি, সামরিক আইন এবং যুদ্ধ-ঘোষণার দায়িত্বও তাঁর, সংবিধানের ৪০ ধারা অনুযায়ী সামরিক সমাবেশের (mobilization) দায়িত্বেও তিনি রয়েছেন এবং প্রায় একশ সদস্য-বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবার অধিকারও তাঁরই ;—এই উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে মার্শালরা, জেনারেলরা, মন্ত্রীরা রয়েছেন, যুদ্ধ-শান্তি ও সামরিক সমাবেশের নীতি-নির্ধারণের দায়িত্বও এই কমিটির ওপর ন্যস্ত রয়েছে—কিন্তু এতো ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার বাস্তব ক্ষমতা ছিলোনা। চীনের সামরিক বাহিনীর সর্বময় পরিচালক, সে-দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং তার অব্যবহিত নীচের পদাধিকারী হলেন চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ।

কোরিয়-যুদ্ধের প্রথম চীনা সেনানায়ক লিন পিয়াও, ম্যাক-আর্থারের নেতৃত্বে মার্কিণী সেনা-বাহিনীকে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের সীমান্ত রেখা '৩৮ তম সমান্তরাল' ('38th parallel') থেকে ১৯৫০ এর ১৬ অক্টোবর ও ১৯৫১র ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে ১০০ কিলোমিটার দূরে হটিয়ে দিয়ে সেদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিন হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম চীনা বাহিনী তার সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুসৈন্যের দূরবর্তী অভ্যন্তরে পৌঁছে চমক সৃষ্টি করলো। আমেরিকার পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীর বিপুল আধুনিক শস্ত্রসজ্জার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীনাবাহিনীর অকিঞ্চিৎকর শস্ত্রসরঞ্জামের এই সংগ্রাম, যেমন চীনাবাহিনীর মনোবলের পরীক্ষা দিয়ে গেলো, তেমনি মাও সে-তুং-এর যুদ্ধনীতিতে সেনাবাহিনীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদাতিকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা চীনের শক্তির আধার যে শস্ত্রাসজ্জা নয়, সে পরীক্ষাও দিয়ে গেলো। মাও সে-তুং বরাবরই সেনাবাহিনীকে জনসাধারণের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখেছেন এবং চীনের জনতার ওপর যেমন, তেমনি সেনাবাহিনীর

উপরও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অবিসম্বাদী অধিকার সম্বন্ধে বার বার উল্লেখ করেছেন তার বিভিন্ন সময়ের রচনায়। মাও সে-তুং ১৯৩৮-এর ৬ই নভেম্বর যখন বলেন : "The Party commands the gun, the gun must never be allowed to command the party," সে সময় তিনি দলের সর্বময় প্রভুত্বের স্মারকরূপে সেনাবাহিনীকেও স্মরণ করিয়ে দেন যে অস্ত্রশস্ত্র বলে বলীয়ান সেনাবাহিনীও সর্বময়কর্তা নয়। সর্বময়কর্তা চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমসময়ে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ তাদের 'সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশসূচক' ('Instruction to the Army') নির্দেশকাতেও আবার দ্ব্যর্থহীনভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে 'দল বন্দুকের নিয়ামক হবে, বিপরীত নীতি কখনই গ্রাহ্য হবে না।' একই নীতির প্রচারণার জন্য মাও সে-তুং বলেন : "The whole Party must concentrate its attention on war, must learn the science of war, must be prepared for war." (Problems of War and Strategy, (Selected works, vol II)।

কোরিয়া-যুদ্ধে চীনের বিজয় সমরনায়ক লিন-পিয়াও-এর পরিবর্তে কোরিয়ায় চীনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত জেনারেল পেং টে-হুয়াই, চীনা সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতিপদে এবং চীনা-বাহিনীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। পেং টে-হুয়াই পুরোপুরি সোভিয়েত মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। পেং এসেই স্বেচ্ছামূলক সামরিক বৃত্তির পরিবর্তে ১৯৫৫-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির (conscription) অনুশাসন প্রবর্তন করলেন এবং সামরিক নিয়মকানুন পরিবর্তন করে চীনা সামরিক বাহিনীতে সর্বপ্রথম বিভিন্ন পদ-মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক বাহিনীর স্তর, পদমর্যাদার সূচক ষ্ট্রাইপস, ডেকরেশনস্; যোগ্যতার পরিমাপক উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান বেতনের হার চালু করেন। পিপল্‌স্ আর্মির গেরিলাযুদ্ধের পর্যায়ের চাল-চলন সবই বদলে গেলো, সে-স্থান দখল করলো সেনা-বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন ইউনিফরম ও ধরণ-ধারণ। চাল-চলনে, পোষাকে-আশাকে, এই পরিবর্তন দেখে চীনাবাহিনীকে সোভিয়েত বাহিনীর অনুসারী মনে হোতো। সোভিয়েত বাহিনীর অনুকরণে চীনাবাহিনীতে বুক ভর্তি মেডাল ও বর্ণাঢ্য ডেকরেশনে সজ্জিত ডজন খানেক মার্শাল দেখা দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন চেন্-ঈ, চু-টে, হো-লুঙ, সু হি-সিয়াং-চিয়েন, লিন-পিয়াও, পেং টে-হুয়াই, ইয়ে চিয়েন-ইং প্রমুখরা।

চীনের সামরিক বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের আমলের আদর্শবাদী ও বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিবর্তে যত বেশী পেশাদারী মনোভাব আয়ত্ত করলেন, ততই তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বা দলীয় নিয়ন্ত্রকদের (political commissars) সঙ্গে মর্যাদার মোড়কে ঢাকা নূতন পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসরদের সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমটায় এই

সংঘাত জনসাধারণের দৃষ্টির আগোচরেই ঘটতে থাকে। মার্শাল চু-টে এই নূতন জাতের সামরিক অফিসারদের পেশাদারী মনোভাবের এবং মর্যাদার উত্তুঙ্গ চূড়ায় বসে রাজনীতিকদের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। চীনের তেরটি সামরিক জেলার কর্তৃত্বে আসীন কম্যুনিষ্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মিলিটারী কমিটি—যার সকল সদস্যই হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য—মার্শাল পেং টে-হুয়াই-এর তীব্র সমালোচনা করেন। এদিকে কোরিয়া-যুদ্ধে পেং টে-হুয়াই-এর পূর্ববর্তী সমরনায়ক, চীনা সরকারের অন্যতম উপ-রাষ্ট্রপতি, লিন-পিয়াও-এর দলের সুউচ্চ পর্যায়ে নিযুক্তিতে এবং দলের সর্বময় উচ্চতম কর্তৃত্বের 'সাত জনের' একজন সদস্যরূপে উন্নতিতে পেং-এর মনও তিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সোভিয়েত সমর্থক পেং টে-হুয়াই-এর অবস্থা চীনের সামরিক কাঠামোতে আরও বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে যখন ১৯৫৮ সালের ২২শে আগষ্ট পিকিং চীন ভূখণ্ডের সমীপবর্তী চিয়াং-কাই-শেক অধিকৃত কুয়েময় দ্বীপে বোমা ফেলতে সুরু করলেও পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোভিয়েত রুশ চীনের পাশে এসে দাঁড়াতে অস্বীকার করে বললো: "The U. S. S. R will come to China's aid should she be attacked by the U-S. A ....but as for the civil war which the people of China are waging against the Chiang Kai-Shek group, we have no intention of being drawn into that." (Communique of 5 October, 1958)। মার্শাল পেং টে-হুয়াই-এর অবস্থা আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো. ১৯৫৯ এর ২রা থেকে ১৬ই আগষ্ট লুসানে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের পর। এই অধিবেশনে পেং টে-হুয়াই চীন-সোভিয়েত মৈত্রীর স্বপক্ষে জোরালো ভাষায় বিতর্ক করেন। পেং এর মূল বক্তব্য ছিল, চীন-সোভিয়েত মৈত্রীর নৈতিক সুযোগ হ্রাস পেলেও এই চুক্তির বৈষয়িক সুযোগ উপেক্ষা করা চলে না। পেং টে-হুয়াই-এর এই মতবাদ মাও সে-তুং-এর যুদ্ধ সম্পর্কিত বৈপ্লবিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এই কারণেই 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদে'র ("Right-wing opportunisn") অভিযোগে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক বিষয়ক কমিটি পেং টে-হুয়াইকে বরখাস্ত করে দেন। মার্শাল পেং-এর সঙ্গে চীনা সামরিক বাহিনীর আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারেরও পদচ্যুতি ঘটে।

পেং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকরণে যান্ত্রিক শস্ত্রে সজ্জিত সামরিক ডিভিশন তৈরী করতে চেয়েছিলেন; আর চেয়েছিলেন রাজনৈতিক পায়তারার পরিবর্তে সামরিক সংঘাতের প্রস্তুতির মহড়া। পেং কৃষক সন্তান হয়েও চীনের ভারী শিল্পায়নের ভিত্তিতে সমর সজ্জার উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্রুতায়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু পেং এজন্য মূল্য দিয়ে বিদায় নিলেন। তার স্থলবর্তী হলেন মার্শাল লিন পিয়াও—যিনি কোরিয়া-

যুদ্ধে ম্যাকআর্থারের মার্কিণী সেনাবাহিনীকে চীন সীমান্তের ইয়ালু নদী থেকে একশ মাইল দূরে হটিয়ে দিয়ে যুদ্ধের 'চলমান কৌশলে,' ('war of movement') বিশ্বের অন্যতম সর্বোত্তম রণকুশলী-রূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। লিন পিয়াও শিল্পপতির সন্তান হয়েও তার দৃষ্টি ছিল যান্ত্রিক শস্ত্র-সজ্জার দিকে নয়, বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কৃষক সন্তানদের দিয়ে তৈরী শক্তিমান পদাতিকবাহিনীর দিকে। ১৯৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, যেদিন ক্রুশ্চেভ পিকিং পৌঁছালেন, মার্শাল পেং টে-হুয়াই-এর স্থলবর্তী নূতন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও, সেনাবাহিনীর পথ প্রদর্শকরূপে একটি বড়ো আকারের প্রবন্ধ লিখলেন, এই মর্মে যে সেনাবাহিনীকে সর্বপ্রথম রাজনীতিতে সচেতন করে তুলতে হবে, তারা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন এবং তারই পাশে জনতার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবেন: 'The army is a tool for the Political battle. The troops must actively and spontaneously participate in the building of the country, and in the movement of the masses.' ধীরে ধীরে রাজনীতির প্রভাব সেনা-বাহিনীর উপর বৃদ্ধি পেলো, তার ফলে দলের প্রভাবও। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির উচুস্তরের পদগুলি সেনাবাহিনীর উচুমহলের অফিসাররা পূরণ করলেন। মাও শুধু চীনের সাধারণ মানুষের জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকতে চাননি; সেনাবাহিনীর মধ্যেও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তার কাম্য ছিল। পিপলস্ লিবারেশন সেনাবাহিনীর মধ্যে ইয়েনান রিপাব-লিকের বিপ্লবী দিনগুলির বৈপ্লবিক মানসিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য মার্শাল লিন পিয়াও ১৯৬৫র ২২শে মে তারিখে সেনাবাহিনীর মধ্যে পদমর্যাদার বিভিন্ন স্তর বিলুপ্ত করে দিলেন; ট্রটস্কি যেমন সোভিয়েত রুশে লাল ফৌজের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রসারের জন্য ১৯১৭ সালে লাল ফৌজের পদমর্যাদার স্মারক সকল স্তর লোপ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর পূর্বে চীনের সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদার শ্রেণীবিভাগ যেমন ছিলনা, সেই জায়গায় এই বাহিনী দশ বছর পর আবার ফিরে এলো। চীনের সেনাবাহিনীর এই পরিবর্তন, রুশ সেনাবাহিনীর মার্শাল ও জেনারেলদের বক্ষ-বিস্তৃত পদমর্যাদার মূল্যবান স্মারকগুলিকে খুবই বেখাপ্পা করে তোলে। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির এই বৈচিত্র্যহীন আটপৌরে সাজ-পোষাক, তাদের সেনাবাহিনীকে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দান ক'রে জনসাধারণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সকল প্রকার বিভেদ দূর করে দিলো। জনসাধারণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর এই ঐক্যের বন্ধনের ধ্বনি রচিত হ'ল: 'জলের মধ্যে মাছ যেমন, জাতির জীবনে সেনাবাহিনীরও সেই স্থান'—"The army is in the nation, like a fish in water."

রণকৌশলের দিক থেকে মাও সে-তুং-এর নীতিতে অস্ত্রের চাইতে ব্যক্তি-সৈনার অন্তর্নিহিত

শ্রেষ্ঠত্ব পর্বতপ্রমাণ উত্ত জরূপে সর্বদাই স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, তাই মাও সে-তুং-এর বিবৃতিতে যে কোনো রকমের বোমার প্রকৃতি-বিচারে, তাদের 'কাগুজে বাঘে'র ('Paper Tigers') পর্যায়ে ফেলা হয়েছে: "from the point of view of strategy, there is absolute confidence in the inherent superiority of men over arms and in Mao's statement that bombs of any kind are no more than paper tigers." (Pp 104, China comes of Age: Jean Pierre-Brule)।

চীনে স্থায়ী ৫০ লক্ষ সামরিক শক্তির মধ্যে ৩০ লক্ষ সুদক্ষ সেনা। এর বাইরে রয়েছে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সকল চীনা নাগরিকদের দিয়ে তৈরী রিজার্ভ-বাহিনী। এই রিজার্ভদের মধ্যেও দুইটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে রয়েছেন সকল নন্-কমিশনড্ অফিসার এবং যারা তাদের বরাদ্দ বছরগুলি সেনাবাহিনীতে কাটিয়েছেন তারা। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন, যারা কোনো না কোনো কারণে সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীতে জড়িত হতে পারেন নি। এদের মধ্যে বিশেষ কর্ম-কুশলতাসম্পন্ন মহিলারাও রয়েছেন। রিজার্ভে রয়েছেন এমন কারুর—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে—প্রথম ডাক পড়তে পারে। এ-ছাড়াও সেনাবাহিনীর আর একটি অতিরিক্ত রিজার্ভ শাখা (auxiliary reserve) রয়েছে যাকে বলা হয়ে থাকে গণমিলিশিয়া বা Peoples Militia। এই পিপলস মিলিশিয়া ১৯৬৪ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব পেয়ে আসছে। কিন্তু পিপলস মিলিশিয়ার মধ্যে যারা ট্রেনিং পান নাই তাদের থেকে ট্রেনিং প্রাপ্তদের পৃথক করার ব্যবস্থা রয়েছে। মিলিশিয়া বাহিনীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে বলা আছে যে, স্থলে বা আকাশে দেশ আক্রান্ত হলে নিয়মিত সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা এগিয়ে আসবে। এদের রাজনৈতিক তাত্ত্বিক শিক্ষা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত নরনারীদের হাতে তত দ্রুত অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। সাধারণ মিলিশিয়াকে গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের হাতে চট করে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় না। তাদের দায়িত্ব হ'ল চীনের কম্যুনগুলির প্রতিরক্ষা সাধন এবং তাদের অঞ্চল শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলে গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধের মহড়া নেওয়া। নিয়মিত সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়ার সমবেত প্রতিরোধ, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত শত্রুকেও, দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, ঘায়েল করে দিতে পারে। কিন্তু মিলিশিয়াকে বারমাস কাজে লিপ্ত রাখবার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত করে শান্তিকালীন প্রত্যহিকতায় তাদের উত্তীর্ণ হবার আয়োজন রাখা হয়েছে,—উৎপাদন-ব্যবস্থার স্তরে স্তরে।

চীনের এই বিশাল সামরিক বাহিনী—সেনা-বাহিনী ও মিলিশিয়ার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে যা গঠিত —চীনের সীমান্ত অতিক্রম করে দ্রুত বেশীদূর অগ্রসর

হতে পারবে না। ইউরোপের খ্যাতনামা রণকুশলী জার্মানীর ক্লাউসভিটজ্-এর (Clausewitz) ২৫০০ বছর পূর্বে চীনা রণকুশলী সান ৎসে (Sun Tse) বলেছিলেন সর্বোত্তম সেনানায়ক তিনিই হবেন, যিনি শত্রুকে প্রতারণা করতে অচিন্ত্যনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করেছেন। মাও সে-তুং, সানৎসের চিন্তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁর গেরিলা সংগ্রামের নীতি নির্ধারণে। এদিক থেকে চীনাবাহিনীর বিন্যাসের মধ্যে তাঁর সংগ্রামের নীতি নিহিত রয়েছে বলা যেতে পারে। এই বিন্যাসের মূল তত্ত্ব হ'ল, চীনাবাহিনীকে প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে সাজানো হয়ে থাকে, আক্রমণের ভঙ্গিতে নয়। স্থলবাহিনীর বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীকেও, প্রতিরক্ষার লক্ষ্য রেখেই অনিবার্য-ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। চীনের মিলিশিয়া সমেত বিপুল সেনাবাহিনীর বিন্যাসের প্রকৃতিতে, চীনের সেনাবাহিনীর পেছনে কোন্ সামরিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব কাজ করছে, তারও নিশানা পাওয়া যায়। মাও সে-তুং-এর এবং ক্ষমতাসীন থাকাকালীন লিন পিয়াওর রচনা থেকে এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধস্তন সামরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত কমিটির নথিপত্র থেকে পরিষ্কারভাবে চীনা সেনাবাহিনীর সামরিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের নিশানা পাওয়া গেছে। মার্শাল লিন পিয়াও-এর ১৯৬৫র ৩রা সেপ্টেম্বরের এক বক্তৃতায় জানা যায়, সে-সময় চীনই একমাত্র দেশ, যে প্রকাশ্য ঘোষণায় স্বীকার করে যে চীনকে কোনো যুদ্ধ যদি করতেই হয়, চীন সে যুদ্ধ করবে চীনা ভূখণ্ডে,—চীনাভূখণ্ডের চরম ধ্বংস সাধনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে। মার্শাল লিন পিয়াও, সেই প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় মাও সে-তুং-এর চীনাবিপ্লব-কালীন গেরিলা যুদ্ধের নির্ধারিত নীতির অনুসরণে বলেন: শত্রুকে আমাদের ভূখণ্ডের গভীরে ব্যূহের মধ্যে পথ দেখিয়ে আনতে হবে। আমাদের গভীর ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে আসবার পথ করে দিয়ে শত্রুর সেনাবাহিনীকে বিস্তৃত বিন্যাসে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য করতে পারবো এবং এইভাবে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পাবো এবং পরে জমিয়ে দিয়ে তার পা নিরেট করে দিতে পারবো। তারপর সুরু হবে তিল তিল করে শত্রুর বিস্তৃত বাহিনীকে গ্রাস করবার কাজ এবং তারই পরিণতিতে আসবে তার চূড়ান্ত ধ্বংস'—"It is necessary to lead the enemy to penetrate deep into our territory, Only by letting him come to us can we force him to disperse his troops, so as to have him by every finger, and bog down his legs. Then, unit by unit, mouthful by mouthful, we shall be able to dispose of him."

১৯৭৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মাও সে-তুং-এর লোকান্তরের পর, মাও-পন্থীর নেতৃত্বে যারা র‍্যাডিকাল পরিচয় দিয়ে হুয়া-কেংকে

দলের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হবার পথরোধ করে দলীয় সংগ্রামের জন্য তৈরী হয়েছিলেন, তাদের দমন করবার জন্য হুয়া কুয়ো-ফেং এবং তার সমর্থকদের সেনাবাহিনীর বৃহদাংশের সাহায্য নিতে হয়েছে। এই সাহায্যের পরিবর্তে সেনাবাহিনীর মধ্যেও আবার দাবী উঠেছে আধুনিকীরণের। সুতরাং, মাও সে তুং-এর অনুসরণে, ১৯৬৫ সালে চীনা-বাহিনীর যে সামরিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব লিন পিয়াও বিবৃত করেছিলেন তার কতটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তব রয়েছে, সে-কথা বলা দুষ্কর। মাও সে-তুং-উত্তর চীনের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে রুশ-চীন দ্বন্দ্বের মূল্যায়ণ পরবর্তীকালে করা হবে।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

(৮নং রুল দ্রষ্টব্য)

১.	প্রকাশের স্থান	২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
২.	প্রকাশের কাল	মাসিক
৩ ও ৪.	মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় ১০।৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩
৫.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	সুনীল দাস, ভারতীয় ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬
৬.	স্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা	১. সুনীল দাস ও ২. বিজয় নাগ ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

১১।৩।৭৭

রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি বাংলা কবিতার ইংরেজী রূপান্তর

ডঃ মঞ্জুলা ভট্টাচার্য

"ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি : কিন্তু ঢাক বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভাল হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে। অনেক বন্ধু এবং অ-বন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন—সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অ-বন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসর-শয্যার সন্ধানে আছি, জুটিবে কী না জানিনা। কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয়না।" (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫৪)।

কিসের অনুবাদের কথা কবি বলছেন? কোন অজ্ঞাত অনুবাদের এই গোপন স্বীকৃতি? পত্রটি লেখার সময় কবি ছিলেন কাশ্মীরে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও কবির সঙ্গে ছিলেন। সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ তাকে অনুরোধ করেন নিজের দু' একটি কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করার জন্যে। কবি সে অনুরোধ রাখেন এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় পরের মাসেই অর্থাৎ নভেম্বরে সত্যেন্দ্রনাথের দুটি কবিতা "তোড়া" ও "চম্পা"র ইংরেজী রূপান্তর "A Posy" ও "Champa" মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় অনুবাদকের নাম ছিলনা কেবল "by a poet" ছিল। কিন্তু কবি গোপন করলে হবে কি? পত্রিকার পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বুঝতে পারেন এই অনুবাদকটি কে। নিঃসংশয় হবার জন্যে পত্র লেখেন কবিকে যার উত্তরে কবির ওই উক্তি।

অনুবাদগুলি স্বনামে প্রকাশিত করায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তির মূল কারণ সত্যেন্দ্রনাথ অনেকের ঈর্ষার পাত্র হবেন এবং অন্যান্য কবিরাও কবির কাছ থেকে তাঁদের কবিতার তর্জমা দাবী করবেন। সুতরাং অনুবাদকের নাম ছাড়াই কবিতা দু'টি মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় তার পরের সংখ্যাতেই (ডিসেম্বর, ১৯১৫) রীতিমত কবির স্বাক্ষর সমেত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় "The Young Mother" নামে। এটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নূতন মাতা" (আলেখ্য) কবিতার ইংরেজী

রূপান্তর। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার ক্ষেত্রে কবি যা যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ক্ষেত্রে তা মনে করেন নি কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, যেহেতু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন জীবিত ছিলেন না, ঈর্ষার প্রশ্ন তাঁর ক্ষেত্রে ওঠে না। তবে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালেরই নয় দেবেন্দ্রনাথ সেনেরও (তিনি তখন জীবিতই ছিলেন) তিনটি কবিতা কবি ওই পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন কয়েক মাস পরে। প্রথমে দুটি "The Maiden's Smile" (যুবতীর হাসি) ও "My Offence" (সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান), মডার্ণ রিভিউ, মার্চ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ও পরে একটি "The unnamed child" (নামশূন্যা কন্যা) ওই বছরেই মে মাসে প্রকাশিত হয়। কেবল তাই নয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরেকটি কবিতা "মেথর"-এর তর্জমা "The Cleanser" নামে অনুদিত হয়ে ওই পত্রিকাতেই প্রায় ন' বছর পরে কবির নামাঙ্কিত হয়েই মুদ্রিত হয়। যদিও এই সর্বশেষ কবিতাটির শেষে "This poem is a free rendering of Satyendranath Datta's Bengali poem "Methar" ("The Scavanger"), which appeared in Prabasi 16 years ago" লেখা আছে তবুও "free rendering" একে কোনো-মতেই বলা যায় না, এটি নিছক অনুবাদই। তুলনায় এ পর্যন্ত উল্লিখিত অন্যান্য কবিতাগুলি অনেক বেশী 'free rendering'।

সব মিলিয়ে যে ক'টি কবিতার তর্জমা কবি করেন সেগুলি হল:

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—তোড়া—A Posy—মডার্ণ রিভিউ, নভেম্বর ১৯১৫

২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—চম্পা—Champa-মডার্ণ রিভিউ, নভেম্বর ১৯১৫

৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—মেথর—The Cleanser—মডার্ণ রিভিউ, জুন, ১৯২৫

৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—নূতন মাতা—The Young Mother—মডার্ণ রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১৫

৫। দেবেন্দ্রনাথ সেন—যুবতীর হাসি—The Maiden's Smile—মডার্ণ রিভিউ, মার্চ ১৯১৬

৬। দেবেন্দ্রনাথ সেন—সোহাগিনী ইথে তোর—My Offence মডার্ণ রিভিউ, মার্চ, ১৯১৬

৭। দেবেন্দ্রনাথ সেন—নামশূন্যা কন্যা—The unnamed child—মডার্ণ রিভিউ, মে, ১৯১৬

এতগুলি কবিতার মধ্যে বেশীর ভাগই যখন নিজের নামেই কবি প্রকাশ করেছেন তখন সত্যেন্দ্র-নাথের দুটি কবিতার সম্বন্ধেই বা সতর্কতার কারণ কি? সম্ভবত প্রকাশের আগে কবি ঠিকমত মনস্থির করতে পারেন নি। এ ছাড়া আরো একটি কারণ ছিল। পরের অনুবাদগুলি যে কবি প্রমথ চৌধুরীর অনুরোধে করেন তার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে।

ওই সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির প্রত্যুত্তর (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৪৩) দেখে মনে হয় দেবেন্দ্রনাথ সেনের "অশোকগুচ্ছ" ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মন্দ্র" থেকে অনুবাদ করার জন্যে প্রমথ চৌধুরী কবিকে অনুরোধ করেন :

"অশোকগুচ্ছ ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা তর্জমার মত পাওয়া গেল। দ্বিজু রায়ের 'মন্দ্রে'র কবিতা ইংরেজীতে তর্জমা করবার মত শক্তি আমার নেই।.....তাই দ্বিজু রায়ের 'আলেখ্য' থেকে একটা কবিতা তর্জমা করলুম, আরো অন্তত একটা করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু শক্তি নেই। আর দু' চার জন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জমা করা—নইলে তারা পীড়া বোধ করবে।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠির তারিখ ২৪ অক্টোবর, ১৯১৫। এর মধ্যেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির মধ্যে খুব অল্পদিনের তফাৎ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার অনুবাদ তখনও মডার্ণ রিভিউ-এ প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং ধরে নিতে হবে সম্পাদকের হাতে অনুবাদগুলি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ মহলে কারোর অজানা থাকে না যে কবিতাগুলির অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ আরো কিছু অনুবাদ করতে কবিকে উৎসাহিত করেন। কবি যে ভয় করেছিলেন "কর্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে" তাই সত্যি হল। তবে এরজন্যে কবি যে খুব দুঃখিত তা মনে হয় না। কারণ পরের চিঠিতেই প্রমথ চৌধুরীকে আবার লিখছেন : যদি আর কোনো কবির কবিতা তর্জমা করাতে চাও তাহলে ফরমাস কোরো। আমার যেটুকু পুঁজি তার দ্বারা সকল রকমের তর্জমা আমার হাতে আসেনা। যেগুলো Lyrical সেগুলোই কতকটা পারি—কিন্তু জিনিষটা যথার্থ ভালো হলেই তর্জমাও ভালো হয় সে কথা বলা বাহুল্য—নইলে অনেক মশ্‌লা মেশাতে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তোড়া' ও 'চম্পা' কবিতা দুটির তর্জমা পরে "Lover's Gift'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অনুবাদগুলিকে নিঃসন্দেহে 'free rendering'—বলা যায় যদিও এক্ষেত্রে সেরকম কোনো উল্লেখ নেই। 'চম্পা' কবিতার মোট চারটি স্তবক আছে। অন্তিম স্তবকের প্রথম তিনটি পংক্তি অনুবাদে বর্জিত। এই পংক্তিগুলি হল :

ধীরে এসু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি;
মুঁছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব।
সূর্য্যেরি বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি;

অবশ্য এই বর্জনে অর্থের কোনো ক্ষতি হয়নি। "দিনদেবে নমস্কার" ভাষান্তরে হয়েছে "Proudly Saluted" এবং এতে কবিতায় চম্পার গর্বিত ভঙ্গিটি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

"A Posy" কবিতার প্রথম ও তৃতীয় (অন্তিম) স্তবকের শেষে যথাক্রমে "Only the ribbon remains" এবং "My love remains alone," এ দুটি চরণ কবি নিজে সংযোজন করেছেন। তৃতীয় স্তবকের প্রথম চরণের আরম্ভে "দুধের" কথাটি

(অন্য দুটি স্তবকের মত) 'মদ' ও মধু'র সঙ্গে নেই, অনুবাদে কিন্তু 'দুধের' শব্দটি আছে। অর্থাৎ মূল কবিতায় যেখানে "মধুর মত মদের মত অধীর করা রূপ বেসেছিলেম ভাল" আছে, অনুবাদে সেখানে "The beauty I loved was like milk and honey and wine" আছে। সম্ভবত অধীর করার পক্ষে দুধ শব্দটি বেমানান বলেই সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন নি এবং একই কারণে অধীর শব্দের কোনো ইংরেজী প্রতিশব্দ রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নূতন মাতা" কবিতার অনুবাদ "The Young Mother" যথার্থ অর্থেই তর্জমা। ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে সম্পূর্ণ কবিতাটির কবি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। "Lover's Gift"—এ যখন কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এর নাম হয় "The Child".

"সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান" ও "যুবতীর হাসি" এ দুটি কবিতার তর্জমা উল্লিখিত কবিতাগুলির সঙ্গেই কাশ্মীরে করা হয়। "সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান" কবিতাটির রূপান্তরে ছোটখাট বহু বর্জন ছাড়াও তৃতীয় স্তবক সম্পূর্ণ বর্জিত। স্তবকটি এইরকম :

ঝকমক পাখা দুটি
উষার আলোকে উঠি,
খোলে যবে প্রজাপতি রূপের দোকান,
ভুবন করে গো তার কতই বাখান।
সোনার পাখীরে ধরি,
কনক-কণিকা হরি,
কে চায় করিতে তার খেলা অবসান ?
সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান !

"The Maiden's Smile" কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের "যুবতীর হাসি" কবিতার ইংরেজী রূপান্তর। Lover's Gift-এর এটি একুশ সংখ্যক কবিতা এবং এতে কবিতাটির নাম দেওয়া নেই। এ অনুবাদটিকেও প্রায় ভাবানুবাদই বলা যায়। অর্থাৎ যথেষ্ট মাত্রাতেই free rendering. মূল কবিতাটি চতুর্দশপদী এবং অষ্টক ও ষট্‌ক সনেটের রীতি অনুযায়ী ভাগ করাই আছে। তবে অন্যান্য অনুবাদের মত এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিরই সাহায্য নিয়েছেন বলে সনেটের form ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মূল কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে "হে রূপসি" সম্বোধন করে। তর্জমায় "হে রূপসি" হয়েছে "My Love" এই পংক্তিতেই "নদী" হয়েছে "Waterfall."

তর্জমায় এই ধরণের পরিবর্তন করায় সম্ভবত কোনো আপত্তি ওঠে যে কারণে প্রায় ন বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মেথর" কবিতাটি অনুবাদ করার সময় কবি "free rendering" কথাটি উল্লেখ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের তৃতীয় কবিতাটি অর্থাৎ "নামশূন্যা কন্যা"র অনুবাদ "The unnamed Child" কবি কবে বা কোথায় করেন তা জানা যায়না। মূল কবিতাটি প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে, ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৯১৬ মার্চ-এপ্রিল-এ। অনুবাদটি প্রকাশিত হয় মডার্ণ রিভিউ

পত্রিকায় ওই বছরেই মে মাসে। সুতরাং যতদূর মনে হয় কবিতাটি প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই কবি অনুবাদ করেন। মূল কবিতার অনেকাংশ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও ত্রয়োদশ পংক্তি বাদ গেছে। নবম পংক্তিতে যেখানে "দিদিরা" আছে সেখানে ইংরেজিতে "elder sister" করা হয়েছে।

"The Cleanser" (সত্যেন্দ্রনাথ রচিত "মেথর" কবিতার অনুবাদ) রবীন্দ্রনাথ অনূদিত সমসাময়িক বাংলা কবিতার সর্বশেষ অনুবাদ। এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ১৯২৫ সালের জুন মাসে। মূল কবিতাটি যে প্রবাসী থেকে নেওয়া তারও উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকেও যত্রতত্র থাকার জন্যে কবিতাটির সঙ্গে কোনো বাঙ্গালী পাঠকই বোধহয় অপরিচিত নন। তর্জমার সঙ্গে মূল চতুর্দশপদীর প্রায় কোনোই তফাৎ নেই। মূল সুরটিও যথাযথ রাখা হয়েছে। যেমন "কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?/ শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে" ভাষান্তরে হয়েছে:

Why do they shun your
touch my friend
and call yon unclean
Whom cleanliness follows at every
step

এবং "নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ/ আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল।" রূপান্তরে হয়েছে:

Once Lord Shiva had saved the world
from a deluge of poison
by taking it himself,
And you save at everyday from filth
with the same divine sufference.

সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি বহু ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন কবি। খুব অল্প বয়স থেকেই এদিকে তাঁর একটি সহজ প্রবণতা ছিল। তবে সব কিছুর যে আক্ষরিক অনুবাদ হয়না সে সম্বন্ধে কবি কবি বলেই সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই সংযোজন ও বর্জন এবং সেই কারণেই তাঁর অনুবাদগুলি শুধু অনুবাদ নয় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রচনা। তবে এসব সত্ত্বেও ভাষান্তরে যে মূল কবিতার রস পাওয়া সম্ভব নয় এও তিনি মানতেন: "জানি প্রত্যেক ভাষা আপন সাহিত্য সম্পদ কৃপণের মত বন্ধ করে রেখে দেয়, ভাষান্তরে তার রস পৌঁছতে দেয়না।" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্র)

রকমারি গ্রেপ্তার ঃ অন্যকালে, অন্য দেশে

'আন্ পারসন্'

দেশের বন্ধন-মুক্তিই হোক বা মনের বন্ধন-মুক্তিই হোক—এই ধরণের বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামে রাষ্ট্রশক্তির হাতে গ্রেপ্তার হ'বার একটা রোমাঞ্চ আছে। যে কোনো কালে, যে কোনো দেশেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে। গ্রেপ্তারের যে একটা হেতু সব সময় খুঁজে পাওয়া যাবে তা নয়। গ্রেপ্তার নিবর্তনমূলক হতে পারে। অর্থাৎ, যাদের গ্রেপ্তার করা হোলো, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কোনো কাজে তার আশু লিপ্ত হবার আশঙ্কা রয়ে গেছে, শাসন ক্ষমতায় আসীনেরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ত্রস্তভাবে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেন। আবার কেউ বা কোনো সরকার-বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত হবার পর গ্রেপ্তার হলেন। যারা জেনেশুনে এই দুই ধরণের গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেন, আদর্শবোধ বা জীবননীতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পরিচালনা করে থাকে। অবশ্যি, নিছক ক্ষমতালাভের আকাঙ্খাও যে কোনো কোনো দলবদ্ধ মানুষকে এই ধরণের কাজে নিয়োজিত করেনা, তা নয়। তবে এই শ্রেণীর দলবদ্ধ মানুষরা রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নের মুখে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন না, হাল ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মরক্ষার মসৃণ পথ খুঁজতে হয়। কিন্তু যাঁরা 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা,' আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে যান, আদর্শের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে যান, তাঁদের কোনো নিপীড়নই নিরস্ত করতে পারে না। এঁরা 'স্থিতপ্রজ্ঞ', এঁরা অমৃতের সন্তান, দুর্লভ এঁদের মানবজন্ম।

শাসকদল এদের ওপরও কলঙ্ক আরোপ করে এদের ঋজু মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে চান। যেমন দেশের বিপ্লবীদের এককালে ইংরেজ শাসকরা 'টেররিষ্ট'—অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী—আখ্যায়িত করে লঘু করতে চেয়েছিলো। 'সন্ত্রাস' কোনো গৌরবের তকমা নয়, উদ্দেশ্যহীন আতঙ্ক সৃষ্টি, আকারণ হত্যার বিভীষিকা দিয়ে ঘেরা ধ্বংসের আবর্তই এদের উপজীব্য—ইংরেজ সরকার ভারতীয় জনমানসে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন। ইংরেজের চোখে যাঁরা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী, ইতিহাসের চোখে তারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিপ্লবী-রূপে আর তাঁদেরই কোনো কোনো সতীর্থ মৃত্যুহীন প্রাণের প্রতিষ্ঠা দিয়ে শহীদের জয়মাল্য নিয়ে মহা-প্রস্থানের পথে চলে গেছেন।

এঁদেরই কত রকমারিভাবে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে। গোয়েন্দাদের সে এক কলাচাতুর্য! যারা কোনো সাতে-পাঁচে নেই এমন লোক হঠাৎ গ্রেপ্তার হলে বিহ্বল হয়ে যান। নিরুদ্বিগ্ন পথচারী রাস্তায় চলতে চলতে গ্রেপ্তার হলেন; পথে অজ্ঞাত-পরিচয় গোয়েন্দারা হয়তো তাকে ডেকে বললেন—"শুনুন"। তারপরই তাকে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো, হয়তো বা সানুনয় নিবেদন করলো গোয়েন্দারা তার কাছে, "মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" সেই অর্ধ ঘণ্টা ব্রহ্মার মুহূর্তেরই মত; পাঁচ মাসও হতে পারে, পাঁচ বছরও হতে পারে। আর নিরুদ্বিগ্ন বন্দী মানুষটির মনে অহরহ প্রশ্নের ঝড় বয়ে চলেছে: "আমাকে গ্রেপ্তার! কেন!"

আর যিনি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নানা ছলা-কলার আড়ালে সংগ্রামের ছক রচনা করে চলেছেন, তাকে ঠাহর করতে বেগ পেতে হয় গোয়েন্দাদের। ইনিও নিস্তরঙ্গ, নিরুদ্বিগ্ন; সাধারণের একজনরূপে নিজেকে বিস্তার করে চলেছেন-যেন একেবারেই "অর্ডিনারী নো-বডি,"—সাধারণের চাইতেও সাধারণ, ভাবে-সাবে, আচারে-আচরণে। মুহূর্তের জন্যও তার দিকে মুখ তুলে চাইবার প্রয়োজন নেই, সদাজাগ্রত আইনের প্রহরীদের। এই প্রহরীরা ওঁত পেতে থাকেন জনতার ভিড়ের বাইরে নিভৃত আনাগোণার সন্ধানে যদি বা কোনো সূত্র থেকে আঁচ করা যায়, কোথায় গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে বহুবাঞ্ছিতদের। সামান্য আভাসেই জাল ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। বাড়ীর ফটকের সামনে মুচী জুতো সেলাই করছে মন দিয়ে, হয়তো বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। ভিখিরি অপ্রতিভ মুখাবয়ব নিয়ে ভিক্ষা করছে আসে-পাশে। দেখে বুঝবার উপায় নেই, এদের নকল চেহারার আড়ালে অনুসন্ধিৎসু আসল চোখের দৃষ্টি অন্য কিছুর দিকে নিবদ্ধ। তাদের শিকার এ-পথে যাতায়াত করে, এরকম একটা খবর তাদের কাছে পৌঁছেছে। তারপর একদা সেই পথে শিকার যদি কোনোও দুর্লগ্নে দেখা দিলেন, তার চারপাশে অভিমন্যুর ব্যূহ রচনা করতে দেখা গেলো—সেই মুচি, বাউল, ভিখিরি, মুটে, খঞ্জ ইত্যাদিদের—যারা ছলনার আবরণ খুলে ফেলে আত্মপরিচয় দিয়ে ঘোষণা করেন: 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হোলো। আমরা সব গোয়েন্দাবিভাগের লোক। আপনার জন্যই আমাদের এই বহুরূপী বেশে দীর্ঘ অপেক্ষা।'

এ-এক রোমাঞ্চকর গ্রেপ্তার। প্রাক্-গ্রেপ্তার উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে ফেরারী সংগ্রামী ঘুরছেন। কোন্ দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ এসে তাকে বন্দীশালায় তুলে নিয়ে যাবে, সেই অনুচ্চারিত উচ্চকিত উৎকণ্ঠা নিয়ে তার যাতায়াত। তারই মাঝখানে সকল সতর্কতার বর্মভেদ করে গ্রেপ্তারের বেষ্টনী তাকে ঘিরে ফেললো। তারপর বন্দীশালার দীর্ঘ অবসরে সংগ্রামের আর এক পর্যায় সুরু।

গ্রেপ্তারের আরও রকমারি ঢং আছে।—রাত দুপুরে বাড়ী ঘিরে গ্রেপ্তার। কিছু ঘটার পূর্বেই আক্রমণ, কিম্বা কিছু ঘটলে রাত্রির আড়ালের এই

আক্রমণ, যাতে শিকারের এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় না থাকে। সামরিক ভাষায় যাকে বলা যায় 'Pre-emptive Strike'। যেমন ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে স্বয়ং প্রাক্-যুদ্ধ আক্রমণে ইসরাইলী বিমান বাহিনী মাটিতে অপেক্ষমান মিশরীয় বিমানবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো। রাত্রির গ্রেপ্তারে শিকারকে পেলে, তাকে আলতোভাবে তুলে নিঃশব্দে সরে পড়লো শিকারীর দল। অস্ত্রপাতির সন্ধানে এলে তল্লাসীর তোড়জোড়, বিভীষিকার রেশ ছড়িয়ে দিয়ে গেলো। আর যদি জিঘাংসার মন নিয়ে কোনো পুলিশের বড় কর্তার কিম্বা কোনো উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজ-কর্মচারীর হত্যার প্রতিশোধ তুলতে রাত্রির অভিযান হয়—যেমন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘটেছে—আক্রান্ত বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ভাঙ-চুর, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নির্বিচার মারপিট, দীর্ঘকালের জন্য পরিবারে ও পাড়ায় সন্ত্রাসের ছাপ রেখে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারেরও কোনো বাছ-বিচার নেই —প্রাপ্তবয়স্কদের পাইকারীহারে গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়েছে, ব্যায়াম-পুষ্ট শরীরে দৈহিক পীড়নের ঢল নেমে এসেছে। একদা বাংলাদেশ—ইংরেজ আমলের বাংলাদেশ—এই অভিজ্ঞতার নিকষে পুড়ে নিখাদ হয়ে বা'র হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে তার পুনরাবৃত্তি থেকে কীই বা বাদ গেছে?

এই রোমাঞ্চও স্তিমিত হয়ে যায়। জীবনভোর বন্দীশালার ডাক পড়লে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার, প্রাক্-গ্রেপ্তার ও গ্রেপ্তারের রোমাঞ্চ তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাবেই! তাই যত দফা গ্রেপ্তারের ডাক পড়ে সংগ্রামীর, রোমাঞ্চও সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে অনিবার্যভাবে। তাছাড়া, রোমাঞ্চ বয়সেরও একটা স্বধর্ম বটে। তরুণ বয়সের গ্রেপ্তার, আর পরিণত বয়সে পৌনঃপুনিক গ্রেপ্তারের মানস-ক্রিয়া তো ভিন্নতর হবেই! কিন্তু যে বয়সে হোক, যত দফায় হোক, গ্রেপ্তারের ও-পিঠে কিছুটা বিষাদ অপেক্ষা করতে থাকবেই। কারণ এত সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের গতিপথে গ্রেপ্তার সাময়িক ছেদ টেনে দিয়ে যায়, একটি অসমাপ্তির রেশ তুলে দিয়ে যায়। আতোঁল ফ্রান্স যে কোনো পরিবর্তনের মধ্যে বিষাদের ছায়াপাত দেখে বলেছিলেন: "All changes, however small have their melancholy." গ্রেপ্তার আর বিষাদ, এপার আর ওপার!

কিন্তু গ্রেপ্তার কি রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান হতে পারে? বাংলা সাহিত্যে তার স্বল্প-স্বাক্ষর রয়েছে। সেখানে সামান্য পরিধিতে ইতিহাস, সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। জারের আমলে গ্রেপ্তার-কারাগার প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাহিত্যে এখানে-সেখানে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু লেনিন-ষ্ট্যালিনের সোভিয়েত রুশের জীবনে প্রাক্-গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার ও উত্তর-গ্রেপ্তার পর্ব ইতিহাস, সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে, শিল্পী সলঝেনিৎ-সিনের অনুপম সাহিত্যসৃষ্টিতে।

'গ্রেপ্তার! সে তো জীবনের গতিপথে ধ্বস্, আত্মিক ভূকম্পন, যাকে সামলানো যায় না!' এমনি

ভাষায় সলঝেনিৎসিন বিপ্লবোত্তর রুশ-সাহিত্যে, ব্যক্তিজীবনে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন। 'আমরা প্রত্যেকেই সৌরজগতের এক একটি কেন্দ্র বিশেষ। সেই সৌরজগৎ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়, যখন কেউ এসে কানের কাছে হিস্ হিস্ করে বলে ওঠে—তোমাকে গ্রেপ্তার করা হোলো'—'Each of us is a Center of the universe, and that universe is shattered when they hiss at you : "you are under arrest." আর তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ স্তব্ধ অবিশ্বাস নিয়ে অস্ফুট ধ্বনিতে গ্রেপ্তারের শিকারকে বলতে শোনা যায় 'আমাকে?' 'কেন?' "...Me?" "what for?" মুহূর্তের মধ্যে বর্তমান, অতীতে বিলীন হয়ে গেলো। আর অদৃষ্টের পরিহাস, অতর্কিত গ্রেপ্তারে বিধ্বস্ত মানুষটির মনে বার বার একটি কথাই দোল খেয়ে যাবে : 'নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়ে থাকবে, ওরা ভুলটা সংশোধন করে নেবে।'

সে কি তাণ্ডব! রাত্রির নৈঃশব্দে দরজায় বিকট ধাক্কায় দরজা খোলামাত্রই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিভাগীয়দের আবর্জনাময় ভারী বুট নিয়ে উদ্ধত প্রবেশ, সঙ্গে তল্লাসীর ভীত-কম্পিত সাক্ষী রয়েছে, ত্রস্ততায় ঘুম ভেঙে যে এদের সঙ্গী হয়েছে। কম্পিত হাতে গ্রেপ্তারের শিকারের প্রিয়জনেরা তার জামা, কাপড়, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, কিছু টুকিটাকি খাবার জড়ো করছেন। নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দাদের তো আর তর সয়না! সন্ত্রাসের ত্রস্ততায় সকলকে আচ্ছন্ন করে গোয়েন্দাদের কেউ মিথ্যা হাঁক দেবে..... "কিছুই সঙ্গে দেবার দরকার হবে না। সেখানে ভাল খাবার দেবে, থাকবার জায়গাটিও উষ্ণ।" তারপর সুরু হবে ঘরের মধ্যে ভাঙ-চুর। বাক্স-পেটারা খুলে জিনিষপত্র মেঝেতে ফেলে লণ্ড-ভণ্ড স্তূপ জড়ো করা হবে। এটা আছাড় দিয়ে চুরমার করা হবে, ওটা দেয়াল থেকে টেনে ফেলে দেওয়া হবে! আর স্তূপীকৃত জিনিষগুলিকে ভারী বুটের তলায় পিষে ফেলে পৈশাচিক তাণ্ডবে মসগুল হয়ে থাকবে শিকারীর দল। এখানেই শেষ নয়। যা কিছু হাতের কাছে পাবে, সব মালপত্র তারা নিয়ে যাবে, কখনও বা যে অভাগা গ্রেপ্তার হলেন তার কাঁধে সেই মালপত্র চাপিয়ে দিয়েই। কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।' যে পরিবার থেকে গ্রেপ্তার করা হোলো, সেই পরিবার চিরজীবনের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেলো, এবং পীড়ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনার অভিশাপ তাদের ছায়ার মত সারাজীবন অনুসরণ করবে। বন্দীশালায় বন্দীর খাবার প্যাকেট পৌঁছে দেবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে—কখনও বা দিনের পর দিন—তাদের হয়তো বা শুনতে হবে 'ও নামে কেউ এখানে নেই', অথবা 'এ নাম আমরা কদাপি শুনি নাই।' আর চিঠির উত্তর! ছ'মাস, এক বছর বাদে হয়তো বা বন্দীর জবাব পাওয়া যাবে। কিম্বা মোক্ষম জবাব আসবে কর্তৃপক্ষের : 'বন্দীর চিঠি লেখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে' অথবা : 'চিঠিলেখার অধিকার

নেই'—এই সাঙ্কেতিক সংবাদ-এর প্রকৃত অর্থ হল "গুলি করে মারা হয়েছে'—"Has been shot."

গ্রেপ্তার এমন কোনো নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব ঘটনা নয়। সোভিয়েত রুশে গ্রেপ্তারের তত্ত্ব অপরাধ আইনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। সলঝেনিৎসিন দেখেছেন অপরাধতত্ত্বের পৃষ্ঠপটে একটি সমাজতত্ত্ব,—যা গ্রেপ্তারকে একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। সেখানে গ্রেপ্তারের বিন্যাস কত বিচিত্র! নানা মাপকাঠি দিয়ে গ্রেপ্তারের বিন্যাস রচিত: রাত্রিবেলা এবং দিনের বেলা; বাড়ীতে, কর্মস্থলে, ভ্রমণরত অবস্থায়. প্রথম দফায় গ্রেপ্তার, পুনরাবৃত্তি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত গ্রেপ্তার। এ-ছাড়া চমক লাগানো গ্রেপ্তার, প্রতিরোধের মুখে গ্রেপ্তার; গ্রেপ্তারের সময় তল্লাসীর রকমফের, আটক মালের ফিরিস্তি করা কি না করা, গ্রেপ্তারের পর ঘর শীলমোহর করে দেওয়া। স্বামীর পর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে সন্তানদের অনাথালয়ে প্রেরণের অথবা পরিবারের অবশিষ্টদের নির্বাসনে অথবা বৃদ্ধদের কোনো শ্রম-শিবিরে পাঠাবার বিধানও রয়েছে।

এখনও ফিরিস্তি ফুরায় নি। আরও বিচিত্রতর গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা রয়েছে. দু'জনে মিলে বলশয় থিয়েটারে গেলেন, একজন হাঙ্গেরীয় মহিলা আর একজন গোয়েন্দাদপ্তরের জিজ্ঞাসাবাদকারী কর্মচারী। থিয়েটার শেষ হলে দেখা গেলো মহিলাটিকে তার গোয়েন্দা সঙ্গী সোজা মস্কোর বিখ্যাত বন্দীশালা লুবিয়াঙ্কায় হাজির করে দিলো। এই মহিলা দুটো টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান কমিনটার্নের সাহায্যে। কখনও বা দেখা গেলো পথে দেখা একটি মেয়েকে নিয়ে একটি পুরুষ ট্যাক্সিতে উঠছে। আসলে মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করে লুবিয়াঙ্কায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। মেয়েটি দোকান থেকে কিছু জামার কাপড় কিনে সবে মাত্র রাস্তায় বা'র হয়েছে।

পার্টির কিম্বা সামরিক বিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে গ্রেপ্তার করতে হবে, তাদের নূতন কাজের ভার দিয়ে রেলে পৃথক গাড়ীতে পাঠিয়ে পথে তাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। গ্রেপ্তারের হিড়িকে কোনো অখ্যাত পার্টি সদস্য ম্রিয়মান হয়ে রয়েছেন। তাকে হঠাৎ পার্টি দপ্তরে ডেকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সোচি স্বাস্থ্য-নিবাসে যাবার টিকিট দেওয়া হল। সস্ত্রীক ষ্টেশনে পৌঁছালে একটি মিষ্টিভাষী ব্যক্তি যাত্রীর স্ত্রীকে নমস্কার করে এক মিনিটের জন্য যাত্রীটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। হাতে হাত ধরে সেই ব্যক্তিটি যাত্রীটিকে নিয়ে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলো!

সোভিয়েত রুশে এ-ছাড়াও আরও বিচিত্র পদ্ধতি রয়েছে গ্রেপ্তারের। ফ্যাক্টরীতে প্রবেশপত্র পরীক্ষা করিয়ে সবেমাত্র কর্মীটি ফ্যাক্টরীর অলিন্দে দাঁড়িয়েছে, পাশে ডেকে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হোলো। পেটে অস্ত্রোপচারের মাঝখানে গ্রেপ্তার করা হোলো। খাবার দোকানে নিমন্ত্রিত গ্রেপ্তার হয়। রাত্রিতে যে ধর্মীয় পরিব্রাজকটিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিলো, সে-ই

আশ্রায়দাতাকে গ্রেপ্তার করলো, ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষক মিটার পরীক্ষার আছিলায় গৃহস্বামীকে গ্রেপ্তার করলো। সাইকেল আরোহী পথে সাইকেলের ধাক্কা দিয়ে আহতকে গ্রেপ্তার করলো। রেলওয়ে কণ্ডাকটার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, সিনেমার ম্যানেজার, যে কেউ যে কোনো নাগরিককে যে কোনো সময় গ্রেপ্তার করতে পারে। মেরুণ রঙের গোপন গোয়েন্দার পরিচয়পত্র এরা সময়মত খুলে বার করে দেখায়। ততক্ষণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অব্যাহতি পাবার আর কোনো সুযোগ থাকে না।

সলঝেনিৎসিন বলছেন : 'কয়েক দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তার কোনো অপরাধই করেন নাই, তাই তাদের দিক থেকে প্রতিরোধের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। সোভিয়েত গোয়েন্দা পুলিশ GPU-NKVDর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ তাদের কাছে খোলা ছিল না এবং নিশ্চিত ধ্বংসই তাদের নিয়তি—"There was a general feeling of being destined for destruction, a sense of having no-where to escape from the GPU-NKVD…'

গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ! বন্দীর শরীরে কোনো আঘাত চিহ্ন না রেখে, তার মনোবল ভাঙবার জন্য ৩১-দফা নিপীড়নের পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টালিনের গোয়েন্দারা বন্দীর কাছ থেকে মিথ্যা স্বীকৃতি আদায় করে তাকে দীর্ঘ বছরের জন্য বন্দী-জীবন ও নির্বাসিত জীবনে নিষ্পেষিত করেছে! সলঝেনিৎসিনের নিজের অপরাধ ছিল দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় সামরিক অফিসারের দায়িত্বে থেকে অপর এক সামরিক অফিসরকে চিঠিতে স্টালিন সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ করে তাকে 'পাখান' বলেছিলেন। 'পাখান' অর্থ 'বড় চোর', এজন্য তাকে ৮ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছিল।

এই মিথ্যাস্বীকৃতিতে বন্দী নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে এবং অপর ব্যক্তিদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের কারান্তরালে অপসারণের সহায়ক হয়েছে কোন কোন সময় চরম দণ্ডেরও। এই অপরাধ স্বীকারের ফাঁদে পর পর সকল সারির বলশেভিকরা বন্দী হয়ে নির্মম নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। যে যতক্ষণ ক্ষমতায় রয়েছে, ততক্ষণ নির্মম হস্তে সমকালীনদের কাছ থেকে মিথ্যা স্বীকৃতি আদায় করে তাদের মৃত্যুর পথে যাত্রা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরই জল্লাদের খড়্গাঘাতে মৃত্যুর মিছিলে তাদেরও যোগদান করে প্রায়শ্চিত্ত করতে, হয়েছে। ক্ষমতায় মদমত্ত বলশেভিকদের এই ন্যাক্কারজনক পরিণতিকে সলঝেনিৎসিন বলেছেন 'আত্মিক অবমাননা'—"Spiritual baseness"।

প্রাক্-গ্রেপ্তার সংশয়জাল, গ্রেপ্তারের ধাক্কা, উত্তর-গ্রেপ্তার জিজ্ঞাসাবাদে আনুষঙ্গিক অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দুর্জ্জয় আত্মশক্তির উদ্বোধনের উদাত্ত আহ্বান

জানিয়েছেন সলঝেনিৎসিন সর্বকালের সর্বদেশের সংগ্রামীদের কাছে। সলঝেনিৎসিন বলেছেন গ্রেপ্তার হবার মুহূর্তে মসৃণ অতীতকে দৃঢ়ভাবে পেছনে ফেলে আসতে হবে, বন্দীশালার দ্বারপ্রান্তের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে : আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেছে, হয়তো একটু আগেই, কিন্তু এ-বিষয়ে করবার কিছু নাই। আমি আর স্বাধীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারবো না। আমার মৃত্যু অবধারিত,—কিছু সময় আগে বা পরে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যত বিলম্ব হবে, তত সেটা কঠিন হবে। তাই যত দ্রুত হয় ততই ভাল। আমার আর কোনো সম্পদ নাই। যাদের আমি ভালবাসি তারা আমার কাছে মৃত। তাদের কাছে আমিও মৃত। আজ থেকে আমার দেহ আমার নিকট অবান্তর, অপরিচিতও বটে। একমাত্র আমার আত্মা এবং আমার বিবেক আমার কাছে পরম সম্পদের গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করবে :

"From the moment you go to prison you must put your cozy past firmly behind you. At the very threshold, you must say to yourself: My life is over, a little early to be sure, but there is nothing to be done about it. I shall never return to freedom. I am condemned to die—now or a little late, But later on, in truth, it will be even harder, and so sooner the better. I no longer have any property whatsoever. For me those I love have died, and for them I have died. From today on, my body is useless and alien to me, Only my spirit and my conscience remain precious and important to me.'

সলঝেনিৎসিন গ্রেপ্তারের সঙ্গীত রচনা করে আত্মার শক্তি দিয়ে পশুশক্তিকে পরাস্ত করেছেন—যা যুগে যুগে দেশে দেশে অভয় মন্ত্র বিলিয়ে দেবে।

পৌষ ১৩৮১র
পর
কিস্তি ২

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ

o o o o o o o o o o

পুলকেশ দে সরকার

দুই

[জয়শ্রীর পৌষ ১৩৮১ সংখ্যায় পুলকেশ দে সরকার 'সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক একটি আলোচনার প্রস্তাবনা করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বে তিনি দ্বিতীয় কিস্তিটি জয়শ্রীর দপ্তরে জমা দেন। কিন্তু ইত্যবসরে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হ'ল এবং 'প্রেস সেন্সারশিপ' প্রয়োগ হ'ল। স্বাধীনতাপূর্ব ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় প্রেস সেন্সরের নামে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশে যে কঠিন বাধার সৃষ্টি হ'ল তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলকেশ বাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশে জয়শ্রী বিরত রইল। এই সংখ্যায় সেই কিস্তিটি পত্রস্থ করা হ'ল।

সম্পাদক, জয়শ্রী]

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে কিসের দ্বন্দ্ব হয়েছিল? স্বাধীনতা বনাম ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস। স্বাধীনতা বা স্বরাজ কথাটা বাঙলা দেশে নতুন কিছু নয়। অবশিষ্ট ভারতবর্ষ যখন অচেতন তখনই বিপ্লবী বাঙলার লক্ষ্য ছিল স্বরাজ বা স্বাধীনতা। সেটা বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের কাল; ১৯০৫, তেইশ বছর আগে। স্বদেশী আর বয়কট ছিল খোলা হাতিয়ার। আর একটি ছিল গুপ্ত ধারা—সশস্ত্র বিপ্লবের, দেশ-মুক্তির, স্বরাজ বা স্বাধীনতার, কেবল বঙ্গভঙ্গ রদ নয়। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জমিদার সভা। তাদের লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ; তাদের প্রবক্তা ছিলেন আই-সি-এস পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কিন্তু তদ্দিনে বাঙলার তরুণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ, তাদের দুঃসাধ্য-ব্রতের স্বরাজের স্বপ্ন মানিকতলা বাগান বাড়ীর বেড়া ডিঙোতে পারে ন। ১৯১৯ এর শাসন-সংস্কারে স্যার সুরেন্দ্রনাথ হলেন

দ্বৈত-শাসনের মন্ত্রী ১৯২১এ। তখন ঐ বৈপ্লবিক অগ্নির ভস্মাবশেষ একমাত্র গত্যন্তর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ল। যার ব্যক্তিত্বে এ সম্ভব হ'ল, সেই দেশবন্ধু বন্ধ্যা অসহযোগ আন্দোলনের প্রান্তে দিলেন নতুন স্লোগান, বিধানসভার হয় সংস্কার নয় বিনাশ। অসহযোগ-কালীন প্রেরণা চার টুকরো হয়ে গেল। নো-চেঞ্জার (খাদি), প্রো-চেঞ্জার (স্বরাজী), স্তিমিত বিপ্লবী, মুসলিম-জাহান-পন্থী মুসলমান। জনসাধারণ তো চিরকালই মূক।

দেশবন্ধুর অন্তিমের পর তরুণের স্বপ্ন আবার যেন অগ্নিগর্ভ হ'য়ে ওঠে। ১৯২৮-এর প্রোজ্জ্বল কংগ্রেসে তার দীপ্তি দেখা গেল। সুভাষচন্দ্রের সংগঠন শক্তিকে দেখে আতঙ্কিত গান্ধীজী ব্যঙ্গ করলেন একে "সার্কাস" বলে। কংগ্রেসের এমন অধিবেশন সেকালে ছিল অভূতপূর্ব। যেমন এর ব্যাপ্তি, তেমনি এর রৌদ্র-রূপ। ১৯০৫ এর বঙ্গশক্তির যেন পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল।

১৯০৫ এর উৎস থেকে যেমন অগ্নি-ঝরা ১৯০৮; ১৯২৮ এর উৎস থেকে তেমনি ১৯৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫।

১৯২৮এ সুভাষচন্দ্র কি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন? কংগ্রেস অধিবেশনের আগে স্বচক্ষে দেখেছি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ—কেরাণী বাঙালী কৃশ সন্তানদের। নিয়মানুবর্তিতাই শুধু নয়, পদক্ষেপের তালে তালে দৃপ্ত জিজ্ঞাসা, হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ডে সঙ্কল্পের লাপডাপ। কলেজস্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কল্পনাতীত বর্ণাঢ্য মিছিলে আশ্চর্য নারীবাহিনী, হঠাৎ বন্ধ আঙিনার সব দ্বারগুলো খুলে দিয়ে মেয়েরা এসেছেন রাস্তায়, তালে তালে পা ফেলে চলছেন, ছেলেদের সঙ্গেই, এমনি করে যাবেন হাওড়া থেকে পার্ক-সার্কাস। দেশবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নিজের বাড়ীর পর্দা দিয়েছিলেন ছুঁড়ে, স্বয়ং বাসন্তী দেবী খোলা রাস্তায় এসে ধরা দিয়েছেন পুলিশের প্রস্তুত বেষ্টনীতে, দেশবন্ধুর যোগ্যতম শিষ্য সুভাষচন্দ্র দিলেন প্রতিটি বঙ্গ নারীর সামনেকার চিক তুলে।

মাত্র বছর দু'য়েক আগে কলকাতায়-আসা মফঃস্বল শহরের তরুণ আমি, আমার চোখে পড়ল নতুন কাজল, দিব্যদৃষ্টি। বিপ্লবী দাদাদের মুখে কুব্যাখ্যা কু-প্রচার সত্ত্বেও যে নারী-শক্তির অভিব্যক্তি দেখেছিলাম সেদিন, আজও মনে পড়লে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন নারী-মুক্তি।

শুধু তাই নয়, পার্কসার্কাসের গান্ধীজী-কথিত সার্কাসে ঘোড়ার-নাচন নাচিয়েছিলেন তিনি বেনিয়া-বাদের পদানুসারীদের। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যাঁর স্বাধীনতা-প্রস্তাব তোলবার কথা ছিল তাঁকে পায়েব করলেন গান্ধীজী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিলেন গান্ধীজী। সর্বনাশের খবর যখন পৌঁছালো সুভাষ-শিবিরে, টললেন না তিনি, প্রকাশ্য অধিবেশনে আনলেন স্বয়ং সে প্রস্তাব। ইতিমধ্যে জওহর-পিতা প্রেসিডেন্ট ম তলাল নেহেরুর যোগসাজসে গান্ধীজী ভবিষ্যৎ

নেতৃত্বের উপঢৌকনও রাখলেন পিতৃদেবের সামনে। সুভাষচন্দ্র সেই থেকে খারিজ। স্বাধীনতা প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের হ'ল হার—দেশে সুনিশ্চিত নায়ক হ'লেন তরুণ জওহরলাল নেহেরু। সুভাষচন্দ্রের নিঃসঙ্কোচ স্বার্থত্যাগের, যাঁর কোন তুলনার ভিত্তি-ছিল না, এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে-গান্ধীজী যেখানে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা প্রস্তাবকে দু'বছর ঠেকিয়ে রাখতে, তার মেয়াদ হ'ল ১৯২৯ এর রাত বারোটা। জওহরকে করেছেন সভাপতি, সূত্রধর গান্ধীজী ঘড়ি ধরে বসে আছেন বৃটিশ-উপহার—ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস — পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশায়, সেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস, যা এসেছিল দেশবন্ধুর কাছে, কিন্তু গান্ধীজী আলি ভাইয়ের কারামুক্তির শর্তে বাতিল করে দিয়েছিলেন। আসোন। স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হ'ল ১৯২৯-৩০ এর সন্ধিক্ষণে, নবদিগন্তে উষার আলো ফুটতে আর কতই বা দেরী ?

কিন্তু গান্ধীজী সাবধান করে দিলেন, স্বাধীনতার প্রস্তাব কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণা নয়। জাতীয়তা-বাদের প্রতীক স্বাধীনতাপন্থী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পড়লেন বাদ। একেবারে নিরঙ্কুশ যেনিয়া-পার্টি। কেউ কেউ বলেছিলেন, সমন্বয়ের জন্য কমিটিতে বিরোধী বক্তব্যও থাকা উচিত, গান্ধীজী বলেছিলেন, না, একমতাবলম্বী চাই। হোমোজিনিয়াস ক্যাবিনেট। পাকা পার্টি, কংগ্রেস সেই থেকে আর বহুমতানুসারী দেশপ্রেমিক-দের প্ল্যাটফর্ম নয়। বৈশ্যতান্ত্রিক একমতানুসারীদের নিরেট পার্টি।

১৯২১-এর চৌরাচৌরিতে প্রথম টেস্ট কেস। ১৯২৮-এ দ্বিতীয় টেস্ট কেস. ১৯২৯-এ স্বাধীনতা-প্রস্তাবে তৃতীয় টেস্ট। সুভাষকে সরাসরি বর্জন। কেননা ১৯২৯ ছিল স্বালাময়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় ট্রেডস ডিসপিউট্স বিলের সময় ভগৎ সিং-বটুকেশ্বর দত্তের বোমানিক্ষেপ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী যতীন দাসের অনশনে আত্মদান, ভগৎ সিং প্রমুখের গলায় ফাঁস নামছে। যতীন দাসের এই অসামান্য আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিরূপ কথা লিখতে হ'ত ব'লে গান্ধীজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া ছিল মৌন ; কেননা, অনশনে মৃত্যু নয়, অনশনে ভয় দেখানোর অধিকারে যেখানে তিনি কাউকে অংশ দিতে রাজি ছিলেন না, সেখানে সত্যিই একেবারে আমরণ অনশন ! মন্তব্য অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বিস্ময়ের এই, গান্ধীজী নিজ হাতে জওহরের কণ্ঠদেশে ভাবী-নেতৃত্বের বরমাল্য দুলিয়ে দিলেও ভারতবর্ষের যুবসমাজের আহ্বান আসছিল সুভাষচন্দ্রের কাছেই অনেক বেশি এবং বৃটিশ সরকার ও তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বও তা নোট করে যাচ্ছিলেন।

বড়লাট লর্ড আরুইন যখন ঘোষণা করলেন, সাইমন কমিশনের ভিত্তিতে এক গোল বৈঠক হবে লণ্ডনে, গান্ধীজী সে ঘোষণা লুফে নিলেন ; তাঁর নেতৃত্বে তাঁর সমভাবাপন্ন

মতিলাল, জওহরলাল প্রমুখেরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জন্য দিলখোসি এক ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্র প্রমুখেরা প্রতিবাদী এক পাল্টা ইস্তাহার জারি করলেন। গান্ধীজী সুকৌশলে জওহরলালকেই লাহোর কংগ্রেসের মসনদে বসালেন। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হবে তিনি জানতেন। কিন্তু তার আগে তিনি বড়লাট আরুইনের সঙ্গে দেখা করলেন। বহু-প্রার্থিত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস যখন এলই না, স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। সুভাষচন্দ্র বললেন ন্যায় শাস্ত্রানুসারে একটা পাল্টা সরকার করতে হয়; কিন্তু রাজনৈতিক ম্যাজিকে বরাবর বিশ্বাসী গান্ধীজী স্বভাবতই তা নাকচ করে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবার আগে, অথবা ডাণ্ডীমার্চের আগে, আবার মিনতিপূর্ণ চিঠি লিখলেন বড়লাটকে—সেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের জন্যই আকুতি। কিন্তু বৃটিশ সরকারের দিক থেকে কোন সাড়া আসে না, দেশে বিক্ষোভ এবং উত্তালও আয়ত্তাতীত হয়ে উঠছে। ধরসনা লবণের গোলা দখলের অভিপ্রায় জানিয়ে আবার বড়লাটকে চিঠি লিখলে বৃটিশ সরকার গান্ধীজীকে বন্দী করলেন যারবেদা জেলে এবং সেখান থেকে নিরুপদ্রব আপোষ প্রস্তাব চলল। ১৯৩১-এর ৫ই মার্চ ভারতব্যাপী প্রবল গণ-আন্দোলনের ওপর প্রবলতর আঘাত মেরে তাকে গান্ধীজী চৌরিচৌরার মতই দিলেন পঙ্গু করে এবং এই পঙ্গুত্বের অ্যানেসথেসিয়ায় আর এক নাম গান্ধী-আরুইন চুক্তি। চুক্তি নয় বৃটিশ কূটনীতিকদের একতরফা জয়: প্রথম শর্ত, আন্দোলন প্রত্যাহার; দ্বিতীয় শর্ত, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগ দান; তৃতীয় শর্ত, হিংসাত্মক ঘটনামুক্ত সত্যাগ্রহীদের কারামুক্তি।

স্বাধীনতা নয় সমঅংশীদারত্ব

স্বাধীনতা-আন্দোলন জাহান্নমে গেল, কারণ বরাবর বৃটিশ সহযোগী গান্ধীজীর তা আদৌ কাম্য ছিল না। গোলটেবিল গোল হয়ে এক বিরাট শূন্য আঁকল। সেখানে তো কোন সমস্যার মীমাংসা হলই না, কূটনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে তিনি সমস্যাগুলোকে আরও ঘোলা ও ঘোরালো করে দিয়ে এলেন। তিনি সেখানে লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব ভুলে নিয়ে সম-অংশীদারত্বের জন্য ওকালতী করলেন, কেন না, তাঁকে ব্রিফ করবার জন্য পেছলেন ভারতীয় বেনিয়া শ্রেণীর জি ডি বিড়লা। কংগ্রেস গান্ধীজীর সম্পূর্ণ কুক্ষিগত এবং সেই সুবাদে ঐ গোলাকার বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন গান্ধীজী; রাজনৈতিক পরামর্শ দিতে পারে সারা ভারতে এমন একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিই খুঁজে পাননি, তাই সঙ্গে নয়েছিলেন তাঁদেরই একজনকে যিনি ছিলেন সেকালের বণিক শ্রেণীর বর্শাফলক এবং গান্ধীজীর পৃষ্ঠপোষক। অথবা কংগ্রেস যেমন একান্তভাবে গান্ধীজীর কুক্ষিগত, মুসলিম লীগে যেমন একছত্র জিন্না, তেমনি গান্ধীজীও বিড়লাগোষ্ঠি ভুক্ত ভারতীয় বণিকশ্রেণীর কুক্ষিগত। গান্ধীজী যে

এই বেনিয়াদেরই মুখপাত্র দ্বিতীয় গোলটেবিলে তা যেমন নগ্ন হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে যে জটিলতর ক'রে দিয়ে এলেন তার কারণও এই যে, আসলে গান্ধীজী যেমন ছিলেন হিন্দু বেনিয়াশ্রেণীর কণ্ঠ, জিন্না তেমনি ছিলেন মুস্‌লিম বেনিয়াশ্রেণীর কণ্ঠ, বৃটিশ কূট-নীতিকেরা বসে মজা দেখছিলেন এঁদের খেলা। লক্ষ্য করছিলেন বুদ্ধিদীপ্তি ও কূটনৈতিক চালে গান্ধীজী জিন্নারও সমকক্ষ নন, বৃটিশ কূটনীতিকদের সমকক্ষ হওয়া তো দূরস্থান। ওঁরা হেসে বললেন, তোমাদের খেলার আমপায়ার হিসেবে আমরাই একটা মীমাংসা করে দেব। তোমরা বাড়ী যাও।

বৃটিশ কূটনীতিকেরা বুঝে নিলেন, গান্ধীজীর কংগ্রেস স্বয়ম্ভর নয়, তার দুর্বলতা মুসলিম সম্প্রদায়, গান্ধীজীর কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের, একথাটি ভুয়ো, সে মুস্‌লিম সম্প্রদায়কে পৃথক জ্ঞান করেই একটা ভাগাভাগির রফা করতে মনের দিক থেকে প্রস্তুত, ব্যস্তও। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এ-নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতেই এ মানসিকতা প্রকট হয়েছিল। তিনি সুভাষচন্দ্রকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথক নির্বাচন মেনে নিলে সুভাষচন্দ্রের আপত্তি আছে কি না। সুভাষচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে করাচীতে শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেছে। সারাদেশে জাতীয় অবমাননাকর গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ছিল তাকেই ভাষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র এক প্রস্তাবে; প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল; সেদিনকার নির্লজ্জ নেতৃত্ব ঐ প্যাক্টকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সুতরাং সুভাষচন্দ্র ছিলেন একা; অর্থাৎ জাতীয় সম্মানের একক মশালধারী নেতা। দ্বিতীয় গোলটেবিলে গান্ধীজী একা এবং বেনিয়া কুক্ষিগত কংগ্রেসে তিনি নিরঙ্কুশ। জি ডি বিড়লাকে পাশে রেখে পাশা যা খেললেন, দেখে বৃটিশ কূটনীতিকেরা হাতের দস্তানায় হাসি চেপে রাখলেন।

শূন্য হাতে গান্ধীজী ফিরে এসে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। ১৯৩০এ গণআন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে এবং বৃটিশ সরকারকে দমননীতি অবলম্বনের অবকাশ দিয়ে গান্ধিজী তাঁর যথার্থ ভূমিকাই পালন করেছেন। তবু যে বিক্ষোভ ধূমায়িত তারও তো একটা প্রকাশ হওয়া দরকার এবং গোলটেবিল যাতায়াতের ব্যর্থতা ঢাকাও অত্যন্ত জরুরী। অতএব আর একটা আন্দোলন যদি করতেই হয় এবং কর্তার ইচ্ছায় যখন কর্ম তখন একবার কর্তাকে জানাতেই হয়। কিন্তু বড়লাট তাঁর সাক্ষাতের প্রার্থনা কেবল নামাঞ্জুরই করলেন না, গান্ধীজীর দ্বিধাজড়িত একটি পদক্ষেপের উপক্রমেই চালান দিলেন তাঁকে জেলে। তাতে কর্তারও মুখ রক্ষা, গান্ধীজীরও মুখ রক্ষা হল।

বৃটিশ কূটনীতিকেরা প্রতিশ্রুত তৃতীয় গোল-টেবিল দিলেন নাকচ করে এবং গান্ধীজীরই মনঃপুত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ দিলেন প্রকাশ করে। হঠাৎ গান্ধীজীর হৃদয়টা কেঁদে উঠল আর এক কারণে। ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষকে দুটি বড় সম্প্রদায়ে ভাগ

করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, হিন্দুদেরও বিভক্ত করে দিয়েছেন জাত-হিন্দু আর তপশীলি হিন্দু ; এঁদেরও পৃথক নির্বাচন। হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনে প্রাণ কাঁদল না একটুও, জাত-হিন্দু আর তপশীলি হিন্দুদের পৃথকীকরণে কেঁদে আর একবার তিনি জিন্না ও বৃটিশ কূটনীতিকদের কাছে স্বীকার করলেন, তিনি সর্বাংশে হিন্দু এবং তাঁর কংগ্রেসও হিন্দু।

তিনি আমরণ অনশন সুরু করলেন কার প্রতিবাদে? হিন্দু-মুসলমান পৃথক-নির্বাচনের জন্য নয়, জাত-হিন্দু তপশীলি-হিন্দুদের পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে। এবং যতীনদাসের মৃত্যুতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, অনশন করে মরতে পারেন খুব কম মানুষই, হুমকি দিতে পারেন অনেকেই। সুতরাং, তিনি জানতেন মরতে তাঁকে হবে না, আপোষ একটা হবেই। কি আপোষ হ'ল? 'অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য' আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল বিধান-সভাগুলোতে যেখানে ৭১টি, সেখানে তা হল ১৪৮টি।

আন্দোলনের গতি ধারা

এরপর গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন কোন দিকে ধাবিত হল?—না, অস্পৃশ্যতা নিবারণের বা হরিজন আন্দোলনে। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর আন্দোলনের এই আর এক বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ঐক্যের ওপর জোর না দিয়ে জোর দিয়েছেন অনৈক্যের ওপর। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না, অন্তত বেশ কিছুকাল তাদের সংখ্যাই ছিল প্রবল, যদ্দিন সত্যিকারের জাতীয় আন্দোলন ছিল। প্রথম তো তিনি একটা জাতীয় আন্দোলনে একটা বিজাতীয়, খিলাফতি বিষ ঢোকালেন অজ্ঞানে নয়, সজ্ঞানে, তারপর একটানা মুসলমানের মধ্যে যে অংশ জাতীয়তাবাদী ছিল তাকে দূরেই ঠেলেছেন এবং জিন্নার গোষ্ঠিকে তোষণ করতে চেয়েছেন, বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে, যাঁরা জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাঁরা বিগড়ে গেছেন। গান্ধীজী কখনো কংগ্রেসের সেক্যুলার সত্তাকে শক্ত করেন নি, জিন্না প্রমুখকে উপলক্ষ্য করে, সাম্প্রদায়িকতাকে মুখ্য করে তুলে, কংগ্রেসকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছেন। আবার স্বাধীনতা আন্দোলন বিসর্জন দিয়ে হরিজন আন্দোলন নিয়ে পড়লেন। অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়বেন কি, খণ্ডের ওপর জোর দিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়েছেন। তারপর তো দেশটাকেই দিলেন তিন টুকরো ক'রে। আজও তার জের চলছে। ভারতবর্ষে মুসলমানরা তখনও ছিলেন সংখ্যালঘু, পাকিস্থান রাজত্ব উপঢৌকন পাবার পর আজও ভারতবর্ষে তাঁরা সংখ্যালঘু, এখনও দুর্বল, অনুন্নত শ্রেণীরা তখনও দুর্বল, তাদের বিশেষ বিশেষ সুবিধে দেবার জন্য ভোট প্রার্থীরা সদাই ব্যস্ত। তাই ভোট শাঠ্যে এদের কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। দেশ সেক্যুলার, সংবিধান সেক্যুলার, কিন্তু কাজের বেলাই সব কিছুই সাম্প্রদায়িক। অপরাধ শুধু হিন্দু হওয়ায়; যত আইন তাঁদের জন্য, মুসলমানদের

সমাজ সংস্কারে হাত দেয় এমন কংগ্রেসী বা কম্যুনিষ্ট এ-ভূভারতে নেই। ঐ এক লক্ষ্য ভোট। ভোট যে মানুষকে কোন দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দেয় আজ যাঁরা রিগিং রিগিং বলে চেঁচান, তাঁরাও ঐ পাঁক মুক্ত হতে পারেন নি। ওটা হচ্ছে প্যাঁচের কথা, যে-যখন যে-ভাবে পারেন অপরকে কাবু করেন। কারুরই দেশ, জাতি, জাতীয়তাবাদ, অখণ্ডতা লক্ষ্য নেই; তাৎক্ষণিক লাভটাই বড়। কম্যুনিষ্টদের তো দেশ, জাতি, জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই, এজন্য তাঁদের চালিত ট্রেড ইউনিয়ান সংস্থা কখনো জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেয়নি, এঁদের সব কিছুই, দেহ-মন-কর্ম-পররাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থে সমর্পিত। গান্ধীজী মুসলমানদের জন্য, হরিজনদের পৃথক স্বার্থের জন্য লড়েছেন, কার্যত সর্বতোভাবে পৃথক শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে পারেন নি। গান্ধীজী, নেহরুজী সবাই 'জাতপাত তোড়' বলে মুখে হেঁকেছেন, ভোটের বেলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাদব, ভূমিহারদের পৃথকই করে রেখেছেন। প্রাদেশিকতারও কার্যতঃ তাঁরাই প্রশ্রয় দিয়েছেন, আজ তামিলনাড়ুর নামে নালিশ করলে চলবে কেন; সে তো বৈচিত্র্যের ভারতে নিজস্ব সত্তা বজায় রাখবার সংগ্রামেই জিতেছে, সংগ্রাম করে চলেছে। ভূ-ভারতে ঐ তো একমাত্র রাজ্য যেখানে দেশপ্রেম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষণগুলো আজও সঞ্জীবিত আছে। ওঁদের জন্যই আজ সারাভারত হিন্দীভাষী হবার মৃত্যু থেকে বেঁচেছে।

গান্ধী-কংগ্রেসের কার্যকলাপের এই এক বৈশিষ্ট্য যে, সুভাষচন্দ্রের প্রতি জাতক্রোধবশত জাতীয়তাবাদকে পরিহার করে সিণ্ডিকেট থেকে ইণ্ডিকেটে এসে ঠেকেছে, অর্থাৎ গোষ্ঠিবদ্ধতা। এই গোষ্ঠির প্রসাদেই চ্যবন মহাশয় সযত্নে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক পটভূমিকার সৃষ্টি করেছেন এবং তারই গায়ে ফুটে উঠছে স্মাগলারদের রাজ্য। এর তাৎপর্য কি? তাৎপর্য-এই, যে-বৃটিশ শোষণ করার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি এবং ইংরাজদের নির্বিচারে গাল দিয়েছি, আজ অবৈধ ঢালাও বিদেশী কারবারে সেই অপরিমেয় শোষণই চলছে, মন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে কবুল করেছেন এই স্মাগলারদের গায়ে হাত দেবার সাহস তাঁদের নেই—তাঁরা নাকি এতই প্রভাবশালী। অর্থাৎ, তাঁরা যে তাঁরাই এই সত্যটা লাইসেন্স-কেলেঙ্কারির চাপাচাপিতে স্পষ্টই ধরা পড়েছে।

কংগ্রেসের বিজাতীয়তাবাদ আজ তাই-এদেশে সোভিয়েট রুশিয়ার চরদের সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে; যদি কোনদিন এখানে অর্ডার অব লেনিন খেতাবধারীদের ডাঙাডাঙিতে হাঙ্গারী-চেকোশ্লোভাকিয়ার পুনরভিনয় হয়; অন্তত ইতিহাসে তা বিস্ময়ের বস্তু হবে না।

এই সর্বনাশ ঠেকাবার জন্যই ঋষিদৃষ্টি নিয়ে একমাত্র জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেছেন।

১৯৩২-এর কৃত্রিম ব্যর্থ আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই সুভাষচন্দ্র আবার ১৮১৮ এর তিন আইনে

বন্দী হন। জেলে আবার শক্ত অসুখে পড়েন। চিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয়ে ইউরোপ যাবেন এই শর্তে একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে তাঁকে ১৯৩৩ এর ২২-এ ফেব্রুয়ারিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি ভিয়েনাতে এক চিকিৎসালয়ে ভর্তি হন। আর, মার্চ মাসে গান্ধীজী সকল ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে নিজের তিন সপ্তাহের সীমাবদ্ধ (আমরণ নয়) অনশন ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গবমেণ্ট তাঁকে ছেড়ে দেন পুনা না ছেড়ে যাবার শর্তে। সেই শর্ত লঙ্ঘন করায় আবার আটক হন এবং আবারই হরিজনদের জন্য প্রাণ পুড়লে অনশন আরম্ভ করেন, সরকারও তাঁকে ছেড়ে দেন।

গান্ধীজীর সংগ্রাম-বিরোধী এই আচরণে ভিয়েনা থেকে ভি. জে. প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র এক যুক্ত-বিবৃতিতে দেশে একটি বিকল্প নেতৃত্বের আহ্বান জানান। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে তাঁর ভবিষ্যৎ "নেতাজী জীবনের" ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তোলেন। ইউরোপ ঘুরে তাঁর এই প্রতীতিও হয়েছিল যে, একটা বড় রকমের যুদ্ধ আসন্ন, বৃটেনের সে দুর্দিনের সুযোগ নিতে হবে।

এদিকে ১৯৩২-এর ব্যর্থতার আরও দুটি অর্থনৈতিক কারণ ছিল এবং আশ্চর্য, ইতিহাস-বিদদেরও এই দুটি কারণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। একটি ম্যানচেষ্টারের সঙ্গে বোম্বাইর, ক্লেয়ার লীজের সঙ্গে মোদির প্যাকট, আর একটি জাপানের সঙ্গে ভারতের ইণ্ডো-জাপানিজ প্যাক্ট। গোল টেবিল বৈঠকে যা হয়নি লীজ-মোদি প্যাক্টে তাই হ'ল —অর্থাৎ সম-অংশীদারত্ব। ম্যানচেস্টারের সঙ্গে বোম্বাইর—আসলে যে-মিশন নিয়ে গান্ধীজী গোল-টেবিলে গেছলেন।

কিসে কি ঘটল? বিলাতীপণ্য বর্জনের ফলে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল; দেশীয় পণ্যোৎপাদকরা দেশের চাহিদা মেটাতে পারছিল না; সে জায়গা পূরণ করছিল জাপানী পণ্য। প্রমাদ গুণল ম্যানচেষ্টার ও বোম্বাই। ম্যানচেষ্টার পুরোণো বন্ধু; কোন আপোষ করতে হয় তো তার সঙ্গেই; বস্তুত ভারতীয় বৈশ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়ারা পলাশীর আমল থেকেই বৃটিশ বুর্জোয়ার পোঁ-ধরা। স্থির হ'ল, হাই টেরিফ তুলে জাপানী পণ্য রুখতে হবে। তাই হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হ'ল লীজ-মোদি প্যাক্ট। ভারতীয় বেনিয়ারা কংগ্রেস সত্যাগ্রহকে যে অর্থের জোগান দিচ্ছিল তা বন্ধ করে দিল। ১৯৩২-এর কৃত্রিম আন্দোলন মরুপথে হারিয়ে গেল। সত্যের পূজারী গান্ধীজী কখনো এ সত্য প্রকাশ করেন নি।

জাপানও বলল, ঠিক আছে, আমরা মজা দেখাতে জানি। তারা ভারতীয় তুলো কেনা বন্ধ করে দিল। তুলা ব্যবসায়ীদের হায় হায়। তখন জাপানকে ডেকে আর একটা প্যাক্ট।

কোথায় রইল গান্ধীকংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন? তাই হরিজনদের ব্যথায় হৃদয়কাতর। ১৯৩৩ এ আর একটি কর্মসূচী নেওয়া হ'ল। কাউন্সিল প্রত্যাবর্তন। কোন কাউন্সিল? ১৯১৯ এর আইন মতে ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যার প্রবর্তন হয়েছিল এবং কংগ্রেস করেছিল বর্জন।

পুস্তক পরিচয়

My Uncle Netaji : Dr Asoke Nath Bose : **Esem Publications** : 67/2, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-700009 : Rs 30.00

১৯৭৭-এর ২৩শে জানুয়ারী গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার ডঃ অশোকনাথ বসু জননেতা শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র। সুতরাং বসু-পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ সন্তানরূপে গ্রন্থকার বাল্যকাল থেকেই, পারিবারিক জীবনেও যেমন, তেমনি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে, জিয়াউদ্দিনে'র বেশে পেশোয়ারের পথে গোমো রেলষ্টেশনে বিদায় দেওয়া পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্রকে অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, বসু পরিবারের ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীদের 'রাঙাকাকাবাবু', সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গ্রন্থকার ১৯২৭ সালের মার্চে ম্যাট্রিকুলেশন দেবার আগের বছর ১৯২৬ সালের জুলাই মাস থেকে কৈশোরের সঙ্কোচ নিয়ে পত্রালাপ সুরু করেন। সুভাষচন্দ্র সে-সময় বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দী। কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রের সসঙ্কোচ প্রথম চিঠির উত্তরে সুভাষচন্দ্র ১৯২৬-এর ২৬শে আগষ্ট তারিখে যে চিঠি লিখলেন, তাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের মনের দরজায় তার ভবিষ্যৎ পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের প্রসঙ্গটিকে সব চাইতে বড়ো করে তুলে ধরলেন (পৃঃ ২১)। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর ১৯২৭-এর ১৬ই মার্চ ভ্রাতুষ্পুত্রকে লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র সেই প্রসঙ্গটির পুনরুল্লেখ করেন এবং শরীরকে শক্ত-পোক্ত করবার জন্য ব্যায়াম অনুশীলনের নির্দেশ দিলেন। (২৭ পৃঃ)

এই গ্রন্থে জাতীয় সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্রের পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশে কাছের মানুষ সুভাষচন্দ্রও অন্তর্ধানপূর্ব-জীবনের নানা পর্যায়ে উপস্থিত রয়েছেন। এই কাছের মানুষের সঙ্গেই ১৯৩০-৩১ সাল থেকে গ্রন্থকারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে ওঠে এবং দেখা যায় যে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন আলিপুর জেল থেকে সুভাষচন্দ্র গোপন পথে নির্দেশপূর্ণ স্লিপ, নোট ইত্যাদি বাইরে পাঠান। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় আপশোষ করে লিখেছেন যে ১৯৩০-৩১ সালের লেখা সেই চিঠি-পত্রগুলির কিছুও বা যদি রাখা যেতো! ১৯৩২

সাল থেকে অবশ্যি গ্রন্থকার নিষ্ঠার সঙ্গে 'রাঙ্গা-কাকাবাবুর' লেখা চিঠি-চিরকুট ধারাবাহিকভাবে রেখে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের ইউরোপবাসের বিভিন্ন সময়কার তোলা ফোটোগুলিও। এই সময় গ্রন্থকার ও তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু আচার্য যদুনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ সরকার ইউরোপে ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্রের প্রবাসজীবনের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সহকারীরূপে নানা কঠিন ও অন্তরঙ্গ দায়িত্ব পালন করেছেন—যার ইতিহাস-নিষ্ঠ স্বাক্ষর এই গ্রন্থের অমূল্য উপাদানরূপে স্বীকৃত হবে।

গ্রন্থের স্বল্পপরিসরে কাছের মানুষ সুভাষচন্দ্রকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রন্থকার উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগসূত্র, রূপরেখায় সীমিত রাখতে হয়েছে গ্রন্থকারকে। ১৯২৭-এর নভেম্বরে সাইমন কমিশনের গঠন ঘোষিত হবার পর, ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে সর্বতোভাবে বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে ভারতবর্ষের সর্বদলসম্মত একটি সংবিধান রচনার জন্য সর্বভারতীয় সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সর্বদলীয় সম্মেলন মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সংবিধান রচনার জন্য যে কমিটি গঠন করেন, ১৯২৮-এর আগষ্ট মাসে সেই কমিটির সর্বসম্মত রিপোর্ট ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবী করেন। সুভাষচন্দ্র এই কমিটির সদস্যরূপে এই সিদ্ধান্তে সহমত হয়েও সেই রিপোর্টের মুখবন্ধে ভারতবর্ষের সংবিধানের ভিত্তিরূপে পূর্ণস্বাধীনতার দাবীতে অবিচল থাকেন। গ্রন্থকার বলছেন: "The committee issued in August, 1928, a unanimous report, subject to certain reservations made in the preamble stating that a minority including uncle would not accept Dominion Status and pressed for complete national independence as the basis of the constitution." (পৃষ্ঠা ৩৬)। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আজও বিতর্ক চলে এবং সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক নেতৃত্বকে যারা খর্ব করতে চান, তারা এই ধরণের অস্পষ্টতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকেন। তাই এই প্রসঙ্গটিকে স্পষ্টতর করবার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টের মুখবন্ধে (premable) সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সংখ্যালঘু সদস্যদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল।

গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়টি—1933-1936: In Europe—সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধকালীন বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে, বলা চলে। মূলতঃ চিকিৎসার জন্য ইউরোপে এলেও ১৯৩৩, ৬ই মার্চ তাঁর জাহাজ ভেনিসে এসে পৌঁছাবার পরই সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন 'ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য

এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যা করবার অপটু শরীর নিয়েও তা করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন।' (পৃঃ৭১) সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার পাসপোর্টে ফ্রান্স, ইটালী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ায় যাবার অনুমতি থাকলেও ইংল্যাণ্ডে কিম্বা জার্মানীতে যাবার অনুমতি ছিলো না। কিন্তু ভিয়েনার চিকিৎসকদের সুপারিশে জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেষ্টে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাবার সুপারিশের ফলেই তার জার্মানী প্রবেশের সম্মতি মেলে। ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি পান ১৯৩৮ সালে, যখন আবার ইউরোপে এসেছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, হরিপুরা কংগ্রেসের আগে।

সুভাষচন্দ্র, ইটালী, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, জার্মানী সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়াতে পরিভ্রমণ করে এই সব স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্র-নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। বুগোশ্লাভিয়াতে ব্রিটিশ দূতাবাসের হস্তক্ষেপে সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হন, যার ফলে সেখানকার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপা হতে পারে নাই (পৃঃ৯৬)। এই অধ্যায়েই জানা যায় ১৯৩৩-এর জুলাইতে ওয়ারশ থেকে সুভাষচন্দ্র মস্কো যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সোভিয়েত সরকার ভিসা না দেওয়ায় তার যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই সময় সবচাইতে সার্থক সফর হয় ইতালীতে, বার বার রোমে যাবার সুযোগ পেয়ে। সে-সময় একবার রোমে সোভিয়েত দূতাবাসে সোভিয়েত রুশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব লিট্‌ভিনফের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ আলোচনা করেন। (১০৯ পৃঃ)

ত্রিশ দশকে ইউরোপে থাকাকালীন ইতালী সুভাষচন্দ্রের সফরসূচীতে অনেকটা জুড়ে ছিল। তার প্রধান কারণ তৎকালীন ইতালী সরকার খোলাখুলিভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলো। লণ্ডনের ব্যর্থ গোল টেবিল বৈঠকের পর ভারতে ফেরার পথে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সিনর মুসোলিনী সাক্ষাৎ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ১৯৩৩-এর মার্চে ভেনিসে জাহাজ থেকে অবতরণ করবার পর সুভাষচন্দ্র ইতালীয় সংবাদপত্রে যে অভিনন্দন পেয়েছিলেন, তারই পুনরভিব্যক্তি দেখা যায় সে-বছর ডিসেম্বরের শেষে রোমে মুসোলিনী কর্তৃক ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট উদ্বোধনে উপস্থিত হবার জন্য সাদর আমন্ত্রণে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর রোমেই ইউরোপে প্রাচ্য দেশের ছাত্রদের কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করতে আমন্ত্রিত হন। এই কংগ্রেসের স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে ইউরোপে প্রাচ্যদেশের ছাত্রদের একটি কনফেডারেশন গঠিত হয়, যার স্থায়ী ব্যুরো রোমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থায়ী ব্যুরোর যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতের অমিয়নাথ সরকার ও চীনের মিস্ লিও। (Miss Lieo)। এই প্রাচ্য ছাত্র সম্মেলনে আরবদেশের,

চীনের, ইসরাইলের বহু প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আসবার সুযোগ পান। আরব ছাত্রনেতা এল জাবিরী সুভাষচন্দ্রের ভাষণে এবং পরে তার সঙ্গে আলোচনায় এতো অভিভূত হ'ন যে ইতালী এবং সুইজারল্যাণ্ডে সে সময় যে সকল আরব নেতা, বিশেষভাবে সিরীয়বাসী, নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন, তাদের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন (পৃঃ ৯০)। রোম সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের ব্যাপক পরিচিতিতে বৃটিশ সরকার যে কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ১৯৩৪র ১৩ই ফেব্রুয়ারী জেনেভা থেকে গ্রন্থকারকে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র আর আভাস দিয়েছিলেন (পৃঃ৯২)।

১৯৩৩-এর মার্চ জার্মানীতে নাৎসী দল ক্ষমতায় আসার পর ইহুদী এবং কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে কুৎসিত অপপ্রচার সুরু করে হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ'-এ ভারতীয়দের সম্বন্ধে অবমাননাকর উক্তি রয়েছে ক্ষমতায় আসার পর অন্যতম নাৎসী নেতা আলফ্রেড রোজেনবার্গও [illegible] এবং ডঃ [illegible] অবমাননাকর [illegible] রুদ্ধ উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে-বছর ১২ই আগষ্ট বার্লিন থেকে সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে পত্র লেখেন (পৃঃ ৮৩)। নাৎসীদের মধ্যে ভারতভক্ত পদাধিকারীও ছিলেন। তাদের মধ্যে ডঃ [illegible] ক্লার্ক নামক এক অধ্যাপক সুভাষচন্দ্রের পরম অনুগত ছিলেন। গ্রন্থকার তাকে নাৎসীদলের মধ্যে বামপন্থীরূপে চিহ্নিত করেছেন (পৃঃ ৮৭)। ১৯৩৪-এর ২০শে মার্চ সুভাষচন্দ্র মিউনিখে পৌঁছালে পরের দিন সেখানকার ভারতীয় ছাত্ররা তাঁর কাছে নাৎসীদের ভারতবিদ্বেষী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথনির্দেশ চাইলেন। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ তথ্য সহকারে কঠোর ভাষায় তাদের অভিযোগ লিখে জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রকে স্মারক লিপি পাঠালেন। মিউনিখে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব-রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কার্ল হাউসহোফারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যোগাযোগ করেন। ডঃ হাউসহোফার কাইজারের আমলের সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল জেনারেল এবং এদিকে নাৎসীদল তাকে প্রবীণ রাজনৈতিক পদাধিকারীরও সম্মান দেয়। মিউনিখ থেকে প্রাগ হয়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিন যান। সেখান থেকে ২৮শে মার্চ তারিখে গ্রন্থকারকে লেখেন, "I had been to the Foreign Office to discuss the question relating to India and Germany." (পৃঃ ৯০)। তিনি বার্লিনে অর্থনৈতিকসংক্রান্ত মন্ত্রী ডঃ শ্মিডট্-র সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বকেয়া অপপ্রচার বন্ধ করবার বিষয়টি হিটলারের গোচরে উত্থাপনের অনুরোধ জানান। ডঃ শ্মিডট্ ভারতীয়দের অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে যান এবং হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্রকে সুমীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেন। (পৃঃ ৯৪)

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে চড়ে ডাবলিন যান। ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁর যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সেখানে ডি ভ্যালেরা ও তার সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে, আয়ারল্যাণ্ডের সংযুক্তিকারী রিপাবলিকান আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে এবং সিন ফিন আমলের বিপ্লবী ম্যাডাম গোন্নে ম্যাকব্রাইড-এর সঙ্গে মিলিত হন। সুভাষচন্দ্র যে-সময় আয়র্ল্যাণ্ডে রয়েছেন, জহরলাল সে-সময় ইংল্যাণ্ডে গেছেন। তার পূর্বে কমলা নেহেরুর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেল থেকে নিঃসর্ত মুক্তি পেয়ে জহরলাল জার্মানীর বাডেনভেলিয়ার (Badenweiler) স্বাস্থ্যনিবাসে কমলা নেহেরুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন, সুভাষচন্দ্র জহরলালকে স্বাগত জানাতে এবং কমলা নেহেরুর সংবাদ নিতে একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কমলা নেহেরু অকস্মাৎ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লসেনী সহরে লোকান্তরিত হন। সুভাষচন্দ্র সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার সৎকারের পর অষ্ট্রিয়ার বাদগাস্তাইন স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে আসেন।

১৯৩৫-এর এপ্রিল মাসে ভিয়েনায় গল-ব্লাডার অপারেশনের পর, ভিয়েনা প্রান্তদেশে পুরকের-স্‌ডরফ স্বাস্থ্যনিবাসে স্থান পরিবর্তন করে সেখান থেকে ২০ মে গ্রন্থকারকে চিঠি লিখে জানান যে দুটি ভারতীয় সংস্কৃতি-বিদ্বেষী ফিল্মের প্রচার বন্ধ করবার জন্য বার্লিনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ফিল্ম কংগ্রেসে ভারতীয় মোশন পিকচার সংগঠন দাবী জানিয়েছেন এবং মূলত সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ঐ ফিল্ম দুইটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় (পৃঃ ১১৬)। শুধু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই ভারতের স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রবাসে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি প্রহরা ছিলো না, ভারতীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্যও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (পৃঃ ১২০)। তিনি ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারী ভিয়েনা রেডিও থেকে মাসে একদিন ভারতীয় সঙ্গীত প্রচারেরও ব্যবস্থা করেন। এ-ছাড়া জানা যায় যে ১৯৩৫-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভিয়েনার মহিলা ক্লাবে (Women's club) "The place of Indian women in the Freedom Movement" সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন।

নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় গ্রন্থকার নিজেই হরিপুরা কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির শিবিরে বসবাসকালীন "রাঙ্গাকাকাবাবুর" তীব্র তিরস্কারের সম্মুখীন হয়ে টের পেয়েছেন। ক্যাম্পের নিরামিষ আহারে কাতর গ্রন্থকার, গোপনে ডিম এনে কয়েকদিন খেয়েছেন। সুভাষচন্দ্র টের পেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সোজা বলে দেন : 'যদি নিরামিষ খেয়ে ক্যাম্পের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতে না পারো, পরের ট্রেনে বাড়ী ফিরে যাও।' (পৃঃ ১৫৫)

ব্যক্তিজীবনের একটি জটিল সামাজিক সমস্যা নিয়ে গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন তার মতামত জানবার জন্য। প্রসঙ্গটি ছিল গ্রন্থকারের বিবাহ সম্বন্ধে। সুভাষচন্দ্র তাঁর উত্তরে ৮. ৭. ৩৯ তারিখে লেখেন :

...My own views on matrimony are quite at variance with those of orthodox Hindu Society,

You were right in not marrying before you started earning. Men and women should have perfect freedom in the choice of their life's partner. Others my only advise ...personally I think and feel that matrimony should follow a period of friendship and intimacy. I am against "arranged" marriages which are in vogue in our Society.

....

....

Lastly I hold that before men and women marry they should study at least one good book on sex and its problems'. One should not walk into matrimony quite ignorant of sex and its many problems.…(পৃঃ ১৬১)

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও তাদের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এর অন্তর্ধান-উত্তর জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেবার তিনি সোভিয়েত রুশ যাবার অনুমতি পান নাই। ১৯৪১-এও সে-সুযোগ তার হাতের বাইরে রয়ে যায়। ১৯৪৫-এর ১৮ই আগষ্টের পর সে-সুযোগ তার যাত্রাপথে আবির্ভূত হয়েছিলো কিনা ইতিহাস তা একদিন অবারিত করবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মিউনিখ প্যাক্টের পর চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্মশান-শয্যায় ইউরোপে অনিবার্য যুদ্ধের পৃষ্ঠপটে ভারতায় বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান ভারতের প্রান্তরে চিরকাল ধ্বনিত হবে:…"an open propaganda throughout India in order to prepare the Indian people for a national struggle, which should synchronize with the coming war in Europe." (পৃঃ ১৬২)

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র জাপান, জার্মানী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের উদ্যোগ করেন (পৃঃ ১৯০);—সে-কথা আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর বাঁ কানের নীচের একটি কালো তিলকে—যা ব্যক্তি-পরিচয়ের চিহ্নস্বরূপ সুভাষচন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পাসপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিলো—তিনি প্রায়-নিভৃতে অস্ত্রোপচার করিয়ে মুছে ফেলেন (পৃঃ ১৯৯)। এই ঘটনাকে গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে তখন থেকেই ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের উদ্যোগরূপে অনুমান করা যায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এর মার্চে জার্মানীতে পৌঁছবার পর, ক'লকাতার জাপানী কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ কি ভাবে রাখতেন এই গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। (পৃঃ ২১৬)

এই গ্রন্থের ২২০-২২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত প্রসঙ্গ-বিশেষ আজও বিতর্কিত। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী সুভাষচন্দ্রে উত্তরণে যে বিশাল পটভূমিকার রেখাঙ্কন এবং কাছের মানুষ 'রাঙাকাকাবাবুর' যে পরিচয় গ্রন্থে পরিবেষিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গের অনুল্লেখে তা আদৌ খর্ব হোতোনা। বরং এই প্রসঙ্গের উল্লেখ অনেকের কাছে এই গ্রন্থে বেমানান মনে হ'তে পারে। এই প্রসঙ্গ বাদ দিলে, সুভাষ-সাহিত্যে গ্রন্থটি একটি অনস্বীকার্য অবদান।

সুনীল দাস

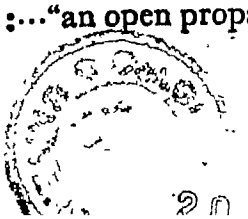

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	১৫·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১৭·০০
ছোট পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সহজপাঠ্য (ছোট) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মযোগী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
ছাত্রছাত্রীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী আর্তির সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার বাঙালী
বীরত্বে বাঙালী
বিজ্ঞানে বাঙালী
বাংলার ঋষি
বাংলার বিদুষী
বাংলার মনীষী
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা
রবীন্দ্রনাথ
জীবন গড়া

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—
গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটে তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। তরুণদের প্রাণে দেশাহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।
—অমৃত
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—

ব্যবহারিক শব্দকোষ

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আনন্দ

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ শুষ্ক দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/77

Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1·00 with Regtd Postage Rs 3·20 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

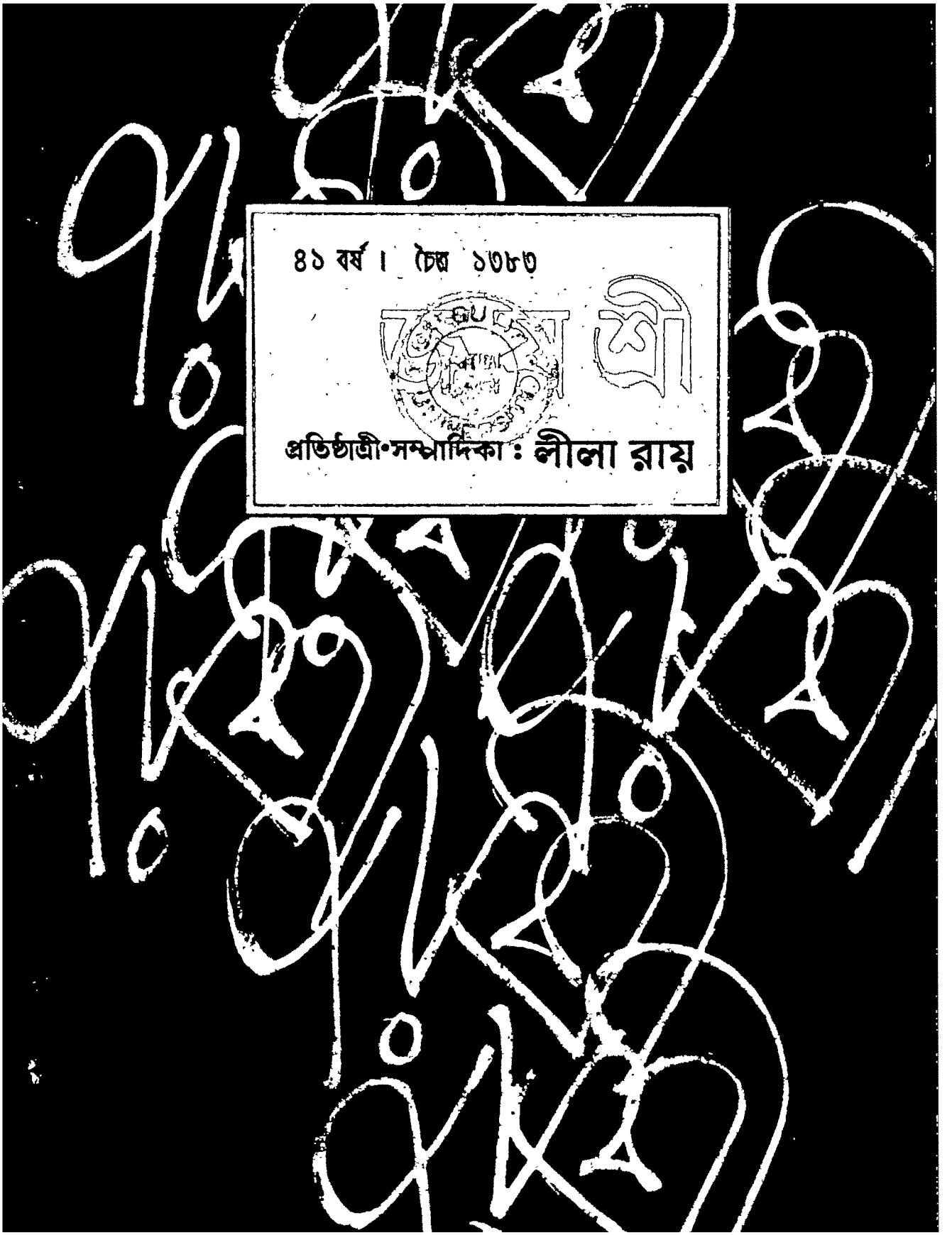

৪১ বর্ষ । চৈত্র ১৩৮৩

বঙ্গ শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা : লীলা রায়

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাপস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন

(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা

৪১ বর্ষ ১৩৮০ চৈত্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥

রাজনৈতিক ভূকম্প ৬৮৯

কবিতা

ছোট ছোট গল্পের জীবন নিয়ে ॥ ৭০২
দিলীপ কুমার কোনার

প্রবন্ধ

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব ॥ অভয়শঙ্কর শর্মা

সাহিত্যে সমকালীনতা ও আধুনিকতা ॥ ৭১৩
সমর দত্ত

গল্প

অনিদ্র রজনীতে ॥ সুমনা দাস ৭১৮

মালতী বৌ ॥ ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৭২২

বিবিধ

কেন্দ্রীয় ও রেল বাজেট ৭০২

কবিতা

গাছেরা ঘুমাতে জানে
দিলীপ কুমারকোনার ৭৩৩

বর্ষসূচী ৭৩৪

সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশন-এর

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬·০০

NETAJI SPEAKS
Volume One
A collection of speeches & writings 5/-

রামমোহন
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব
সুনীল দাস

ধর্ম ও বিজ্ঞান
অনিল রায় ২·০০

২০-এ গিরগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

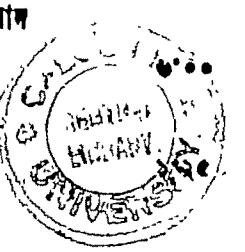

জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র ২য় খণ্ড ১২.০০ পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বক্সী

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্যতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ করুন

কিনুন	একশ টাকা
জাতীয়	বেড়ে গিয়ে
সঞ্চয় পত্র	দুশ' টাকা
(পঞ্চম পর্যায়)	হবে মাত্র সাত বছরে

অন্যান্য সুবিধা

* করমুক্ত সুদ
  (বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত)

* সম্পদ করে রেহাই
  (দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত)

আরও কিছু জানতে হলে লিখুন

অনুমোদিত এজেন্টকে

অথবা ডাকঘরকে

জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা

D.A.V.P. 76/927

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

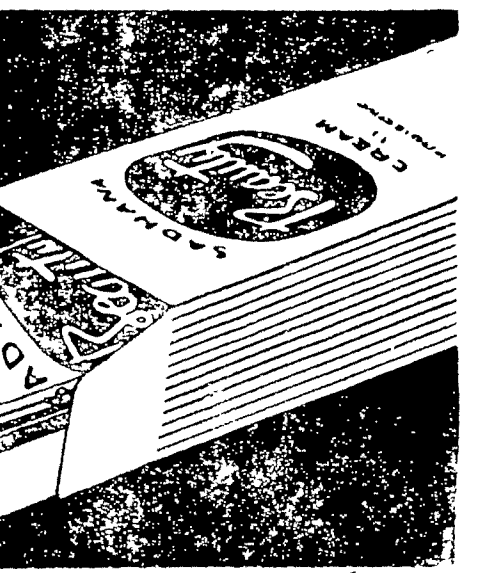

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

58C 5/71

ভারতী

৪১ বর্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা। চৈত্র ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক ভূকম্পন!

অবশেষে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতার আসন থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। স্বেচ্ছা-নির্বাসনের গৌরব নিয়ে নয়, ষষ্ঠলোকসভার নির্বাচনে রায়বেরিলি কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী রাজনারায়ণের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের চরম কালিমা নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়া ভারতবর্ষ চলবে না, কংগ্রেস দলে ইন্দিরা গান্ধীর বিকল্প নেই, নির্বাচনের পূর্বেই কংগ্রেস দলের যারা দলীয় পরিষদীয় পার্টির নেত্রী-পদে তাঁকে নির্বাচিত করে আর একবার তাঁর প্রধান-মন্ত্রীত্বের পদ পাকা করে ফেলেছিলেন, সেই চাটুকার এবং বয়স্যদের কাছে এই পরাজয় দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুর্নিবার আঘাত নিয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু কী তাদের নেত্রী; ভারতে এগার বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধীই ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাধারণের সমতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন? তার মন্ত্রী-সভার বহু রথী-মহারথী মহাজনপন্থা অনুসরণ করে পরাজয়ের দুরতিক্রমণীয় কর্দমে অভিষিক্ত হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর ৬০ জনের ৪৮ জন পুনর্নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১৭ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন এবং ৩৫ জন রাষ্ট্র ও উপরাষ্ট্র-মন্ত্রী প্রার্থীর মধ্যে ২৮ জন অবিশ্বাস্য পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। উনিশ মাসের জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর সকল প্রকার দুষ্কার্যের সহচর মুষ্টিমেয় মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী উটপাখীর মত রাজ্যসভার ২৫০ জন সদস্যের নিরাপদ আশ্রয়ে কংগ্রেস দলের ১৬৩ জনের ভিড়ে মাথাগুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। তাদের দুষ্কার্য কি ভুলবার?

ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ছিল দলীয় নেতাদের

স্বপ্নের অগোচর। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী ইন্দিরা গান্ধীর রায়বেরিলী কেন্দ্রের গোড়ার সভাগুলিতে বলে চলছিলেন : 'এবার কম পক্ষে আড়াই লক্ষ ভোটে ইন্দিরা গান্ধী জিতবেন।' ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দপ্তরের চিরকালের প্রধান জগপৎ ছুবে'র নিশ্চিন্ত, নিশ্ছিদ্র, নিরুত্তাপ পরিবেশের নির্বিঘ্ন দপ্তর পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে মন্ত্রপূতঃ শ্লোকের মত উচ্চারিত হয়ে চলছিল 'এবার দু'লাখ ভোটে ইন্দিরা গান্ধী জিতবেন।' এ-ছাড়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী মামলার অন্যতম পর্যুদস্ত সাক্ষী, যশপাল কাপুর রায়বেরিলীতে সরেজমিনে অবস্থান করে নির্বাচন তদারক করছিলেন। আর তিনি নির্বাচনী কেন্দ্রের যেখানেই যাচ্ছিলেন সেখানেই ইন্দিরা-বিরোধী ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলছিলেন। এ-ছাড়া নির্বাচনের পূর্বেকার দেড়মাস স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধী সর্বশেষ প্রিয় পার্শ্বচর, ওম্ মেটা প্রায়ই বিমানযোগে রায়বেরিলীর নির্বাচনী প্রস্তুতি তদারক করে চলছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ইন্দিরা গান্ধী ও তার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীমহোদয়রা, বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেশে, কংগ্রেস দল জনসাধারণ থেকে কী পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং উনিশ মাসের দুঃশাসন তাদের কী পরিমাণ সাধারণের চক্ষুশূল ক'রে তুলেছিলো, তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত এরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর সব চাইতে তাজ্জবের কথা এই যে, ভোট গণনার পূর্ব-মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী প্রতিনিধি মাখনলাল ফোতেদার নামক ব্যক্তি, রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলের মত দীর্ঘকালের নিদ্রাভঙ্গের পর ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সঞ্জীব, অধুনা সঞ্জয় গান্ধীর, নির্বাচনে লক্ষাধিক ভোটে জয়ের দিবাস্বপ্ন দেখে আত্মময় রইলেন। জনমন থেকে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন, হয়ে উত্তুঙ্গ দূরত্ব থেকে সেদিন ফোতেদার বললেন : "We are winning both seats with a thumping majority. ...."Not less than two lakhs in Rae Bareli. In Amethi, I would say, around a lakh"! হায়রে! দিন যত এগিয়ে গেলো লাখের স্বপ্নও গুড়িয়ে যেতে লাগলো। আর ২০শে মার্চের রাত বারটার পর জগপৎ ছুবে, কাপুর, ফোতেদারের বিশীর্ণ মুখ দুরন্ত ত্রাসের ছায়াপাত আচ্ছন্ন করে ফেললো। উনিশ মাসের দুঃশাসনের অপ্রতিরোধ্য ইন্দিরা গান্ধী ও তার প্লাবনে চতুঃস্পার্শের শখের পৃথিবী তর তর বেগে ভেসে চলেছে, আর সেই প্লাবনকে খড়কুটো দিয়ে হাস্যকরভাবে রোধ করতে এগিয়ে এলো ভীত কম্পিত অত্যাচারী ফোতেদারের দল! রায় বেরিলীর ভোট গণনা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জেলা-শাসকের কাছে বিশে মার্চ রাত্রি একটা পঁচিশ মিনিটে ফোতেদার একটা দরখাস্তে দাবী জানান, গোটা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন করা হউক। নির্বাচনী অফিসার বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই

হাস্যকর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করলে ফোতেদায় রাত্রি একটা ছেচল্লিশ মিনিটে পুনরায় ভোটগণনার জন্য আর একটি দরখাস্ত করে "শেষের সে-দিন ভয়ঙ্কর"-এর মুহূর্তটিতে আরও পিছিয়ে দেবার আর একবার হাস্যকর প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সব খড়কুটো ভেসে যাবার পর জনতার জোয়ারের মুখে রাত্রি ২টা ৪মিঃ ভারতবর্ষের সর্বময় ক্ষমতা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর অপসারণ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ বছর পর ভারতবর্ষে এক নূতন যুগের পত্তন হ'লো।

শুধু কি ইন্দিরা গান্ধী? তিনি যে দলের সর্বময় কর্ত্রীরূপে ১১বছর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্বে আসীন থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিষদে কংগ্রেস দলের মন্ত্রী ও সদস্যদের ওপর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব আরোপ করে তাদের একান্তভাবে তল্পীবাহকে পরিণত করেছিলেন, লোকসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তর ভারতের বহুরাজ্য থেকে তাদের মূলত জনতা পার্টির এবং প্রসঙ্গত কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসির হাতে নির্মূল, নিশ্চিহ্ন—বলতে গেলে নির্বংশ হতে হয়েছে। দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেস প্রার্থীরা সমূলে, সবংশে উৎসাদিত হয়েছেন। এই কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস একটিও আসন পায় নাই। রাজস্থানে ২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১টি আসন পেয়ে রাজস্থানের কংগ্রেসী কেল্লা রক্ষা করছে, মধ্যপ্রদেশের ৪০টি আসনের মধ্যেও কংগ্রেসের অবস্থা একই রকম, মাত্র ১টি আসন তাদের ভাগ্যে লাভ হয়েছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, উড়িষ্যার মত কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটিগুলিতে অকল্পনীয় বেগে ভাঙ্গন ধরেছে। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী দুর্গে জনতা পার্টি ৪৮টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ১৯টি, কংগ্রেস পেয়েছে ২০টি, ওড়িষ্যায় ২১টি আসনের মধ্যে জনতা পার্টি ১৪টি, কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী ১টি ও কংগ্রেস ৮টি আসন পেয়েছে। গুজরাতেও ২৬টি আসনের ১৬টি জনতা পার্টি দখল করেছে, কংগ্রেস পেয়েছে ১০টি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মাত্র ৩টি আসন পেয়েছে, জনতা পার্টি পেয়েছে ১২টি, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী ৩টি। পশ্চিমবঙ্গে জনতার জোয়ারে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা ২০টি আসনে প্রতিযোগিতা করে ১৭টিতে জয়ী হয়েছে এবং তাদের সহযাত্রী আর, এস, পি ৩টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি আসনে এবং বিরোধী সমর্থিত একজন নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি আটজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন, তারা সকলেই পরাজিত হয়েছেন। ১৯৭১-এর নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় তিনজন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন।

পূর্বেকার বছরগুলির আসন সংখ্যা—১৯৬৭ ৫২০ কংগ্রেস পেয়েছিলো—২৮৩

" ১৯৭১ ৫১৮ " ৩৫২

১৯৭৭ সালে রাজ্যওয়াড়ী লোকসভায় মোট আসন-সংখ্যা এবং কোন্ দল কত আসনে জয়ী হয়েছে, নীচের তালিকায় তা দেওয়া হোলো।

রাজ্য	মোট আসন	জনতা পার্টি	সি,এফ, ডি	সি,পি, আই,এম	ডি,এম,কে	আকালী	কংগ্রেস	সি,পি, আই	এ,ডি, এম,কে	নিঃ দল ও অন্যান্য দল
অন্ধ্র	৪২	১	—	—	—	—	৪১	—	—	—
আসাম	১৪	৩					১০			১
বিহার	৫৪	৪৬	৮							
গুজরাট	২৬	১৬					১০			
হরিয়ানা	১০	১০								
হিমাচলA	৪	৩	—	—	—	—	—	—	—	—
জম্মু ও কাশ্মীরB	৬						২			২+১
কর্ণাটক	২৮	২					২৬			
কেরল	২০						১১	৪		৫
মধ্যপ্রদেশ	৪০	৩৭					১			১+১
পশ্চিমবঙ্গ	৪২	১১	৩	১৭			৩			৬+২
মহারাষ্ট্র	৪৮	১৯		৩			২০			৬
উত্তর প্রদেশ	৮৫	৭১	১৪	—	—	—	—	—	—	—
মণিপুর	২						২			
মেঘালয়	২						১			১
নাগাল্যাণ্ড	১									১
ওড়িষা	২১	১৪	১	১			৪			১
পাঞ্জাবC	১৩	৩		১		৮	১			
রাজস্থান	২৫	২৪					১			
সিকিম	১	—	—	—	—	—	১	—	—	—
তামিল নাড়ু	৩৯	৩			১		১৪	৩	১৮	
ত্রিপুরা	২		১				১			

কেন্দ্রীয় শাসিত

অঞ্চল	মোট আসন	জনতা পার্টি	সি,এফ, ডি	সি,পি আই,এম	ডি,এম,কে	আকালী	কংগ্রেস আই	সি,পি এম,কে	এ,ডি, অন্যান্য	নিঃ দল ও দল
দিল্লী	৭	৬	১	—	—	—	—	—	—	—
চণ্ডীগড়	১	১								
আন্দামান	১						১			
দাদরা, নগর হাভেলী	১	—	—	—	—	—	১	—	—	—
অরুণাচল	২						১			১
গোয়া	২						১			১
লাক্ষাদ্বীপ	১						১			
মিজোরাম	১									১
পণ্ডিচেরী	১								১	
মোট	৫৪২	২৭০	২৮	২২	১	৮	১৫৩	৭	১৯	৩১*

A মণ্ডী কেন্দ্রের নির্বাচন মে মাসে হবে, এখন বরফে ঢাকা।

B : Leh-তে পরে নির্বাচন হবে।

C : ফিরোজপুর পুনর্নির্বাচন হচ্ছে।

* নির্দল ও অন্যান্য —৩১ জনের মধ্যে জনতা সমর্থিত নির্দল—১

পেজেন্টস এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টি—৫

আর, এস, পি— ৪

এফ, বি—৩

মুসলিম লীগ—২

রিপাবলিকান পার্টি (খাবড়াগোড়ে গোষ্ঠি)—২

ন্যাশনাল কনফারেন্স (শেখ আবদুল্লার দল)—২

কেরল কংগ্রেস—২

নাগাল্যাণ্ডের ইউ, ডি; এফ—১

মেঘালয়ের হিলস্ স্টেটস পিপলস ডেমোক্রাটিক দল—১

গোয়ার মহারাষ্ট্র গোমন্তক দল—১

লোকসভায় বিভিন্ন বছরে নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা

দল	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৭১	১৮-১-৭৭ তারিখে
কংগ্রেস	৩৬১	২৮৩	৩৫২	৩৫৫
অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট	২৯	—	—	—
সি, পি, আই	—	২৩	২৩	২৪
সি, পি, আই (এম)	—	১৯	২৫	২৬
সংগঠন কংগ্রেস	—	—	১৬	১১
স্বতন্ত্র	১৮	৪৪	৮	—
জনসংঘ	১৪	৩৫	২২	১৬
এস, এস, পি	৬	২৩	৩	—
পি, এস, পি	১২	১৩	২	৩
রিপাবলিকান্‌স	৩	১	—	—
অন্যান্য দল	৩১	৫৪	৫৩	৪৪*
নির্দল	২০	২৫	১৪	২৮
শূন্য আসন	—	—	—	১৭

* ডি, এম, কে	—	১২
আন্না. ডি, এম, কে	—	৬
বি, এল, ডি	—	৯
কেরলা কংগ্রেস	—	৩
মুসলীম লীগ	—	৩
ফরোয়ার্ড ব্লক	—	৩
নির্দল	—	৮
		৪৪

পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জোটের সঙ্গে জনতা পার্টির কোনো রফা করবার আদৌ প্রয়োজন ছিল কিনা, সেটা বিশেষভাবে বিচার্য। জনতা পার্টি অল্প-সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতে যে অপ্রতিরোধ্য কংগ্রেসবিরোধী উদ্বেলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো, তার ঢেউ এসে উত্তর-পূর্ব ভারতকেও অপ্রত্যাশিতভাবে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলে। সেই তরঙ্গ মার্ক্সবাদী ও তাদের সহচরদের উতরে দিয়েছে, যেমন বহুভোটের ব্যবধানে জনতা পার্টির প্রার্থীরাও প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং, জনতা পার্টির কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় প্রতিনিধিরা মার্ক্সবাদী ও তাদের সহচরদের অনেকগুলি আসন ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম বাংলায় এমার্জেন্সী-উত্তরকালে তাদের প্রাধান্য সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৯ সালে মার্ক্সবাদীদের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলো এবং হত্যার রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে এবং যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দলকে ঘায়েল করতে চেয়েছিলো। সেই হিংস্রতার রাজনীতিই পশ্চিম বাংলায় মার্ক্সবাদী ও তাদের সহচরদের পতন ডেকে আনে। তারপর কয়েক-বছরের মধ্যে পূর্বেকার সাংগঠনিক শক্তির তুলনায় তারা অনেকটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। জয়প্রকাশ নারায়ণ অনুমোদিত সংঘর্ষসমিতির সংগ্রাম থেকে সরে থাকা এবং এমার্জেন্সী জারী থাকাকালীন নিষ্ক্রিয় থাকার পেছনেও সেই ক্ষীয়মান শক্তির মানসিকতাই কাজ করেছে। অথচ সেই সময় জনসংঘর্ষ সমিতির অন্তর্ভুক্ত দলগুলি—সাংগঠনিক কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি, লোকদল এবং জনসঙ্ঘ—হয় সত্যাগ্রহ করেছে, না হয় গোপন সুরঙ্গ পথে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেছে, এই চারদলের নেতৃবর্গ ও সদস্যরাই এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগত ছোট-বড়ো সর্বোদয়ের কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জেল ভর্তি করেছে। পশ্চিম বাংলার মার্ক্সবাদী মোর্চার নেতারা সেদিক থেকে অক্ষত রয়েছেন। তাই মনে হয় মার্ক্সবাদীদের পথের কাঁটা দূর করা ছাড়া—অর্থাৎ 'to pull their chestnuts out of fire'—জনতা পার্টির দিক থেকে তাদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি ও আরও একধাপ এগিয়ে এসে কোথাও কোথাও নির্বাচনী মৈত্রী-বন্ধনের (electoral alliance) আর কোনো সার্থকতা ছিলো না। জনতা পার্টি যে আসনগুলিতে—কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসিকে নিয়ে—প্রার্থী দিতে চান, সেগুলিতে নাম বিজ্ঞাপিত হ'লে মার্ক্সবাদী ও তার শরিকেরা বুঝে নিতেন কোথায় তাদের প্রার্থী দেওয়া চলে, আর কোথায় চলে না। তারপরও যদি তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন যোগ্য জনতা প্রার্থীর সঙ্গে, জনতার জোয়ারই তাদের সেই হঠকারিতার জবাব দিয়ে দিতো। ১৯৬৯ সালে যুক্ত ফ্রন্টের আমলের সন্ত্রাস ও হিংস্রতার জন্য সেদিনকার এই

নীতির নেতা মার্ক্সবাদীরা কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করেন নাই, পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে বিনম্র ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই, অথচ সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যাচ্ছে জনতা পার্টির নেতারা পশ্চিম বাংলার বিধান সভার আগামী নির্বাচনে মার্ক্সবাদীগোষ্ঠির সঙ্গে সমঝৌতার জন্য আলাপ-আলোচনা করছেন। মার্ক্সবাদী গোষ্ঠি কর্মসূচীর ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় আগ্রহী। নির্বাচনে সমঝৌতার একটি সূত্র যদি হয় নির্বাচনোত্তর কর্মসূচী, সেক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়ী হ'লে যারা একত্রিতভাবে নির্বাচনের পূর্বে কর্মসূচীরও প্রচার করেছেন, নির্বাচনের পর তাদের একত্রিত হয়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব এসে যায়। জনতা পার্টির মুখপাত্ররা কী মার্ক্সবাদীগোষ্ঠির সঙ্গে নির্বাচনোত্তর যৌথ মন্ত্রীসভার সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে বিধান সভা নির্বাচনের বোঝাপড়ার আলোচনা সুরু করেছেন? এবং সেই সম্ভাব্য সরকার যদি সন্ত্রাস ও হিংস্রতার পথে দলীয় একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রসর হয়—সেই পরিস্থিতিকেও কী তারা মেনে নিতে তৈরী আছেন? পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে জনতা পার্টির মুখপাত্রদের এই জবাব দেবার দায়িত্ব রয়েছে। কারণ পশ্চিম বাংলার বহু মানুষ এখনও ১৯৬৯-৭০-এর সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নাই।

১৯৭২-এ নির্বাচন-কেন্দ্রে সন্ত্রাসের আতঙ্ক দিয়ে কংগ্রেসের প্রশাসন, সন্ত্রাস ও হিংসার আর এক বিভীষিকা পশ্চিম বাংলায় সৃষ্টি করেছিলো। সাম্প্রতিক লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের উৎসাদনে সেটা দূর হয়ে যাবে, যদি না বিধান সভার নির্বাচনে অবাঞ্ছিত সমঝৌতা ও নির্বাচনী মৈত্রীর ফাঁদে পশ্চিম বাংলার মানুষকে আবার জড়িয়ে না পড়তে হয়। কয়েকটি আসনের লোভে যদি কোনো পক্ষ জনসাধারণের সঙ্গে এই ধরণের প্রবঞ্চনা করেন—সে জনতা পার্টি হলেও—তার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠবে, পূর্বাহ্ণেই জনতা পার্টির সমর্থক, সুহৃদ, মুখপাত্রদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য। ১৯৬৯ ও ১৯৭২ সালের পুনরাবৃত্তি পশ্চিম বাংলার মানুষ কিছুতেই হ'তে দেবে না।

কংগ্রেসের চাঁদের হাট এখনও কয়েকটি রাজ্যে বজায় আছে। আসামে কংগ্রেসের ভিতে জনতার ঝড় কাঁপুনি লাগালেও খুঁটির মূলোৎপাটনে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানকার ১৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১০টিকে হাতের মুঠোয় রেখেছে, হাত ছাড়া হয়ে জনতা পার্টির হাতে গিয়েছে মাত্র তিনটি। তেজপুরে পূর্ণনারায়ণ সিং, পৌহাটিতে রেণুকা বড়কাকতি ও কোকড়াঝাড় সমতল উপজাতির আসনে চরণ নার্জারী—তিনপ্রান্তে তিনজন। তবুও বলা যায়, এই তিনজন আসাম রাজ্যে তিনশ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি; পূর্ণনারায়ণ সিং চা-বাগান শ্রমিকদের, রেণুকা বড়কাকতি শহুরে মানুষের এবং চরণ নার্জারী গ্রামের ও উপজাতিদের। এদের তিনজনের প্রতিনিধিত্বের একটা সার্বজনীনতা রয়েছে।

কংগ্রেসের মান রেখেছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক, ও কেরল। অন্ধ্রের ৪২টি আসনের ৪১টিই কংগ্রেসের দখলে রয়েছে, অন্ধ্র থেকে জনতার সবে ধন নীলমণির একটি আসনে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি নির্বাচিত হয়ে লোকসভার স্পীকারের পুরনো আসন অলঙ্কৃত করেছেন। কর্ণাটকের ২৮টি আসনের ২৬টি কংগ্রেসের দখলে রয়েছে, আর ২টি পেয়েছে জনতা পার্টি, তার একটিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হেগ্‌ড়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তামিল নাড়ুর ৩৯টি আসনের মধ্যে আন্না ডি, এম, কে'র সঙ্গে সমঝৌতা করে কংগ্রেস ১৩টি, আন্না ডি, এম, কে ১৮টি, সি, পি, আই ৩টি। জনতা পার্টি ও ডি, এম, কে যথাক্রমে মাত্র ৩টি ও ১টি আসন পেয়েছে; কেরলের ২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১১টি, সি, পি, আই ৪টি ও অন্যান্য দল ৫টি আসন পেয়েছে। জনতার ঝড় দক্ষিণে এসে পৌঁছায় নি, হয়তো এমারজেন্সীর দৌরাত্ম্য, নির্বীজকরণের অত্যাচার, ধর-পাকড় ও জেলবাস, উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মত জিঘাংসার মনোভাব নিয়ে, সরকারী তাণ্ডবরূপে দক্ষিণে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

এবার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে বিহার, উত্তর প্রদেশে তো বটেই, অন্যান্য যে সকল রাজ্যে জনতাপ্রার্থী জয়ী হয়েছেন. সর্বত্রই তাদের সঙ্গে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান লক্ষাধিক। দুই লক্ষ ও তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জনতা দলের জয়ীর সংখ্যাও কম নয়। বিহারের হাজীপুরে জনতা দলের প্রার্থী চারলক্ষাধিক ভোটে জয়ী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এতো প্রচুর ভোটের ব্যবধানের কারণরূপে বলা যেতে পারে এবারকার নির্বাচনে মোট ভোটদাতাদের সর্বাধিক শতকরা ভাগ ভোট দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে মোট ভোটারদের শতকরা ৪৫.৬৭ ভাগ ভোটাররা ভোট দিয়েছিলেন, ১৯৫৭ সালে শতকরা ৪৭.৮৪ ভাগ ভোটাররা, ১৯৬২ সালে শতকরা ৫৫.৪২ ভাগ ভোটাররা, ১৯৬৭ সালে শতকরা ৬১·৩৩ ভাগ ভোটাররা ভোট দিয়েছিলেন। ১৯৭১ এই শতকরা হার কমে ৫৫.২৭ ভাগে নেমে আসে, আবার ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ভোটদাতাদের এই শতকরা হার পৌঁছেচে শতকরা ৬৫·০০ ভাগে; অর্থাৎ, এবার মোট ৩২০.০৫০,৬৯৪ ভোটারদের মধ্যে ১৯৩,৭৪৮,৫২৭ জন ভোট দিয়েছেন।

রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্জাবে মোট ভোটারদের শতকরা ৭৩·৩৮ ভাগ, হরিয়ানায় শতকরা ৭৩·২৬ ভাগ, দিল্লীতে শতকরা ৭১·৩৮ ভাগ, ত্রিপুরায় শতকরা ৭০·০৭ ভাগ ভোট দিয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের কম যে সব রাজ্যে ভোট পড়েছে, তাদের মধ্যে উত্তর প্রদেশ রয়েছে। এছাড়া, গুজরাতে শতকরা ৬৯·২৪ ভাগ, হিমাচল প্রদেশে শতকরা ৬১·৪৭ ভাগ, বিহারে শতকরা ৬০·৯২ ভাগ, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৯·২১ ভাগ, রাজস্থানে শতকরা ৫৬·৯২ ভাগ, মধ্য প্রদেশে শতকরা ৫৫·৫৭ ভাগ, আসামে শতকরা ৫৪·৯০ ভাগ ভোট

দিয়েছে, ওড়িষ্যায় মোট ভোটের শতকরা হার মাত্র ৫৩·৩২ ভাগ ভোট দিয়েছে।

জনতা পার্টির সব চাইতে সাফল্য হয়েছে হরিয়ানায়। সেখানে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭০·৩৫ ভাগ জনতা পার্টি ছিনিয়ে নিয়েছে, উত্তর প্রদেশে এই সংখ্যা শতকরা ৬৮·০৩ ভাগ, বিহারে শতকরা ৬৪·৯৭ ভাগ; আর ১৯৭১-এ এই রাজ্যে কংগ্রেসের ভোটের হার ছিল শতকরা ৪০·০৬ এবার সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২·৪৩ ভাগে, রাজস্থানে জনতা পার্টির ভোটের হার মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৫·১৩ ভাগ, আর সেখানে কংগ্রেসের ভোটের হার মাত্র ২৯·৬১ ভাগ, অথচ ১৯৭১-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেসের ভোটের হার ছিল ৫১·৩৫ ভাগ।

১৯৬৭ ও ১৯৭১-এ অন্ধ্র প্রদেশ, তামিল নাড়, কর্ণাটক এবং কেরলার ১২৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে পেয়েছিলো ৫৭টি আর ১৯৭১ সালে ৭০টি আসন পেয়েছিলো; আর কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৪৩·৩৭ ভাগ ও ৩৯·৫ ভাগ। ১৯৭৭-এ এই চারটি রাজ্যের ১২৯টি আসনে কংগ্রেস পেয়েছে ৯২টি। আর বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লীতে ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে ২২৭টি লোক সভার আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে ১৩২টি এবং ১৯৭১-এ ১৭১টি আসন পেয়েছে। ১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মোট ১৩৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১১২টি আসন পেয়েছিলো। ১৯৭৭ সালে এই কয়েকটি রাজ্যে রাজনৈতিক ভূকম্পন ঘটে কংগ্রেসের অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ১৯৭৭-এ কংগ্রেস বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লীতে একটি আসনও পায় নাই। মধ্যপ্রদেশে ১টি ও রাজস্থানে ১টি পেয়েছে অর্থাৎ উত্তর ও মধ্যভারতের ছয়টি রাজ্যে এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে কংগ্রেস যেখানে ১৯৬৭ ও ১৯৭১-এ যথাক্রমে ১৩২টি ও ১৭১টি আসন পেয়েছিলো, সে-স্থলে ১৯৭৭-এ পেয়েছে মাত্র ২টি আসন।

কংগ্রেস বরাবরই সংখ্যালঘু ভোট পেয়ে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ১৯৫২ সালে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৫ ভাগ পেয়ে, কংগ্রেস লোকসভায় ৩৬৪টি আসন পেয়েছিলো। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০·৭৩ ভাগ পেয়ে ২৮৩টি আসন পেয়েছিলো, আর ১৯৭৯ সালে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩·৬৮ ভাগ ভোট পেয়ে ৩৫০টি আসনে জয়ী হয়েছিলো। ফলে লোকসভায় কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বজায় ছিল। সে বছর জাতীয় স্তরে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩·৬৮ ভাগ গড়ে কংগ্রেস পেয়ে থাকলেও, কোনো কোনো রাজ্যে কংগ্রেস দল এই স্তরের চাইতে শতকরা হারে বেশী ভোট পেয়েছিলো। যেমন সেবার কংগ্রেস অন্ধ্র প্রদেশে পায় শতকরা ৫৫ ভাগ, আসামে পায়

শতকরা ৫৭·২২ ভাগ, রাজস্থানে শতকরা ৫০·০৪ ভাগ, মহারাষ্ট্রে শতকরা ৬১·৩ ভাগ। ১৯৭৭ সালে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৪·৫৪ ভাগ পেয়ে ১৯৫২ সালের পর কংগ্রেসের ভোটের শতকরা হার এবার শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সারা ভারতবর্ষে মোট প্রদত্ত ১৯৩,৭৪৩,৫৩৭ সংখ্যক ভোটের মধ্যে কংগ্রেসের বাক্সে পড়েছে ৬৫,০৮৮,৫২০টি ভোট।

গোটা ভারতে প্রদত্ত ভোটের মধ্যে জনতা পার্টির অংশ মাত্র শতকরা ৪৩·১৭ ভাগ। এই অংশের মধ্যে অবশ্যি জনতার সমর্থক আকালী দল কিম্বা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের ভোট কিম্বা অন্য যাদের সঙ্গে জনতা পার্টি আসন ভাগাভাগি করেছে, তাদের ভোট যুক্ত হয় নাই। মোট কথা জনতা পার্টির সমর্থকদের নিয়েও জনতার ভোটের হার ৫০ ভাগে পৌঁছাবে না।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা জনতা পার্টির কাছাকাছি এসে যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। লোকসভায় তাদের এবারকার আসন সংখ্যা ২৬ থেকে ২২-এ নেমে গেলেও, মহারাষ্ট্রে তারা ৩টি আসন পেয়েছে, উড়িষ্যায় ১টি, পাঞ্জাবে ১টি, আর পশ্চিমবঙ্গে ২০টি আসনে প্রতিযোগিতা করে ১৭টিতে জিতেছে। মার্ক্সবাদীরা কেরলে একটি আসনও না পাবার ফলে কেরলার মার্ক্সবাদীদের শক্তির বড়াই-এর দিন চুকে গেলো। এখন রইলো কেবল পশ্চিম বাংলা। তাই এখানে জনতা পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া করে এই রাজ্যের ওপর খবরদারীর উদ্যোগ সুরু হয়ে গেছে। বিধান সভায় কর্মসূচীভিত্তিক আসন ভাগাভাগি এবং যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাব নিয়ে এই কারণেই মার্ক্সবাদীরা জনতা পার্টির নেতাদের স্বমতে আনবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আবার ক্ষমতা পেলে ১৯৬৯ সালের মত তারা যে হিংস্রতার ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে দলীয় একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? এ-যাবৎ তারা তো এ-বিষয়ে নীরবই রয়েছেন।

মার্ক্সবাদীরা গত লোকসভার ২৬টি আসনের পরিবর্তে এবার ২২টি আসন পেলেও, কেরল, অন্ধ্র, আসাম, ত্রিপুরায় তারা আসন হারিয়েছেন, যদিও মহারাষ্ট্রে ৩টি ওড়িষায় ১টি, পাঞ্জাবে ১টি আসন পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে, পূর্বেই বলা হয়েছে, পূর্বেকার ২০টি আসন, এবার ১৭টিতে কমে এসেছে। এদিক থেকেও মার্ক্সবাদীরা জনতার জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গে শেষবারের মত, ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবেন, বিধান সভার নির্বাচনে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদের দিকে হাত বাড়িয়ে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এক অংশ মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে বহুদিন যাবৎই মিলিত হবার জন্য দলের অভ্যন্তরে সংগ্রাম করে আসছে। এবারকার লোকসভার নির্বাচনে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কোথাও বা কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, কোথাওবা কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। তার ফলে এই দলের শ্যাম ও কূল দুই-ই গেছে এবং দলের এই পরিণাম দলের ভেতর যারা মার্ক্সবাদীদের সন্নিকটবর্তী হতে

চান, তাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। ১৯৭১ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি লোকসভায় ৯টি রাজ্য থেকে ২৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলো, আর এবার একমাত্র কেরল ও তামিল নাড়ু থেকে সর্বমোট ৭জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে,। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১-এ তাদের ৩জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবার এই রাজ্যে ৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকলেই পরাজিত হয়েছেন।

জনতা পার্টির উদ্ভব, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে উৎসাদন, মার্ক্সবাদীদের কেরলে মারাত্মক শক্তি হ্রাস এবং সামগ্রিকভাবে লোকসভায় শক্তিহ্রাস, দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মার্ক্সবাদীদের পশ্চিম বাংলায় আরও ঘনিষ্টতর ক'রে তুলতে পারে। সুতরাং যারা মার্ক্সবাদীদের নির্বাচনী বোঝাপড়ার আমন্ত্রণ জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন. তাদের একটু দূরদৃষ্টি দিয়ে আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। তারা যদি ভেবে থাকেন মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় এলেও তারা নৈবেদ্যর উপাচার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ক্ষমতার শরিক হয়ে সহ-অবস্থান করবেন, তাদের সেই নির্বোধের স্বর্গসুখ ভাঙতে বেশী সময় লাগবে না। তবে একথাও সুনিশ্চিত, জনসাধারণও সে-অবস্থায় তাদের দিক থেকে অনিবার্যভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

মোরারজী দেশাই ২৪শে এপ্রিল প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তার পেছনে সমর্থন রয়েছে জনতা দলের ২৭১ জনের, কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসীর ২৮ জনের, ৮ জন আকালী দলের, পেজেন্টস এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টির ৫ জনের, রিপাবলিকান পার্টির ২ জনের, মার্ক্সবাদীদের ২২ জনও সমর্থন করেছেন এবং আরও ডজন খানেক অন্যান্য ছোট ছোট দল এবং নির্দলদের। জগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রীর আসনের দিকে হাত বাড়িয়ে অকারণ জটিলতা বৃদ্ধি করে জনতার জোয়ারে বাঁধ দেবার কাজে লেগেছিলেন। জগজীবনবাবু সুদক্ষ প্রসাশনিক। তাঁর মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেসত্যাগে জনতার জোয়ার সুনিশ্চিতভাবে স্ফীতকায় হয়েছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবেন, জয়কাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই প্রমুখদের অতর্কিত গ্রেপ্তার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ, আইনের শাসনের সাময়িক বিলোপ সাধন করে যে এমারজেন্সী ইন্দিরা গান্ধী জারী করেছিলেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জগজীবনবাবু একাধিকবার স্বীকার করেছেন, যে গোড়ায় সেই এমারজেন্সীর প্রয়োজনীয়তা ছিলো। মোরারজী দেশাই জনতা পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, অবিচলিতভাবে ইন্দিরা গান্ধীর কারাগারে ২০ মাস নির্জন বাস করে এই বয়সেও আত্মিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন। সুতরাং মোরারজীর পরিবর্তে জগজীবন রাম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হ'লে, প্রচণ্ডভাবে অনৈতিকতা প্রশ্রয় পেতো। শপথ নেবার আগে রাজনারায়ণ ও জর্জ ফারনাণ্ডেজ-এর আচরণ দুঃখজনক। মন্ত্রীর তালিকায় নাম ঘোষিত হবার পর শপথ গ্রহণে অনুপস্থিত থেকে জনতার উদ্বেলতায় স্বল্পক্ষণের জন্যও এঁরা বিভ্রান্তি

এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জনতার চাপ তাদের ঠিক পথে এনেছে।

ত্রিশ বছর পর ভারতবর্ষে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হ'ল। দেশবিভাগে জাতীয় নেতৃত্ব জাতীয় বিপ্লব প্রতারিত করে, সমাজবিপ্লবের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিলো, সে-বাধা ত্রিশ বছরের সংগ্রামের পর অপসারিত হ'ল। দেশ-বিভাগের অপরাধে যারা অপরাধী, সমাজবিপ্লবের পথে প্রকাণ্ড বাধা অপসারণের পর, সেই অপরাধীদের মূল্যায়নে বিপ্লবী জনতা অগ্রসর হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক আদর্শের ডাক পড়বে এই মূল্যায়নে এবং বিপ্লবের পরবর্তী পন্থা-নির্ণয়ে। জনতা পার্টির নূতন সরকারকেও এই দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত ক'রে দিচ্ছি।

ভারতীয় জীবনে ইন্দিরা গান্ধীর শাসন যে স্বৈরাচারের স্বাক্ষর রেখে গেছে, সর্বতোভাবে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে, সংবাদপত্রের এবং স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করেছে, শ্রমিক-কৃষকের শোষণমুক্তির পথে যে অবরোধ সৃষ্টি করেছিলো, মোরারজী দেশাই তার প্রথম ভাষণে তার সবই দূর কর'বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে সেদিকে নূতন সরকার অনেকটা এগিয়েও গেছেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সকল দেশের সঙ্গে সুস্থসম্পর্ক স্থাপনের এবং প্রকৃত নন্-এলায়েণ্ড থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নন্-এলায়েণ্ড থাকার নামে কোনো বৃহৎ শক্তির দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের প্রবণতা রুখতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাক্তন সরকারের নায্য প্রতিশ্রুতি মোরারজীর সরকার মেনে চলবেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর রূপায়ণে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর পক্ষে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, এটাই লক্ষ্য করতে হবে। গত ৭ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট নন্-এলায়েণ্ড আন্দোলনের ব্যুরোর উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রকৃত নন্-এলাইনমেণ্টের নীতি ঘোষণার সঙ্গে মোরারজী বলেন: 'উন্নয়নের নৈতিক ও আত্মিক ভিত্তি থাকতে হবে তার বস্তুতান্ত্রিক উপাদানের সঙ্গে। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য যদি আনন্দ ও তৃপ্তি হয়, তবে জীবনকে শুধু যান্ত্রিকতায় পরিণত করলে চলবে না।' নূতন সরকারের এটাই সর্বোত্তম বাণী, যে বাণীর অনাবিল উৎস জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রবল নৈতিক ও আত্মিক প্রেরণায়। ২৪শে মার্চ মোরারজী দেশাই-এর প্রধান মন্ত্রীত্বে নির্বাচনের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ সেই নৈতিক ও আত্মিক পটভূমি থেকে রাজশক্তি ও জনশক্তি সমন্বিত শক্তির কর্মপ্রবাহের উল্লেখ করেন, যুবশক্তি তার সঙ্গে অনির্বার্যভাবে যুক্ত হবে। রাজশক্তি ও জনশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হ'লে বিপ্লব দেখা দেবে এবং বিনয়নম্রচিত্তে দুর্বার জনশক্তির বিপ্লবী-চেতনাকে স্বীকার করে নিতে হবে। দেশবিভাগের প্রতারণার নিরিখে সমাজবিপ্লবের এই ইশারা স্মরণ রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

এই উনিশ মাসের এবং তার পূর্ববর্তী সময়ের সকল অনাচারের তদন্ত হবে। একটি একটি করে

জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং তা উন্মোচিত করছেন। আইনের রথ এগিয়ে যাবে, কে তার চাকার তলায় পিষ্ট হ'ল কে হ'ল না, ইতিহাস তা পেছন ফিরে দেখবে না।

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের কথা শিয়রে সমন অপেক্ষা করছে, ইন্দিরা গান্ধীকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মত নৈতিক বল তার পার্শ্বচরদের কারুর ছিলো না। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে জনতার আক্রমণে ১৪ই এপ্রিল প্যারিসের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ভেঙ্গে গেলে রাজা ষোড়শ লুই তাঁর পারিষদ ডুক্ ডেল্য রচেফুক্যো লিয়ানকোর্টের মুখে সে সংবাদ শুনে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন "C'est une re'volte,"—'এতো বিদ্রোহ'! লিয়ানকোর্ট তাকে সংশোধন করে বলেন: "Non, Sire, c'est une re'volution": 'না, মহাশয়, 'এটি একটি বিপ্লব'!

লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর অত্যাচারের বাস্তিল দুর্গ পতনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা গেলেও, তার পারিষদবর্গের মধ্যে লিয়ানকোর্টের মত স্পষ্টভাষী একটিও অবশিষ্ট ছিলো না। ইন্দিরা গান্ধী গোটা দেশকে যেমন বন্দী শিবিরে পরিণত করেছিলেন, তার পারিষদদের বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকেও তেমনি শৃঙ্খলিত করে রেখেছিলেন।

৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭

ছোট ছোট গল্পের জীবন নিয়ে

দিলীপকুমার কোনার

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে
আমার হাত, পা এবং সমস্ত যৌবন।
ফুল ফোটাবার আকাঙ্খা নিয়ে
বাগানে কে এসেছিলো
আমি দেখি নি।

বহ্নির আবেগ নিয়ে জ্বলছিলো একরাশ তারা
শেষ রাত্রির অনন্ত আকাশে।
তখন সৃষ্টির কলঘরে বন্দী
মৃত বাসনার পাখী,
তখন ফুল ঝরার ঝাপসা শব্দে
হাওয়ায় হাওয়ায় রুপোলী মর্মর।
তারই মাঝে একসময় মনে হলো,
আজকাল তরুণ গলায় কেউ আর আমাকে
নাম ধরে ডাকছে না:
না মৌসুম, না সৌমেন, না নীতেশ
কিংবা কুন্তলা।

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে
আমার হাত, পা এবং সমস্ত যৌবন।
ছোট ছোট গল্পের জীবন নিয়ে
অতঃপর আমি
সহজিয়া বাউলের মতো
ভোর বেলাকার নদীতীরে যেতে চাই—
চলে যেতে চাই॥

ধারাবাহিক প্রবন্ধ
ফাল্গুন সংখ্যার পর
কিস্তি ১৩

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভয়শঙ্কর শর্মা

চীনা বিমানবাহিনী

১৯৪৯-এর ১লা অক্টোবর চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের কিছু পূর্বে মাও সে-তুং ঘোষণা করেছিলেন "……we shall have not only a powerful ground force, but also a powerful air force and a powerful navy……" (Consultative Political Conference of the Chinese People-এর অধিবেশনে ১৯৪৯-এর ২১শে সেপ্টেম্বরের প্রদত্ত ভাষণ)। ১৯৪৯ সালে ঘোষিত এই লক্ষ্যপূরণে মাও সে-তুং-কে বাইশ বছরের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিলো। জাপান সমুদ্র থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ বিস্তৃত এলাকায় বিন্যস্ত চীনের স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিবর্গের হিসাব-নিকাশের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চীনের বিমানবাহিনীর ব্যাপকতা কত? অতি আধুনিক সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব না হলেও, ছয়-সাত বছর পূর্বেকার হিসাব দেওয়া চলে। সে-সময় চীনের ৩০০০ আধুনিক বিমান সাজানো রয়েছে দূর-বিস্তৃত বিভিন্ন বিমান বন্দরে, এদের মধ্যে আবার ২০০০-ই জেট বিমান। চীনের বিমানবাহিনী কিন্তু খুবই নবীন। ১৯৪৯ সাল নাগাদ চীনা কম্যুনিষ্টবাহিনীর কোনো বিমান ছিলো না বললেই হয়। কোরিয় যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রুশ প্রথম ১০০০ বিমান চীনা সামরিকবাহিনীকে পৌঁছে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে চীনা বিমানবাহিনীর শক্তি ৫০ স্কোয়াড্রন জঙ্গী-জেটি মানে পৌঁছে যায়। এই বিমানগুলি মিগ-১৫, মিগ-১৭, মিগ-১৯, মিগ-২১-এর সমষ্টি। গোড়ায় এই বিমান সোভিয়েত রুশ সরবরাহ করলেও বর্তমানে চীনারা নিজেরাই এই প্রকৃতির বিমানগুলি তৈরীতে দক্ষতা অর্জন করেছে! এ-ছাড়া এই বাহিনীতে বিশ স্কোয়াড্রন হাল্কা বোমারুবিমান যুক্ত হয়েছে, দূর-পাল্লার

বোমারু রয়েছে, হেলিকপটারের স্কোয়াড্রন রয়েছে এবং পরিবহনের জন্য বহু বিমান রয়েছে।

বিমানবাহিনীতে, বৈমানিক বিমান বন্দরের এবং প্রশাসনের লোকজন নিয়ে, পাঁচলক্ষেরও বেশী সামরিক ব্যক্তিরা রয়েছেন। এদের ওপর নিরঙ্কুশ দলীয় কর্তৃত্ব রয়েছে। চীনা বিমানবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা বৈমা নকরা রয়েছেন। তাছাড়া পুরোপুরি মহিলাবৈমানিকদের দ্বারা সংগঠিত একটি মহিলা জঙ্গী বাহিনীও রয়েছে। বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশের পর চীনা বিমান-বাহিনী পৃথিবীতে তৃতীয় বিমান-শক্তিরূপে স্বীকৃত হলেও, বিমান-তৈরীর প্রযুক্তিবিদ্যায় চীন এখনও পিছিয়ে আছে।

সোভিয়েতের প্রস্তুতি

চীনের এই সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৬৯-এর মার্চে উসুরী নদীর তীরে চীন-রুশ সংঘাত বেধে গেলো, আর তারই অল্প কয়েকমাসের মধ্যে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে চীনের ওপর সোভিয়েত রুশের আণবিক আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠলে হো চি মিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য হানয়ে উপস্থিত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রুশ-চীন সংঘাতের মীমাংসায় ১৯৬৯-এর অক্টোবর থেকে রুশ-চীন বৈঠক সুরু হয়ে তিন বছর পরও সেই বৈঠক অচল হয়ে রইলো, কারণ দুই পক্ষের মধ্যে আলোচ্য বিষয়-সূচী (agenda) নিয়ে মতৈক্য হ'লো না। এই অবসরে চীন যেমন আনবিক আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য পিকিং-এ ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে ভূগর্ভ সহর তৈরী করেছে, বিভিন্ন রকমের সকল আণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তেমনি সোভিয়েত রুশও নিরুদ্যম না থেকে বহির্মঙ্গোলিয়াতে অস্ত্র-শস্ত্র বিন্যাস ক'রে আক্রমণাত্মক ব্যূহ রচনা করে। ইনটার-ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ হিসাব করে বলেন ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২-এর মে মাসের মধ্যে চীনের মুখোমুখি সোভিয়েত সামরিক ডিভিসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৪-এ বেড়েছে অর্থাৎ রুশ সেনাবাহিনীর এক চতুর্থাংশ পূর্বে চীন সীমান্তে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে মার্কিণ গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে জানা যায় ইতিমধ্যে আরও তিনটি নূতন যান্ত্রিক ডিভিশন চীন সীমান্তে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং সে-সময় চীন-সীমান্তে মোট সোভিয়েত ডিভিসনের সংখ্যা ৪৯-এ পৌঁছেছে;—অর্থাৎ সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

১৯৭৫-এর ২২শে ডিসেম্বর পিকিংস্থ 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা যে সংবাদ পরিবেশন করেন, তাতেও চীন সীমান্তে সোভিয়েতের চূড়ান্ত সামরিক প্রস্তুতি সমর্থন করে। সংবাদে বলা হয় সর্বশেষ চীনা উপগ্রহ চীন সীমান্তে রুশ সামরিক তৎপরতার বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। মঙ্গোলিয়ায় অবস্থানকারী সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। ভ্লাডিভস্টক থেকে সোভিয়েত

নৌবাহিনীর ঠঠলও দ্বিগুণ করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, কামান ও অন্যান্য সরঞ্জাম পশ্চিম রাশিয়া থেকে সীমান্তে আনা হয়েছে। ৬৪০০ কিলোমিটার রুশ-চীন সীমান্তে তা রয়ে গেছে। চীন, সেনিয়াং, পিকিং, লাঞ্চো এর সিনকিয়াং-এ সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে।

রুশ-চীন বৈঠক

১৯৬৯ সাল থেকে তিন বছরব্যাপী সীমান্ত-বিরোধের আলোচনায় সোভিয়েত রুশের মুখপাত্র লিওনিড্ ইলিচেভ ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে পড়েন, আলোচনার কড়াকড়ি ও সংঘাতে। তিন বছর আলোচনা চলাকালীন তিন জন সোভিয়েত মুখপাত্র পর পর দায়িত্ব নেন। ইলিচেভ এদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। ১৯৬৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৭১-এর অক্টোবর পর্যন্ত চীন-রুশ সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসা আলোচনার বৈঠকে চীনের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়াও কুয়ান-হুন প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন। চীনে সাংহাই-এর চার র‍্যাডিক্যালের—'Gang of four'—বিরোধীদের ধারণা, এই র‍্যাডিক্যালদের পরামর্শ অনুযায়ী হুন, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে আলোচনায় কঠিন মনোভাব (hard line) গ্রহণ করতেন। হুন বরাবরই কট্টর সোভিয়েত-বিরোধী। তার জেদ-এর দরুণ রুশ-জাপ শান্তি-চুক্তিতে সোভিয়েত-বিরোধী ধারা সংযোজিত হলে সেই শান্তি-চুক্তির আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৯ সালের অক্টোবরে চীন-রুশ সীমান্ত-সংঘর্ষ-মীমাংসা বৈঠক সুরু হবার পর মাঝে মাঝে এই বৈঠকে ছেদ পড়েছে। শেষবার ছেদ পড়ে ১৯৭৫-এর মে মাসে। বৈঠকে রুশ প্রতিনিধিদের মুখপাত্র লিওনিড ইলিচেভ দেশে ফিরে যান। আবার আলোচনা-বৈঠক সুরু করবার জন্য ১৮ মাস বাদে লিওনিড ইলিচেভ ১৯৭৬-এর ২৭শে নভেম্বর পিকিং-এ পৌঁছান এবং ৩০শে নভেম্বর চীনা উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আলোচনা-বৈঠকের চীনা-মুখপাত্র ইউ চাও-র (Yu Chao) সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন। দুই পক্ষের আলোচনা দীর্ঘায়িত হবার এবং মাঝে মাঝে ছেদ পড়ার কারণ আলোচ্য-বিষয় নির্বাচনে (agenda) মতানৈক্য।

১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিওনিদ ইলিচেভ এবং চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুয়াং হুয়ার সীমান্ত সংক্রান্ত গোপন বৈঠকের সংবাদ ২৭শে ফেব্রুয়ারী পিকিং থেকে প্রচারিত হয়েছে। ৭ বছর যাবৎ দীর্ঘায়িত এই আলোচনায় কোনো নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। একমাত্র চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের 'তাত্ত্বিক শিক্ষণ গোষ্ঠি' প্রচারিত একটি প্রবন্ধ ছাড়া। এই প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিবৃতির পর বলা হয়েছে যে, রুশ-চীন আদর্শগত বিরোধ দীর্ঘকাল যাবত চলবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই দেশের মধ্যে সহাবস্থানে পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

মাও-এর মৃত্যুর পর

১৯৭৬-এর ৮ই সেপ্টেম্বর মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে নানা বিতর্ক চলছে। ১৯৭৬-এর গোড়ায় চু এন লাই-এর মৃত্যুর, পর তার স্থলবর্তী অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তেং সিয়াও-পিং-এর বিতাড়ন, চীনের র‍্যাডিকালদের এ-বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ, মাও-এর মৃত্যুর পর মাও-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী হুয়া কুয়ো-ফেং-এর ১৯৭৬-এর ৮ই অক্টোবর চীনের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণের দুইদিন পূর্বে ৬ই অক্টোবর, মাও-পত্নীসহ সাংহাই-এর চার র‍্যাডিক্যাল নেতার গ্রেপ্তার এবং অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে চীনের বড় বড় সহরে তাদের সমর্থকদের বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ—চীনের এই আভ্যন্তরীণ অস্থৈর্যের মধ্যে রুশ-চীন বিরোধের সূত্রগুলি কোন্ খাতে বইছে, তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য না হলেও, বিরোধের পরিমাপক নানা লক্ষণ চিহ্নিত করা চলে। চু এন-লাই-এর মৃত্যুর পর সোভিয়েত রুশ ও তার আওতায় পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দলগুলির শোকবার্তা-সমূহ চীন তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয় এই কারণে যে, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি'র সঙ্গে এই সকল রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টিসমূহের কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নাই। তেমনি মাও-এর মৃত্যুর পর অনুরূপ শোকবার্তা সমূহ এবং হুয়া কুয়ো-ফেং-এর চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি'র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য ঐ সব দেশের অভিনন্দন-বার্তা সমূহও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবার অপর পক্ষে ১৯৭৫-এর অন্তিম পর্বে, চু এন-লাই-এর মৃত্যুর পূর্বে, তেং সিয়াও পিং চীনের প্রশাসনের সর্বময় দায়িত্বের পদ থেকে তার ২১ মাস পূর্বে চীনের আকাশে উড়ন্ত রুশ হেলিকপটার নামিয়ে তার তিন বন্দী রুশ বৈমানিককে মুক্তি দিয়ে চীন-রুশ সংঘর্ষ-মীমাংসার একটি সেতু রচনা করেছিলেন বলা যেতে পারে।

এই তিন রুশ বৈমানিক মুক্তির পর চীনাদের আদর, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনায় হতচকিত হয়ে যায়। পিকিং-এ মস্কৌর রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি, এস, তলস্তটিক যেন যাদুমন্ত্রে বিস্মিত হয়ে গেলেন, এই সব কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে।

কিন্তু এর মধ্যে মস্কৌ-পিকিং-এর অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের বিরাম নাই। এই সময় চার-দিনের মধ্যে চীন দুইবার জানায় যে বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করবার জন্য সোভিয়েত-মার্কিণী প্রতিযোগিতা আর একটি বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আনছে।

সমসময়ে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী সরবে ঘোষণা করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আর একটি যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মস্কৌই যুদ্ধের আসল উৎস, আমেরিকা দুর্বলতর এবং আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

এর পূর্বে ১৯৭৫ এর ১৩ই ডিসেম্বর সোভিয়েত রুশ প্রাভদার পৃষ্ঠায় বলেছে: চীন এশিয়ার দেশগুলির বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন জন্য নানা দেশের সব মিলিয়ে ৩০ লক্ষ বর্গ

কিলোমিটার পরিমিত ভূখণ্ড দাবী করেছে, যার পরিমাপ মোট চীনা ভূখণ্ডের এক তৃতীয়াংশের সমান। এছাড়া দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ২০০টি দ্বীপের ওপর চীন দাবী জানিয়েছে। এই দ্বীপগুলির অনেকগুলিই চীনের ১০০০ মাইলেরও বেশী দূরে এবং জাপান, ভিয়েৎনাম, ফিলিপিনস ও অন্যান্য দেশের দ্বীপপুঞ্জ এই ২০০টির মধ্যে গোণা যেতে পারে।

চীন প্রজাতন্ত্রের ২৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৭৬-এর অক্টোবরে চীনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিনন্দনের উত্তরে চীনের ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও স্টেট কাউনসিল তাদের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি সোভিয়েত রুশকে জ্ঞাপন করে। কিন্তু সোভিয়েত রুশের সঙ্গে চীনে মাও-এর মরণোত্তর ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক কি দাঁড়াবে সে-সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সূচনা অনাবৃত হয়েছে বলে জোর করে বলা যায় না। ১৯৭৬-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি চীনের মাও-উত্তর রাজনৈতিক সংঘাতে চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো-ফেং-এর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিধ্বস্ত, বন্দী ও ধিক্কৃত সাংহাই র‍্যাডিক্যাল-রূপে চিহ্নিত চার নেতা—যাদের বর্তমান নামকরণ হয়েছে "Gang of Four", অর্থাৎ 'চার-দুর্বৃত্তের দল'—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তারা যাদের পর্যুদস্ত, অসম্মানিত এবং ক্ষমতার আসন থেকে নির্বাসিত ও চীনের জনজীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, নেপথ্য-নির্বাসন থেকে তাঁরা বেরিয়ে এসে ১৯৭৬ সালের ২৪শে অক্টোবর, পিকিং-এর তিয়েন-আন-মেন স্কয়ারে হুয়ার সমর্থনের এবং 'চার-দুর্বৃত্তের' বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আয়োজিত জনসমাবেশে হুয়া কুয়ো-ফেং-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সু সিয়াং-চিয়েন (Hsu Hsiang-chien), নিয়ে য়ুং-চেন (Nieh Jung—Chen), চেন য়ুন (Chen Yun), তান্ চেন-লিন (Tan Chen-lin), চিং-চুয়ান (Ching-Chuan) এবং উলান ফু (Ulan Fu)। এরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত চু-এন-লাই অনুসৃত নীতির সমর্থক ছিলেন। এই নীতিরই বিন্যাসরূপে '৭৬-এর ২৫শে অক্টোবরে দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয় চীনের নূতন ক্ষমতাসীনদের কাজ হবে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর মীমাংসা এবং চীনের নবায়ন। এই লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য কৃষি, শিল্প, কারিগরী-সংগঠন এবং প্রতিরক্ষার উন্নয়নের পথে সকল অন্তরায় দূর করতে হবে। চীন পর্যবেক্ষকরা মনে করেন এই কর্তব্যসাধনে চীনকে দ্রুত সমাজবাদী শক্তিরূপে স্বীকৃত হ'তে হবে এবং সে-কাজে আদর্শনৈতিক বিতর্ক, সহায়ক না হয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এ-ছাড়া 'চার-দুর্বৃত্তদের' উৎসাদনের জন্য সেনাবাহিনীর ওপর হুয়ার নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই কারণে হুয়াকে সেনাবাহিনীর দাবীও মেটাতে হবে। আর তাদের দাবী হ'লো সেনাবাহিনীর আধুনীকিকরণ। এই আধুনীকিকরণের পথ মসৃণ করতে হ'লে মস্কৌর সঙ্গে সংঘাত তো বন্ধ করতেই হবে! উপরন্তু মস্কৌর সঙ্গে সম্পর্কটা মৃদু ক'রে তুলতে হবে। সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকেও মাও-এর লোকান্তরের পর নানা

কৌশলে চীনের সঙ্গে মীমাংসার সদিচ্ছা চীনের নূতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত রুশ থেকে বেতারে চীনের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিবর্তে চীনের সঙ্গে অতীত মৈত্রী-সম্পর্কের সুখস্মৃতির রোমন্থন হচ্ছে। একটি বেতার বার্তায় বলা হয়েছে ১৯৬০ সালে চীন-রুশ দ্বন্দ্ব শুরু হবার পূর্বেকার দশ বছরে সোভিয়েত রুশ ১১,০০০ চীনা বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং বর্তমানে তা আবার আরম্ভ করা সম্ভব। এমনকি চীনের আণবিক শিল্পসমৃদ্ধিতে সোভিয়েত রুশের অবদানও একটি বেতার বার্তায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। মস্কৌ বেতার থেকে আদর্শনৈতিক প্রচারেও বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে চীন ও রুশের পারস্পরিক স্বার্থে মৌলিক বিরোধের উল্লেখ করে এই দুই দেশের পুনর্মিলনের পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তা সর্বৈব মিথ্যা। মস্কৌ এই পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মৈত্রী গঠনের জন্য রুশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: "....the revival of the mighty anti-imperialistic alliance of the Union, China, and other Socialist States" (Victor Zorza, ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৪-১১-৭৬)। ১৯৭৬-এর ২৫শে অক্টোবর মস্কৌ থেকে জানানো হয় যে ২৪শে অক্টোবর রাত্রিবেলা সোভিয়েত রুশ এবং মঙ্গোলিয়া চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করবার জন্য নূতনভাবে আবেদন জানিয়েছে। সে-মাসে পশ্চিমী সংবাদপত্রে ক্রেমলিনের কে, জি, বির মুখপাত্র ভিক্টর লুইস নামক এক ব্যক্তি একটি প্রবন্ধে লেখেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করে যে চীনা সামরিকবাহিনীর পুরানো নেতাদের সঙ্গে তাদের পক্ষে আপোষ-রফা করে ফেলা সহজ হবে কারণ তারা জানে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য চীনকে কী বিপুলভাবে এগিয়ে দিয়েছে: "It is therefore believed in Moscow···that they still realise the need to find a common language with their Soviet neighbour"। (Victor Zorza, ষ্টেটসম্যান ৪-১১-৭৬)। এই সঙ্গে লুইস ভয় দেখিয়ে বলেছেন 'মস্কৌর তরুণ নেতাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। আর এক মাসের মধ্যে চীনা নেতাদের এ-বিষয়ে সায় জানাতে হবে। এটাই বোধহয় তাদের বলবার শেষ সুযোগ যে, যারা চীন সম্পর্কে মস্কৌর অনমনীয় ও অমোঘ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন তারাই যথার্থ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।' ভিক্টর লুইসকে দিয়ে ষাট দশকের শেষের দিকে চীনকে অনুরূপ ভয় দেখানো হয়েছিলো। সোভিয়েতের এই ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের ১৫ই অক্টোবর সে সময়কার মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব কিসিংগার সোভিয়েত রুশকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন 'চীনে রুশ সামরিক হস্তক্ষেপের পরিণাম গুরুতর হবে'। সোভিয়েত রুশ

অবশ্যি কিসিংগারের সতর্কবাণীকে এই বলে উড়িয়ে দেয় যে তার মনে ভয় ঢুকে গেছে, পাছে চীন ও সোভিয়েত রুশ তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলে!

দ্বন্দ্ব ও দাঁতাত প্রচেষ্টা

১৯৭৬-এর ২৮শে এপ্রিল মস্কো পিকিংকে অচল রুশ-চীন সীমান্ত—আলোচনায় ফিরে আসবার আহ্বান জানালে তারপর দশদিন পিকিং থেকে বেতারে, মস্কোকে আক্রমণের বেগ ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেলো। সে-সময় চীনে, দারুণ আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ; সাংহাই-এর 'চার দুর্বৃত্তের' গ্রেপ্তারের পর বিক্ষোভের তরঙ্গ, হুয়া কুয়ো-ফেং-এর মত মধ্যপন্থীদের সোভিয়েত রুশ দলে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। আর সেই সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে লুণ্ঠন, শোষণ, নিপীড়নের এবং যৌথ শেয়ার কোম্পানীর মারফৎ এশিয়ায় একচেটিয়া মুরুব্বীয়ানায় (hegemonism) এবং সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন অভিযোগের তীব্রতায় চীন, সোভিয়েত রুশকে তচ্‌নচ্‌ করে দেয়।

আরও আছে। ১৯৭৬-এর ৭ই মে প্যারিসের সূত্রে জানা যায় সফররত ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব এণ্টনী ক্রশল্যাণ্ডকে চীনারা বলেন যে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এবং অনিবার্য। চীনের চোখে সোভিয়েত রুশ পূর্ব-পশ্চিমের দাঁতাত সংগঠিত করে পশ্চিমী শক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন রাখতে চায়।

কিন্তু এই দুই দেশের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ কৈ? ১৯৭২ সালের শেষের দিকে চীনের পশ্চিম সীমান্তে কাজাখাস্তান-সিনকিয়াং এলাকায় দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিনকিয়াং সীমান্তে চীনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির মাত্র নয় দিনের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সিনকিয়াং-এ চীনা মিলিশিয়া এবং সোভিয়েত রুশের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চীনা সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী প্রচার করে যে সোভিয়েত রুশ মালাক্কা প্রণালী করায়ত্ত করতে, ঐ এলাকায় একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ১৯১৪র ২৮শে অক্টোবর জার্মাণ যুদ্ধ-জাহাজ দ্বারা পেনাং বন্দরে আক্রান্ত হয়ে রুশ ক্রুইজার 'জেমচুগ'-এর সাতজন নাবিক মৃত্যুবরণ করে। রুশ কর্তৃপক্ষ পেনাং-এর ওয়েষ্টার্ন রোডে অবস্থিত ক্রিশ্চিয়ান কবরখানায় সেই মৃত নাবিকদের অন্তিম শয্যার ওপর ১৯৭৫-এর শেষের দিকে একটি স্মারক-স্তম্ভ প্রস্তুত করে এবং ১৯৭৬-এর ৫ই ফেব্রুয়ারীতে মালয়েশিয়ার রুশ রাষ্ট্রদূতের সভাপতিত্বে পেনাং-এ সোভিয়েত রুশের উদ্যোগে ঐ নাবিকদের জন্য একটি স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতো দীর্ঘবছর পর অনুষ্ঠিত এই স্মরণ-সভাটিকেই মাল্লাকা প্রণালীর ওপর খবরদারীর জন্য তার আশে-

পাশে রুশ নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগরূপে চীনা সরকারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা চিহ্নিত করেছে।

রুশ-চীন দ্বন্দ্বের তীব্রতা ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারীতে আর একটি ঘটনায়ও উদ্ঘাটিত হয়েছে। ২২শে ফেব্রুয়ারী 'পিপলস ডেইলীর' ভাষ্যে ঘোষিত হ'ল আমেরিকার গুপ্তচর সি, আই, এর চাইতে রুশ গুপ্তচর কে, জি, বি মারাত্মক ক্ষতিকর। পিপল্‌স ডেইলীর সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে পৃথিবীর সকল কোণে প্রায় ৯০,০০০ হাজার কে, জি, বির গুপ্তচররা ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের কেউবা কূটনীতিক, কেউবা সাংবাদিক এবং কেউবা গোপন সংবাদ আহরণকারী, বিমানে ও জাহাজে নিয়োজিত রয়েছে। এরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত, প্রয়োজন হলে ধ্বংসাত্মক কাজও করে। পিকিং রেডিও বলেছে: "In western Europe a major target region, the Soviet espionage activities are ceaseless." সে-বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীন অভিযোগ জানায় যে সোভিয়েত রুশ তার জাতীয় অর্থনীতিকে সামরিক রূপ দিয়ে অস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধির ও যুদ্ধপ্রস্তুতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সোভিয়েত রুশের সমসাময়িক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৬-৮০) ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার নিকট-সম্পর্ক শস্ত্রোৎপাদনের দিকে এবং যার লক্ষ্য জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষমতা সম্প্রসারণ: "...which is closely related to munition production and which constitutes the basis for upgrading the capabilities of national defence." (New China News Agency)।

দাঁতাত (detente) নিয়ে চীন-রুশ বিরোধও সর্বজনবিদিত। ১৯৬৯ সালে ব্রেজনেভ এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার (Asian Collective Security) ডাক দেবার পর থেকেই চীনের চোখে এই ব্যবস্থাকে চীনের চারপাশে চীন-বিরোধী ব্যূহ রচনার উদ্যোগরূপে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের রচিত ব্যূহ সিয়াটোর (Seato) অনুরূপ। অবশ্য মস্কৌ থেকে চীনকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য এক সময় বলা হয়েছে শান্তির জন্য সার্বজনীন ব্যবস্থায় চীনের অংশ গ্রহণ অনিবার্য: " necessary participant."

দাঁতাত নিয়ে বিরোধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৭৬-এর জানুয়ারীতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকো চীন-জাপান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে জাপানের দরজায় ধর্ণা দিয়ে চেষ্টা করেন যাতে, এই চুক্তিতে চীনের জেদে কোনোরকম রাজনৈতিক মুরুব্বীয়ানা-বিরোধী ধারা (anti-hegemony Clause) যুক্ত না হয়। কিন্তু চীনের জেদে সেটা সম্ভব হয় নাই। ইতিপূর্বে সোভিয়েত রুশ জাপ-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ জাপানের উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েতের দখলে যে চারটি জাপানী দ্বীপ আছে,

তা না ছেড়ে দিলে জাপান সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করবে না। চীনের এই anti-hegemony তত্ত্বের মূল উৎস ব্রেজনেভের এশিয়ান যৌথ নিরাপত্তা (Asian Collective Security) প্রস্তাব প্রতিরোধের একটি শলাকা-বিশেষ। গ্রোমিকোকে তাই বলতে হচ্ছে : "...the Chinese leadership is trying to pressurise Japan into adopting Peking's hostile line towards the Soviet Union ...This proves China itself is seeking hegemony।" অথচ ১৯৭২-এ সাংহাই থেকে প্রকাশিত চৌ-নিক্সনের যৌথ বিবৃতিতে anti-hegemony সর্ত থাকলেও, ব্রেজনেভ সে-সময় তার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

১৯৭৬-এর ৭ই নভেম্বর, মস্কোর রেড স্কোয়ারে অক্টোবর বিপ্লবের ৫৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লেনিন স্মৃতিসৌধ থেকে মার্শাল গ্রেচকোর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় দাঁতাত বিরোধিতার দায়ে চীনকে অভিযুক্ত করা হয়। সেদিনই চীনের নূতন নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানিয়ে দেয় যে 'দুই দেশের মধ্যে নীতিগত বিরোধ ("questions of principles"). রাষ্ট্র এবং সরকারী স্তরে ('State and Government levels') সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হবে না। দক্ষিণ চীন সমুদ্রে অবস্থিত প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ ১৯৭৪-এর জানুয়ারী মাসে চীন তৎকালীন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের হাত থেকে নৌ-যুদ্ধে কেড়ে নেয়। ১৯৭৬য় ২২শে নভেম্বর প্রাভদায় চীনের প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ দখলের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় আলোচনা করে সোভিয়েত রুশ ঐ দ্বীপপুঞ্জের উপর ভিয়েৎনামের অধিকার সমর্থন করে। আর চীনও ১৯৭৬য় ২৬শে ডিসেম্বর মাও সে-তুং-এর তিরাশিতম জন্মদিনে চীন-রুশের দ্বন্দ্বের কোনো রকম মীমাংসার সম্ভাবনাকে দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করে এবং সেই সঙ্গে 'পিপলস ডেইলীতে' চীন-রুশ বিরোধের পূর্বাভাস দিয়ে মাও-এর ২০ বছরের পুরাণো একটি বক্তৃতা পুনঃপ্রকাশ করে। চীনের পলিট-ব্যুরোর ১৯৫৬ সালের ২৫শে এপ্রিলের অধিবেশনে মাও এই বক্তৃতাটি দেন এবং শোধনবাদের (Revisionism) বিরুদ্ধে চীনের মত যে কত দৃঢ়মূল, সে কথা বোঝাবার জন্যই এই বক্তৃতাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং মাও সে-তুং-এর লোকান্তরের পর যে চীন, সোভিয়েত রুশ সম্পর্কে তার নীতি পরিবর্তন করবে না, 'পিপলস ডেইলী'তে ১৯৭৬ এর ২৬শে ডিসেম্বরে মাও-এর ১৯৫৬-এর বক্তৃতা পুনঃ প্রকাশনে এই তাৎপর্য বহন করছে।

মাও-এর মৃত্যুর পরও বিরোধের তীব্রতা কোনো অংশে হ্রাস পায় নাই। ১৯৭৬-এর ৮ই নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়া (Huang Hua) সোভিয়েত রুশের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবকে জুঁয়াচুরী-রূপে এবং মস্কোর দাঁতাত-এর আগ্রহ শূন্যগর্ভ ও ছলনাময় রূপে বর্ণনা করেন। হুয়া খুব স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্র সঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটির ৮ই নভেম্বরের (১৯৭৬) সভায় বললেন : সোভিয়েত রুশই পৃথিবীতে যুদ্ধের সব

চাইতে ভয়াবহ উৎস। হুয়া আরও বলেন, একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা, অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী স্থিতস্বার্থের সংরক্ষণ। এই দুই পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি বিশ্বযুদ্ধে।

কিন্তু ১৯৭৬-এর ১০ই নভেম্বরে জানা যায় চীনা প্রজাতন্ত্রের ২৭-তম বার্ষিকীতে মস্কৌর অভিনন্দনের জন্য চীন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। অবশ্য এই কৃতজ্ঞতার আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব নাই। সেজন্যই তার অব্যবহিত পরে ১৬ই নভেম্বর পিকিং-এ সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট আমেদ বোকাসার সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় চীনের উপপ্রধান মন্ত্রী লি-সিয়েন-নিয়েন যা বলেন তার তাৎপর্য হোলো চীনের রুশ নীতি বদলায় নাই। লি স্বার্থহীনভাবে বলেন: 'চেয়ারম্যান মাও চীনের যে পররাষ্ট্র নীতি স্থির করে গেছেন, তারা অবিচলিতভাবে তাই অনুসরণ করবেন।'

চীনের জঙ্গীবাদীরা ১৯৭৬-এর অক্টোবরে পরাজিত হলেও বিধ্বস্ত হন নাই। তাদের পুরোপুরি বিধ্বস্ত করতে হ'লে হুয়া কুয়ো-ফেংকে বাস্তববাদের সঙ্গে জঙ্গীবাদের সমন্বয় করে চলতে হবে এবং সোভিয়েত রুশ-এর প্রতি মাও-এর নীতি মোটামুটি অনুসরণ করতে হবে, সে-নীতি এখনই পরিত্যাগ করা চলবে না। তাই রুশ-চীন দ্বন্দ্বের আপাতত তীব্রতা কমলেও সে-অন্তঃসলিলা দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হবে না। তবে সোভিয়েত রুশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তঃসলিলা শস্ত্র-প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি শস্ত্র সংঘাতের রূপ নেয়, রুশ-চীন বিরোধেও তীব্রতা দেখা দেবে, সেদিন চীনকে হয়তো আমেরিকার পাশেই দেখা যাবে। অবশ্যি চীনের ধারণা রুশ-মার্কিণ বিরোধ শস্ত্র সংঘাতে অনিবার্য পরিণতি পাবে এবং সে-সময়ও চীন পরিখায় অপর পাশে সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। রুশ-চীন দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি কোন পথে, চীনের সাম্প্রতিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের পর তা আপাতত অনির্ণেয় হয়ে উঠেছে। চীন-রুশের বিরোধ মাওবাদের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের শোধনবাদ-এর বিরোধ। চীনে জাতীয়তাবাদের উপর মাও-বাদের পুরু প্রলেপ পড়েছে। সুতরাং মাওবাদ ও চীনা জাতীয়তাবাদের আদর্শনৈতিক তত্ত্বকে যারাই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবেনা, তাদের সঙ্গে চীনের বিরোধ মিটবে না। সোভিয়েত রুশের সঙ্গে চীনের এই বিরোধ আপাতত দৃশ্যত হ্রাস পেয়ে থাকলেও চীনের আভ্যন্তরীণ শক্তি সংঘাতে কিছুটা চাপা পড়েছে মাত্র। সুতরাং এই আলোচনায়ও আপাতত এই খানেই ছেদ টেনে অপেক্ষা করতে হবে।

সমাপ্ত.

সাহিত্যে সমকালীনতা ও আধুনিকতা

সমর দত্ত

বিভিন্নকালে, বিভিন্ন সময়ে, সমাজ-জীবনের পরিবর্তন একটি ইতিহাস-সম্মত স্বীকৃত ঘটনা। এই পরিবর্তন দেখা দেয় নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা শক্তির প্রভাবে পরিবর্তনের রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্যে রূপান্তর ঘটায়। যার লক্ষণগুলিকে বলা হয় আধুনিক। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার লক্ষণগুলিরও রূপান্তর হয়। বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের রূপান্তরের এমন একটি দিক্‌চিহ্ন।

সাহিত্য-জগতে মাঝে মাঝে এমন এক একজন প্রতিভাশালী স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের সৃষ্টি পুরাতনের গর্ভে কখনো বিলুপ্ত হয়না। তাদের সৃষ্টি সর্বকালের রসপিপাসু মানুষদের উদ্দেশ্যে। সেইজন্য তাদের সৃষ্টির মধ্যে যে আধুনিকতা বিদ্যমান তা কোনো বিশেষ কালের মধ্যে সীমিত নয়। সে আধুনিকতা সর্বকালীন, সে আধুনিকতা চিরন্তন। এমনিভাবে আধুনিকতার দু'টি চিত্র আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত। একটি কোনো বিশেষ কালের আধুনিকতা আর একটি সর্বকালের আধুনিকতা। অথবা একটি যুগীয় আধুনিকতা অপরটি শাশ্বত আধুনিকতা। বাংলার অন্যতম সাহিত্য-প্রতিভা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে আধুনিকতার এই দুই স্বরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছে—'সমকালীনতা ও 'আধুনিকতার' পরিচয়ে।

১৯৭০ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা-বক্তৃতামালার ভাষণে তিনি 'সমকালীনতা'ও 'আধুনিকতা' শব্দ দু'টির ভিন্নধর্মী মৌল সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেন এবং নানারূপ তত্ত্ব ও তথ্যদ্বারা জীবনে ও সাহিত্যে সমকালীনতা ও আধুনিকতার প্রতিফলনের রূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন ঃ

'সমকালীন সাহিত্যে তৎকালীন জনসাধারণের চাহিদাগুলিকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয় ও সেই চাহিদাগুলিকেই সাহিত্যের রূপে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। সে সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে, সমষ্টি-সমর্থক ও দল-সমর্থক সাহিত্য। ফরাসী বিপ্লবের কথা আগেই বলেছি। তখনও দু' জাতের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল—সমকালীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য। সমকালীন সাহিত্যে ফরাসী দেশের চাষীদের আর মধ্যবিত্তদের অভাব অভিযোগের কথা রূপায়িত হয়েছিল আর সেই সময়ের আধুনিক সাহিত্যে শ্রেণীর দাবি সর্বমানবীয়

দাবির রূপ নিয়ে খণ্ডকালের বাঁধন কাটিয়ে চিরকালের দরবারে আপনার স্থান করে নিয়েছিল। একটা সাহিত্যে ধরে দেওয়া হ'ল গ্রামের চাষীদের ও শহরের মধ্যবিত্তদের দাবি। আর একটা সাহিত্যে বর্ণিত হ'ল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার সুর, ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের দাবি, তার স্বাধীনতার ও একচ্ছত্র অধিকারের কথা। একটি সাহিত্যে বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর কথা প্রকাশ পেল, তার সাহিত্যিক রূপ শ্রেণীর চৌহদ্দি ছাপিয়ে নিয়ে বিশ্বমানবত্ববাদের এলাকায় নিজের স্থান করে নিতে পারলো না। বিশেষ কাল, বিশেষ গোষ্ঠী এই সাহিত্যকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিল। আর অন্য সাহিত্য বিশেষ-কাল ও সেই বিশেষ কালের মানুষদের একেবারেই উপেক্ষা না করে কিম্বা আদর্শেই তাদের পাশ কাটিয়ে না গিয়েও তাদের মধ্যে যে চিরকালের মানবীয় সত্তা আছে সেটিকে প্রকাশ ক'রলো। আর এইভাবে সে সাহিত্য স্থান করে নিল চিরকালের মানব হৃদয়ে। ব্যক্তি-সত্তাকে বিপ্লব এমনি করে মুক্তি দিল সামাজিক শৃঙ্খলের বাঁধন থেকে। এই মুক্ত বাঁধনহারা ব্যক্তি-সত্তার আবির্ভাব হ'ল ফরাসী সাহিত্যে। বিচার স্থান নিল নির্বিচার ভাবালুতার, মুক্তি দিল জীবনকে সব রকম অন্ধ রহস্যময়তার ও অত্যাচারের নিগড় থেকে।"

এরপর রুশীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ বলেন :

"রুশীয় সাহিত্যেও এই দু'মুখী ধারার প্রকাশ দেখতে পাই। রোম্যান্টিসিজম্ এসে অতীতের বাঁধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করলো। পুশকিন এলেন, রুশীয় কবিতা ব্যক্তি-সত্তার জয়গানে মুখর হ'য়ে উঠলো। নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিগন্ত খুলে গেল রুশ দেশের মানুষদের সামনে। ভাষা, ভাব, চিন্তা সব একটি বিরাট ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হল, রাঙিয়ে উঠলো তার রঙে। তলস্তয় এসে ব্যক্তিসত্তার নানান্ ধারার সঙ্গে সমাজ-সংঘর্ষের খবর দিলেন আমাদের ; দস্তয়েভ্স্কি এসে ব্যক্তি-সত্তার চেতন-অবচেতন যে মিশ্রণ আছে তার বিচিত্র বুনুনি খুলে দেখালেন আমাদের। আনুষ্ঠানিক ধর্মীয়তার শ্বাস-রোধকারী প্রাণখর্বকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তির আলোকের ঘ্রাণ পেলো জীবন। রুশীয় জীবনে আধুনিকতা নিয়ে এলো এই সব সাহিত্য। তারপর এলো বিপ্লবের যুগ রাশিয়ায়। তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে লাগলো তার মধ্যে জনতার কোলাহল, শ্লোগান-চীৎকার, তাদের সমষ্টিগত দাবি, মিছিল—সব এলো, কিন্তু ব্যক্তি-সত্তা নিন্দিত হ'ল, প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা পেলো রুশীয় সাহিত্য বিপ্লবের যুগে। অথচ মানব-সমাজের ইতিহাসে প্রতিটি দ্বন্দ্বের, সংঘাতের ও বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিসত্তাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান।"

ফরাসী সাহিত্য এবং রুশীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে সমকালীনতার সুস্পষ্ট ছবি সৌম্যেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন, সাহিত্যে আধুনিকতার আলোচনা সম্বন্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ বলেন :

"আধুনিক সাহিত্য কোনো বিশেষ কালের

শীল-মোহর অঙ্কিত সাহিত্য নয়। সে কালোত্তীর্ণ সাহিত্য। তার গর্ব যে একটি বিশেষ কালের মানুষদের সুখ-দুঃখ, প্রেম, হিংসা, মানবতা, নীচতা—তাদের সত্তার বিচিত্র ভাবগুলি চিরকালের মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে সাহিত্য আধুনিকতার দাবি করতে পারে না। আধুনিকতার দাবি সেই সাহিত্যই করতে পারে যে সাহিত্যে মানুষের মানবিক সংঘাতের ইতিহাস আছে, আচার ও অনুষ্ঠানের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টার ও বিদ্রোহের হদিশ আছে, নতুন সৃষ্টির আবেগ যে সাহিত্যে পরিস্ফুট এবং সমষ্টির দাবির যাথার্থতার বিচার আছে যে সাহিত্যে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ মুক্তির ব্যাকুলতাকে ও চেষ্টাকে এবং ব্যক্তি-সত্তাকে জীবনের ও সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার অশ্রান্ত প্রয়াসকে যে সাহিত্যে চিরন্তন মানবতার রূপ দিয়ে চিরকালের হাতে সঁপে দিতে পারে, যেকালেই সেটি সৃষ্টি হ'য়ে থাকুকনা কেন, সেই সাহিত্যই আধুনিক সাহিত্য। কোনো কালই তাকে বর্জন করবেনা, চিরকালের মানুষ তাকে তাদের আত্মার আত্মীয়, অন্তরের আপনজন ক'রে ভালবেসে গ্রহণ করবে।"

এযুগে যে দেশ সর্বনিয়ন্ত্রনবাদের (Totalitarianism) ভিত্তিতে পরিচালিত, সেই দেশের সাহিত্যিকগণ রাষ্ট্রের হুকুম অনুসারে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হ'ন। এটা মানসিক ক্রীতদাসত্বের লক্ষণ। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ চায় বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে মানুষের রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষ। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ।

কিন্তু সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর নয়, কারণ সে সমাজে সমষ্টির চাপে ব্যক্তিসত্তা বিড়ম্বিত। সুতরাং সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে সেই সাহিত্য কখনই সৃষ্টি-ধর্মী এবং কালজয়ী হ'তে পারে না। সেইজন্য সেই সাহিত্য আধুনিকতার নিদর্শন নয়।

আর একটি সমস্যা হ'ল দলীয়তাবাদ। দলাদলি সব সময়েই ছিল। মনে হয় দলাদলি ব্যতিরেকে রাজনীতি অসম্ভব। কিন্তু এযুগের রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সাহিত্য, শিল্প, ধর্মের মতো সর্বজনীন সর্বকালীন বস্তুগুলিও দলীয়-সীমার অন্তর্গত। দলীয়তাবাদের চোখে কোনো কিছু নিত্য বা ধ্রুব নয়। ফলে এই কাঠামোর মধ্যে রচিত সাহিত্য, ব্যক্তির অনন্যতা ও তার স্বকীয়তাকে প্রকাশ না করে ব্যক্তিকে সমষ্টির অন্তর্গত ক'রে প্রকাশ করে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ এবং দলীয়তাবাদ সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে বর্তমানকালে বাঙলা সাহিত্যের যে ধারা প্রবহমান সেটি হচ্ছে সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে খর্ব করবার ধারা। সৌম্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই দুর্লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন "……এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, আধুনিক মনের ও ভাবের প্রকাশও এই

সাহিত্যে কোথাও নেই। এই সাহিত্যের স্রষ্টারা ধরেই নিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে মানব সমষ্টির কল্যাণের পরিপন্থী. ব্যক্তিসত্তাকে সমষ্টির খাঁচায় আটক করতে না পারলে মানুষের কল্যাণ নেই। অথচ সমস্যাটি ঠিক এর বিপরীত। সমষ্টিগত মানুষকে ব্যক্তিসত্তার অধিকারী করে তোলাই আমাদের কালের মহৎ ব্রত।".....

বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক আধুনিকতার জ্যোতিতে ভাস্কর হয়ে উঠেছিলো রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণের অনুকূলতায়। এই সব কালজয়ী পথপ্রদর্শকরা ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্যকে জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে এমন গতি সঞ্চার করলেন যে চিন্তার স্বাধীনতায় ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশ অপরূপ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠলো। এই মননের ও ভাবের জোয়ার উনবিংশ শতাব্দীর সীমা ছাপিয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করলো। মানব-মন এক নূতন জীবনবাদ ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'ল। জীবন-পরিধি এক সুদূর অপরিজ্ঞাত দিগন্তরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হ'ল। মানুষ আত্ম-শক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি সচেতন হ'য়ে উঠলো। এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও উদ্দীপনা মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্ফুরিত হ'ল। এমনিভাবে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের আবির্ভাব থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান অবধি এই একশো উনসত্তর বৎসর কাল হ'ল বাঙলা দেশে আধুনিকতার যুগ। সৌম্যেন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম আভাস পাওয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে। সনেটের সূচনা বাঙলা কাব্যে করলেন মাইকেল মধুসূদন ও লিরিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভূতি তার জায়গা করে নিল বাঙলা কাব্যে। তার পরে আধুনিকতার বিরাট স্রোত নিয়ে এলেন আধুনিকতার ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। লিরিক কবিতায় বাঙলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিকের পর্যায়ে জায়গা করে নিল। ছোট গল্পের সূচনা হ'ল। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে,' 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি আধুনিকতার চরম নিদর্শন। এই উপন্যাসগুলিকে একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ সমাজের সমস্যাগুলিকে সর্বকালের মানব-সমস্যার সার্থক রূপ দিয়ে আমাদের হৃদয় অধিকার করেছে।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ছোট গল্প ও 'কবি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি, বনফুলের গল্পগুলি ও শৈলজানন্দের 'কয়লা-কুঠি' জাতীয় ছোট গল্পগুলি নিঃসংশয়ে আধুনিক।"

ভারতের নব-জাগরণের মূলমন্ত্র ছিল সাহিত্য। সাহিত্য-সাধনাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করেছে। মহত্তর সংগ্রামে যদি আমাদের আবার অবতীর্ণ হতে হয়, এই সাহিত্যই আমাদের প্রেরণা জোগাবে। এযুগে অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল সাহিত্য। সমকালীন

সাহিত্যের কুশ্রীতার দিকে তাকিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ বলছেন :

"কোনো মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত কিম্বা মুক্তির ইঙ্গিত এই সাহিত্যে নেই। এই সাহিত্য বলছে—দেখ জীবন ঘিরে এই অন্ধকার, দেখ এই কুশ্রীতা ও অশ্লীলতা লক্ষ লক্ষ জীবনের আশ্রয়, এখানেই তাদের সৃষ্টিতে যবনিকা পড়েছে।.... এই সাহিত্য মানব-মনের জটিল বুনুনি ও তার মনের আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব—এ সবকে উপেক্ষা করে সমস্যাটিকে একপেশে করে সহজ করে নিয়েছে। মনটি নয় সম্পূর্ণ সাদা, নয় সম্পূর্ণ কালো। আর এই কালোর দিকটাকে স্ফীত করে দেখাবার চেষ্টাকে আধুনিক ব'লে প্রচার করছে। এই এক পেশেমির জন্যে মানুষ সম্বন্ধে এরা যা বলছে সেটি সত্য নয়। এই কারণেই এই সমকালীন সাহিত্য সত্যভ্রষ্ট সাহিত্য। সাহিত্যের বাস্তবতার কাজ হচ্ছে এই গোটা মানুষটিকে দেখানোর কাজ, আংশিক মানুষটিকে নয়। 'দেবদাস' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই গোটা মানুষটিকে দেখিয়েছেন দেবদাসের চরিত্রে। সমকালীনতার বাহাদুরী হচ্ছে মানব-চরিত্রের একটি বিশেষ অংশকে দেখানোর চেষ্টায়, আধুনিকতার কাজ হ'চ্ছে সমগ্র মানুষটিকে দেখানোতে।"

কিন্তু বাংলার অন্যতম সাহিত্য-প্রতিভা সৌম্যেন্দ্রনাথ নিরাশ হননি। তিনি আশার বাণী দিয়ে বলেছেন :

"আশা করা যাক্ যে সমকালীনতার হাল-ফ্যাশানী ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে বাঙালী সত্তা তার যেটি স্বধর্ম ও মৌলিকত্ব, যে মৌলিকত্বের জন্যে সে অনন্য, সে বিশ্ববন্দিত, সেই চিরন্তন আধুনিকতার পথে সে আবার অগ্রসর হবে।

"সৃষ্টিশীল আধুনিকতা বাঙালীর প্রাণবায়ু; সমকালীনতার বিষাক্ত গ্যাস তাকে কোনো মতেই নাশ করতে পারবে না"—।

অনিদ্র রজনীতে

সুমনা দাস

শীতের রাত। শ্বেতার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ও বুঝতে পারল না, ও ঠিক কোথায় শুয়ে আছে। একটু পর মনে পড়ল, গতকাল ও বাবা-মা ও ভাই দীপের সাথে এখানে বেড়াতে এসেছে। লেপটা ভাল করে পায়ে টেনে নিয়ে শ্বেতা আবার ঘুমোবার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম আসছে না। শ্বেতা জানলার স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকাল। গাঢ় নীল আকাশে কত তারা জ্বলছে-নিবছে টুপটাপ। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শ্বেতা চাঁদটাকে দেখতে পেল না। দূরপাল্লার একটা ট্রেণ হঠাৎ খুব জোরে হুইস্‌ল দিয়ে গাঢ় নীল আকাশের নিস্পন্দতাকে ভেঙে-চুরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। শ্বেতার হঠাৎ ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে ট্রেণের শব্দ শুনলেই ওর এ-রকম হয়। বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট গুমরে উঠছে। অথচ সারাদিন ও বাবা-মা-ভাইয়ের সাথে বেশ মজা করেছে। শ্বেতা হঠাৎ আপন মনে বলে উঠল'—

"আমার ভাল লাগছে না,—কিছু ভাল লাগছে না।"

... .

"এই দিদি, ওঠ্‌ ওঠ্‌, কি ঘুমোয় রে বাবা, ওঠ্‌ না।"

—দীপের অক্লান্ত চেষ্টায় অবশেষে শ্বেতার ঘুম ভাঙল। "—কি হয়েছে কি, ডাকাডাকি করছিস কেন?"—শ্বেতা ঝাঁঝিয়ে উঠল। দীপ সগর্জনে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শ্বেতার বাবা জয়দীপ ঘরে ঢুকলেন—"এই যে মামণি, উঠে পড়েছো দেখছি। চট্‌ করে রেডি হয়ে নাও তো। আমি ও তোমার মাম্মা একটু বেরিয়ে আসি, তারপর তোমরা বেড়িও রামদীনের সাথে। O. K.?"

—O. K. পাপা, আমরা রেডি হয়ে নিচ্ছি।

—আচ্ছা, তাহলে আমরা চলি। বাই।— জয়দীপ বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতার মা শ্রুতি ঘরে ঢুকলেন। সদ্য স্নান সেরে এসেছেন। মাকে দেখেই দীপ চেঁচিয়ে উঠল'—"ও মাম্মা, আই'ল গো উইথ য়ু।"

"নো দীপ। তুমি এখনও রেডি হওনি। তুমি দিদির সাথে বেরিও।" শ্রুতি আপত্তি জানালেন।

"তোমরা কখন ফিরবে মাম্মা?"—শ্বেতা জিজ্ঞেস করল।

—"বেশী দেরী হবে না। আচ্ছা, সোনারা বাই—"বাই মাম্মা"—দুজনে ডুয়েট গাইল।

... ...

স্নান সেরে, রেডি হয়ে, চা-টা খেয়ে শ্বেতা ও দীপ বাগানে রোদে এসে বসল। শ্বেতা দীপকে ধমকে উঠল—"দীপ, তুমি তখন মাম্মার সাথে যাব-যাব করছিলে কেন? মাম্মা-পাপাকে একটু নিজেদের মধ্যে কথা বলার চান্স দেবে তো। সারাদিন তো তোমার জ্বালায়…" শ্বেতা আর কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই দীপ তেড়ে উঠল—"তুই চুপ কর তো দিদি। বেশী কথা বলবি না। এমন জায়গায়ও মানুষ চেঞ্জে আসে। নামটাও কি সিলি—রামগড়। এখানে কি রামের গড় আছে নাকি?"

"তুই বড্ড বেশী কথা বলিস্, দীপ। আমার তো জায়গাটা বেশ ভালই লাগছে। আই থিংক মাম্মার পক্ষে এই চেঞ্জটা ভালই হবে।"

—মাম্মার কি হয়েছে দিদি?

—তুই বুঝবি না।

—'আমাকে বুঝিয়ে দাও না, তাহলেই বুঝবো।

"শোন তা'হলে—আমাদের স্টমাকে ইউটেরাস নামে একটা অর্গান আছে। আলসারেশনের জন্য মাম্মার সেই অর্গানটা রিমুভ করতে হয়েছে। এমনিতে এটা মাইনর অপারেশন হলেও, মাম্মার এই অপারেশনটার পর ফিজিকালি ও মেনটালি খুব আপসেট হয়ে পড়ে। তাই ডক্টর চ্যাটার্জী মাম্মাকে চেঞ্জে যেতে এ্যাডভাইস করেন। তাই তো আমরা এখানে এলাম।"

—"ও আচ্ছা, বুঝেছি, বুঝেছি।"—দীপ খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল। শ্বেতা ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল।

এমন সময় গেটের কাছে শ্রুতি ও জয়দীপকে দেখা গেল। দীপ লাফিয়ে উঠল—দিদি পাপারা এসে গেছে। চল্, এবার আমরা বেরোই। শ্রুতি ও জয়দীপ বাগানে ঢুকে ক্লান্ত ভাবে শ্বেতা ও দীপের পরিত্যক্ত গার্ডেন চেয়ার দুটোতে বসে পড়লেন।

—"পাপা, আমরা বেরোচ্ছি। বাই।" শ্বেতা ও দীপ তাদের বাংলোর দরোয়ান-কাম-গাইড রামদীনের সাথে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ শ্বেতা বলে উঠল—"দীপ আই হ্যাভ লেফট মাই ওয়াচ ইন মাই ড্রয়ার।"

—"ওঃ দিদি, তুই না একটা হোপলেস। যা নিয়ে আয়। আমাদের কারুর হাতে ঘড়ি নেই, সময় বুঝব কি করে?"

—"স্যরি দীপ। তোরা এগো। আমি আসছি।"

—শ্বেতা দৌড়াল। গেট দিয়ে ঢুকে শ্বেতা হঠাৎ শুনতে পেল, তার মা-বাবা উত্তেজিতভাবে কোন ব্যাপার আলোচনা করছেন। কৌতূহলী কিশোরী একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বনঝাউয়ের আড়ালে দাঁড়াল। একটু পর ও বুঝতে পারল, ওরা ওর টিনাকাকীমা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। টিনাকাকীমাকে শ্বেতার একটুও ভাল লাগে না। সব সময় খুকী সেজে থাকেন আর ওদের বাড়ি এসে ওর পাপার সাথে গল্প করেন। দীপকে খুব 'ফাইভ স্টার' খেতে দেন। কিন্তু শ্বেতা ওর সাথে বেশী

কথা বলে না। শ্বেতা এটা খুব ভালভাবেই জানে যে, টিনাকাকীমাও তাকে পছন্দ করেন না। শ্বেতা শুনল, জয়দীপ খুব ঠাণ্ডা ভাবে বলছেন—"আঃ হা, তুমি এত অস্থির হচ্ছ' কেন? কি এমন হয়েছে সাংঘাতিক!"

উত্তেজিত শ্রুতি চাপাস্বরে বললেন—"কি হয়েছে, তুমি জান না? সত্যি কি চেঞ্জ তোমার! হিপোক্র্যাট।"

—"আরে বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়ো না। শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।"

—"আমার শরীরের কথা তোমার ভাবতে হবে না।"

—"ছি ছি, কি সব বলছ, শ্রুতি। এখন এই বয়সে এত এক্সাইটেড হওয়ার কোন মানেই হয় না। বড় বড় দুটো ছেলেমেয়ে আছে। ওরা যদি এ অবস্থায় দেখতে পায় আমাদের, কি ভাববে বল তো?"

—"যা খুশী ভাবুক গে। আমি আর এখন কারও কথা ভাবব না। তুমি শুধু আমাকে জানিয়ে দাও—আমি হসপিটালে থাকার সময় তুমি যে রোজ টিনাকে নিয়ে ঘুরতে, সে কথা আমাকে বলনি কেন? তুমি তো প্রসুন না থাকলে ওদের বাড়িতেও যেতে। বল, জানাওনি কেন? হোয়াই? তুমি বয়সের কথা তুলছো, ছেলে-মেয়ের কথা তুলছো, কেন তখন তোমার এসব মনে ছিল না?"—শ্রুতির কপালে এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

জয়দীপ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিব্রত স্বরে বললেন—"তোমাকে বোঝালেও তুমি এখন বুঝবে না। য়ু মাস্ট টেক রেস্ট নাউ।"

—"না আমি বুঝব না, টিনা বুঝবে। তুমি আমাকে rest-এর কথা বলো না।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, শোন শ্রুতি, ব্যাপারটা হচ্ছে, ইয়ে মানে—টিনা ওয়ান্টস সামওয়ানস কম্প্যানি। ওর কোন সন্তান নেই, প্রসুনও সারাদিন কাজে থাকে তাই। আমাদের কোন খারাপ মানে, I mean, ক্ষতিকর ইনটেনশন ছিল না।"

—"টিনার মত এরকম অনেক মেয়ে আছে। তারা তো অন্য ভাবে সময় কাটায়। তুমি আমাকে ভাঁওতা দিয়ো না।"

—শ্রুতির চোখ সরু হয়ে এল।

—"ঠিক আছে, তুমি যখন এত উত্তেজিত হচ্ছো, আমি স্বীকার করছি, আই প্লীড গিল্টি, আমার দোষ হয়েছে, আই গট উইক ফর আ টাইম। আমাদের এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ছেলে-মেয়েরা বড় বড় হয়ে গেছে, ভালোর জন্যেও বলছি—নাউ আই ওয়ান্ট আ পীসফুল কম্প্রোমাইজ এ্যাণ্ড এ্যাড্‌জাস্টমেন্ট বিটুইন আস।" O-K?"

শ্রুতি কোন কথা না বলে হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত পায়ে তাদের ঘরের দিকে চলে গেলেন। উদ্বিগ্ন মুখে জয়দীপও তার পেছনে গেলেন।

শ্বেতা এতক্ষণ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিল। এখন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল। অবাধ্য কৌতূহল ও

দুশ্চিন্তাকে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে কিছুতেই শ্বেতা চাবি আটকাতে পারল না। যদিও সে বুঝতে পারল—এভাবে আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনা তার খুবই অন্যায় হচ্ছে, তাও কিছুক্ষণ পর শ্বেতাও জয়দীপকে অনুসরণ করল নিঃশব্দ পায়ে। তাদের ঘরে ঢুকে বাবা-মা'র ঘরের 'আই হোলে' চোখ রেখে দেখল—শ্রুতি বিছানার ওপর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আর জয়দীপ তার মাথায় হাত রেখে সামান্য অধৈর্য্য স্বরে বলছেন—"ওঃ শ্রুতি প্লীজ স্টপ উইপিং। আই স্টিল লাভ য়ু শ্রু, আই স্টিল লাভ য়ু।"

শ্বেতা আর দাঁড়াল না। ড্রয়ার টেনে ঘড়িটা বার করে পরে নিয়ে গেট দিয়ে বেরোতে গিয়েই দেখল দীপ ও রামদীন ফিরছে। দীপ শ্বেতাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল "হাই দিদি, কি ব্যাপার, সেই সেই যে গেলি আর পাত্তাই নেই। আমরা কত ঘুরে এলাম। কি করছিলি এতক্ষণ?" শ্বেতা "যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলল স্যরি দীপু, আমি একটু বাইরুমে ছিলাম। আয়, বাগানে বসি।"

"—ওঃ তোর বাথরুম মানেই তো একঘণ্টা। যা, তুই গিয়ে বোস, আ ম মাম্মা-পাপাকে ডেকে আনি। আর কথা বলার চান্স দিচ্ছি না বাপু।"—দীপ দৌড়ে বারান্দায় উঠে গেল। রামদীন ভেতরের দিকে চলে গেল। শ্বেতা গিয়ে বাগানে বসল। সে দীপকে বারণ করতে গিয়েও পারল না।

কিছুক্ষণ পর শ্রুতি ও জয়দীপকে নিয়ে দীপ বেরিয়ে এল। শ্রুতি শ্বেতাকে দেখে চমকে উঠে বললেন।

"আরে শ্বেতা, তুমি কখন এলে? দেখিনি তো!"

শ্বেতা নতমুখে তার প্যারালালসের একটা আলগা সুতো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল—"আমি একটু বাথরুমে ছিলাম মাম্মা।"

—"ওঃ আচ্ছা, তাই বলো।"—জয়দীপ যেন আশ্বস্ত হলেন—"আচ্ছা চলো, আমরা তা'হলে এখন লাঞ্চ সেরে নিই। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

... ...

সেই রাতে আবারও শ্বেতার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের খাটে দীপ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে তার মৃদু শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শ্বেতা কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল অবশেষে। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়-মাথায় জল দিয়ে এসে আবার শুলো। হঠাৎ তার কানে জয়দীপের কথাগুলো ভেসে এল—"শী ওয়ান্টস সামওয়ানস কম্পানি। আমাদের কোন খারাপ মানে, আই মিন, ক্ষতিকর ইনটেনশন ছিল না।"...শ্বেতা বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ষোল বছরের শ্বেতার কাছে এ বড় সাংঘাতিক আঘাত। শ্বেতা মনে মনে বলল—"ওঃ গড্, হোয়াট ক্যান আই ডু নাউ। ওঃ-হো।" কাঁদতে কাঁদতেই শ্বেতা বলে উঠল—"আই হেট য়ু পাপা, আই হেট য়ু। বাট ওঃ গড্, আই লাভ য়ু অলশো পাপা, আই লাভ য়ু অলশো।"*

* ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় গৌহাটি হাজিক গার্লস কলেজে প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত। জঃ সঃ

মালতী বৌ

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মাটির দাওয়া যে এমন সুন্দর, মসৃণ আর ঝকঝকে হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তারই এক কোণে বসে পানু পালের বউ মালতী হাতির গায়ে রং-এর তুলি টানছিল। দাওয়ার সেদিকটায় লাল সাদা নীল সবুজ রং-এর ফুটকি পড়ে মনে হচ্ছিল নানান রং-এর কুচি ফুল ফুটেছে মাটির বুকে। বেশ দেখাচ্ছিল।

কুমোরের মেয়ে, মাটি আর রং এর ভেতর মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার দিনে কচিৎ কখনো মেয়েদের দেখা যেত পুতুল গড়তে বা তুলি ধরতে। মালতী যতদিন কুমোরের মেয়ে ছিল ওসবের ধার ধারেনি কিন্তু এখন শিল্পীর বউ হয়ে শিখতে হয়েছে। পানু পালের দক্ষিণের ছোট ঘরের দাওয়ায় এখনও চাকটা আছে তবে বাপ মরে যাবার পর হাঁড়ি-কলসি গড়া ছেড়েছে পানু। বাঁধা ঘর আছে তাদের পূজার প্রতিমা গড়ে। ফরমায়েসি মূর্তি গড়ে কখন-সখন। মেলার জন্য পুতুল গড়তে বউকে শিখিয়েছে তাই এখন ও-কাজটা আর নিজে করে না। অন্য সময়ে থিয়েটারে মেতে থাকে। তার নিজের থিয়েটার—পালপাড়া নাট্য-সমাজ।

মালতী নিবিষ্ট মনে হাতির হাওদায় চড়া লাল রং ধরাচ্ছিল। ভানু যে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে টের পায়নি।

হাওদায় অমন লাল রং দিচ্ছ কেন মালতী বৌ?

আচমকা প্রশ্নে মালতী মুখ ঘুরিয়ে ভানুকে দেখে বলল: ওমা, তুমি আবার কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছ। সামনে এসে বস।

ভানু সামনে এসে বসে মালতীর কাজ দেখছে। মালতী মুখ নীচু করে কি সুন্দর রং ফোটাচ্ছে হাতির গায়ে। তার হাতের আঙুল, তুলি, রং, যেন যাদু খেলছে। ভানু খুঁটিয়ে দেখছে সব।

তুলির শেষ টান দিয়ে মুখ তুলে হাসল মালতী।

ভানু তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

কি দেখছ ভানুবাবু?

তোমার কপালের সিঁদুর গুড়ো নাকের ডগায় পড়েছে।

ওমা তাই নাকি—রং হাতেই নাক মুছতে চেষ্টা করল মালতী।

ভানু হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বলল: মুছোনা। সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে?

মালতী হাত নামিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ভানু অপ্রস্তুত হয়ে বলল: বাঃ এত হাসছ কেন!

মালতী বলল, না-না হাসব কেন! হাতিটা কেমন হয়েছে বল দেখি?

ভাল হয়েছে। হাওদায় হলুদ রং দিলে ক্ষতি কি ছিল!

মালতী হেসে বলল: লাল রং না দিলে তোমার মত কার্তিক সওয়ারীকে মানাবে কেন।

ধ্যেৎ, আমি কি হাতি চড়ি নাকি!

তবে ময়ূর গড়িয়ে দেব।

পানু পাল বাইরে থেকে বাড়ীর ভেতর ঢুকে ভানুকে দেখে বলল: আরে ভানুবাবু যে।

পানুদা, তোমার বউ আমাকে কার্তিক বলছে।

পানু গায়ের জামাটা খুলে দাওয়ায় বসতে বসতে বলল: দূর তুমি কার্তিক হবে কোন দুঃখে। তুমি ভীম সেন—বলে পানু অ্যাক্টিং সুরু করল—না জানি কি গুরু অপরাধে বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি—

মালতী হেসে কুটিপাটি। একটা রাক্ষসী পুতুল হাতে নিয়ে বলল: ও ভীম সেন, এই যে তোমার বউ হিড়িম্বা—

ভানু পুতুলটাকে দেখে রেগে বলল: কি বিচ্ছিরি, মূলোর মত দাঁত।

পানু পাল ভানুকে কাছে টেনে এনে বউকে ধমক দিল—খবরদার, ভানুবাবুর বৌ হবে রাঙ্গাটুকটুকে। হিড়িম্বা নয় দ্রৌপদী গড়ে দিবি মালতী।

মালতী তখনও হাসছে। পানুর কথা শুনে ভানুর দিকে তাকিয়ে বলল: দ্রোপদী না পদী কি আহ্লাদী—বলে পা ছড়িয়ে বসা সেই আহ্লাদী পুতুল তুলে দেখাল।

ভানু রেগে বলল: পানুদা তোমার বউ নিজেই একটা আহ্লাদী!

পানু হেসে উঠল। বলল, ঢের হয়েছে বৌ। এবার আমাকে আর ভানুবাবুকে কিছু খেতে দে দেখি।

মালতী উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গান ধরল—ভানুবাবু রাগ করেছে, খেতে দেব কি। ঘরে আছে শুকনো মুড়ি ধামি ভরে দি!

ভানু হেসে ফেলল। বলল: পানুদা তোমার বউ গান গাইতেও পারে দেখছি!

পানু উত্তর দিল: ও সব পারে ভানুবাবু। চেঁকিতে পাড় দিতে জানে, চাক ঘুরাতে পারে, রাঁধতে জানে, পুতুল গড়তে ওস্তাদ কিন্তু আমি ওর কোনো সাধ—কথাটা শেষ করলনা পানু।

কি বলছ, তুমি আবার করবে কি?

পানু হেসে বলল: তাইতো বটে আমি আবার করব কি? কিন্তু তোমাকে যে বউ ক্ষ্যাপায়।

ভানু বলল: তোমার বউ এমনিতে কিন্তু খুব ভাল।

পানু হেসে ফেলল। গলা বাড়িয়ে বলল: মালতী, ভানুবাবু তোকে ভাল বলছে।

ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিল মালতী, আমার হাতের মোয়া আরও ভাল। এনে দিচ্ছি!

মালতী দু'জনকে দুটি পাত্রে মুড়ির মোয়া এনে দিল।

খেতে খেতে ভানু বলল: আচ্ছা পানুদা, সেই কবে থেকে তোমাদের বাড়ীতে আসছি বলত।

পানু বলল: আগে আমার কাঁধে চেপে আসতে এখন নিজের পায়ে হেঁটে আসছ।

ভানু অভিনয়ে করে বলল: তুমি তো কেবলই বল আগে ইস্কুলের পড়া শেষ কর তবে—

পানু বলল: দূর, তুমি কেন পুতুল গড়তে যাবে। তুমি হলে বামুনের ছেলে, লেখা পড়া শিখে চাকরী করবে। এ সব কাদামাটি ছেনতে যাবে কেন!

কিন্তু তুমিতো একদিন বলেছিলে শিল্পীর জাত নেই। আমাদের ড্রয়িং মাষ্টার দিলীপ কর, জাতে কায়স্থ তিনি তো রবি ঠাকুরের মূর্তি গড়ে প্রাইজ পেয়েছেন।

পানু কিছুক্ষণ চুপচাপ ভানুর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল: শিল্পীর জাত নেই! ঠিক আছে, শেখাব তোমাকে!

মালতী জল এনে সামনে রেখে বলল: কি শেখাবে ভানুবাবুকে?

পানু বলল: ওর সেই পুরানো বায়না—পুতুল গড়া শিখবে।

মালতী বলল: তা ভানুবাবু পারবে! রং নিয়ে বাদ-বিচার করতে শিখেছে, কোথায় কি পড়লে সুন্দর দেখায় বলতে পারে—বলে ভানুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল: ভানুবাবু, আগে আমার সাগরেদ হও তবে তো বড় শিল্পীর ছাত্তর হবে!

পানু সায় দিয়ে বলল: ঠিক। মালতীর কাছ থেকে প্রথম পাঠ নাও তুমি।

ভানু খুশি হয়ে বলল: আমাকে শেখাবে তবে মালতী বৌ?

মালতী বলল: তোমাকে নয় তো কাকে শেখাব। কিন্তু দক্ষিণা কি দেবে?

ভানু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: তোমাকে মাইনে দিতে হবে?

মালতী গম্ভীর হয়ে বলল বা: দিতে হবে না।

পানু হাসতে লাগল। বলল: বড় হয়ে গুরুকে না হয় একটা শাতনরী হার গড়িয়ে দিও ভানুবাবু—বলে হাত নেড়ে অভিনয় করল—আহ্ রমণীর অঙ্গের ভূষণ সেও জানি কত সুখ পায়—!

মালতী ঝংকার দিয়ে উঠল: হয়েছে! এবার যাও দত্তবাবু খবর পাঠিয়েছে তার আড়তের জন্য বড় গণেশ ঠাকুর গড়তে হবে!

আবারও লোক পাঠিয়েছে বুঝি। নাঃ এরা একটু হাত পা ছড়াতে দেবে না দেখছি—বলতে বলতে জামাটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেল পানু।

ভানু চুপচাপ বসে।

মালতী কাছে এসে বলল: কি ভাবছ ভানুবাবু।

ভানু চিন্তিত হয়ে বলল: ভাবছি টাকা কোথায় পাব!

মালতী হেসে উঠল। তাকে আদর করে বলল:

টাকা দিয়ে আমি করব কি! কাজ শিখে তোমার মত একটা সুন্দর পুতুল গড়ে দিও আমাকে' বলে মালতী ঘরে ঢুকে গেল!

ভানু বলল: একটা কেন দশটা দেব। তাহলে কাজ শেখাবে তো?

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিল মালতী, শেখাব।

কাল আসব কিন্তু!

এসো।

সেই থেকে ভানুর কাজে ফাঁকি নেই। স্কুল ছুটির পরে ছুটির দিনে, খেলা ফেলে মালতীর পাশে এসে হাজির হয়। কেমন করে মাটি মাখতে হয়, সেই মাটি রূপ লয় কি করে, কতটা রৌদ্রে শুখতে হয় তারপর খড়ির প্রলেপ, কোথায় কি রং ধরাতে হয়, মালতী হাতে ধরিয়ে শেখায় ভানুকে। তারপর নিজেই তার হাত পা ধুইয়ে ঘরে চিড়ে মুড়ি যা থাকে খেতে দেয়। বলে, এবার বাড়ী যাও, পড়াশুনায় মন দাও।

মালতী বড় কঠোর শিক্ষক। তাকে সন্তুষ্ট করতে হিমসিম খায় ভানু।

মালতী বৌ!

ক বলছ।

এই দেখ, এটা বাড়ীতে বসে গড়েছি।

পুতুলটা হাতে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে মালতী বলল: কিওটা?

কেন, বুঝতে পারছ না, টিয়া পাখী!

পাখী না ব্যাং 'ধেড়ে ধড়ে এমন ছোট্ট পাখা কেন! এই কি টিয়ার ঠোঁট হয়েছে—বলে মালতী সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ভানু রেগে গেল। বলল: ফেলে দিলে যে!

মালতী গম্ভীর হয়ে বলল: কিছুই হয় নি বলে। মাটির আবার দাম কি!

ভানু গুম মেরে বসে রইল। কত কষ্ট করে সে পাখীটা গড়েছিল। ভুল হয়েছে বলে অমন অনাদরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মালতী। ক'দিন আগেও এমন ব্যবহার করেছিল মালতী বৌ। সে হাঁস গড়ল। সেটা দেখে বলল, পিটটা এমন সমতল করলে ডানা, তার খাঁচা দেখাবে কি শুধু তুলি দিয়ে—বলে তার সামনেই সেটা দুমড়ে ভেঙ্গে দিল। সেদিন অভিমানে কেঁদে ফেলেছিল—আজ রাগ করে আর আসবনা বলে প্রতিজ্ঞা নিয়ে উঠে যাচ্ছিল কিন্তু পানুদার একটা কথা মনে পড়ায় বসে পড়ল। পানুদা হাতে ধরে কিছু না শেখালেও মুখে তাকে অনেক কথা বলে। বলে, ভানুবাবু, শিল্পীর ধৈর্যের পরীক্ষা বড় কঠিন। ভাঙ্গতে হয় বলে যারা দুঃখ পায় তারা গড়তে পারে না।

ভানুর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল মালতী। তাকে কাছে টেনে এনে বলল, এই নাও মাটি, আমার সামনে বসে গড় দেখি তোমার টিয়া পাখী।

ভানু বাধ্য হয়ে আবার টিয়া গড়তে বসল।

ভুল হলে নির্দয় হয় বটে কিন্তু মোটামুটি ভাল হলে প্রসংশায় পঞ্চমুখ মালতীর। ভানুর গড়া নাড়ু-গোপাল নিয়ে খুব নাচানাচি করেছিল মালতী বৌ।

ভানুর ছোটকাকা নদীর ওপারে কলেজে পড়ে। বাড়ীতে চরখা কাটে। গরমের ছুটি তখন। একদিন বলল : চল ভানু তোকে একটা মহামানব দেখিয়ে আনি।

ভানু সেভেনথ্ ক্লাসে পড়ে। মহামানব কথাটার মানে জানে। বলল, এখানে আবার মহামানব কে এল!

চলনা আমাদের কলেজে! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম শুনেছিস?

শুনেছি। বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি এসেছেন?

ভানু উৎসাহিত হোল।

ছোটকাকা তার কাটা সুতোয় বোনা একটা খদ্দরের চাদর বগলে পুরে ভানুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলেজের গেস্ট হাউসের ছোট ঘরে একটি চেয়ারে বসে আছেন শীর্ণকায় সাদাসিদে আচার্য রায়। পরণে খাদির ধুতি সার্ট, মুখে ছোট দাড়ি। মাথার চুল অবস্তস্ত। চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কলেজের অধ্যাপক ছাত্ররা। ছোটকাকা গিয়ে প্রণাম করে তাঁর হাতে চাদর দিয়ে বলল : আমি চরকা কাটি। তারই সুতো দিয়ে তৈরা চাদর এনেছি আপনার জন্য।

আচার্য হেসে ছোটকাকার মাথার চুল ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন : বেশ করেছিস। সঙ্গে ঐ ক্ষুদেটা কে?

ভানু এগিয়ে এসে প্রণাম করল, ছোটকাকা বলল : আমার ভাইপো, আপনাকে দেখতে এসেছে।

আচার্য ভানুর হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন : পেট ভরে ফেনা ভাত খাবে আর দৌড়বে। চা খাও নাকি?

আজ্ঞে না।

বাহাদুর ছেলে। চা বিষ। মিশ্রির পানা খাবে। বড় হয়ে কি হতে চাও?

শিল্পী।

আচার্য হেসে ছোটকাকার দিকে তাকাতে সে বলল : আমাদের যে কুমোর প্রতিমা গড়ে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ও পুতুল গড়াও শেখে।

ছোটকাকার কুমোর কথাটার আপত্তি জানিয়ে ভানু নিজেই বলল : আমি শিল্পী পানু পালের ছাত্র হব। এখন মালতী বৌ-এর কাছে শিখছি।

আচার্য মৃদু হেসে কুমোর ছুতোরদের কথা তুলে বাঙ্গালীর চাকরীর মোহ, তাদের ব্যবসা-বিমুখতা নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন।

পরদিন সকালেই ভানু এল পানুর বাড়ী। উদ্দেশ্য কালকের আচার্য দর্শনটি সাড়ম্বরে বলা। কিন্তু এসে দেখে থমথমে ভাব। দাওয়ার উপর পা ঝুলিয়ে মালতী বৌ চুপচাপ বসে আর পানুদা উঠানময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ভানুকে দেখে কেউ কোন কথা বলল না।

ভানু কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল : তোমাদের কখন যে ভাব আর কখন ঝগড়া হয় বুঝতে পারি না। মাঝখান থেকে আমি জব্দ হয়ে যাই!

কেউ কোন উত্তর দিল না।

এসেছিলাম একটা সুখবর জানাতে তা আর বলা হোল না দেখছি! ও পানুদা—

পানু মুখ না ফিরিয়ে বলল: কি বলছ!

ভানু উৎসাহিত বলল: জান, কাল আচার্যকে দেখে এলাম।

মালতী মুখ নীচু করেই প্রশ্ন করল: আবার আচায্যি পাড়ায় কেন?

ভানু হো হো করে হেসে উঠল। বলল: পানুদা, তোমার বৌ বলে কি শোন। আরে আচায্যি পাড়ায় নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

পানু এবার এগিয়ে এসে দু হাত উলটে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলল: আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল—সেই প্রফুল্ল।

কি সব আবোল-তাবোল বকছ দু'জনে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—নাম শোননি নাকি। বিজ্ঞানী, মস্তবড় প্রফেসর!

পানু বলল: দাড়ি মুখে, খদ্দর পরেন।

চিনতে পেরেছ তা হলে!

পানু বলল: মালতী, মইটা পেতে দে টঙ-এ উঠব।

মালতী নির্বিবাদে ঘরে ঢুকে মাচায় উঠতে মই দিয়ে এল।

পানু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বাদে একটা মূর্তি এনে ভানুর সামনে ধরে বলল, দেখ দেখি, এই মানুষটি না কি!

ভানু মূর্তি দেখে অবাক। হুবুহু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র!

তুমি গড়িয়েছ পানুদা?

মালতী বলল: আবার কে! গত বছর কলেজের ছেলেরা এনে বায়না দিয়ে গেল। টাকাও দিল না মূর্তিও নিল না। শুধু পরিশ্রম সার!

পানু হেসে বলল: ও কথা বলিস না মালতী। টাকা ঘরে এলনা বলে কি আনন্দ আসে নাই। শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ।

কথাটা মালতীর মনঃপুত হলোনা তবু সে নীরব থাকল।

ভানু ওদের কথায় কান না দিয়ে বলল: ইস্। কাল যদি এই মূর্তিটা নিয়ে আচার্যকে দেখাতে পারতাম। বলতে পারতাম, এই দেখুন আপনার মূর্তি গড়েছে শিল্পী পানু পাল—আমার গুরুর গুরু।

মালতী হেসে উঠল। বলল, ওমা, সেখানে গিয়ে-কি গুরু আর মহাগুরুর নাম বলেছ নাকি?

ভানু সগর্বে বলে উঠল, একশোবার বলব। আচার্য গুণীর কদর বোঝেন!

পানু আর মালতী হেসে অস্থির। ওদের মনে যে মেঘ জমেছিল ভানু এসে তা উড়িয়ে দিল।

ভানু বলল, আচ্ছা পানুদা, আচার্য রায়কে সামনে বসিয়ে রেখে এই মূর্তি গড়েছিলে নাকি।

আমার, কি তোমার মত ভাগ্য যে তাঁর কাছে যেতে পারব। ছবি দেখে, মুকুন্দ মাস্টারের কাছে তাঁর গল্প শুনে তবে গড়েছি।

ভানু অবাক হয়ে পানুর মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকল। তারপর বলল, বাবা বলেছেন ম্যাট্রিক পাশ করলে আমাকে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেবেন!

পানু হেসে বলল, তাই নাকি! বড় সুখবর ভানুবাবু। সেখানে অনেক বড় বড় শিল্পী আছেন। তোমার ভাগ্য ভাল।

মালতী বলল, আমি কি কম নাকি?

ভানু উত্তর দিল: তুমিও শিল্পী। পানুদা কলকাতার শিল্পীর চেয়ে কম কিসে।

পানু বিষণ্ণ সুরে বলল, বড় হতেই চেয়েছিলাম কিন্তু পারলাম কই। ভানুবাবু, আমাদের সুখচর গ্রামের বাইরে আরও কত শহরগঞ্জ আছে। বড় হয়ে যখন জানবে সব বুঝবে।

পানু পাল চিরদিনই খামখেয়ালী। ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠে হুম করে পড়া ছেড়ে দিল। বিয়ে করল। তার পর বাপের সঙ্গে জাত ব্যবসায় নেমে পড়ল। ব্যবসায়েও মন নাই। ছেড়ে দিয়ে নদীর ওপারে তারক পালের আর্ট স্কুলে ভর্তি হলো। বাপও মরল আর্ট স্কুলও ছাড়ল। মালতী তাকে কোনদিন ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। এখন থিয়েটার হয়েছে ব্যাধি। বাবার আমলের তিনঘর গ্রাহক আছে তাদের পূজার প্রতিমা গড়ে। নতুন খদ্দের এলে সময় নেই বলে ফিরিয়ে দেয়। মনের মত মূর্তি গড়ার কাজ পেলে নেয় নইলে নয়। তবে মাঝে মধ্যে পরিচিত সুহৃদ-স্বজন চেপে ধরলে তাদের কাজ করে দেয়। যেটুকু কাজ করবে তাতে খুঁত নেই। কম কাজ করেও সুখচর গ্রাম আর তার আস পাশের অঞ্চলে পানু পালের নাম ডাক আছে। পানু কাজ করবে কিন্তু তার দাম আদায় করতে তার ঘোরতর আলস্য। আর যখন পাওনা মিলল তার অর্দ্ধেক যাবে পালপাড়া নাট্যসমাজে বাকীটা মালতীর হাতে।

মালতী রেগে বলে, তুমি তো শিল্পী, তোমার সৃষ্টি আর আনন্দ নিয়ে আছ। আমার কোন আনন্দ থাকতে নেই। তোমার ঘর সামলাব আর ফুটো হাঁড়ি নিয়ে কপাল চাপড়াব—তাই না?

পানু উত্তর দিল: পয়সা দিয়ে হবে কি। ছেলে-পুলে নেই ভাই-বোন নেই। শুধু তুই আর আমি, ভাবনা কি তবে? আনন্দ তো মনে। তোর মনের জোরে দুঃখ কষ্ট ভুলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস মালতী। নইলে আমি তলিয়ে যেতাম।

মালতী অতি দুঃখেও হেসে ফেলল। বলল: নাটক তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। পার শুধু কথা দিয়ে ভোলাতে! মনে জোর থাকলেও হাত তো দুটো। তোমার দু'র্গার মত দশটা নয়।

পানু হেসে বলল: শিল্পীর বউ হয়ে এ তুই কি বললি? দুর্গার ও দুটো হাত—দু'হাতে দশ হাতের শক্তি ধরেন বলে ভক্তদের দশটা হাত দেখাতে হয়। তোর দুটো হাতে কি কম শক্তি রে!

মালতী দু হাত যোড় করে বলল: হয়েছে আর সুখ্যাতিতে দরকার নেই। তা এই অবেলায় এমন সেজে গুজে চললে কোথায়?

পানু বলল : গাঙ্গুলী বাড়ী। কর্তাবাবা স্মরণ করেছেন।

ভানুবাবুদের বাড়ী যাচ্ছ! তা ভানুবাবুকে ডেকে সঙ্গে নাও—ও আর কতক্ষণ কাদা-মাটি নিয়ে পড়ে থাকবে।

ভানু বারান্দায় এক কোণে বসে একমনে পুতুল গড়ছে।

ও ভানুবাবু একবার এদিকে এস দেখি।

ভানু ঘরের ভেতর ঢুকে বলল : কি বলছ!

পানু প্রশ্ন করল : অনেক দিন তো হয়ে গেল। কেমন শিখলে?

ভানু হেসে বলল : এবার যখন আমাদের বাড়ীতে দুর্গা গড়তে যাবে ছনু পালকে আর সঙ্গে নিতে হবে না। আমি তোমার সহকারী হব।

বটে! তা এখন কি গড়ছ?

হুঁকো হাতে বুড়ো। জান পানুদা, আমি বুড়োর গলায় পৈতে আর মুখে দাড়ি বসাতে চেয়েছিলাম কিন্তু মালতী বৌ-এর আপত্তি।

কেন?

মালতী এক কোণে বসে হাসছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে ভানু বলল : মালতী বৌ বলে, বুড়ো হলেই কি তাকে বামুন হতে হবে নাকি? আর দাড়িতে নাকি বুড়োর তামাক খাওয়া মুখের সুখ ঢাকা পড়বে।

পানু মালতীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল : শিল্পীর বউ নিজেও শিল্পী হয়েছে তো! ওর মতামতটা শুনতে হবে বৈকী! তবে ভানুবাবু বুড়োর দাড়ি দিলে তার রং কি দেবে?

কেন সাদা।

উঁহুঁ। হুঁকো-খেগো বুড়োর দাড়ি কখনও সাদা হয় দেখেছ, তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে হয়ে যায়!

মালতী হেসে উঠল। বলল : তাই বলছিলাম কি দরকার এত ঝঞ্ঝাটে। দাড়ি তুমি বড় হয়ে লাগিও।

পানু বলল : এবার গুরুর মুখে ছাত্রের কথা শুনি।

মালতী বলল : ভানুবাবু কেমন শিখেছে তা নিজের চোখে দেখ একবার। ভানুবাবু তোমার গড়া পুতুল এনে দেখাও ওঁকে।

ভানু বারান্দা থেকে কটা পুতুল এনে দেখাল পানুকে।

পানু দেখে খুশী হোল। মালতীকে বলল : ভানুবাবু গড়েছে মন্দ নয়।

মালতী বলল : আমার বিদ্যা শেষ। এবারে তোমার ছাত্র হবে ভানুবাবু।

ভানু হেসে বলল : পানুদা, আমি শিল্পী হতে পারব তো!

আলবৎ পারবে। প্রথম প্রথম ভুল তো সবার হয়। তোমার ও-পুতুলে ভুল আছে কিন্তু তাতে হয়েছে কি। কাজে ফাঁকি দেবে না। মালতী তোমাকে ভাল শিখিয়েছে আর ভাল তোমার হাতও।

আমি কবে তোমার ছাত্র হব ?

পানু হেসে মালতীর দিকে তাকাল। তারপর বলল : এখন থেকে তুমি নিজের বাড়ীতে বসে গড়তে থাক। তারপর আমাকে এনে দেখাও। ব্যস, ছাত্র তখন থেকেই। নাও, এবার চল আমার সঙ্গে !

কোথায় ?

তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। তোমার ঠাকুর্দা ডেকে পাঠিয়েছেন।

পানুকে দেখে ভানুর ঠাকুর্দা ভুবন গাঙ্গুলী বললেন : আমাকে একটা বড় মূর্তি গড়ে দিতে হবে পানু !

ভানু বলল : কার তোমার নাকি !

ভুবন হেসে বললেন : আমারটা আমাদের বাড়ীর কুমোরটা গড়ে দেবে। পানু গড়বে আমার বাবার। এবারে শোন যা বলি, পুরাণ নথিপত্র ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ বাবার একটা ফটো পেয়ে গেছি অবশ্য পোকায় অনেকটা কেটে ফেলেছে কিন্তু মুখটা সম্পূর্ণ আছে !

ভানু হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পানু তাকে শাসিয়ে দিয়ে বলল : ফটোখানা একবার দেখান দেখি।

ভুবন বললেন : দেখাব বলেই তোমাকে ডেকেছি। এখন দেখ পারবে কি না।

—বলে টেবিলের দেরাজ খুলে একখানা পোকায় কাটা বহু পুরান ফটো পানুর হাতে দিলেন।

পানু ফটোখানা হাতে নিয়ে চুপচাপ দেখতে থাকল।

ভানু দেখে বলল : দূর এটা দিয়ে কি মূর্তি গড়া যায় ? বুক পেট সব পোকার পেটে। পায়ের অর্ধেক নেই। এমন ছেলে সে বাপের ফটো যত্ন করে রাখতে পারে নাই।

ভুবন হেসে ফেললেন। বললেন : বাবার যে ফটো আছে তাই কি ছাই জানতাম নাকি !

পানু ফটোর দিকে তাকিয়ে বলল : মানুষের মুখ আর চোখটাই আসল। হাত পা থাকলে ভাল। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মূর্তি আমি গড়ে দেব কর্তাবাবা তবে এমন খাড়া অবস্থায় নয়—বসা মূর্তি, যেন ধ্যানে বসেছেন।

ভুবন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন পানুর দিকে বললেন : হঠাৎ ধ্যানের কথা মনে পড়ল কেন কেউ কিছু বলেছে নাকি তোমাকে, বলে ভানুর দিকে তাকালেন।

ভানু বলল : তোমার বাবা সন্ন্যাসী হয়েছিল গল্প করেছ কিন্তু তার যে ফটো আছে, ফটো দেখে পানুদা মূর্তি গড়বে এ কথা বলেছ আমাকে ?

পানু বলল : না কর্তা বাবা, কেউ কিছু বলেনি। ঠাকুরের চোখ মুখ দেখে মনে হলো খুব একটা সংসারী ভাব নয়। তাই বললাম ধ্যানে বসলে মানাবে ভাল।

ভুবন বললেন : আমার বাবার আমিই প্রথম এবং শেষ সন্তান। আমার বয়স যখন ছ সাত বছর

তখন তিনি গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান আর ফিরে আসেন নাই।

পানু ফটোর দিকে তাকিয়ে হাসল আর কিছু বলল না।

ভুবন বলল : তুমি একটা বড়সড় মূর্তি বানিয়ে দাও। আমি বৈঠকখানা ঘরে সাজিয়ে রেখে দেব। সবাই দেখবে। তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দেব।

ভানু আপত্তি জানিয়ে বলল : পঞ্চাশ টাকায় হবে না আরও কিছু বাড়াতে হবে বড়দাদা।

পানু হেসে বলল : ভানু আমার সহকারী কি না তাই দরদাম করছে। তা ভানুবাবু, আগে মূর্তিটা তো গড়ি তারপর দেখে শুনে কর্তাবাবা বাড়িয়ে দেন ভাল, নইলে পঞ্চাশেই রাজী হয়ে যাও।

ভুবন হেসে বললেন, সেই ভাল কথা। আমাদের ভানু কুমোরকে দিয়ে না হয় কাদা ছেনার কাজটা করিয়ে নিও।

ভানু বিরক্ত হয়ে বলল : কুমোর আমিও নই পানুদাও নয়। আমরা শিল্পী। মূর্তি গড়ার মাটি তৈরি করতে হলেও শিল্পী হতে হবে।

ভুবন কৌতুক করে বলল : তাই নাকি ?

নিশ্চয়ই। মাটি এঁটেল হবে না সড়সড়ে হবে, কতটা তুষ, কতটা গোবর কি ভাবে মাখতে হবে ধারণা আছে তোমার।

পানু হেসে তাকে থামিয়ে বলল : তুমি যত বক্তৃতাই কর ভানুবাবু—কর্তাবাবা ওকে মাটি ছেনা ছাড়া আর কিছুই বলবেন না।

ভুবন হেসে উঠলেন। বললেন : তাহলে পানু ঐ কথাই থাকল। তুমি আগাম কিছু টাকা নেবে নাকি।

ভানু বলল : মুখ ফুটে বলবে নাকি পানুদা ! তুমি দিয়ে দাওনা।

পানু বলল : না কর্তাবাবা। আগে কাজ তারপর টাকার কথা।

পানু কথা বলছে আর ফটো নিয়ে মাঝে মাঝে দেখছে।

এ ফটো নিশ্চয়ই বিয়ের পরে তোলা। আপনার মা কিছু বলেন নাই কোনদিন।

ভুবন একটু অবাক হয়ে বললেন : মাও অল্প বয়সে মারা গেছেন। তখন বোধ হয় আমার বয়স হবে বছর পনের। তিনি কাঁদতেন আর আমাকে বলতেন সন্ন্যাসী যদি হবি তবে বিয়ে করবিনা খোকা। আর কিছু আমার মনে নেই !

থাক ওতেই হবে—বলে পানু ফটো নিয়ে চলে গেল।

ভানু বাড়ীতে বসে পুতুল গড়ে। পানুর কাছে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

একদিন পানু পালের বাড়ী যেতেই মালতী বলল : ভানুবাবু, তোমার ঠাকুর্দার পায়ে শত শত প্রণাম।

আরে দেবে তো পঞ্চাশ টাকা তার জন্য আবার এত প্রণাম কিসে।

পঞ্চাশ কেন দশ দিলেও ভাল। এমন কাজ তিনি দিয়েছেন যে লোকটা থিয়েটার-যাত্রা ভুলেছে। বাড়ীর বাইরে এক পাও যায় না।

ভানু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : সে কি ! এই যে পানুদা বলল, এখন যাচ্ছি শ্বশুর বাড়ী, পরে এসে মূর্তি গড়ব। (ক্রমশ :)

কেন্দ্রীয় ও রেল বাজেট ঃ

১৯৭৭-৭৮ এর কেন্দ্রীয় বাজেট কিম্বা রেল বাজেট পরাজিত কংগ্রেস সরকারের তৈরী। নূতন জনতা সরকার দায়িত্ব নিয়ে বাজেট রচনার সময় পান নাই। এবার নূতন বছরের চার মাসের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ভোট-অন-একাউন্ট বাজেট জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী এইচ, এম, প্যাটেল পাশ করিয়ে নিয়েছেন। মে-মাসের নূতন বাজেটে জনতা সরকারের অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায়-নীতির কাঠামোতে বাজেট উপস্থাপিত করা হবে।

১৯৭৬-৭৭ সালের অনুমিত ঘাটতি, বছরের শেষে সংশোধিত হয়ে ৪২৫ টাকা দাঁড়াবে। কিন্তু প্ল্যানের এবং প্ল্যান বহির্ভূত খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পাবার দরুণ বাজেট প্রস্তাবের মোট ঘাটতি ১৪৩২ কোটিতে পৌঁছাবে। আর বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটির বিশেষ ঋণ গ্রহণ করে ঘাটতির পরিমাণ ৬৩২ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। ১৯৭৬-এর মার্চ থেকে এ-যাবৎ পাইকারী মূল্য-সূচকের হার শতকরা ১২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবার ফলে অতিরিক্ত ফাঁপাই মুদ্রা দিয়ে বাজেটের ঘাটতি মেটানো সম্পর্কে নূতন অর্থমন্ত্রী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই কারণে সব দিক খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় দপ্তরের সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কোনোও নূতন পরিকল্পনায়, নূতন খাতে ব্যয় নির্বাহে নিষেধ, ব্যয়সঙ্কোচন ও অতিরিক্ত চাকচিক্য বন্ধ করে সাদাসিধে ভাবে চলবার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯৭৭-৭৮-এ অন্তবর্তীকালীন বাজেটে প্রতি-টাকা কি ভাবে আয় হবে এবং অর্জিত প্রতি টাকা থেকে কোন কোন খাতে ব্যয় হবে তার একটা হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায়।

১৯৭৭-৭৮-এর আয়ের প্রতিটাকার মধ্যে ঃ ২২ পয়সা শুল্ক থেকে, ১০ পয়সা কাস্টমস থেকে, ৮ পয়সা করপোরেশন ট্যাক্স (যৌথ কোম্পানীর) ট্যাক্স থেকে, ২ পয়সা আয়কর থেকে এবং ২ পয়সা অন্যান্য ট্যাক্স থেকে আয় হবে। রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে আয় হবে ২৫ পয়সা, ঋণ আদায় খাতে ১১ পয়সা, বাজার ঋণ, স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড খাতে ১০ পয়সা, বৈদেশিক ঋণ খাতে ৬ পয়সা, এবং অন্যান্য খাতে আদায় দশ পয়সা। ৪ পয়সার ঘাটতি কোনো আয় দিয়ে মেটানো যাবে না।

অর্জিত প্রতিটাকা থেকে ব্যয় হবে ঃ পরিকল্পনায় ৩৭ পয়সা, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ২০ পয়সা, প্রতিরক্ষায় ১৮ পয়সা, দেয় সুদ

বাবদ ব্যয় ১১ পয়সা, সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যসমূহে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দিতে হবে পাঁচ পয়সা, বিবিধ ব্যয় বাবদ নয় পয়সা।

নূতন রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতেও বিগত রেলমন্ত্রীর তৈরী বাজেট লোকসভায় উপস্থাপিত করেন। বাজেটে ২৬.৪৫ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। রেলের যাত্রী-ভাড়া এবং মালের মাশুল অসম্ভব চড়িয়ে ১৯৭৪-এর মে-মাসের রেলধর্মঘটের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা জাতীয় ক্ষতি বিগত কংগ্রেস সরকার মিটিয়েছে। অথচ রেলকর্মচারীদের মোট দেয় ৪০ কোটি টাকা দিতে কংগ্রেস সরকার কিছুতেই সম্মত হ'লনা।

নূতন রেলমন্ত্রী তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এক ঘোষণায় বলেন ১৯৭৪-এর মে মাসের ধর্মঘটের জন্য স্থায়ী-অস্থায়ী যে সব রেল কর্মচারীর সাময়িক বা স্থায়ীভাবে পদচ্যুতি হয়েছে, তাদের চাকুরীতে বিনা ছেদে আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে নির্দেশ দিয়েছেন।

গাছেরা ঘুমাতে জানে

দিলীপকুমার কোনার

গাছেরা ঘুমাতে জানে,
জানে কাকে বলে জাগরণ।
প্রস্তাবনা,
পাণ্ডুলিপি নিয়ে
আমরা অনেক ক্লেশে
স্বপ্নের শিশুদের খুঁজি :
অথচ প্রাচীন গাছের বুকে হাত রেখে,
প্রয়াস, প্রতিজ্ঞা রেখে ভুলে যাই
সহিষ্ণুতা, ক্ষমা :—
তাই দেখি
কখন আমরা সবাই হয়েছি একাকী।

ভুল সংশোধন

১৩৮৩ র ফাল্গুণ সংখ্যা 'জয়শ্রী'র "রুশ-চীন দ্বন্দ্ব" প্রবন্ধে ৬৫৬ পৃষ্ঠার ২ কলমের ১৪-১৫ লাইনে "তিন হাজারের মধ্যে এই প্রথম তার সীমান্ত অতিক্রম করের" পরিবর্তে "২০০ বছরের মধ্যে এই প্রথম তার সীমান্ত অতিক্রম করে" পড়তে হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। জঃ সঃ

লেখকের নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	কয়েকটি কবিতা (কবিতা)	৪৫
	চিঠিহীন কলকাতা "	২৫৭
অভয়শঙ্কর শর্মা	মানবাত্মার মুক্তি সংগ্রাম : সলঝিনিৎসিন-শাখারভ	৬১
	রুশ-চীন দ্বন্দ্ব (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	১০৯, ১৫৭, ২২০, ৩৬৬, ৪৭৩, ৫৯৯, ৬৫৫, ৭০৩
	মাও-সে-তুঙ (আলোচনা)	৪২৭
অন্নদামোহন বাগচী	জীবনের আয়নায় (গল্প)	১৭১
	জীবনের আয়নায় (গল্প)	৩১৭
	স্মৃতির তর্পণে (গল্প)	৪৮৫
অশোক মিত্র	আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো ? (সেমিনার)	২৬০
অরুণকুমার সেনগুপ্ত	শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র (আলোচনা)	৩৭৬
অতীন্দ্রনাথ বসু	সমাজবিদ্যায় বিজ্ঞানায়ন (পুনমুদ্রণ)	৪৬৩
অমূল্যভূষণ সেন	বর্তমানে সুভাষভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা (সেমিনার)	৫২৩
অমিয় চক্রবর্তী	কলকাতা (কবিতা)	৫৮৩
অমিয় চক্রবর্তী	বীর-বন্দনা (কবিতা) প্রচ্ছদ, নেতাজী সংখ্যা	৫৮৩
অলকরঞ্জন বসুরায় চৌধুরী	সুভাষচন্দ্র : বাংলা কবিতায় (আলোচনা)	৫৮৬
'আন্ পারসান্'	রকমারি গ্রেপ্তার ; অন্তকালে, অন্যদেশে	৬৬৮
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	কয়েকটি কবিতা (কবিতা)	৪৩
	কবিতা : সত্তর দশক (কবিতা)	২৫৫
কৃষ্ণ ধর	কলিকাতা (কবিতা)	২৫৬
গোপাল ভৌমিক	সচেতন শিল্পের তাগিদে (কবিতা)	৩৫৫
চারণিক	'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল'	২৫৩
	'আমি লহরে লহরে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলছি'	৬৪৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার	দিস ডিলাইট ইজ গড (গল্প)	১২৩
	ইন টিউন উইথ গ্রেস (কাহিনী)	৬২৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের মূল্যায়ন (গ্রন্থ-পরিচিতি)	৯
	শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে অনৈতিহাসিক রাজনীতির অনুপ্রবেশ (একটি প্রতিবাদ পত্র)	৪৮১
ত্রিপুরাশংকর সেন	প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)	১১৯
	'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের শতবর্ষ পূর্তি (প্রবন্ধ)	১৯৮
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	আঞ্চলিক সাহিত্য (গ্রন্থ-পরিচিতি)	১৩১
	ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার আদিপর্যায় (অনুবাদ কবিতা)	২০৩
	টিউলিপ (কবিতা)	৩৬০
	কয়েকটি কবিতা (কবিতা)	৬৪৯
দিলীপ কুমার কোণার	ছোট ছোট পাখির জীবন নিয়ে (কবিতা)	৭০২
	গাছেরা ঘুমাতে জানে"	৭৩৩
ধীরেশ ভট্টাচার্য	কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে (আলোচনা)	৭৩
নারায়ণ চৌধুরী	শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা (আলোচনা)	৩৭
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ	গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয় খণ্ড (গ্রন্থ-পরিচিতি)	৩৪
	আগামী শতাব্দীর কলকাতা (সেমিনার কলকাতা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে)	৩৯৭
পবিত্র কুমার ঘোষ	স্বামীজী নতুন রূপে (গ্রন্থ-পরিচিতি)	২৫
	সভ্যতার স্বপ্ন (কলকাতার পশ্চাৎভূমি সুন্দরবন)	৩৬৪-৮
	বর্তমানে সুভাষভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা	৫৩৩
প্রলয় সেন	ডায়েরী থেকে (গল্প)	৩৩৭
পুলকেশ দে সরকার	সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ (প্রবন্ধ)	৬৭৫
ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	মালতী বৌ (গল্প)	৭২২
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শীত যখন গভীর (কবিতা)	৪৪
বিজয় কুমার নাগ	বাংলার শরৎ—ভারতের দরবারে (সমীক্ষা)	৪৯
বাসুদেব দেব	ছুটি কবিতা (কবিতা)	১৪০

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাসুদেব দেব	তাকে শুধু দুঃখে রেখো (কবিতা)	৩৬৩
	কয়েকটি কবিতা (কবিতা)	৪৯১
বিজন কুমার ঘোষ	শনির দশা (গল্প)	৩২৩
বিদ্যুৎ পর্ষৎ,	বিদ্যুতের যোগান ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (সেমিনার)	৩৬৪·১৫
B. K. Saha	Economic Planning of Netaji Subhas & Role of Public sector in India	৫০৯
বিনয় কুমার বসু	'পথবেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' (একটি ঐতিহাসিক ঘটনা)	৫৪৬
ভোলানাথ সেন	এ শতাব্দী শেষে কলকাতা (সেমিনার)	২৭০
V, V. Giri	My Association with Netaji Subhas Chandra Bose	৫০৭
ভূদেব চৌধুরী	বর্তমানে সুভাষ-ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা	৫১৩
মানস রায় চৌধুরী	মেঘভাঙা (কবিতা)	৩৫৭
মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়	আগামী শতকের কলকাতার রূপরেখা (সেমিনার)	৩৬৪·১০
মৃণাল বিশ্বাস	আফ্রিকা : কালোমানুষের মুক্তি-সংগ্রাম (আলোচনা)	৬১১
ডঃ মঞ্জুলা ভট্টাচার্য	রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি বাংলা কবিতার ইংরেজী রূপান্তর (প্রবন্ধ)	৬৬৩
রাখাল দত্ত	এবছরের বাজেট	৬২
রাজর্ষিরঞ্জন দাশগুপ্ত	গঙ্গারাষ্ট্র (ইতিহাসের সন্ধানে)	৭৫
রমেশচন্দ্র মজুমদার	ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিমত (ঐতিহাসিক দলিল)	১৫০
রু চরা মুখোপাধ্যায়	আলো যে যায়রে দেখা (গল্প)	১৭৮
রামকৃষ্ণ চন্দ	আবার ফিরিয়া আসি (কবিতা)	৩৯০
রিপিতা দত্ত	বিগত (গল্প)	৩৮৭
শিবব্রত ঘোষ	গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্র ৩০, (আলোচনা)	১২৫
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	বিষয় চলচিত্র (গ্রন্থপরিচিতি)	৮১
	দুটি কবিতা (কবিতা)	১৩৮

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
—নন্দ মুখোপাধ্যায়		
	কলকাতা : ১৯৭৬ (কবিতা)	৩৫৯
	কয়েকটি কবিতা (কবিতা)	৪০৩
—ীল দাশ	জয়শ্রীর জয়যাত্রা (কবিতা)	১০৮
	প্রতিক্ষায় বসে থাকি (কবিতা)	৩৫৫
— সাদ সমাদ্দার	পৌর সংস্থা তথা রৌপ্যমুদ্রানি	২৭৮
নাথ বসু	ফেরোমোন (বিজ্ঞানধর্মী গল্প)	৩০১
। চক্রবর্তী	ভারত চেতনার প্রসারে ভারতসভা (শতবর্ষের আলোকে)	৩২৯
গুপ্ত	ব্যাংকিং : একটি সেমিনার	৮৩
	বাংলার রেনেশাঁস (গ্রন্থপরিচিতি)	১০২
[redacted]	রাত-দুপুরে স্বাধীনতা এলো (গ্রন্থপরিচিতি)	২০৫
	শতাব্দীর সাধনা (গ্রন্থ-পরিচিতি)	৪৪৭
সলঝেনিৎসিন	হুঁশিয়ার (বেতার ভাষণ)	১৫৪, ২২৭
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	একবিংশ শতাব্দীর প্রজাপতি (কবিতা)	২৫৭
সুবিমল ঘোষ ও পীযূষকান্ত সোম	বস্তি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কয়েকটি ভাবনার বিষয় (সেমিনার)	২৮৬
সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়	সেই সাধ থেকে গেল মনে (কবিতা)	৩৫৫
সৌমিন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	কলকাতা কখনো তুমি কল্লোলিনী হবে ? (কবিতা)	৩৬৩
ডঃ সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়	একবিংশ শতাব্দীর কলকাতা কেমন হবে ? (সেমিনার)	৩৬৪.১
সুহাস দাস	গেছেল (গল্প)	৩৭৯
সুমিতা চৌধুরী	জাপানের নবীন বর্ষবরণ উৎসব	৪০০
সমর গুহ	আসিবেনা তুমি !	৫৩৬
সুমনা দাস	শিলাজতুর সুবাস (কবিতা)	৬২৩
	অনিদ্র রজনীতে (গল্প)	৭১৮

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সমর দত্ত	সাহিত্যে সমকালীনতা ও আধুনিকতা (আলোচনা)	৭১৩
হরিদাস কর	কীর্তন সংগীতের বর্তমান অবস্থা (আলোচনা)	১৮৩
সম্পাদকীয়	যুগান্তরের পথে	২
	দুই হাজার খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা	২৪৫
	সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধন বিল	৩১১
	সুভাষ চরিত্রের উপাদান	৪৯৯
	নির্বাচনের ডাক	৫৭৫
	দিন আগত ঐ	৬৩৭
সম্পাদকীয়	রাজনৈতিক ভূকম্পন	৬৮
	বর্তমান প্রসঙ্গ	১৪৬, ১৯৩, ২৩০, ৪৫১, ৫৮৭, ৬৫৫
	পুস্তকপরিচয়	১৮৭, ৫৭৭
বিবিধ	কলকাতা বন্দর একটি সমীক্ষা	৩
	অতীন বসুর প্রথম জীবন	৪
	শ্রদ্ধার্ঘ্য-অনুষ্ঠান	৫৩
	কেন্দ্রীয় ও রেল বাজেট	৭৩
	বর্ষসূচী	৭৫

২০৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

...নস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

	১৫·০০
কেট সহ	১৭·০০
...	৭·০০
... ধর্ম	১৫·০০
... id Gita (in English) ... Ch. Ghosh)	
...া (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
... (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
(কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
...গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
... জ্যাকেট সহ	১·৫০
	১·৫০
... সংস্করণ)	৫·০০
...ক্ষা	১·৫০
...াণী	৭·৫০
... Speaks	
...ত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

... অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান ... অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী ...।

...কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের ...ালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন ...কবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের ...ীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

...ধর্ম"—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে ...চনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

...ঘোষ এম. এ., বি. টি.

	৩·০০
...চ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইন্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃঃ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

স্বাঃ
পুনর্গঠ
অদ্বিতী—

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে ব্যবহার করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পুরণ হয়, নূতন শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00 with Regtd Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস